ISSN 2227-1635

বাঙলা সাহিত্যিকী

সাহিত্য • সংস্কৃতি • ইতিহাস • ঐতিহ্য
বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

নবপর্যায়: দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়ঃ ৩য় সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যিকী

সাহিত্য • সংস্কৃতি • ইতিহাস • ঐতিহ্য

বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সম্পাদক

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ ইকবাল হোসেন

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, বাংলাদেশ

বাঙলা সাহিত্যিকী

নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

প্রকাশকাল:

ভাদ্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ

সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব):

মোহা: ওলিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব):

আহম্মদ শরীফ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বর্ণবিন্যাস:

মো: রবিউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মো: আবদুর রহিম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ গোলাম কিবরিয়া, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বিবেকানন্দ বিশ্বাস, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

đ প্রকাশনায়:

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

এই পত্রিকার কোন প্রবন্ধ পূর্বানুমতি

ব্যতিরেকে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদ:

বাবুল, রাজশাহী

মুঠোফোন: ০১৯৩৩-৪১১৪১০

মূল্য: $ ১২০.০০

টঝ ৳ ৭.০০

Bangla Shahittiki *(Bengali Research Journal)*

Edited by: Mr. Dr. Ibrahim Ali, Printed by: Shahpir Chisti Printing Press, Kadirgonj, Rajshahi, Published by: Department of Bengali, Rajshahi College, Rajshahi, Bangladesh.

e-mail: bangladepartment1959@gmail.com

বাঙলা সাহিত্যিকী

প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান

অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উপদেষ্টা

প্রফেসর মোঃ মোশাররফ হোসেন

বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ

প্রফেসর মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর আল-ফারুক চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সদস্য

মোঃ কামরুজ্জামান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোহাঃ ওলিউর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ড. মোসাঃ ইয়াসমীন আক্তার সারমিন

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোঃ ইকবাল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মঈন উদ্দীন আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পুলক কুমার সরকার

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

(প্রবন্ধের বক্তব্য ও অভিমতের দায়বদ্ধতা সম্পাদনা পরিষদ বহন করে না)

বজলুর রহমান খান
ও
মোঃ শাহাদাত হোসায়েন
সম্পাদিত

সাহিত্যিকী

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

বাঙলা সাহিত্য মজলিস
রাজশাহী কলেজ

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 'সাহিত্যিকী'র প্রচ্ছদ

সম্পাদকীয়

গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক, প্রবহমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিরন্তর যুগোপযোগী ও সার্থক বাহক রাজশাহী কলেজ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টিতে কলেজের বাংলা বিভাগ সুপরিসর ক্ষেত্র নির্মাণে বদ্ধপরিকর। মননঋদ্ধ ও সৃজনব্যাপ্ত দিগন্তকে প্রসারিত করার ধারাবাহিকতায় 'বাঙলা সাহিত্য মজলিস'-এর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল গবেষণা পত্রিকা 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র তৃতীয় সংখ্যা। এ সংখ্যাতে রবীন্দ্র-পূর্ব ও উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান ও 'বাঙলা সহিত্যিকী'র মূলচেতনা 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূত হয়েছে- গবেষণা পত্রিকার চারিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে। উনিশ শতকীয়শোভন বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর কাব্যেই আধুনিকতার যোজক জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম প্রথম স্ফুরিত হয়। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুমাত্রিক প্রতিভা ও অবিস্মরণীয় অবদান বাঙালির নিকট অবশ্যই স্বীকার্য। ঔপনিবেশিক যুগে রাজশাহী শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং এ শহর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে কারণে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সাহিত্যের পাশাপাশি রাজশাহীর পত্র-পত্রিকার উপর লিখিত একটি স্বল্পপরিসর প্রবন্ধ এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের অক্ষয় সৃষ্টি ও অমরকীর্তি বাঙালি পাঠক সমাজে আজও সমাদৃত। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে নবপ্রেরণা এবং নবউদ্যোগে শুরু হয় নব্য সংস্কৃতির বুনন ধারা। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাসের উত্তরাধিকার রূপে ইসলামের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে আত্মনিমগ্ন হলেন। আবার অনেকেই স্বাধিকার ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বিপ্লবী চেতনাকে সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটালেন, একই সাথে গভীর সমাজমনস্কতারও পরিচয় দিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফররুখ আহমদ, জহির রায়হান, আনোয়ার পাশা, শওকত ওসমান, আল মাহমুদ প্রমুখ। এ সকল কবি ও সাহিত্যিকদের অসামান্য অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রচিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র অবয়বে পূর্ণতা এনেছে।

রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের শুভ উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যিকী' সৃজনশীল ও মননশীল লেখক-পাঠকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে– এ আমাদের প্রত্যাশা। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মৌলিক মানসম্মত প্রবন্ধে পত্রিকাটির অবয়ব ঋদ্ধ করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাজশাহী কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু গবেষণা পত্রিকা 'বাঙলা সাহিত্যিকী' নবপর্যায়-৩য় সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। রাজশাহী কলেজের বর্তমান প্রশাসন বিশেষ করে অধ্যক্ষ প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান- যাঁর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ, অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র বাস্তবিক আত্মপ্রকাশ, তাঁর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অন্তহীন বিনম্র শ্রদ্ধা। পত্রিকাটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বাংলা বিভাগের যে সকল কর্মযোগী শিক্ষকের নিরলস শ্রম ও কর্মনিষ্ঠা তাঁদের প্রতিও ধন্যবাদ এবং সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রাবন্ধিকগণের জন্য জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:

রাজশাহী কলেজ, বাংলা বিভাগ থেকে ষাণ্মাসিক রূপে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যিকী' একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পত্রিকা। আগ্রহী লেখক-প্রাবন্ধিক 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক বাংলা ভাষায় লিখিত যে কোন প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলো থেকে রিভিউবোর্ড কর্তৃক মনোনয়নপূর্বক প্রকাশের জন্য নির্বাচন করা হয়। পূর্বে প্রকাশিত বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান/ পত্রিকায় দাখিলকৃত প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র সম্পাদনা পরিষদ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের যে সব বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করে তা নিম্নরূপ:

১. প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব বজায় রাখা।
২. গবেষণা প্রবন্ধের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা।
৩. ফুটনোট ব্যবহার ও যথাযথ প্রয়োগ করা।
৪. গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করা।
৫. প্রবন্ধের শুরুতে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ সংযোজন করা।
৬. প্রবন্ধের বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা। (তবে উদ্ধৃতিমূলের বানান অবিকৃত থাকবে)।
৭. প্রবন্ধের পরিসর যথাসম্ভব আট থেকে বার হাজার হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখা জমাদানের

শেষ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

'বিজয়' সফটওয়্যারে 'SutonnyMJ' ফন্টে কম্পোজ করে প্রবন্ধের দুই সেট প্রিন্ট কপি সিডিসহ জমা দানের জন্য অনুরোধ করা হল। এছাড়াও নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা প্রেরণ করা যাবে bangladepartment1959@gmail.com। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

যোগযোগের ঠিকানা:

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোন: ০১৫৫৬-৩১৩৪৭৭
ফোন: ০৭২১-৭৭২৬২৩

মো: ইকবাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোন: ০১৭১৫-৭১৫০৭১
ফোন: ০৭২১-৭৭২৬২৩

সূচিপত্র

ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার: ফররুখ আহমদ ১

ড. ফরিদা সুলতানা
বাংলাদেশের গণআন্দোলন এবং কথাসাহিত্য ৫১

মোহা: ওলিউর রহমান
বাংলা ছোটগল্প: রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ৬১

ড. ইয়াসমীন আকতার সারমিন
উপনিবেশিক যুগে রাজশাহীর পত্র-পত্রিকা ও মধ্যবিত্ত সমাজ ৮৩

মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান চৌধুরী
দিবর দীঘির বিজয়-স্তম্ভ ও বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ: একটি নতুন পর্যবেক্ষণ ৯২

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী
মধুসূদনের কাব্য: জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ১০০

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী
তিস্তাপাড়ের গান ১১৩

ড. মোঃ আবদুল মজিদ
নজরুলের কবিসত্তায় আমিত্বের প্রভাব : একটি নিবিড় পর্যালোচনা ১২৩

মঈন উদ্দীন আহমেদ
বাংলা উপন্যাসে জেলে জীবন: প্রসঙ্গ পদ্মানদীর মাঝি ও গঙ্গা ১৩৪

চন্দন আনোয়ার
সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপট ১৫৮

ড. আবু নোমান
বাংলায় সুলতানি আমলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ১৭৯

আহম্মদ শরীফ
আবুল মনসুর আহমদ-এর আয়না: হাসির আড়ালে কান্না ২০২

রওশন জাহিদ
সোনালি কাবিন: আত্মসূত্রের লোকজ দলিল ২২৬

মো: রবিউল ইসলাম
তারাশঙ্করের ছোটগল্পে জীবনচিত্র ও সমাজবাস্তবতা ২৪৩

মো: গোলাম কিবরিয়া
বনফুলের গল্প: বিন্দুতে সিন্ধু সন্ধান ২৬৬

ড. ফজলুল হক তুহিন
আল মাহমুদের কবিতায় নারী ২৮৪

মোহাম্মদ সফিকুল আলম
বাংলা বানান: সমকালকে ধারণ করে নিরন্তর সহজ ও স্পষ্টীকরণের পথে ৩০৫

মোঃ মতিউর রহমান
বাঙালি চেতনায় নজরুল ৩১৪

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বিশ্বাসের উত্তরাধিকার: ফররুখ আহমদ

ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল প্রাচুর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে যেসব কবি প্রতিনিধিস্থানীয় তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) অন্যতম। তিনি বিভাগপূর্ব যুগ থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন এবং চল্লিশের দশকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর কাব্যে সমাজের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান বিধায় ফররুখ আহমদ ইসলামি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন; তাঁর কাব্যে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ ঘটেছে। তাঁর বিশ্বাস ইসলামি বিধান ও রাসুলের (সা.) মহান আদর্শের অনুসরণে সমাজে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবে। তাই বলে তিনি গোঁড়া ধার্মিক বা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, সব মানুষেরই কবি ছিলেন। মানুষের মহত্ত্ব ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশের জন্যই তিনি ইসলামের দারস্থ হয়েছিলেন। তা ছাড়া দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, জরা, মৃত্যু, মহামারী প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও তাঁর কবিতায় স্বচ্ছন্দে স্থানলাভ করেছে। আদর্শের সঙ্গে, রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে, আধুনিক শিল্পাঙ্গিকের এমন সার্থক সম্মিলন কেবল তাঁর মতো প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) সমাজ, সময় ও আদর্শসচেতন কবি। ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্যধারায় স্বতন্ত্রধর্মী কবিতা রচনা করে তিনি সৃজনশীলতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ বলেন :

> কীটস, শেলী ও নজরুলের কাব্য থেকে ফররুখ নিজের গোসল খানায় নিভৃত আবৃত্তি করতো। তার গলা এত দরাজ ছিল যে, নীচের রাস্তা থেকেও তার আবৃত্তি আমি মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম। সে যা আবৃত্তি করতো তার মধ্যে সে নিজেকে এমন নিবিড়তার সঙ্গে নিক্ষেপ করতো আর তার উচ্চারণ এত পরিষ্কার ছিলো আর নিজের কণ্ঠে সে এমন লালিত্য আনতে পারতো যে তার আবৃত্তি সব সময় আমার মনে গভীর এক ছাপ রেখে যেতো। এ কথাও তখন আমর মনে হতো যে ফররুখ নিজেও এক সময় কবি হয়ে আবির্ভূত হবে।[১]

তিনি যে একদিন বড় কবি হয়ে আবির্ভূত হবেন সে পরিচয় তাঁর বাল্যকালেই কবিতার প্রতি প্রবল অনুরাগ ও অনায়াস দখল থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ছাত্ররূপেও তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে সৃষ্টিপর্বের সূচনা থেকেই পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য তাঁর প্রথম কবিতা পেয়ে শিক্ষক-সাহিত্যিক আবুল হাশেম চমৎকৃত হয়েছিলেন।[২] তেমনি কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর ক্লাসের খাতায় কয়েকটি কবিতা পেয়ে, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসু মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং বিশী তাঁকে সেদিন 'তরুণ শেক্সপীয়র' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[৩] কেবল প্রতিভাবান কবি বা ব্যক্তি রূপেই নয়, অত্যন্ত মানবদরদী রূপেও তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের আর্তনাদে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন এবং কখনো কখনো নিজেও অন্ন পরিহার করতেন।[৪] সেজন্য মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনে প্রথম জীবনে মার্কসবাদী মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[৫] তখন তাঁর কিছুকিছু কবিতা সমাজতান্ত্রিক দলের *অরণি*, *পরিচয়*, *স্বাধীনতা* পত্রিকাসমূহে প্রকাশ লাভ করেছিল।[৬] এ সূত্রে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।[৭] কিন্তু এ মানসিক অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মওলানা আব্দুল খালেকের সান্নিধ্যে তাঁর মানসলোকে ইসলামি মানবতাবোধের উদয় হয়।[৮] কবির ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৯] পরবর্তীকালে এ মনীষীকেই তিনি *সিরাজাম মুনীরা* (১৯৫২) কাব্যটি উৎসর্গ করেন। মূলত এখন থেকেই তাঁর জীবন ও সাহিত্যে ইসলামি আদর্শের রূপায়ণ ঘটে এবং তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন শুরু করেন। কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবিকন্যা বানুর বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক:

> আব্বা বলতেন, ''দাম্ভিক পরহেজগারের চাইতে অনুতপ্ত পাপী ভালো"। ব্যক্তিজীবনে আব্বা ছিলেন পরহেজগার। জীবনে জ্ঞান থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সাধারণত নামাজ কাযা করেন নি তিনি। শরীর ভীষণ অসুস্থ থাকা অবস্থায় ত্রিশ রোযাই রেখেছেন। আব্বা ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না, সাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই না।[১০]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থকে সম্মুখে রেখে বাংলাদেশকে দুভাগে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তানকে নির্যাতিত মানুষের আবাসস্থল ও ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলেও নেতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা ছিল না। তাঁরা ইসলামের আবরণে শোষণ ও ক্ষমতার অধিকার লাভে জনসমর্থন আদায় করতে চেয়েছিলেন মাত্র। এ তাৎপর্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ পরিচালিত 'জমিয়তে ওলামা-ই-হিন্দ' ও 'জামায়াতে ইসলামী' ও প্রতিষ্ঠান দুটি সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে তারা

* প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না।[১১] কিন্তু সমকালীন যুবসমাজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের মূল নীতির সাথে সমাজতন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে পাকিস্থান আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষিত নতুন রাষ্ট্রে তাদের স্বপ্ন ও সংকল্প ছিল পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রের বিনাশ, সাধারণ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক মুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের মতো কবি হিসেবে ফররুখ আহমদও সজ্ঞান ছিলেন। তবে তিনি ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ায় ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ কিংবা সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে আস্থাবান ছিলেন না। সামাজিক পরিত্রাণের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি রীতিনীতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেজন্য তাঁর *সাত সাগরের মাঝি* (১৯৪৪), *সিরাজাম মুনীরা* (১৯৫২), *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬৯), *হাতেম তা'য়ী* (১৯৬৬) কাব্যের সম্পূর্ণ অবয়ব জুড়ে মহানবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের আমন্ত্রণ আছে। কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য নয়, কবি মূলত সমাজ থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর করে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামি আদর্শের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> তাঁর বিশ্বাস, ইসলাম একটি শাশ্বত কল্যাণকর মানবিক আদর্শ, যা সর্ব যুগে সর্ব দেশে মানুষের জীবন-সমস্যা সমাধানে সহায়ক। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি এ আদর্শের স্বপ্নোজ্জ্বল রূপের ধ্যান করেছেন, তার জয়গান করেছেন এবং অধঃপতিত মুসলমানের মুক্তির জন্যে এ আদর্শ নতুন করে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে আপনার অবিচল বিশ্বাসের কথা সকলকে জ্ঞাত করিয়েছেন।[১২]

কবি কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই সংকটময় মুহূর্তে প্রতিবাদী আন্দোলনের সাথে সোচ্চার হয়ে উঠতেন এবং অজস্র ধারায় লিখে যেতেন সংগ্রামী চেতনা নিয়ে। 'রেনেসাঁ আন্দোলন', 'ভাষা আন্দোলন', 'ঢাকা বেতার কর্মচারীদের দাবি আদায় আন্দোলন', 'সিপাহী বিপ্লব শত বার্ষিকী সংগঠন', 'রেডিও লেখন ফ্রন্ট' ও বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সংস্থা গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৩] একই সঙ্গে 'তাঁর কবিতা ছিল সংগ্রামের প্রতীক এবং তাতে মানবতাবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।'[১৪] ফলে ছাত্র যুবক অনেকেই আসতে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা কিংবা আন্দোলনের পরামর্শ নিতে।[১৫] দেখা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং 'আওয়ামী মুসলিম লীগ', 'কৃষক প্রজা পার্টি', 'নেজামে ইসলাম', 'ন্যাপ', প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলের জন্ম নেয়। এ বিষয়ে কবি ছাত্রনেতাদের উপদেশ দান করতেন এভাবে :

> নওয়াব-নাইট, খাজা-গজা, জমিদার-জোতদারদের সংগঠন মুসলিম লীগ ইসলামের নাম নিয়ে ইসলাম-বিরোধী জুলুমে লিপ্ত। এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দেশের তরুণ সমাজ আর অশিক্ষিত জনসাধারণ মুসলিম লীগের সাথে ইসলাম ও পাকিস্তানকে এক করে দেখেছেন। মুসলিম লীগ কায়েম করেছে পুঁজিবাদ আর এর প্রতিবাদে প্রসার লাভ করেছেন কমিউনিজম। এ স্রোতকে রুখতে না পারলে দেশ, সমাজ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৬]

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর। তাই পাকিস্তান পত্তনের এক মাসের মধ্যে এর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের সময় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা অনুযায়ী বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে। আর সব চাইতে আশার কথা এই যে, এই আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্র সমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।... নিরক্ষর জনগণকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করার চেষ্টা এঁদের এ পর্যন্ত সফল হলেও, আর সম্ভব হবে না। সময়ের চাকা তার গতি পরিবর্তন করেছে। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে চেপে রাখা কারুর সাধ্যেই কুলাবে না।[১৭]

এখানেই শেষ নয়, রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তিনি ঢাকা বেতারে কর্মরত সহকর্মীদের নিয়ে ধর্মঘট পালন করেছিলেন।[১৮] তাছাড়া মাতৃভাষা ও ভাষা আন্দোলনে শহীদদের নিয়ে একাধিক সনেট-কবিতা-গান রচনা করেছেন। দেশ ও সমাজের পটভূমিতে তাঁর সনেটজাতীয় কবিতা সংকলন *মুহূর্তের কবিতা* (১৯৬৩) এক অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু সর্বত্রই তিনি মানবতার বিকাশ ও শোষণহীন সমাজ গঠনে ইসলামের প্রতি দৃঢ়রূপে আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। সে সময় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের অনৈসলামিক কাজকর্ম ও দৌরাত্ম্যে সমাজে সীমাহীন অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে কবি ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সে অবদমনের জন্য নানা প্রকার ছদ্মনামে[১৯] অজস্র ধারায় ব্যঙ্গকবিতা লিখে তাদের ভ্রম সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। উপরন্তু শাসকশ্রেণীকে বিদ্রূপ করে *রাজ-রাজড়া* নামে একটি নাটকও লিখেছিলেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল।[২০] সরকারী আমলা-তোষামোদকারী ও দুর্নীতিবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে 'হায়াৎ দারাজ খান পাকিস্তানী' নামে *ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্যটি* মীর জাফরের জবানীতে রচনার জন্য তিনি কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এবং তাঁর পিছনে পুলিশ ধাওয়া করেছিল।[২১] শুধু কবিকেই নয়, এ দেশরে মানুষ বিভিন্ন প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন

তুললে সরকারীভাবে জনতার উপর নির্মম দমননীতি চালানো হয়েছিল। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালে কবিকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ'-এ ভূষিত করা হলে নগদ অর্থসহ স্বর্ণপদক ও সম্মানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২২]

১৯৭১ এর স্বাধীনতাযুদ্ধে কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই এ দেশের মানুষ বাধ্য হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে, তিনি পাকিস্তান আমলে যেমন ইসলামের শাশ্বতসুন্দর শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজজীবনেও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ইসলামের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন-পঁচিশ বছর তো শুধু মোনাফিকের রাজত্ব চলেছে। আল্লাহ মোনাফেকদের বিদায় দিয়েছেন এবার সঠিক ইসলামের অভ্যুদয় হবে। [২৩] তাঁর এহেন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী এবং আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আবুল ফজল মন্তব্য করেন :

> ইংরেজ যুগ, পাকিস্তান আমল, পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ এই তিন সংঘাত-মুখর যুগের অনেক ঝড়-ঝাপটায় আরো অনেকের মতো, এ কবির জীবনও কেটেছে। এ ঝড়-ঝাপটায় অনেকে বিচলিত হয়েছেন, হয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পীও এ পরিণতি এড়াতে পারেননি। অনেকের মন-মানস নোঙরহীন নৌকার মতো বারবার দোলা খেয়েছে, হয়েছে একাৎ ওকাৎ। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ অবিচল থেকেছেন সর্ব অবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে। চরম দুঃখ-দুর্দিনেও হেরার রাজ তোরণ থেকে চোখ ফেরাননি তিনি ডানে কি বায়ে। এ অস্থির যুগেও একনিষ্ঠতার এমন নজীর বিরল বললেই চলে।[২৪]

দুই.

ফররুখ আহমদের প্রাথমিক কবিতাগুলি *হে বন্য স্বপ্নেরা* (প্র. ১৯৭৬)-য় গ্রথিত হয়েছে। স্বয়ং কবির বর্ণিত সময়ানুযায়ী ১৯৩৬-৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ সব কবিতা রচিত।[২৫] প্রথম দিকের রচনা হলেও এ সবের মধ্যে কবির অসামান্য প্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষর মিলে।[২৬] তখন তিনি কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। সে সময় দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ-বেকারত্ব-মহামারী, স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি প্রভৃতি ঘটনাসমূহ প্রকটরূপ ধারণ করেছে। এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ অন্যান্য সমাজসচেতন কবিদের ন্যায় এ কবিকেও আলোড়িত করেছিল। ফলে এ পর্বের কবিতাগুলিতে কলকাতাকেন্দ্রিক নগরজীবনের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ রূপাভিব্যক্তি লাভ করেছে। সে সঙ্গে বাস্তব জীবনের পাশাপাশি রোমান্টিকতার সংযোগ কবিকে জীবনজিজ্ঞাসায় কৌতূহলী করে তুলেছে। মানুষের যৌবন শক্তিকে তিনি বিজয়ী বীর হিসেবে কল্পনা করে, সে শক্তি দিয়ে মানবমনের জাড্য ঘুচাতে চেয়েছেন :

হে বিজয়ী বীর!.../ আমারে কি দেবে দীক্ষা তোমার মন্ত্রণায়
যাযাবর বেদুইন!/ যাত্রা করিব দিগন্ত ধরি' পথ সন্ধান-হীন
ভাঙিব গোধূলি তন্দ্রা ধরার মরু ধুলায়।[২৭]

শহরকেন্দ্রিক কলকারখানায় কর্মচঞ্চল মানুষের কোলাহল কবিকে বাস্তবের কঠোর রূপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। তার কাছে যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে ক্রমে মানুষও যন্ত্রচালিত মেশিনে পরিণত হয়েছে:

জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এই সব যন্ত্র-জানোয়ার/ দিন রাত্রি ঘোরে ফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তরাল, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর/ অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিংয়ে আসামে জঙ্গলে।[২৮]

কর্মসংস্থানহীন মানুষের করুণ অবস্থা তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। দিনের শেষে 'কারখানায় দৃঢ় পেশী' শ্রমিক যখন অবসন্ন দেহে বিশ্রামে বিভোর, তখন নিদ্রাহীন বেকার যুবক দুশ্চিন্তার নিগড়ে নিমগ্ন। এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি :

আজ রাতে ঘুম আসেনি তোমার শুধু?/ বেকার জীবন (বেকার তারার মত)।
আলোক ছড়ায়, গ্যাস বাতি পথে পথে/ আলো ছড়ায়েও মূল্য পেলনা ওরা
প্রাণহীন ওরা পুতুলের মত তাই... ।[২৯]/

কবি এদের বেদনা সমাজের কাছেও তুলে ধরতে উন্মুখ:

...মুখ তোলে শেষবার/ সব কথা ব'লে যাবো, দেখে যাবো সব শেষ এর... ।[৩০]

জীবনের জটিলতা মানুষকে অহরহ বিব্রত করে। ফলে সে হতাশার সম্মুখীন হয়। তথাপি মহাকালের যাত্রায় অবতীর্ণ না হয়ে তার গত্যন্তর নেই। কিন্তু সেপথে শুধুই জ্বালা। স্বার্থান্বেষী মহলের শোষণের অক্টোপাশে তার আত্মবিকাশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে আছে। এমনকি মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও সেখানে অবশিষ্ট নেই :

এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।/ আমরাও শববাহী যাত্রীদল চলেছি অশেষ,

এ শবের জীবাণুতে পান করি বিষাক্ত নিমেষ/ শুনে যাব বেলাশেষে পিপাসার তৃপ্তিহীন রব।...

শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে জাগে মৃত্যু ভয়াল উৎসব।...[৩১]

বাস্তবের রূঢ়তায়-হৃদয়হীনতায় ব্যথিত কবিচিত্ত সময়ে সময়ে সমুদ্রে-আকাশে-ইতিহাসে কিংবা পুরাণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।[৩২] কেননা শাসনসজিত সর্বনাশে দেশ আজ শ্মশানে পরিণত। এমন দুর্দিনে বর্তমান সমাজ তাঁর কাছে মনে হয়েছে প্রেতপুরী :

এ যে প্রেতপুরী প্রেত জনতার কালো মিছিল,/ তিমিরাবরণে নাই হেথা ফাঁক মুক্তি নীল,[৩৩]

অনুরূপে 'পটভূমি', 'সামুদ্রিক', 'পদ্মার ফাটল', 'পদ্মার ভাঙন', 'কালো দাগ', 'প্রেক্ষণ', 'হীরার কুচির মত', 'নৈরাজ্য', 'প্রেসম্যান', 'হে বন্য স্বপ্নেরা', প্রভৃতি কবিতায় সমকালীন সমাজের নানা গ্লানি ও অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে। যেমন, শহর পরিবেষ্টিত জীবনের নগ্নরূপ :

উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে রাতজাগা মানুষের দল/ পথের দুধারে ঘেঁষে চলে যেন সরীসৃপ পাথর শীতল

আর চলে প্রাণহীন নাগরিক, নাগরিকদের/ উজ্জীবিত পাশবিকতার

নগ্নরূপ মৃত জনতার।[৩৪]

কিংবা:

রাত্রির বিষণ্ন মেঘে বন্ধ হল সকল কপাট,/ নর্দমার ভোজ্য তুলে ভরিছে বুভুক্ষু রাজ্যপাট...।[৩৫]

শোষণের বীভৎস চিত্র :

দশদিক ঘিরে গড়ে মেদস্ফীত শোষকের উর্ণনাভ জাল,/ জনতার রক্তস্রোতে কেটে কেটে চলে তার জাহাজের হাল,

ওড়ে তার বিজয়-পতাকা/ শোষিত-করোটি-চিহ্ন-আঁকা।[৩৬]

ফলে:

ঐ দেখ শিশু কাঁদে, ঐ শোনো দিকে দিকে মৃত্যুর খবর.../ কারখানা গর্ভে আঁকড়িয়া প্রতিদিন ধনীর শহর,

মাঠে মাঠে, শস্যখেতে জলেস্থলে রচিতেছে ওদের কবর।[৩৭]

অপর দিকে:

যন্ত্রের গর্জন-শ্রান্ত তন্দ্রাতুর প্রেসম্যান দেখে/ নতুন বিস্ময় এক ঃ পথচারী আহত বুলেটে।[৩৮]

সব ব্যথা এক হয়ে:

এখানে শিশুর কান্না-ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে,/ মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শঙ্কিত প্রহরে।

আজিকে কবন্ধ ওরা ভারবাহী বহে সে খবর

বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।/ তারপর অদ্ভুত জনতা

মুখ গুঁজে পড়ে আছে শুধু ওঠে অশ্রু-আকুলতা.../ অবিরাম হেথা আর্তস্বর :[৩৯]

এদের জন্য কবির হৃদয়ার্তি:

১. হে প্রিয়। তোমার শেষ রক্ত বিন্দু শুষে নিল বীভৎস পিশাচে।...

তুমি আজ ঝরে গেলে, কেহ জানিল না,

তোমার বিরাট দাবী কেহ মানিল না,/ নর্দমায় মৃত্যু কোলে শান্তি পেলে তাই।[৪০]

২. শীতের হাওয়ায় কেঁপে এরা একদিন/ শেষ হয়ে যাবে।...

রেখে যাবে দীর্ঘশ্বাস, আর/ ক্ষুধার অন্তিম-হাহাকার।

গাছের পাতারা হবে পীত/ অকাল মৃতের হাড় বয়ে নিয়ে যাবে শুধু

এবারের শীত।[৪১]

এর প্রতিকারে অর্থলোলুপ সম্পদশালীদের প্রতি তাঁর হুশিয়ারি :

এবার থামায়ে ঐ রক্তপায়ী জীবনের গান/ ব্যাংকের মিনার ছেড়ে...

ক্ষুধাতুর শীত শীর্ণ মানুষের ভীড়ে/ নেমে এস রাত্রির তিমিরে।[৪২]

তা না হলে:

যারা আজ ধরণীরে ছেয়ে/ বিছাতেছে হাড়ের বিছানা

চিরদিন তারা সহিবে না/ আসে ঐ অগ্নিচূড়,

বিদ্রোহের দিন।[৪৩]

মানুষের এমন দুর্গতির মূলে সাম্রাজ্যবাদী পশুপ্রবৃত্তিকেই তিনি দায়ী করেছেন :

কারণ পৃথিবী আজ পশুর মুঠোতে/ যে মুঠো মৃত্যুর মত ইস্পাত নির্মম

অথবা সাপের মত শিকারকে ঘিরে/ উঠেছে হাজার পাকে, হাজার ফনায়...[৪৪]

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট রক্তাক্ষরে খচিত। সে দিন কলকাতায় সংঘটিত হয়েছিল দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। সে দিনের সেই মর্মান্তিক দৃশ্যাবলী কবির বাণীচিত্রে হয়ে উঠেছে আরো বেদনাঘন :

১. রক্ত-হিংস্র মাঠে নাই রজনীগন্ধার অবকাশ,/ মরুভূমি হল বনঃমরুভূমি মানুষের মন,

সারারাত্রি জেগে শুনি পৈশাচিক মৃত্যুর স্বনন...।[৪৫]

২. এবার দেখেছি নিজের রক্ত, দেখেছি আর.../ পেয়েছি নিজের রক্তের স্বাদ, পেয়েছি আর

রক্ত নেবার দুঃসহ সংবাদ/ কাকে দিয়ে যাব এই দুঃসহ পাপের ভার

এই ক্ষমাহীন আঘাতের অনুপাদ।[৪৬]

৩. নির্বোধ এ জনতার রুগ্নমনে সঞ্চারিয়া বিষ/ এবার এসেছে ডাক জড়বুদ্ধি এ অপমৃত্যুর।

দেখেছি নখরে তার সদ্যোজাত শিশুর শোণিত,/ শুনেছি নারীর কান্না হিংস্রতার বদ্ধমুষ্টি মাঝে।

অসহায় পথিকের বিপর্যয় দেখেছি সম্মুখে।[৪৭]

এমন কদর্য হিংস্র পরিবেশে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী চক্রকে ধিকৃত করে তিনি বলেছেন:

অত্যাচারী শকুনেরা।.../ মানুষের ধ্বংসের শেষ উপহার নাও,

খাও তারে শেষ করে খাও।/ আর নাও বিশীর্ণ ক্ষুধিত তরুণের

জীর্ণ শুষ্ক শব।/ জঘন্য পাশব।..[৪৮]

তবে মানবতার দারুণ বিপর্যয়েও কবি আশাবাদী। কেননা পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসে এ রকম বহুঘটনা ঘটেছে। এই শিক্ষা থেকে তিনি নিশ্চিত হন যে, একদিন মহানিশা কেটে যাবে এবং পূর্বদিগন্তে সোনালি সূর্য উদিত হবে। তখন ধরণীতে পুষ্পিত পুষ্পের জাগরণে পাখিদের কলকুজন শোনা যাবে। কোকিলও গাইবে বসন্তের আগমনী সঙ্গীত:

১. তবুও নতুন করি জেগে ওঠে বাঁচার সাধনা,/ তবুও দুর্গম পথে ভিড় করে যাত্রী সাহসিকা

মধ্যরাত্রে প্রভাতের পাখী/ স্বপ্ন দেখে :[৪৯]

২. আরক্ত ঝড়ের শেষে/ পিঙ্গল ঈশান কোণের দিন

সুতীব্র সংঘাত শেষে খড়কুটো বুকে নিয়ে/ স্বপ্ন দেখে পৃথিবী নবীন :[৫০]

তিন.

হে বন্য স্বপ্নেরা-য় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যূপকাষ্ঠে যন্ত্রণাপিষ্ট মানুষের জন্য কবিপ্রাণের যে হাহাকার ও অস্তিত্ব রক্ষার উচ্ছ্বাস, তা *সাত সাগরের মাঝি* (প্র. ১৯৪৪) কাব্যে প্রতিবাদমুখর হয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রা করেছে। ইকবাল নিষ্পেষিত ভারতবাসীর দুর্দশায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর *শিকোয়া*-য় ইসলামের আলোকিত প্রাণ সত্তায় তাদের জাগরণী বাণী শুনিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'মুসলেম হায় হাম ওয়াতান।'[৫১] এ দাবিতে 'পাকিস্তান আন্দোলন' তথা 'রেনেসাঁ আন্দোলন' -এর পরিপ্রেক্ষিতেই *সাত সাগরের মাঝি*-র কবিতাগুলি রচিত (১৯৪৩-৪৪)। এর মধ্যে একদিকে আছে 'মুসলিম রেনেসাঁ ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপায়ণের আহ্বান ও আকুতি এবং অন্যদিকে নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও শোষক সমাজ এবং সভ্যতার প্রতি ধিক্কার।'[৫২] বিভিন্ন কবিতায় আরব্যোপন্যাসের নায়ক দুঃসাহসিক নাবিক সিন্দাবাদ মুসলিম অভ্যুত্থান ও বিজয়ের প্রতীক

হয়ে এসেছে, এবং হেরার রাজতোরণ তার লক্ষ্যস্থল।[৫৩] এ যেন টেনিসনের ইউলিসিস এর মতোই কতকটা।[৫৪] যার কাছে অবসাদগ্রস্ত জীবন অপেক্ষা সমুদ্রাভিমুখী ঝড়-ঝঞ্ঝাময় সংগ্রামী জীবনই শ্রেয়। অনুরূপভাবে 'আকাশ নাবিক', 'মাঝি-মাল্লা', 'স্বর্ণঈগল', 'ডাহুক', 'পাখী', 'পাঞ্জেরী', প্রভৃতি রূপক একটি একই অবস্থাকে শোষণের প্রতিবাদ, মুক্তির অগ্রগতি অথবা জাতীয় আন্দোলনের প্রতিভূ হয়ে এসেছে। এমনি করে কাব্যটির মধ্যে হৃতগৌরব মুসলিমের আত্মমর্যাদা লাভ ও স্বাধীনতাস্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। এতে তিনি 'ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো সন্তের মতো, কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের ভেতরে উজ্জীবিত হয়েছেন...।'[৫৫] তাছাড়া বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, প্রকাশভঙ্গি ও শব্দ চয়নে কবির নিপুণতা ও রোমান্টিক চেতনায় কবিতাগুলি শিল্পগুণসমৃদ্ধ হওয়ায় মুসলিম-অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের কাছে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাকে রাতারাতি প্রসিদ্ধ করে তুলেছিল।[৫৬] আঙ্গিক প্রকরণে এ কাব্য আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় "বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', বিষ্ণুদে'র 'চোরাবালি', সমর সেনের কয়েকটি কবিতা, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' এর মতোই একটি চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল।"[৫৭]

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। যুদ্ধের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া এ দেশেও প্রতিভাসিত হয়েছিল। একদিকে খাদ্যসংস্থানহীন যুবকদের বৃটিশ দালালেরা প্ররোচিত করে সান্নিপাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছিল, অন্যদিকে অন্নবস্ত্রহীন অসহায় নারী-পুরুষ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছিল। সে সময়ের এক চিত্র:

> লাখে লাখে লোক ঘর বাড়ী জমি তৈজসপত্র বিক্রি করে কয়েক দিন দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করার পর অন্নের আশায় রাজধানীতে আসা শুরু করে দিল আর তাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় অনাহারের প্রকোপে মরে পড়ে থাকল। যারা ফুটপাতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের নানাভাবে- কিশোরী তরুণী এমনকি অনেক গৃহবধূ সতীত্বের বিনিময়ে-বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হল তারা 'ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও', চীৎকারে সারা শহরের আবহাওয়াটা অনিশ্চয়তায় ও কিছুটা আতঙ্কে ভরে দিতো।[৫৮]

মন্বন্তরের এ প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'লাশ' কবিতা। অবশ্য এর পূর্বেও তাঁর 'সন্ধ্যার জনতা', 'ব্লাক আউট', 'আবদ্ধ দৃষ্টি', 'পরিপ্রেক্ষিতে', 'বিরাণ সড়কের গান', 'শকুনেরা' প্রভৃতি কবিতায় নানা কৌশলে আকালজনিত জরা-মৃত্যুর দশা রূপায়িত হয়েছে।[৫৯]

সিকান্দার আবু জাফরেরও (১৯১৯-১৯৭৫) প্রশ্ন ছিল :

স্মরণে কি সমুজ্জ্বল সে রাত্রির কথা,/ ক্ষুধাশীর্ণ মানুষের বিশ্বাসের দামে
কি খেলা খেলেছ তুমি?/ শত ছিদ্র ভিক্ষা পাত্রে কি তোমার দান?
তোমারি তো অব্যর্থ কৌশলে/ পথের পঙ্কিল থেকে সহস্র মানুষ
মৃত্যুশাপ তুলে নিল জীবনের নিষ্ফল আশায়।[৬০]

কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'লাশ' এক অনবদ্য সৃষ্টি। কবিতাটি ১৩৫০ সালে *মোহাম্মদী-তে*[৬১] প্রকাশের পরপরই সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতা সংকলন *আকাল-* এ[৬২] গৃহীত হয়। এ সময় শিল্পী জয়নুল আবেদীনের তুলিতে আঁকা দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র- যেখানে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে মানুষে- কুকুরে কাড়াকাড়ি, নারী-পুরুষের মৃতদেহ, মৃত মায়ের পাশে মরণমুখী শিশুর কান্না-মানুষকে শিহরিত করেছিল।[৬৩] কবি সে দৃশ্যকে ভাষা দিয়ে কেবল সভ্যতার নির্মম ছবিই আঁকলেন না নিজের প্রতিবাদী পরিচিতিও উজ্জ্বল করে তুললেন:

পৈশাচিক লোভ/ করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব সত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার/ ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,
এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে/ করে পরিহাস?...
কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?/ ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?/ মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে।[৬৪]

মানবতার অপহরণকারী ও স্ফীতমেদ শোষক সমাজের প্রতি কবির উপহাস:

মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান/ তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতার সয়তান।...
জনতার সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠি অতি অনায়াসে/ তারে তুমি ফেলে যাও পথপ্রান্তে নর্দমার পাশে।[৬৫]

এদের পাশবিকতায় সমাজের ধ্বসে পড়া রূপ:

লোভের বিকট ক্ষুধা বুকে নিয়ে অত্যাচারী পুরুষেরা চলে,/ মানুষের পথছেড়ে বহু নিম্নে মৃত্যুর অতলে।

তাহাদেরি শোষণের ত্রাস/ করিয়াছে গ্রাস

প্রশান্তির ঘর,/ যেথা মুখ গুঁজে পড়ে আছে শীর্ণ শব ধরণীর পর।[৬৬]

কবির হাতেই 'লাশ' এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে আর একটি কালজয়ী দুর্লভ কবিতা '১৯৭৪' (একটি আলেখ্য)[৬৭]

রিক্ত নিঃশেষিত অসংখ্য মানুষ সভ্যতার কুটিল চক্রে প্রতিমুহূর্তে ভয়ংকর মৃত্যুর পথে ধাবিত হচ্ছে। তার নির্মম ফাঁদে নিষ্পাপ শিশুদেরও পরিত্রাণ নেই। এ যেন যমরাজ্যের এক যজ্ঞশালা:

দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে,/ কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার সড়কে বিপথে,

যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ/ তারি পানে, দুর্নিবার টানে বলে আজ মানুষের

দুর্বল, বিশীর্ণ আউলাদ।[৬৮]

এ মর্মন্তুদ দৃশ্য কবি দিব্যচোখে দেখেছেন এবং শালীনতার মুখোশধারী জালিমের ভ্রষ্টতা উদঘাটন করেছেন:

আমি দেখি পথের দুধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,/ আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়

ধনিকের গর্বিত আসব,/ আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,

আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা,/ গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস,

নারী হল লুণ্ঠিতা গণিকা।[৬৯]

এ শঙ্কাবহুল পীড়কের দল অজগরের মতো সবকিছু গ্রাস করে চলেছে এবং প্রতিদিন নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিচ্ছে মানুষের চরম শত্রু, রুদ্ধ হচ্ছে সমাজের গতি। এ জুলুমের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য কবি ফরিয়াদ জানিয়েছেন আল্লাহর আদালতে। তাঁর কৃপায় ইতিহাসের পাতায় অতীতেও তিনি এমন অত্যাচারী কওমকে ধুলিতে বিলুপ্ত হতে দেখেছেন:

অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির নীচে, অনেক সমুদ/ কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ

মিশে গেল ধূলিতলে/ নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দুর্গম উপলে

উড়ায়ে নিশান।..[৭০]

কবি আজ ন্যায়ের সৈনিক সে নবীন যাত্রীদলের আগমনী বার্তা শুনতে পেয়েছেন। তাদের যাত্রা অগ্রভাগের সমস্ত বিপত্তি নির্মূল করে আবার শান্তির নিশান উড়িয়ে দিবে। এদের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা:

আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়,/ আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,

পথে দেখি পীড়নের ফাঁদ,/ আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়,

মানুষের ভবিষ্যৎ দিনের আউলাদ।[৭১]

বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতাই সিন্দাবাদরূপী কবির আয়েশে ভরা রঙিন মখমল দিনকে বিষাদময় করে তুলেছে। এবং 'জীবনের তাজা ঘ্রাণে' নতুন সফরে টেনে বের করেছে :

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে,/ ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,

ডেকেছে আমাকে জিন্দিগী আর মওতের মাঝখানে/ এবার সফর টানবে আমাকে কোন স্রোতে কেবা জানে।[৭২]

যে জাতি একদিন অপরাজেয় আত্মশক্তির অধিকারী ছিল, যার দুর্নিবার গতি দিকদিগন্তে পাখা বিস্তার করেছিল, সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল যার জীবন, সেই আজ আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে শোচনীয় অধঃপতনের মুখোমুখি। এ পতন থেকে কি কোনো ক্রমেই তার নিস্তার নেই:

হে পাখী।/ কোথায় একলা ফিরছে তোমার তূতী,

সাপের ফণার কাছে এসে তার নিভে যায় অনুভূতি।/ পারো না উড়তে। সেতারা কি ক্ষীয়মাণ?

চাঁদের ভাটায় ঝড়-তরঙ্গে ঘুমে সে হয়েছে ম্লান?[৭৩]

কিন্তু এ নির্মম পরিহাস তো মেনে নেওয়ার কথা ছিল না। পথ ভুলে অন্ধকারে ধাবিত হওয়ার ফলেই তার জীবনে আর্তনাদ বেজে উঠেছে। এ বিষাদ মুঝে ফেলতে হলে আপনার হারানো বিশ্বাসের ভিত্তিতে পুনর্বার জেগে উঠতে হবে :

আজকে আবার সেখানে ফিরতে হবে।/ দিতে হবে ফের আঁধারের বুকে চাষ,

ভরাতে আনারকলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ,/ আন্‌তে নতুন বীজ যেতে হবে ফরাণের অভিযানে,

ভরাতে মাটির রুক্ষতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।[৭৪]

আর সে জন্যই কবি ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল আদর্শের পথে আশ্রয় নিয়েছেন:

এই সব রাত্রি শুধু একমনে করে যায় ধ্যান,/ আবার শুনিতে চায় কোহিতুর, সাফার আহ্বান...

মৃদু স্বপ্নে কথা কয়ে আবছায়া শুভ্রতা বিভোর,/ এই সব ম্লান রাত্রি সূর্যালোক হতে চায় ভোর।[৭৫]

যুগে যুগে নবি রাসুলগণ মানব সমাজের জড়তা ও ভ্রান্তি উন্মোচন করে যে গতিময় পূর্ণজীবনের সন্ধান দিয়ে গেছেন, তা থেকে সরে পড়ার কারণেই মানবকুলকে দুর্ভাগ্যের অতল সাগরে ভাসতে হয়েছে:

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে/ দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,

আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি/ দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী,

মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি,/ কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।[৭৬]

নাবিক যেমন ভুল পথে পরিচালিত হয়ে আরোহী যাত্রীদের প্রাণনাশ ঘটায়, তেমনি হর্তাকর্তাদের আদর্শহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজ আজ অতলে নিমজ্জিত। সে আর্তনাদে কবিহৃদয়ও বিদীর্ণ:

সদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,/ ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।

ওকি বাতাসের হাহাকার, ওকি/ রোণাজারি ক্ষুধিতের।

ওকি দরিয়ার গর্জন, ওকি বেদনা মজলুমের। [৭৭]

পথহারা মানবসমাজকে আলোর রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নাবিক হাল ধরেছেন। রাতভর অভিযান চলছে। এখনো তাদের জাহাজ অন্ধকারেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্মুখে ভীষণ কুয়াশা পথ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিছুতেই সামনে এগুনো যাচ্ছে না। জীবনসংশয়ে যাত্রীদল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তথাপি সিন্দাবাদের মনে দুরন্ত সাহস, যত বিঘ্নই ঘটুক আজ তা অতিক্রম করে বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেই হবে। তাই:

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,/ জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রকুটি হেরি,

দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী কত দেরী।।[৭৮]

দীর্ঘ সাধনায় হেরা পর্বতের গুহায় ঐশ্বীবাণী লাভ করেছিলেন মহানবী (সঃ) এবং সে আলোকে ইসলামের পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে শান্তির প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে মানুষের ময়দানে সে ন্যায়ের ঝাণ্ডা কাঁধে বহন করেছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), খালেদ (রা.), তারেক (রা.), প্রভৃতি আরো অনেকে। আজকের দিনে যাদের হাতে এ ধ্বজা উঠেছে তারা নিজেরাই ইমানে-আমলে দুর্বল ও প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত। তাতে যেন মানবতার কেতন ক্রমশ মাটিতে নুয়ে পড়েছে:

নিশান কি ঝড়ে পড়ে গেছে আজ মাটির পরে?/ আধো চাঁদ আঁকা সেই শাশ্বত জয়-নিশান?

বহু মৃত্যুর প্রলয়-আঘাতে, প্রবল ঝড়ে/ নুয়ে গেছে সেই প্রথম দিনের জয়-নিশান?[৭৯]

অথচ একদিন তো এই নিশানই সমুন্নত ছিল:

আধো চাঁদ আঁকা নিশান আমার।.../ তুমি একদিন এনেছিলে বানজীবন তুফান

জুলফিকারের, খালেদী বাজুর তুমি সওয়ার,/ উমরের পথে বিশ্বের দ্বারে হে অম্লান,

পার হয়ে গেছ বিয়াবান আর খাড়া পাহাড়/ সবল হাতের কব্‌জায় যবে ছিলে সওয়াব।[৮০]

কবি ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত সত্তা নিয়ে যোগদান করতে বলেছেন:

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো/ তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে

দেখবে তোমারইক কিস্তি আবার ভেসেছে সাগর জলে,...

তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা/

এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না তবু তুমি জাগলে না?[৮১]

মানুষ আজ পথ ভুলে শুধু আলেয়ার পিছেই ছুটে চলেছে। তার দুয়ারে সাপের গর্জন, অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়, রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার, ঘুরেফিরে ঝংকার তুলেছে। এ সময় আর সাত সাগরের মাঝির অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে থাকা চলে না। শতাব্দীর এ মরা গাঙে জাহাজটাকে যে ভাসাতেই হবে:

আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,/ ছেঁড়া পালে আজ জুড়াতেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি/ তবুও জাহাজ ছোটাতেই হবে।[৮২]

যাত্রার জয়ভেরী বেজে উঠেছে। যাত্রীরা ভিড় করে বসে গেছে। যাত্রী বোঝায় জাহাজ সাগরের নোনা জল চিরে যাত্রা করেছে। পালে এখন বাতাসের কাঁপন। তার সাথে দ্বাদশী জোছনা আলো জ্বেলেছে। সে আলোয় মুক্তির পথ খুলে যাচ্ছে। আর দূরে নয়, সামনেই তাদের হেরার রাজতোরণ:

তবে খোলো, তবে নোঙর তোলো,/ এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী।
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।[৮৩]

চার

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যুগসন্ধিক্ষণে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে ফররুখ আহমদ আরো কিছু কবিতা লিখেছেন। সে সমস্ত তাঁর *আজাদ করো পাকিস্তান* কাব্য পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। মোট দশটি গান ও কবিতা নিয়ে এর প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯৪৬ সালে।[৮৪] কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৬।[৮৫] তখন গণবিক্ষোভের চাপে পাকিস্তান রূপ নিতে যাচ্ছে এরূপ পরিস্থিতি। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতায় সে আজাদি আন্দোলনের পরিচয় ও অনুপ্রেরণা বিধৃত আছে। এরই সাথে তাতে শোষকের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে। *আজাদ করো পাকিস্তান* সম্পর্কে সহানুভূতিশীল সমালোচক বসুধা চক্রবর্তীর মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> মুসলিম ভারতের বাঞ্ছিত পাকিস্তান আজও অলব্ধ, আজও বন্ধন মুক্ত নয়। কবি ফররুখ আহমদের কণ্ঠ তারই মুক্তি আনবার আহ্বানে মুখর হয়ে উঠেছে। এ বইয়ে তারই পরিচয়।[৮৬]

এর অন্তর্ভুক্ত 'ফৌজের গান', 'ওড়াও ঝাণ্ডা', গান দুটি শিল্পী কামরুল হাসানের অনুরোধে মুকুল ফৌজ এর উদ্দেশে রচিত হয়েছিল এবং আব্দুল আহাদের সুরে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[৮৭] ইসলামের সাম্যবাদী বা 'ধর্মবাদী সমাজতান্ত্রিক'[৮৮] মানবতাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার ও সামাজিক সুবিচার আদায় হবে, এ জাতীয় বিশ্বাস কবির অন্তরে বদ্ধমূল ছিল:

কৃষ্ণা দ্বাদশীর পাণ্ডু ক্ষয়মান চাঁদ/ আরক্ত উষার প্রান্তে এল শেষ হয়ে,
দিগন্তে স্বর্ণাভা : দূরে আলোর ইঙ্গিত।/ থামাও মৃত্যুর সুর শোন জীবনের
অনুধ্বনি : মেঠো পথ; পায়ে চলা পথ/ কাঁকর বিছানো পথ : মজুরের আর
নিঃস্ব জনতার পথ টানিছে আমাকে।[৮৯]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরধীনতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষের যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে, সে আলোকিত পথে তিনি নিজ মাতৃভূমিরও স্বাধীনতা লক্ষ করেছেন:

ইন্দোনেশিয়ার পথ, ফিলিস্তিন আর/ ইন্দোচীন, ইরানের দুর্গম সড়ক
আমাকে টানিছে আজ : থামাও তোমার/ অলস মৃত্যুর সুর, মূর্ছা ক্লেদময়।[৯০]

এবং কবি তা দেখতে চান:

আমাকে শুনিতে দাও আসন্ন ঝড়ের/ গুরুগুরু পূর্বাভাস, দেখে যেতে দাও
বিপ্লব বিকাশ বজ্র দিগন্তে, প্রত্যেক/ শৃংখলিত মনে আর শৃংখলিত পথে
মৃত্যু সন্নিবিষ্ট দৃঢ় আজাদীর পথ/ অজানা দুর্গম পথ শ্বাপদসংকুল।[৯১]

১০ মহররাম ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তে এজিদের জুলুমের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের মুক্তির জেহাদ সংঘটিত হয়েছিল। নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুরূপ জেহাদে আজকের মজলুম জনতাও মুক্তি ছিনিয়ে আনবে। সেজন্য সংগ্রামী জনগণ শিরোন্নত:

আজ মুজাহিদ উদ্যত শির/ ভাঙবে পাপের সকল প্রাচীর
আজ নির্ভীক জনতা হয়েছে/ জেহাদের জোশে রণোম্মাদ।।[৯২]

এ ইস্তিহারে অত্যাচারীর আসনের ভিতও নড়ে উঠেছে:

তার ভয়ে আজ কাঁপিতেছে ডরে,/ এজিদের হাড় পাষাণ কবরে
পাপ গহ্বরে মুনাফেক মরে,/ মরিতেছে ডরে পাপী-নিষাদ।।[৯৩]

এমন ক্রান্তিকালে অনুভূতিহীন নির্জীবদের প্রতি কবির বিস্ময় বাণী :

জাগো জনতার আত্মা। ওঠো, কথা কও,/ কতোকাল আর তুমি ঘুমাবে নিসাড়
নিস্পন্দ, আকাশ ছেয়ে চলেছে যখন/ নতুন জ্যোতিষ্ক-সৃষ্টি; তখনো তোমার
স্থবির নিশ্চল বুকে নাই কোন প্রাণদ ইঙ্গিতে/ নাই অগ্নিকণা : নাই ধূমকেতু বেগ।[৯৪]

উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে হলে লড়াই ছাড়া উপায় নেই। এমনিতেই শত্রু কখনো পথ ছেড়ে দাঁড়াবে না। তাই সংঘর্ষের ইশারাঃ

তোমার পাঞ্জার সাথে জালিমের শাণিত পাঞ্জার/ হবে নাকি সুকঠিন প্রাণান্ত-প্রয়াস!
হবে নাকি বোঝাপড়া জীবন-মৃত্যুর!/ জেহাদের ঝড় সাইমুম:[৯৫]

মুসলিম বীরত্বের অতীত গৌরববোধ কবিচিত্তকে উৎফুল্ল করে তুলেছে। সে উদ্যম তিনি জনতার মাঝে অভিন্নরূপে মিশে দিতে চেয়েছেনঃ

পৃথিবী বিশাল আর বিচিত্র বিশালতর অস্তিত্ব তোমার/ আকাশের দীপ্ত বহ্নি তোমার মুঠিতে
তোমর চোখের কোণে সমুদ্রের রহস্য অসীম/ তোমার বুকের মাঝে সুপ্ত দাবানল
পৃথিবীকে কখন জ্বালাবে?/ যে পৃথিবী জালিমের কঠিন মুঠিতে
সে পৃথিবী জ্বালাবে কখন?[৯৬]

ঐ গৌরবময় আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। তাই:

আজ তুমি চিনে নাও আপন পৃথ্বীরে/ গড়ে তোলো পৃথিবী আপন,
নিজের আত্মাকে আজ চিনে নাও তুমি/ গড়ে নাও পৃথিবী নিজের।[৯৭]

সামন্তপ্রভু শাসক দেশের সম্পদ নির্বিঘ্নে লুট করেছে, নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে, নারীদের সতীত্বকে অপহরণ করেছে। অথচ সমস্ত অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করে আজ 'গোলামের বেশে পুরুষ ফিরিছে শংকিত ভীরু চিতে।'[৯৮] আর উৎপীড়কের মাথার উপরে 'শাহীতাজ' শোভা পাচ্ছে, যা জনগণের শোষিত রক্তেই গড়া। এ শোষণের নিদারুণ চিত্র কবি এঁকেছেন 'জালিম ও মজলুম' কবিতায়। যেমনঃ

দিকে দিকে শয়তানের অনুচর সেই জালিমেরা/ তুলে দিল বেড়া,
আমাদের ক্ষুধাতুর শবের পর্বতে/ অত্যাচার করে গেলে নিশ্চিন্ত বিলাসে
আমাদের ভবিষ্যৎ কালো-সিরা অন্ধকারে শেষ হয়ে আসে/ ক্ষুধাশীর্ণ হাড় ভাসে পথে।[৯৯]

এদের প্রতি অর্পিত হয়েছে মানবের অশেষ ভর্ৎসনা:

তোমাদের পরিচয় আজ হল শেষ।/ অসংখ্য, অশেষ
তোমরা সকলে এক তোমাদের এক মজহাব/ হারাম নেশায় মত্ত ছুঁড়িতেছে বিষাক্ত শারাব...
সব জালিমের সাথে হানিতেছ সমান আঘাত,[১০০]

এ ঘৃণাই বিক্ষোভে পরিণত হয়ে সোনালি স্বপ্নে ভরা স্বদেশকে দুশো বছরের পরাধীনতার দুঃখ ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার শপথ নিয়েছে। কবি এ জাগ্রত জনশক্তিকে কারিগরের মতো এক সাথে মিলেমিশে কাজ করার পরামর্শ দান করেছেন এবং নিজেদের মধ্য হতে যেন শত্রুর সৃষ্টি না হয়ে সে সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন:

লক্ষ পাথরে গড়া এ পাহাড় ভেঙে হল একাকার,/ চলো এক সাথে তুলে নেই হাতে পাহাড় গড়ার ভার
বড় দুশমন মারবার আগে ঘরকে সামাল দিয়ে/ কারিগর। মোরা খুঁজব বাহির পথ;[১০১]

কবি জানেন বিদ্রোহের এ দাবানলে পুরনো দিনের বর্বরতার মতোই আজকের অত্যাচারীরও সমস্ত ষড়যন্ত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ফলে:

ভেঙে পড়ে ডরে কারুণের ভীরু মুঠি।/ ভয়ে ফেরাউন তোলে চারপাশে শত নিষেধের বেড়া,
নীল শংকায় মরে সে অত্যাচারী।/ তখতে বসিয়া সভয়ে সে দেখে অপমৃত্যুর ডেরা।

কখন পড়িবে শিরে তার তরবারি।[১০২]

পাঁচ.

ফররুখ আহমদ আন্তরিকভাবে বাস্তব পৃথিবীকে, স্বীয় সমাজকে সুন্দররূপে দেখতে চেয়েছিলেন।[১০৩] তাঁর সে সৌন্দর্যধ্যান *সিরাজাম মুনীরা*-য় এসে প্রত্যক্ষরূপ লাভ করেছে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ), সাহাবাগণ, তৎপরবর্তী পীর-আউলিয়াদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে। কাব্যটি ১৯৫২ সালে মুদ্রিত হলেও এর সবকটি কবিতা *সাত সাগরের মাঝি ও আজাদ করো পাকিস্তান* এর সমকালীন এবং ১৯৪৩-৪৬ সারে *সওগাত* ও *মোহাম্মদী* তে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০৪] এর পূর্বে নজরুল ইসলামও অন্যায় অকল্যাণের প্রতিকারে ইসলামের উদার মানবতা ও সাম্যনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে সুর তাঁর কবিতার মধ্যে অনুরণিত হয়েছে। যেমন:

১. উমর। ফারুক। আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু,/ আহ্বান নয় রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতা-রাহু।[১০৫]

২. মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,/ ইমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস।
ভায়ে ভায়ে মোরা হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,/ জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ।
শহিদী-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,/ চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম খানায় বসি।[১০৬]

৩. কাঁদিয়া কহিনু-ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল/ মুসলিম হয়ে জন্ম লভিয়া এই কি লভিলি ফল?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে/ আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ/ এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ![১০৭]

অগ্নিবীণা (১৯২২), *বিষের বাঁশী, (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), জিঞ্জীর (১৯২৮), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), শেষ সওগাত (১৯৫৯)*, প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন কবিতা বাদেও বিশেষ করে *কাব্যে আমপারা* (১৯৩৩) ও *মরুভাস্কর (১৯৫১)* কাব্যদ্বয়ে তিনি মহানবীর জীবনাদর্শ তুলে ধরে ইসলামের মূলবাণীকেই সুবিদিত করেছেন। তথাপি আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি আনুগত্য ও আত্ম সমর্পণের কাব্য হিসেবে *সিরাজাম মুনীরা* আরও ব্যাপকভাবে উচ্চারিত। এ কাব্য প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বক্তব্য:

> হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনবাণী নিয়ে লেখা সুদীর্ঘ কবিতাগুলিতে ইসলামী জীবনধারার মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ জোরালো ভাষায় যে, মনে হয়, তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' এদিক দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের একটি অনুপম সম্পদ।[১০৮]

কাব্যের প্রথম কবিতা আখেরি নবীর নামানুসারে *সিরাজাম মুনীরা*, অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রদীপ। মানবসমাজের এক দুর্যোগময় কালে পৃথিবীর বুকে নবির আবির্ভাব ঘটেছিল। সে সময়ের নিষ্ঠুরতার বাস্তব দৃশ্য কবি তুলে ধরেছেন নিম্নরূপে:

বিশ্ব আরব গগনে মেঘ/ অত্যাচারীর হাতে পীড়িতের সেকী দুর্ভোগ, কী উদ্বেগ।
মূক পশু সম মার খেয়ে মরে খরিদা গোলাম বাঁদির দল।/ শিশু হত্যার মৌসুমী যেন, পাপে কেঁপে ওঠে জলস্থল,
শারাব শোণিতে মাতাল মানুষ মানবতাহীন নর্দমায়/ পুরীষ মাখায় শুভ ললাটে কদর্যরুচি পশুর প্রায়,
পথে কেঁদে ফেরে এতিম শিশুরা সর্বহারার বিরাট দল,/ জালিমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে বৃথা মোছে তারা নয়ন জল।...
সত্যধর্ম মুছেছে তখন তিমির লুপ্ত ধরণী হতে/ শুধু নীচু মুখে ভয়াল গতিতে নামছে বিশ্ব ধবংস স্রোতে।...
সে কী অনাচার। সে কী ব্যভিচার। বীভৎস ক্রূর আঁধি বিলীন,/ ভয়াল ঘৃণায় ন্যক্কার তোলে শতাব্দী পথে রাত্রি দিন।
পুতুলে সাজায়ে কাবাঘর কারা মাথা ঠুকে মরে পাপ-মাতাল/ মৃত জড়তার অশেষ আঁধার পচাবিষ তারা করে বমন।[১০৯]

এরূপ চরম অধার্মিকতার দিনে মানবসমাজে রসুলে খোদার আবির্ভাব আল্লাহপাকের অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর আগমনে:

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,/ কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপথ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।/ হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,/ তব বিদ্যুৎকণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।[১১০]

তিনি আবির্ভূত হয়ে আরবভূমিতে পূর্ণমানবতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন :

দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগণ বিপুল দেহ
ক্লেদাক্ত পথে ফোটায়ে মুকুল সাজালো তাদের ধরণী গেহ,
যে মরুতে জানি ফুল ফোটেনাকো, যেখানে উষর পৃথ্বীতল,
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য, আনলে অঝোর ধারা বাদল।[১১১]

কিন্তু নবির আবির্ভাব শুধু আরববাসীকেই পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে নয়, সমস্ত বিশ্বের অন্ধসমাজে শান্তি বিধানের জন্য। ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখতে যারা রসুলের সাথে এবং তার পরবর্তীকালে অসীম সাহস ও ত্যাগের পরিচয় প্রদান করেছেন তাদের প্রতিও কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি:

গলেছে পাহাড়, জ্বলেছে আকাশ, জেগেছে মানুষ তোমার সাথে,
তোমার পথের যাত্রীরা কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে,
তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু-দোল,
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনের ও-কলরোল
তাই ওসমান খুলে গেল দ্বার অতুলন দিল মণিকোঠার,
তাইতো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার,
খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞান যাত্রীরা করে প্রয়াণ।[১১২]

কিংবা:

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানের বীর, চিশ্‌তী বীর
রঙ্গিন করি মাটির সুরাহি নক্‌শবন্ধের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,[১১৩]

নবি ও তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ ও কর্মের প্রতি আনুগত্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। ইসলামের উন্মেষকালে নবিজি যখন পবিত্র 'কোরাণের নূর বুকে পুরে' মানব-মুক্তি ও আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেছিলেন, তখন আবু জিহিল প্রমুখ বহুঈশ্বরবাদী দল তাঁর প্রাণ হননের চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। সে দুঃসময়ে একমাত্র চিরবিশ্বস্ত বন্ধুরূপে আবু বকর (রা.) হযরতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মহিমাকে কবি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন:

বিরাট তোমার প্রশান্ত দিল, শান্তি কোল,/ মরু মুসাফির বন্ধুর সেথা কী কলরোল।
যে নিশান নবী ধুলির ধরায় রাখিলেন তাঁর শেষ নিশানা/ সৌম্য মহান, হে শক্তিমান। তোমারি হাতে সে মেলিলো ডানা।
হে সর্বত্যাগী খলিফা। তোমার দুয়ারে দেখেছি নিত্য ভীড়/ মরু বন্ধুর জীবনের পথে অযুত লক্ষ পথচারীর।
জান্নাতে ফিরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে :/ এস সিদ্দিক দরদী সঙ্গী যে করেছে সাথী নিঃস্বতাকে।...
দরদীর বুকে প্রেম সমুদ্র। বিরাট স্নেহের সেকী পাথার।/ নিল সে তনুতে সাপের ছোবল, নিল সে আঘাত, অত্যাচার!
সেই সমব্যথী হেসে নেয় দেহে বিষ দংশন, বিষের চুম,/ তার বিশ্বাসী কোলে বি-শ্রান্ত নবীজীর যেন ভাঙ্গেনা ঘুম!
অনুপ্রাণিত সে মহা আদর্শে চিত্ত যে তার সুরভি 'লালা'/ সব শ্রমিকের সাথে সে সমান খলিফা মহান-ফিরিওয়ালা!
ইসলাম তরী ভাসালো আবার নিখিল মানসে আবু বকর:/ নবীজীর সাথী, ইসলাম সাথী, মোমিন সঙ্গী শ্রেষ্ঠ নর।[১১৪]

হযরত ওমর (রাঃ) মানবতার আর এক জ্বলন্ত দীপশিখা। এই খলিফাতুল মুসলেমিন মানুষের প্রাপ্য অধিকার ও দুঃখ নিরসনে সর্বদা উদ্বিগ্ন থেকেছিলেন। রাতের অন্ধকারে নিজ কাঁধে বোঝা নিয়ে অনাহারী মানুষের গৃহে তাঁর খাদ্য পৌঁছানোর খবর কারো অজানা নয়:

দেখি সে চলেছে মরু মুসাফির কোথায় কে জানে/ পিঠে বোঝা নিয়ে মৃত বিয়াবান ছাড়ায়ে কী টানে।
চলেছে নিয়ে সে মানবতা-যেথা মরু নিষ্প্রাণ,/ জেরুজালেমের মাঠে ঢেলে প্রাণ বহ্নি তুফান,
চলেছে পারায়ে কাফেলা-সালার শিলা-প্রান্তর/ দুর্গমতার শিখরে যেখানে মানুষের ঘর...
চলেছে সে-পথে, সকল পাহাড় প্রাচীর বাধার/ ধূলি হয়ে ওড়ে সব প্রতিরোধ সম্মুখে তার।[১১৫]

অপর দিকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও সত্যের সংগ্রামে ওমরের (রা.) তরবারি ছিল সদা উদ্যত। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমাজ থেকে সমস্ত জুলুম নির্যাতন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যেখানেই পাপ ও অত্যাচার দেখতে পেয়েছিলেন, সেখানেই তিনি বজ্রপতিত আঘাত হেনেছিলেন। সে বিষয়েও কবি উল্লেখ করেছেন:

পাপের প্রাচীরে যেথা স্তম্ভিত সত্যের প্রভা ম্লান/ তোমার শাণিত তলওয়ারে সেথা বজ্রের প্রস্থান।
নিমেষে প্রাকার ভেঙে হয় গুড়া গুড়া,/ আঁধারের পটে সহসা-প্রকাশ সঙ্গ-মর্মর চূড়া,
সাথে নিয়ে আসে মহাসত্যের অনুচ্ছেদ,/ সীমারেখা টেনে দারাজ দস্তে করে প্রভেদ।
অথবা আবার তলওয়ার চমকায়/ জালিম, পাপীর, অত্যাচারীর শিয়রে দৃপ্তকায়।...
বিপুল প্রতাপে সে বিজয়ী তরবারি,/ সে অপরাজেয় ফিরে আসে ঘরে শান্তি পতাকা ধারী।
সে কী পৌরুষ। শান্তি দীপ্ত/ দারাজ বক্ষে সেকী পুলক,
মিথ্যা হতে সে সত্যে ফারুক/ করে পৃথক।[১১৬]

ওমর (রা.) চরিত্রের মানবপ্রেম ও ন্যায় শাসন সকল প্রকার সংকীর্ণতাকে উৎখাত করে একদিন বিশ্ববাসীকে নিরাপদ আশ্রয় দান করেছিল। সত্যিকার ইসলামে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। খেলাফত কালে সে নীতিকে তিনি বাস্তবরূপে দান করেছিলেন। আজকের সমাজে সমস্ত অনাচার অবিচার দূর করে অসহায় মানুষের দুঃখ মোচনে ওমরের (রা.) মতো ন্যায় শাসন ও মানব প্রেমিকের খুবই প্রয়োজন । কবি সে কামনাও ব্যক্ত করেছেন:

আসুক আবার এ হাতে আমার দোররা ও তলওয়ার/ এই কলুষিত জীবনের বুকে হানিতে শেষ প্রহার।[১১৭]

অথবা:

আজকে উমর পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন/ পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ পণ,[১১৮]

সত্য ত্যাগের অপর দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক ওসমান গণি (রা.)। তার মহত্ত্বও অফুরন্ত। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিশাল ধন সম্পদের অধিকারি ছিলেন। কিন্তু ইসলামের কাজে ও মানুসের কল্যাণে সবই হাস্যমুখে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তারই বৃহত্তর দানে মদীনার মসজিদ গড়ে উঠেছে, তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসে হাফেজের স্মৃতিকৃত পবিত্র কোরান গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। তিনি স্বব্যয়ে এরূপ অগণিত সংস্কারমূলক কাজ সম্পাদন করেছেন। অথচ এ মহান নেতার প্রতি কেউ কেউ ভীরুতা ও স্বজনপ্রীতির কুৎসা রটনা করেছেন। এমন মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করে কবি বলেছেন:

সেই সত্য প্রতিষ্ঠার দিনে/ বিশাল ভাণ্ডার তব ঈমানের পথ মিল চিনে।
করে গেলে সীমাহীন দান,/ বিশাল বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী করে গেলে
মানুষের সম্মান।[১১৯]

তারপর:

সবারে বেসেছে ভালো, করেনি সে স্বজন তোষণ,/ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তার ছিল না সঙ্কীর্ণ আবরণ,
রাষ্ট্রের ক্ষমতা, অর্থ লব্ধ কভু করে নাই যারে,/ মিথ্যা তোষণের কুৎসা মিথ্যাভাষী দেয় আজ তারে।
অদম্য। অনমনীয়। ব্যথা তারে দেয় অপবাদ/ ভীরুতর! সংগ্রামী সে মুজাহিদ অশ্রান্ত জেহাদ
চালায়েছে অন্তহীন সত্যের বিজয় অভিযানে,/ দিক হতে দিগন্তরে, দূর হতে দূরান্তর পানে,
উদ্ধত পাশব গর্ব পাদপিষ্ট করেছে হেলায়/ সে নির্ভীক মুজাহিদ। দেখ চেয়ে লুটায় ধুলায়
উদ্ধত। রোমের গর্ব। দেখ চেয়ে বিস্তৃতি রাষ্ট্রের।[১২০]

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন বিশাল জ্ঞান, অসীম সাহস ও প্রবল দৈহিক বলের অধিকারী। ইসলামের বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহীসালার হিসেবে শত্রুর ময়দানে তার গতি ছিল প্রচণ্ড ঝড়ের মতো:

থর থর করি কাঁপে প্রান্তর জীর্ণ খেজুর পাতা,/ বিদ্যুৎ যেন ছিঁড়ছে আবার খোমাবিথির ছাতা
দক্ষিণে বায় ঘন চমকায় আলীর জুলফিকার/ সহসা প্রকাশ সূর্য খুলেছে মধ্যদিনের দ্বার।[১২১]

এবং:

যেদিকে বাড়ায় নির্ভীক অঙ্গুলি
নুড়ির মতন ওড়ে কাফেরের খুলি কেঁপে মরে তার বজ্রের রবে শংকিত আজাজিল

চৌচির হয় সাঙ্গ হয় যত পিশাচের কালো দিল।[১২২]

তাঁর দৌর্দণ্ডপ্রতাপশালী চরিত্রের পরিচয় কবি দিয়েছেন এভাবে:

দূরপাহাড়ের পাথরে খোদাই সুদৃঢ় তার তনু/ হেরার জ্যোতিতে কোরানের নুরে ভরা অণু পরমাণু
সকল অত্যাচারের মধ্যে ওঠে দিয়ে মাথা নাড়া/ দারাজ বাজুতে সংহত করি অগ্নিগিরির ধারা
ইসলামী জোশে তবে হুশ পাগল পারা/ খোলে একে একে মানবতার সে চির নিরুদ্ধ কারা।[১২৩]

শক্তিশালী যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো অহংকারী ছিলেন না। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর অন্তরে সর্বদা জাগ্রত ছিল। এমনকি শত্রুপক্ষকেও তিনি মানুষের মর্যাদা দানে ভোলেন নি। ব্যক্তিগত রোষে কারো প্রতি তাঁর প্রতিশোধমূলক আচরণ ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যই চমকানো জুলফিকার হাতে তুলে নিয়েছিলেন:

আল্লার পথে জানি তুমি শুধু ধরিয়াছো তরবারি,/ চির-সংযমী ভুলেও কখনো হওনি অত্যাচারী,
কাফেরের থুথু সারা মুখে নিয়ে নাও নাই প্রতিশোধ,/ আল্লার দাস দমন করেছ সব অন্যায় ক্রোধ।[১২৪]

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লালসায় এজিদের অন্যায় ষড়যন্ত্রে ইমাম হোসেনকে (রা.) সমরে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সেখানে তাঁর শাহাদাত বরণ ঘটলেও মানবতার পক্ষে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তিনি যে বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন কবি তাকে গৌরবান্বিত করে এঁকেছেন:

হে ইমাম। দেখ বিস্মিত রবি তোমার শৌর্য দেখছে আজ/ তোমার দীপ্ত পৌরুষে ম্লান শত্রু সেনার জরীন তাজ!
ভীরুবুজদিল পারেনা সইতে তোমার যুদ্ধ আমন্ত্রণ/ তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বহুদূর হতে শত্রু বাহিনী দেখায় রণ।[১২৫]

পরবর্তীকালে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ পাড়ি দিয়ে যে সমস্ত সাধকগণ মানব সমাজে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন, তাদের মধ্য বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহঃ) ও মুজাদ্দিদ আলফেসানী শেখ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী (র.) নেতৃত্বস্থানীয়। এসব মহামানবের প্রতিও কবির অকুণ্ঠ ভক্তি নিবেদিত হয়েছে এবং তাদের জীবনের আলোকে বর্তমান সমাজের অন্ধকার অপসারণের ইঙ্গিত এসেছে। যেমন, আবদুল কাদের জিলানীকে (র.) স্মরণ করে বলা হয়েছে:

দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাতছানি.../ পরিপূর্ণ সেই সূর্য ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে
কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফেরে তিমির দুর্বিপাকে/ জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।
এ নিরন্ধ্র শর্বরীর অন্ধকারে তীব্র দ্যুতি হানি।/ তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সুর্যোদয়।
বলিষ্ঠ সিংহের মত শক্তিমান, একান্ত নির্ভয়/ জীলান সূর্যের রশ্মি যাক আজ খররশ্মি দানি।[১২৬]

ভারত উপমাহদেশে যুগ যুগ ধরে নানা অত্যাচার-অবিচার ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.) আজমীরে আগমন করে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে এদেশের মানুষের মনে নতুন আলো জ্বেলেছিলেন। তার অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করে তোলার জন্য কবি লিখেছেন:

প্রেমের বন্যায় তুমি হে তাপস। আনিলে আশ্বাস/ অফুরন্ত জীবনের। বহু শতাব্দীর মারীবিষ
জড়ায়ে ছিল যে মিথ্যা হিন্দের কলুষ মৃত্তিকায়/ আব্ হায়াতের ধারা তার বুকে ছড়ালো আশিষ,
সত্যের প্রোজ্জ্বল শিখা দীপ্ত হল রাত্রির হাওয়ায়।[১২৭]

মোগল শাসনামলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলামের পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছিল। এর প্রতিকার বিধানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমুদিত হয়েছিলেন মুজিদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী[১২৮] করেও নিরস্ত্র করতে পারেনি। বরং তারই জেহাদের পথ ধরে এদেশেও নেমে এসেছিল সামাজিক সুখ-শান্তি। এই পুণ্যবান বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ করে তাকে অনুধ্যেয় করেছেন তিনি:

হাজার বছর পরে সে হেলাল উঠেছিল জেগে/ হিন্দী বোত-খানা ফুড়ে নিখিল বিশ্বের কূলে কূলে,
অগণন মিথ্যাচারে নমরুদের সাজানো পুতুলে/ বিপুল আঘাত হেনে লক্ষ সমুদ্রের প্রাণবেগে
কোটি শুষ্ক গুলিস্তানে এসেছিল জোয়ার আবেগে/ মুক্ত প্রাণ ধারা।...
পারেনি থামাতে তারে অহঙ্কারী মোগলের ছুরি।/ তৌহিদের সত্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ সেই মুক্ত রবি
হাজার বছর পরে এনেছিল মদীনার ছবি।।[১২৯]

আখেরি নবি, খোলাফায়ে রাশেদীন ও বিশিষ্ট আউলিয়াগণের জীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে কবি তাদের আত্মোপলব্ধি, শিক্ষা-জ্ঞান, কর্ম-সাহস, বীরত্ব, বিপ্লবের দ্বারা বর্তমানকালের চরিত্রশক্তিহীন মুসলমানের প্রকৃতি গঠনের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর সে অত্যুচ্চ কামনার বহ্নিশিখা এ কাব্যের অন্যান্য কবিতা 'আজ সংগ্রাম', 'এই সংগ্রাম',

'মৃত্যু সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা', 'মুক্তধারা', 'ইশারাতে'-ও প্রজ্বলিত।

ছয়.

ফররুখ আহমদ আপন বিশ্বাসকে অভিনব রূপদান করেছেন *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাট্যে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *মাহে নও* পত্রিকার অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায় ১৯৫৬ সালে। পরে তা গ্রন্থবদ্ধ হয়ে মুদ্রিত হয় ১৯৬১ সালের জুন মাসে।[১৩০] এখানে তিনি আরাধ্য কামনাকে চাক্ষুষ মূর্তিমান করে তোলার জন্য স্বীয় ধর্মালোকে প্রাকইসলামি যুগের আরবীয় পুঁথিসাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে প্রাচীন পুথি বা কিংবদন্তী থেকে চরিত্র ও বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর কাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে নির্মাণ করেছেন। এখানে নৌফেল নায়ক। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র চিত্রণই কবির মূল উদ্দেশ্য। চরিত্রটিকে পূর্ণতা দানের জন্য মহানুভব উদারদিল হাতেমের আবির্ভাব। কেননা কবি মানবপ্রেমিক সেবাব্রতী হাতেমের মধ্যে ইসলামি দীক্ষার পরিপোষক ভালবাসা ও ত্যাগে সম্মোহিত হয়েছিলেন। সেকথা তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকাতেই বলেছেন:

> য়েমন মুলুকে ছিল শাজাদা হাতেম, নেকনাম,/ নিল সে দারাজ দিল মানুষের বোঝা গুরুভার!
> ছেড়ে এল তাজ তখ্ত, এল ছেড়ে ঐশ্বর্য্য, আরাম,/ মহান খিদ্‌মতগার পেল প্রীতি, খ্যাতি সে অপার।
> আরবে নৌফেল শাহা প্রতিদ্বন্দ্বী সে যশ লিপ্সার/ বিলালো ভান্ডার, তবু পেল না যে সম্মান দাতার।
> নেমে গেল প্রাণ তার অন্ধ হিংস্র রাত্রির ছায়ায়।/ আশ্চর্য পন্থায় শাহা পেল শেষে মুক্তির দুয়ার।[১৩১]

অবশ্য বিশেষ ভাবপ্রচারে অবতীর্ণ হলেও শিল্পকুশলতায় গ্রন্থটি বেশ নাট্যগুণ সম্পন্ন। বিশেষত হাতেমের সুখ্যাতি ও গৌরব শ্রবণে ঈর্ষানীল নৌফেলের কার্যকলাপ, হাতেম কর্তৃক মানবিক পন্থায় তার মোকাবেলা করার চেষ্টা, পরিণামে নৌফেলের মনে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ইত্যাদি ঘটনা ও দৃশ্য অনেকটাই নাটকীয় সম্ভাবনা সমৃদ্ধ।[১৩২] ফলে এ কাব্যনাট্য কেবর মানবতার অমর প্রেরণা নিয়েই আসেনি, রসাস্বাদনের চিরন্তন সামগ্রী হয়েও পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। বহুকালের পুরাতন ধ্যানধারণার আধুনিক শিল্পাঙ্গিকে তিন অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে, অমিত্রাক্ষর মহাপয়ারে এমন সার্থক শৈল্পিক রূপায়ণে ফররুখ আহমদের কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদিরের মন্তব্য:

> নৌফেল ও হাতেম নাটকে দেখানো হয়েছে : ব্যক্তির খ্যাতির লিপ্সা বনাম মানবিকতার দ্বন্দ্ব। শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্যসৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীর ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত।[১৩৩]

এর আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ইয়েমেনের শাহজাদা হাতেমের গুণকীর্তনের মধ্যদিয়ে। তিনি মানবতার সেবায় উৎসর্গিত পুণ্যাত্মা। তাঁর সুনাম শুধু নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ নেই, সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি আরব-বাদশাহ্ নৌফেলের রাজ্যে আয়োজিত প্রাচীন মেলায় সমাগত পথিক-দর্শকের মুখেও হাতেমের প্রকীর্তি ও উদারতার পরিচয় অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে চোখে পড়ে সেখানে দূরবর্তী ইয়েমেন থেকে আগত এক মুসাফির যথার্থ কদর না পেয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন:

> এদেশে মানুষ নাই? নাই কোন ইনসান এখানে?/ দূরান্তের মুসাফির দেখে কেউ ডাকেনা, কুশল
> জিজ্ঞাসা কেউ করে না; ভুলে।[১৩৪]

অথচ হাতেমের দেশে এমন রীতি নেই। সেখানে যে কোনো মানুষের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল। এতে তিনি যে হাতেমের রাজ্যের লোক সে পরিচয় পেয়ে ঘটনাস্থলেই কয়েকজন দর্শক হাতেমের দানশীলতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাকে নিজগৃহ আতিথেয়তা গ্রহণের অনুরোধে জানিয়েছেন। যেমন, একজন আরববাসীর সম্ভাষণ :

> যেতে হবে আমার তাঁবুতে/ বিদেশী মেহমান। ভুলিনি মেহমানদারী য়েমনের।
> ভুলি নাই কোন দিন সর্বত্যাগী হাতেমের কথা।[১৩৫]

এ পর্যায়ে গুপ্তচরের মুখে বাদশাহ্, নৌফেলের দয়াদাক্ষিণ্যের কথাও ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেননি। হাতেমের এরূপ বিপুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে, নৌফেল সুনাম অর্জনের জন্য খাজাঞ্চীকে লক্ষ দিনার বিতরণের নির্দেশ দেন:

লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে/ পরিচিত, অথবা অপরিচিত। দৃষ্টি রেখো যেন
কৌশলী ভিখারী কোন এ মেলায় করেনা বঞ্চনা/ বারবার ভিক্ষা নিয়ে। দেবে তুমি সহস্র দিনার
দূরান্তের মুসাফির দেখে।[১৩৬]

খাজাঞ্চী দাস-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে মূল্যবান আশরফি বণ্টনে মেলায় নেমেছেন। তারা দরিদ্র প্রতিবেশী রেখে ইয়েমেন থেকে আগত সেই পথিকের হাতে আশরফি দান করেন। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে প্রাপ্ত দিরহান ছুঁড়ে ফেলে দেন। কারণ দানে সততার অভাব, তার উপর দাতা প্রাসাদের অভ্যন্তরে সম্ভ্রমে অবস্থান করে অন্যের দ্বারা গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করবেন, এমন অনুগ্রহ হাতেমের মুল্লুকে কেউ দেখেননি। তার উক্তি:

আশরফি চাইনা আমি, নই আমি ভিক্ষুক সায়েল/ এসেছি মেলায় শুধু এ রাজ্যের রীতি দেখে যেতে,
দেখেছি তা ।চলে যাব এই রাত্রি শেষে নিয়ে যাও/ ফেরায়ে আশরফি তুমি, দিও দর্পী নৌফেল বাদ্‌শাকে।[১৩৭]

এদিকে গুপ্তচর আবার বাদশাহ্‌কে জানিয়ে গেছেন, রাস্তাঘাটে সর্বত্র সকলেই যেন হাতেমের নামে দেওয়ানা। পীড়াদায়ক এ সংবাদে তার দান-ধ্যানের হস্ত আরো প্রসারিত হয়। তিনি রত্নভাণ্ডারের সম্পূর্ণ দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, যাতে দীন-এতিম প্রয়োজন মাফিক ধনদৌলত গ্রহণ করতে পারে। বিনিময়ে তার একমাত্র কামনা:

জানুক জাহান আজ তা'য়ী পুত্র হাতেমের চেয়ে/ ক্ষুদ্র নয় নৌফেলের প্রাণ।[১৩৮]

এমন দানের মহড়ায় কোতোয়াল বন্দী মুসাফিরকে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হন। দিরহাম ধুলায় ফেলে অপমান করার অপরাধে বাদশাহ্‌ তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এতে নৌফেলের নৃশংসতার পরিচয় প্রকাশ পায় এবং খ্যাতির পরিবর্তে দুর্নামই বেড়ে চলে। মরূদ্যানে ক্রীড়ারত বালক ও নানা বয়সী পথচারীদের কথোপকথনে তারই বহিঃপ্রকাশ। একজনের স্পষ্ট বক্তব্য:

নৌফেল নিজেও জানেন :

নৌফেলের জারিজুরি জেনে গেছে এখন সকলে/ সে চায় দাতার নাম দিরহাম বিলিয়ে।[১৩৯]

নৌফেল নিজেও জানেন :

প্রয়াসী আমার/ মেলেনা সে খ্যাতি যশ সর্বস্ব বিলিয়ে, ঘৃণা আমি
পাই প্রতিদানে। কুড়াই কুখ্যাতি শুধু। [১৪০]

এতে তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এবার তিনি হাতেমের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:

এ কথা ভেবেছি শেষ, নেব লুটে তার শাহী তখত।/ রাজ্য, রাজধানী তার লুটাবো ধুলায়, দেখে যাব
কত সে দিলীর, দাতা, কত সে উদার।[১৪১]

মনের প্রশান্তি হারিয়ে এ আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার জন্য বিজ্ঞ উজির বাদশাহ্‌কে পরামর্শ দেন। তার ধৃষ্ঠতামূলক সংকল্পে সভাসদ সিপাহসালাপর ও বৃদ্ধ মুর্শিদও মর্মাহত। তথাপি ঈর্ষাদগ্ধ নৌফেল কর্তব্যে অটল। কেননা তার প্রতিধমনীতে আজ নরকের অগ্নিকুণ্ডে:

আমাকে দিওনা বাধা। প্রতি রন্ধ্রে প্রতি স্নায়ু কোষে/ জ্বলে কোন জাহান্নাম রাত্রিদিন,
জানোনা উজীর তুমি, কেউ তা জানে না।[১৪২]

ইয়েমেনের রাজপ্রাসাদ। বৃদ্ধ বাদশাহ্‌ ও শাহজাদা হাতেম আলোচনায় রত। সেবাব্রতে নিয়োজিত হাতেম দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মাতৃভূমির দুর্বার আকর্ষণে দেশে ফিরে এসেছেন। এ ভ্রমণে তিনি বিভিন্ন জাতির ভাঙা-গড়ার ইতিহাস ও ধ্যানী-জ্ঞানীর সংসর্গ ছাড়াও অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করেছেন। বৃদ্ধ বাদশাহ্‌ এখন যোগ্যপুত্রের কাছে রাজ্যভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু সেবকপ্রাণ যুবরাজ আসনে বসতে আগ্রহী নন। এ সময় আকস্মিকভাবে খবর আসে বাদশাহ্‌ নৌফেল অসংখ্য ফৌজ নিয়ে এদেশ আক্রমণে অগ্রসর হয়েছেন। সংবাদ প্রথমত অবিশ্বাস্য হলেও এর সত্যতা যাচাই করে হাতেমের মনে সদ্ভাব জাগ্রত হয়। তিনি মনে করেন, অযথা খ্যাতির সংঘর্ষে ইনসানের তাজা খুনই শুধু ঝরবে। অথচ আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসাতেই তার তৃপ্তি। তাই জিঘাংসার পরিবর্তে নৌফেলকে সম্পূর্ণ রাজ্য ছেড়ে দিয়েও তিনি রক্তপাত বন্ধ করতে চান। বৃদ্ধ পিতা বিবেকবান পুত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করেছেন ভেবে দেখো এখনো হাতেম।[১৪৩] উপর্যুপরি উন্মত্ত জনগণও কেবল হাতেমের নির্দেশ প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছেন। হাতেম ইচ্ছা করলে বিপুল জনবল ও রাজশক্তি প্রয়োগ করে নৌফেলের অন্যায় আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেই তা করেননি। হাতেম সুবিবেচনায় নৌফেলের অভিযাত্রাকে নিরাপদ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফকীরী বেশে রাজ্য ত্যাগ

করেন। কিন্তু তাতেও নৌফেলের অসূয়া বিষ নির্বাপিত হয়নি। তার বাহিনী ইয়েমনে প্রবেশ করে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে অবশেষে সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়। ফলে বিধ্বস্ত দেশবাসী নৌফেলের প্রতি অশেষ ঘৃণা ও অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।

মোসাহেন পরিবেষ্টিত নৌফেল মহাত্যাগী হাতেমের প্রতি প্রাণভয়ে পলাতক ও কাপুরুষত্বের অপবাদ আরোপ করে, অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা দর্পে মাতোয়ারা। এমনি মুহূর্তে তিনি জানতে পারেন, আজো সংখ্যাতীত মানুষ হাতেমের জন্য অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করেন এবং জনসাধারণ যে কোন সময় বিস্ফোরিত হয়ে বিদ্রোহীরূপ ধারণ করতে পারেন। দরবারস্থ সকলের মনে সে আশঙ্কা দেখা দিলেও ঔদ্ধত্য নৌফেলের মনে তখন অন্য চিন্তা। তিনি বর্বরতার আরো নিম্ন পর্যায়ে ধাবিত হন এবং বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে হাতেমের শির ঘোষণা করেন। তার অন্তর্দাহের স্বরূপ:

হিংস্র আজদাহার মত এই প্রাণ তার খোঁজ চায়/ যে নিল সকল শান্তি, আনন্দ, আরাম। রাত্রি দিন
জ্বলি আমি যে আগুনে শেষহীন ব্যর্থতার বিষে।[১৪৪]

প্রাচীন শহরের একটি রাজপথ। একজন রোগশীর্ণ কুলি ভারি বোঝা নিয়ে বিপদে পড়েছে। বিশেষ অনুরোধেও মুটের মালিক শরাফতির অহংকারে বোঝাটি তার মাথায় তুলে দিতে সম্মত হননি। বরং মজুরি না পাওয়ার ভয় দেখিয়ে বেহায়া, বেতমিজ বলে তাকে ভর্ৎসনাও করেছেন। এ ঘটনাস্থলে একান্ত ছদ্মবেশ হাতেমের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সমস্ত অবগত হয়ে অসহায় মজুরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং বিপুল বোঝাটি মাথায় নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেন। এখানে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ফুঠে উঠেছে আপন সংলাপে:

যে বলেছে কমজাত সে মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী সেই মানুষের অপমান করে নিজে হারালো সম্মান। তোমার এ বোঝা নিয়ে যাব আমি জুবেদা - মহলে; ভেবোনা দুঃখের কথা, অনায়াসে পাবে সে মজুরি প্রাপ্য যা তোমার।[১৪৫]

এমন অপূর্ব সহানুভূতি লাভে মজুরের মনে তা'য়ী পুত্র হাতেমের স্মৃতিই ভেসে ওঠে। অবেশেষে পরিচয় উদ্ঘাটিত হলে সে তাকে তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে। কেননা হয়ত পুরস্কারের লোভে 'বহু শকুনির দৃষ্টি জেগে আছে অলিতে গলিতে।'[১৪৬]

স্বর্গরাজ্য ইয়েমেন আজ নৌফেলের অত্যাচারে জর্জরিত। সর্বত্রই বিষাদের কালো ছায়া। যে সরাইখানা একদিন ফালুদা, শরবত, খোরমা, কোফতা ও বিরিয়ানি - তে ভর্তি ছিল, সেখানে এখন শোকাচ্ছন্ন মানুষ ইফতারের আয়োজনেও কেবল শুকনো রুটি ও পানি ছাড়া কিছুই গ্রহণ করে না। উৎপীড়িত জনতা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তাও করে। কারণ তাদের দরদীবন্ধু:

তা'য়ী পুত্র হাতেমের সাথে/ সকল আনন্দ হাসি চলে গেছে এ জমিন থেকে,[১৪৭]

এমন সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক শিরশ্ছেদের জন্য নৌফেল অযাচিত প্রণমি ঘোষণা করেছেন। অর্থের প্রলোভনে কেউ তাদের দেবতুল্য নেতাকে ধরিয়ে দেবে এমন আশ্বাস ভিত্তিহীন। বরং বিক্ষুব্ধ ইয়েমনবাসী তার মহান ত্যাগের আদর্শকে অনুসরণ করেই আজ নিস্তব্ধ হয়ে আছে। তবে :

সংখ্যাহীন নৌ জোয়ান.../ যেদিন ইশারা পাবে মুক্ত প্রাণ হতেম তা'য়ীর
সেদিন নামাবে টেনে অত্যাচারী নৌফেল বাদশাকে/ ধূলিতে বা জাহান্নামে,
মুহূর্তে দাঁড়াবে যত/ সংগ্রামী, স্বাধীন চেতা নিশঙ্ক তরুণ, সাহারার
মৃত্যু হিংস্র বেদুইন।[১৪৮]

হাতেমের বিশাল প্রতিপত্তি রোষদীপ্ত নৌফেলের মনে যে দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দিয়েছে, তারই লেলিহান শিখায় তিনি আজ দগ্ধিভূত। পুরস্কারের ঘোষণা রেখেও হাতেমকে না পাওয়ায় তার সমস্ত প্রয়াস চরম ব্যর্থতা নিয়ে, তাকে যেন অহরহ বিদ্রূপে - উপহাসে ব্যঙ্গ করে চলেছে। এ অন্তর্জ্বালা নিবারণে বেগম তাকে প্রতিহিংসার সংর্ঘষ থেকে ফিরে আসার অনুনয় জানিয়েছেন। নৌফেল নিজেও তা অনুভব করেন। রাত্রিদিন কেবল ঈর্ষার আগুনে জ্বলেপুড়ে তিনি বুঝেছেন 'হিংসুকের প্রাণ জাহান্নাম।'[১৪৯] তার চেতনায় জেগে ওঠে হাতেম তো কোনো দোষে অপরাধী নয়। অকারণে তিনি নিজেই শত্রুতা বাড়িয়ে তাঁর সম্ভ্রম লুটাতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও পাশবিক দুর্বুদ্ধি তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে তোলে। আবার তিনি হাতেমের অতিমানব জনপ্রিয়তার কাছে নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করেন। তাই রাজ্যের বিনিময়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে নিষ্কণ্টক হওয়ার পূর্বপর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই।

ইত্যবসরে ঘটনাক্রমে হাতেম এক অসহায় কাঠুরিয়া পরিবারের দারিদ্র্য মোচনে তাদের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁকে নিয়ে নৌফেলের দরবারে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য হাজির হওয়ার অনুরোধ জানান। অবশেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে হাতেমকে নিয়ে নৌফেলের দরবারে উপস্থিত হলে, পুরস্কার লাভের জন্য জিজ্ঞাসিত হওয়ায় সত্য ঘটনা খুলে বলেন:

করিনি কখনো বন্দী/ কি সাধ্য আমার, শক্তি কতটুকু রাখি এ বাহুতে

বন্দী করি একে। এসেছে দারাজ দিল, মুক্ত প্রাণ/ দরদী আমার দুঃখে ভয়হীন মৃত্যুর সম্মুখে।[১৫০]

এতে সভামণ্ডলী স্তম্ভিত হয়ে যান। আর নৌফেল বিমূঢ়-বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেন:

চিনেছি তোমার রাহা এতদিনে, কামিল ইনসান/ 'য়েমনি হাতেম তা'য়ী। আমার মনের অন্ধকার

রেখেছিল এত দিন বন্দী করে সে কালো জিন্দানে.../ হৃদয়ের স্পর্শে দেখি চেয়ে

উজ্জ্বল কুতুব তারা জ্বলে আজ সম্মুখে আমার/ অকলঙ্ক, দ্যুতিমান।...

ক্ষমা করো শত্রুতা।[১৫১]

এ কাহিনীতে কবি ঐতিহাসিক স্থান, পাত্র ও ঘটনাকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে ভবিষ্যতের জন্য ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন। আহসান হাবীবের মতে, 'কোন মহৎ শিল্পী নিজের ক্ষমতায় সম্পূর্ণ নতুন একটি জগতের স্রষ্টা হয়ে আবির্ভূত হবেন, অথবা আহরিত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আগামী দিনের কোন উজ্জ্বলতর পৃথিবীর ইঙ্গিত দিবেন...।'[১৫২] মনে হয় ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য। সমসাময়িককালে পাকিস্তানের শোষণ-নিষ্পেষণে এদেশের মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অত্যাচারিত ইয়েমেনবাসীর হাহাকারের মধ্য দিয়ে সে পরিচয় কতকটা ভেসে আসে। নৌফেলের কামনা-অন্ধ হৃদয় বিরাম মাঠ। তার মাধ্যমে কবি স্বীয় সমাজের শাসকচরিত্রের নির্দয়তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। হাতেম মানবতার প্রতিভূ। তার নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমে নৌফেলের মনে যে প্রতিক্রিয়াজনিত পরিবর্তন, তা যদি বর্তমান সমাজে কার্যকরী হয়, তা হলে পৃথিবীর বুকে শান্তির রাজ্য গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাত.

ফররুখ আহমদের সমাজসচেতনতা জীবনঘনিষ্ঠ রূপলাভ করেছে চতুর্দশপদী কবিতা সংকলন *মুহূর্তের কবিতা* (প্র. ১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থখানিতে।[১৫৩] বলতে গেলে তার কাব্যকল্পনার সম্পূর্ণ অবয়ব জুড়ে সনেটের প্রাধান্যই আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রথম থেকেই তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন।[১৫৪] তথাপি সনেট শিল্পী রূপে তাঁর যথার্থ পরিচয় এ কাব্যেই রয়েছে। নির্বাচিত সনেটসংকলন হিসেবে প্রায় প্রতিটি কবিতা আঙ্গিকে, গঠনে, পঙ্ক্তির দৃঢ়তায় নিখুঁত, অনবদ্য।[১৫৫] এ কর্মে তিনি মধুসূদন দত্ত বা প্রমথ চৌধুরীর অনুসৃত চতুদর্শ অক্ষর চরণের চিরাচরিত রীতিকে অনুসরণ না করে, অষ্টাদশ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে মোহিতলাল মজুমদারই প্রথম এ রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। ফররুখ আহমদ তাকে আপন ভাবপ্রকাশের যথার্থ বাহন রূপে স্বচ্ছন্দভাবেই গ্রহণ করেছেন।

মুহূর্তের কবিতা-র অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীতে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শগত ভাবনা-চিন্তা নয়, সমসাময়িক কালের সমস্যামুখর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রূপও নানভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে তিনি *হে বন্য স্বপ্নেরা*-র কবিকে আবার বাস্তবসমাজের পটভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন:

আর একবার তুমি খুলে দাও ঝরোকা তোমার,/ আসুক তারার আলো চিন্তার জটীল উর্ণাজলে,

যে মন বিক্ষত, আজ জাগুক তোমার ছন্দে তালে/ এখানে সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এস একবার।[১৫৬]

সাহিত্যের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ক্ষণিকের বিশ্রাম নিয়ে কবি যেন, জীবনের গূঢ় তাৎপর্য ও মহত্তর জীবনভাবনা থেকে একটু সরে, প্রাত্যহিক দুঃখ-দৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। কবির ভাবনায় সে সুরই এখানে ধ্বনিত হয়েছে :

সন্ধ্যা গোধূলির রঙে জান্নাতের এই পাখী দল,/ জীবনের তপ্ত শ্বাসে, হৃদয়ের সান্নিধ্যে নিবিড়,

অচেনা আকাশ ছেড়ে পৃথিবীতে করে আসে ভীড়।/ গেয়ে যায় মুক্ত কণ্ঠে মৃত্যুহীন সঙ্গীত উচ্ছল।[১৫৭]

ফলে কাব্যবিশ্বাস ছাড়াও এ পর্বে স্বদেশ-স্বজাতি-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-যুগ ও জীবনবোধ কবিতার মূল প্রেরণা যুগিয়েছে। 'কবি এখানে বর্তমানের রূঢ়তার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে অনেকটাই জেগে উঠেছেন, পারিপার্শ্বে দৃষ্টি তুলে ধরেছেন, আপন হৃদয়গহীনে ডুব দিয়ে ভাবনার মুক্তা আহরণের চেষ্টা পেয়েছেন।'[১৫৮] নিসর্গচেতনার মধ্যেও তিনি বাস্তব জীবনসত্যের সন্ধান করেছেন। 'বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ' ও 'কুতুব তারা' কবিতা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মেঘে ঢাকা বর্ষার চাঁদ কবির কাছে মনে হয়েছে সর্বকালের ব্যথিত মানুষের দুঃখের প্রতিচ্ছবি। শ্রাবণমেঘের ঘনঘোর আড়ালে চাঁদের আলো যেমন নিভে আর জ্বলে, তেমনি জীবনযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের জীবনও আশা-নিরাশার শিকার। প্রকৃতপক্ষে বর্ষার চাঁদ তার বিষণ্নরূপ নিয়ে চিরদিন ব্যথিত মানুষেরই স্মৃতি বহন করে চলেছে :

... সে রাত্রির অস্ফুট ব্যথার/ মৃদু স্বর আছে এ আকাশে। সেই ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি

আমার মনের তারে বেজে ওঠে আপনা আপনি,/ শ্রাবণ মেঘের মাঝে ডুবে যায় চাঁদ যতবার;

যতবার ভেসে ওঠে।[১৫৯]

তেমনি 'কুতুব তারা' কবিতাটি পথভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখানোর প্রতীকীরূপে এসেছে। খিজির (আঃ) যেমন বিপদগ্রস্ত হতাশ ব্যক্তিকে মুক্তির আলো দেখান, তেমনি 'কুতুব তারা' বা সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশে অবস্থান করে সমুদ্রে-অরণ্যে-পথে-প্রান্তরে অন্ধকারে নিমজ্জিত দিকহারা পথিককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়:

জুলমতের এলাকায় হে নিঃসঙ্গ, খিজিরের মত/ আবে-হায়াতের তুমি পেয়েছে সন্ধান, চিরন্তন
সত্যের পেয়েছো অভিজ্ঞান। অন্ধাকারে শংকাহত/ দিক-ভ্রান্ত প্রাণে তাই দিয়ে যাও আশ্বাস নূতন....।[১৬০]

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবিতা 'তোমাকে জাগাবো', 'তুমি জাগলে না'-য় রাজকুমার যে বন্দিনী শাহ্‌জাদীর ঘুম ভাঙানোর কথা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা স্থবির-অবসাদগ্রস্ত বাঙালি জাতিসত্তারই অচেতন রূপ :

১. বন্ধিনী, দৈত্যের হাতে তুমি আজ পৃথিবীর মত/ পড়ে আছো নিঃসহায় (জিন্দেগানি মৃত্যুর সমান,
জাগে না তোমার কণ্ঠে ভারমুক্ত জীবনের গান),/ দুর্বহ যাদুর বোঝা করেছে তোমাকে অবনত।[১৬১]
২. যে ঘুম নেশার মত সমাচ্ছন্ন করেছে তোমার/ জাগ্রত চেতনা, বুদ্ধি,... বিষ তার রয়েছে ছড়ানো
সমস্ত সত্তায়, আর ক্লান্তি তার দু'চোখে জড়ানো/ নিয়েছে সহজে কেড়ে উচ্ছ্বসিত প্রাণের জোয়ার।[১৬২]

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কবি বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরেছেন 'জিঞ্জিরা', 'লালবাগ কেল্লা', 'সোনারগাঁওঃ একটি প্রাচীন স্মৃতি' কবিতায়। এগুলিতে তিনি বর্তমানের পটভূমিতে অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ করেছেন :

১. খুলে যায় সে প্রশ্বাসে বিস্মৃতির নিরুদ্ধ দুয়ার,/ দেখি চেয়ে সবিস্ময়ে সেদিনের ঐশ্বর্য্য, আরাম,
হত্যা, ষড়যন্ত্র, লোভ, নির্মম নিষ্ঠুর অবিচার/ (কালজীর্ণ এ মহলে যেথা খোঁজে শ্বাপদ বিশ্রাম)
নয়া কারবালার গাথা এখানে শহীদ সিরাজের/ চলেছে মন্থর নদী স্মৃতি নিয়ে ক্লান্ত ফোরাতের।[১৬৩]

২. কেল্লা লালবাগ! তুমি সময়ের নির্জীব শিকার,/ তোমার আরক্ত বর্ণে নাই সেই উজ্জ্বল জৌলুষ,
মৃত্যু ও ক্ষয়ের স্পর্শে তবু তুমি হওনি কলুষ,/ আজাদী উষার তীরে দেখি আজও গৌরব তোমার।[১৬৪]

৩. এখনো সোনার গাঁও জেগে আছে সেই স্মৃতি নিয়ে/ ইরানের মিছরি দানা নেমেছিল এ মাঠে যে দিন,...
হারানো দিনের স্মৃতি : হাসি-অশ্রু-আনন্দ-সজল/ পদ্মা মেঘনার দেশে জাগে আজও ইরানী গজল।[১৬৫]

একই রূপে 'ইতিহাস', 'বন্দরের স্বপ্ন', 'সাম্পান মাঝির গান' কবিতায় পুরাকালের গৌরবময় প্রাণসত্তায় জেগে উঠে, জাতীয় দৈন্য মোচনে সংগ্রামী জীবনচেতনার ডাক এসেছে:

১. অলেখা সে ইতিহাস সমুদ্রের ঘন অন্ধকারে/ বিশ্রান্ত মাল্লার সাথে পড়ে আছে যুগ যুগান্তর!
সে কথা জানে না কেউ, কোন দিন রাখে না খবর/ তার দীর্ঘশ্বাস জাগে নিকট রাত্রির রুদ্ধ দ্বারে।[১৬৬]

২. দরিয়ার পেরেশানি ভুলে ওরা এ পলিমাটিতে/ কেউ বা বেঁধেছে ঘর, গেছে কেউ দূর সফরের
নতুন ইশারা পেয়ে সমুদ্রের দুর্গম ঘাটিতে,/ গেছে কেউ ঘূর্ণাবর্তে বাণী বয়ে মুক্ত জীবনের।[১৬৭]

৩. যেখানে লবন-গন্ধী সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়ায়/ দুর্বার তরঙ্গ ওঠেহিংস্র, তীক্ষ্ণ ফণা আজদাহার,...
সেখানে সাম্পান মাঝি শংকাহীন সংগ্রামী সত্তায়.../ নির্ভীক সেনানী সেই দরিয়ার নিঃশংক সওয়ার,
তারপর ফিরে আসে কর্ণফুলী নদী মোহনায়।[১৬৮]

এপাশে 'দীউয়ানা মদিনা'য় লোকসাহিত্যের গ্রামীণ নায়িকা মদিনার স্মৃতিচারণায় প্রেমময়ী-স্নেহশীলা বাঙালি নারীমূর্তির শাশ্বতরূপ ফুটে উঠেছে:

এখনো দুচোখে ভাসে ছবি সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার,/ যখন ধানের গুছি পুঁতে দেয় স্বামী তার মাঠে
গৃহ কাজ শেষে নারী ভর দিয়ে একান্তে কপাটে/ চেয়ে থাক মাঠ পানে, শূন্য পথে মন ঘোরে তার।[১৬৯]

পুঁথি সাহিত্যের প্রতি চিরদিনই কবির প্রবল আকর্ষণ ছিল। কেননা পুঁথিকাহিনীতে বিধৃত মনীষী ও বীরপুরুষগণের জীবনগাথা কবিকে সমাজগঠনে অপূর্ব প্রেরণা দান করেছে। স্বীয় সমাজকে তাঁদের জীবনমাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য পুঁথির চরিত্র অবলম্বনে তিনি 'মুহার্রাম মাসে', 'শহীদে কারবালা', 'তাজ

কেরাতুল আউলিয়া', 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'শাহানামা', 'আলিফ লায়লা', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তা'য়ী' প্রভৃতি সনেট লিখেছেন। এ সবের মধ্যে প্রাচীন অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক মূল্যায়ন ও আত্মজাগরণের প্রয়াস প্রারব্ধ হয়েছে:

১. জেগে উঠে কারবালার মরুমাঠ, ফোরাত নদীর/ উচ্ছল প্রবাহ; তীরে এজিদের পাহারা![১৭০]

২. পুঁথি পড়া শেষ হল চাঁদ নিভে গিয়েছে যখন/ দরগা তলার বনে (আউলিয়ার মাজার যেখানে),
পূর্বের হাওয়ার স্বর কারবালার স্মৃতি বয়ে আনে/ দূরে বয়ে যায় নদী মধুমতী স্বপ্নের মতন।[১৭১]

৩. স্মৃতির পাথর পটে সে কাহিনী রয়েছে অম্লান/ উজ্জ্বল রক্তের রঙে, মোছেনি তা মরু সাহারায়,
লোভের পঙ্কিল পথে অথবা রাত্রির তমসায়/ যেখানে জ্বালালো দীপ সত্যাশ্রয়ী আদম সন্তান।[১৭২]

৪. আমার সংশয়, দ্বিধা গেল মুছে কুয়াশার মত/ অস্পষ্ট রাত্রির শেষে প্রথম যখন শুনিলাম
গুলি আউলিয়ার কথা,... ।[১৭৩]

৫. যখন বিভ্রান্ত প্রাণ বল্গাহীন তাজীতে সওয়ার/ অস্তি বা নাস্তির প্রশ্নে বাড়ায় চিত্তের ব্যাকুলতা,
অথবা মৃত্যুর তীরে খোঁজে সে ক্ষণিক মাদকতা,/ কাসাসুল আম্বিয়ার পাই আমি সমাধান তার।[১৭৪]

৬. এ মহা কাব্যের বুকে তেমনি অসংখ্য নদী, নদ/ সময়ের খরস্রোতে মিশে গেছে নিভৃতে নিঃশেষে
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, লোভ, অহমিকা ব্যর্থতার দেশে/ মিশে গেছে,....... মিশে গেছে পান পাত্র, পেয়ালার মদ।[১৭৫]

৭. সংখ্যাহীন মনে আজও দোলা দেয় সেই কথকতা।/ ফেরাতে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত শাহেরজাদীর ব্যাকুলতা।[১৭৬]

৮. চাহার দরবেশের কথা শুনিল সে যখন, আঁধারে/ মনে হল এ জীবন ঝড়-ক্ষুব্ধ রাত্রির কাহিনী।[১৭৭]

অনুরূপভাবে কবি 'শবে বরাত প্রসঙ্গে', 'শবে কদর উপলক্ষে' কবিতাদ্বয়ে মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ও মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন:

এখনো সে পুণ্য রাত্রি নামে পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ/ এক অন্ধকার ছেড়ে অন্য এক আঁধারে হারায়,
ঊর্ধ্বে ইঙ্গিত আসে লক্ষ মুখে অজস্র ধারায়,/ নর্দমার কটি শুধু পাপ-পঙ্কে খোঁজে পরিত্রাণ।[১৭৮]

সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত সাতান্নর 'কবিতা'য় তিনি পূর্বকালের ঐতিহাসিক ঘটনাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন এবং মানবতার মুক্তির জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে উৎসর্গিত প্রাণকে মৃত্যুঞ্জয়ী বলে ঘোষণা করেছেন:

একশো বছর আগে, তবু আজও আছে অমলিন/ সে দিনের স্মৃতিগাথা শহীদের লাল রক্তে আঁকা।[১৭৯]

অথবা:

জঙ্গের ময়দানে ওরা পেয়েছে সে শহীদী সনদ,/ সিপাহী বিপ্লবে ওরা গেছে ভেঙে যুগান্তের নিদ।[১৮০]

'শহীদ স্মরণে' কবিতাটিও একই অনুভূতির ফসল:

মৃত্যু তবু মৃত্যু নয়। নিল যারা শহীদী শপথ,/ মৃত্যু-বিভীষিকা মাঝে পেল যারা প্রাণের সঞ্চয়,
মৃত্যু পরিখা প্রান্তে ওঠে আজ তাহাদেরি জয়,[১৮১]

পাশাপাশি তিনি আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য ও কৃত্রিমতাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে:

১. দেখেছি অনেক কিছু, দেখিনি যা ফেলে আসা গ্রামে,/ দুচোখ ধাঁধানো রঙ কৃত্রিম বর্ণের জুয়াচুরি,
ভদ্রবেশী সভ্যতার অন্তরালে এই বাঁকা ছুরি/ কিম্বা এই বাঘ নখ অকপট বন্ধুত্বের নামে।[১৮২]

২. এখানে শহর ম্লান, জ্বরাগ্রস্ত জননীর মত/ রেখেছে বিশ্রান্ত বুকে টেনে রুগ্ন অসংখ্য সন্তান,[১৮৩]

৩. সর্বগ্রাসী সঞ্চয়ের লোভ আর বিলাস বাসনা/ করেছে উন্মত্ত তাকে, নাগিনীর মত সে নিষ্ঠুর... ।[১৮৪]

৪. এখানে বিস্ময়ে দেখি চিত্র শুধু ইতর সত্তার,/ এ যুগের ধূর্ত কাক নর্দমার কৃমি কীট খোঁজে।[১৮৫]

৫. অশান্ত পৃথিবী আজ,... শান্তিহারা মানুষের মন/ ব্যাধিগ্রস্ত। বাহিরের আড়ম্বর অথবা জৌলুষ
মুছিতে পারে না এই মরণের কদর্য্য কলুষ; [১৮৬]

৬. হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি আজদাহার মত কুণ্ডলীতে/ ঘিরেছে সহস্র পাকে পৃথিবীকে।[১৮৭]

এমন জরাজীর্ণ জীবনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবির ব্যাকুলতা :

এবার আসুক মুক্তি প্রান্তরের কিম্বা সামুদ্রিক/ উচ্ছ্বসিত প্রাণ শক্তিপূর্ণ হোক কানায় কানায়।[১৮৮]

অবশ্য পৌর্বিক সমৃদ্ধির স্বপ্নবিহারী রোমান্টিক কবিমন কখনো কখনো আশাভঙ্গের বেদনায় আর্তি প্রকাশ করেছেন:

মনে হয় এক দিন এ জীবন ছিল সাবলীল/ বহতা নদীর মত, আজ পাওয়া যাবে না তা খুঁজে।[১৮৯]

অথবা:

… যে হিসাব সন তারিখের/ কি লাভ সে দিনটাকে টেনে এনে তবু সময়ের
জের টেনে চলি যাকে ভোলা যেতো অতি সহজেই।[১৯০]

নতুবা:

মৃত্যু কি বিস্মৃতি আনে? এ জীবন দেয় কি সান্ত্বনা/ পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে, সংশয়িত দিন কাটে যার।[১৯১]

সেইসঙ্গে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে, কালস্রোতের নির্মম গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। তবে কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাকে আদর্শের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে:

শুধু এই অন্ধকারে স্থির দীপ যে পারে জ্বালাতে/ বহু শতাব্দীর রাত্রি করে সে সহজে অতিক্রম
তার দীপ আলো দেয় ঘনতম অন্ধকার রাতে,/ নতুন শতাব্দী পানে সে যুগ বিজয়ী বিহঙ্গম
প্রাণবন্ত পাখা মেলে জীবনের নতুন আশাতে।[১৯২]

এ সত্য-সাবলীল পথেই সকল প্রকার সংকট কাটিয়ে, গতিময় মুক্ত সজীব জীবনের প্রত্যাশা অভিব্যক্ত হয়েছে। সেজন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে তাঁর প্রার্থনা :

আমার প্রার্থনা তাই শোন রব, পরওয়ারদীগার/ খণ্ডিত প্রলয় দেখে থামাও তোমার কেয়ামত,
চরম ধ্বংসের আগে তুমি করো পরিত্রাণ।/ সবচেয়ে মূল্যবান দুর্লভ যে মানুষের প্রাণ
তারপরে কেন এই গুরুভার, আগ্নেয় পর্বত?/ করুণার মেঘ থেকে কৃপা তুমি বিলাও এবার।[১৯৩]

তাঁর অপরিসীম করুণাধারায় :

নামুক হেরার রশ্মি আজ তার শিয়রে অম্লান,/ সত্যের প্রদীপ শিখা জাগুক সকল ভ্রান্ত প্রাণে।[১৯৪]

সে আলোয়:

আবার উজ্জ্বল ভোর আসুক উন্মুক্ত বাতায়নে,/ জাগুক প্রথম সূর্য অযুত বৎসর আগেকার
যে সূর্য ভাঙালো ঘুম আদমের, সে সূর্য আমার/ বাতায়নে দেখা দিক দীপ্ত মুখে দিনের প্রাঙ্গণে।[১৯৫]

আট.

সমকালীন তথ্যের সাহায্যে জানা যায়, *হাতেম তা'য়ী* পুঁথি ফররুখ আহমদের অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল।[১৯৬] মধুসূদন যেমন তাঁর মহাকাব্যের নায়ক নির্বাচনে সমস্ত বিশ্বসাহিত্য সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত রামায়ণের পৌরাণিক চরিত্র রাবণের বল-বীর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি দোভাষী পুঁথিসাহিত্যের নায়ক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্র হাতেমের পুরুষোচিত উদারতা-বলিষ্ঠতা ফররুখ আহমদকেও আকৃষ্ট করেছিল। ফলে চরিত্রটির মধ্যে তিনি 'পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন'[১৯৭] বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাট্যের ক্ষুদ্র পরিসরে চরিত্রটির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয়নি বলে, কবি যেন সে অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনে *হাতেম তা'য়ী* (প্র. ১৯৬৬) কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যটির রচনাকাল ১৯৫৩-৫৫।[১৯৮] এখানে কল্পনার বিস্ময়কর প্রভাবে হাতেম মহত্ত্বে-বীরত্বে কতকটা মহাকাব্যের নায়কের চরিত্রগুণসম্পন্ন মহিমা লাভ করেছে।[১৯৯]

খরজমের শাহ্‌জাদা মুনীর শামী সওদাগরজাদী হুস্‌না বানুর চিত্রপট দেখে মোহিত হন এবং তার সাথে শাদীর পয়গাম নিয়ে রওনা হয়ে যান। কিন্তু তিনিও সওদাগরকন্যার সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এমনি দেওয়ানবেশে ইয়েমনের বনপ্রান্তে

এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে যুবরাজ হাতেমের সাথে তার দেখা হয়। সৃষ্টির বিপুল সেবায় নিয়োজিত হাতেম তার দুঃখে কাতর হন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সাত সওয়ালের জওয়াব আনতে বেরিয়ে পড়েন :

কথা বলবার ফুরসৎ পাবে ভাই,/ হুস্‌না বানুর কঠিন সওয়াল এবার জানতে চাই

খোদার রহমে যদি সে জওয়াব খুঁজে পাই দশ দিকে/ আশিক মুনীর। তবে নিশ্চয় পাবে তুমি সে নারীকে।[২০০]

তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য:

চালেছি এ ভবে প্রাণপণ করে খেদমত মানুষের/ ইনসানিয়ৎ চাই শুধু আমি পূর্ণতা এ প্রাণের।[২০১]

প্রথম প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের পথে হাতেম ক্ষুধিত বাঘের গ্রাস থেকে একটি আক্রান্ত হরিণীকে বাঁচানোর জন্য নিজের শরীরের মাংস কেটে দেন। মাংস পেয়ে একদিকে সপ্তাহকাল অনাহারী বাঘের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, অন্যদিকে হরিণীর জীবনও রক্ষা পায়। এই বাঘও খুশি হয়ে তাঁকে প্রথম সয়ালের উত্তর পাওয়ার সম্ভাব্য ঠিকানা দশতে হাবেদা পথ বাতলে দেয়। এখানে হাতেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে এভাবে:

হাতেম তা'য়ীর কাছে ছিল এক দুধারী খঞ্জর,/ নিজের উরুর মাংস কাটিল সে নিষ্কম্প অন্তর,

নিজ হাতে ফেলে দিল সেই গোশ্‌ত চোখের পলকে,/ হরিণী তাকায়ে থাকে বেদনার্ত, অশ্রুভরা চোখে।[২০২]

অতঃপর তিনি বহু বনজঙ্গল, মরুপ্রান্তর পেরিয়ে এক মনোরম বাগিচায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে এক বিজ্ঞ প্রবীণের কাছে তাঁর পরামর্শ ধরে আরো অনেক পথঘাট অতিক্রম করে, তিনি পাতলপুরীর দশতে হাবেদায় পৌঁছে প্রথম সওয়ালের উত্তরপ্রাপ্ত হন। এখানে হাতেমের প্রতি পীর মর্দের উপদেশ ছিল :

যখন যাবে সে মাঠে, মনে রেখো, তখন তোমাকে/ ঘিরবে জুলমাত এসে, পারবে না ছেড়ে যেতে তাকে।

মায়াবিনী পরী এসে বহুবার শিরিন জবানে/ ভোলাবে ভুলো না তুমি; দৃঢ় থেকো নিজের ঈমানে

মাহ্‌তাব-সুরাত নারী কাছে এসে দাঁড়াবে যখন/ ধরো তার হাতপাবে দশতে হাবেদায় নির্বাসন;

আর যদি ভুলে থাকো পাবে মিথ্যা, মৃত্যুর ব্যর্থতা।[২০৩]

দ্বিতীয় সওয়ালের উত্তর পেতে হাতেমকে আরও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমেই তিনি হুলুকা নামে এক অত্যাচারী রাক্ষসের পাল্লায় পড়েন। সেখানে বিশেষ কৌশলে তাকে হত্যা করে উৎপীড়িত এলাকাবাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। এই রাক্ষসের হিংস্রতা সমাজে বসবাসকারী মানুষেরই পশুপ্রবৃত্তির স্বরূপ ছাড়া কিছু নয়। রাক্ষস যেমন আয়নায় নিজের হিংস্ররূপ দেখে, আতঙ্কিত হয়ে প্রাণ ফেটে মারা পড়েছে, তেমনি মানুষ সম্পর্কে হাতেম বলেছেন:

...যদি তারা বিকৃত স্বরূপ/ দেখে নিত কোন দিন আত্মার দর্পণে, যদি তারা

দেখে নিত প্রবৃত্তির পাশবতা, যা রেখেছে ঘিরে/ বিকৃত কদর্য সত্তা পশুত্বের কাছে; তবে তারা

মারা যেত সে মুহূর্তে আতঙ্কিত, বিকৃত স্বরূপে,/ কিম্বা বান্দা গোনাহগার ক্ষমা চেয়ে দরবারে আল্লার

ফিরে যেত ইনসানের সুমহান স্বভাবে স্বরূপে।[২০৪]

এরপর তিনি খরজমের কবরস্থানে সাজাপ্রাপ্ত এ কৃপণ-আত্মার পরিত্যক্ত গুপ্ত ধন বন্টনের ব্যবস্থা করে, তাকে কবরের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান করেন সেখান থেকে তিনি বেদাদ শহরে উপস্থিত হলে, সেখানে আবার এক জ্বিনেধরা শাহ্‌জাদীর সাক্ষাৎ পান এবং তাকেও জ্বিনের প্রভাবমুক্ত করে জ্বিনটিকে হত্যা করেন। এরপর তিনি কুলজুম নদীর কিনারায় এসে উপস্থিত হলে, হাস্‌না নামে এক পরী তার প্রতি অনুরক্ত হন। এ অপরাধে পরীরানী দুজনকেই বন্দী করেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী হাতেম পরীরানীর অসুস্থ পুত্রকে দুস্প্রাপ্য বনৌষধি দিয়ে সুস্থ করে তোলায়, রানী প্রসন্ন হয়ে দুজনকেই কারামুক্ত করেন। মুক্তি পেয়ে হাতেম দরিয়ার তীরে এক বৃদ্ধের নিকট দ্বিতীয় সওয়ালের উত্তর লাভ করেন। এ পর্বে কবরের অভিজ্ঞতায় হাতেমের মনে মহত্ত্বর জীবনানুভূতি:

আদমের আউলাদ, এক খান্দানের গোত্রভুক্ত/ নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তের রয়েছি ছড়িয়ে

বহু বর্ণ অসংখ্য জবান, কিন্তু রক্তধারা এক,/ এক অনুভূতি হৃদয়ের।[২০৫]

তেমনি বখিল ব্যক্তির দুর্দশার কারণ বর্ণিত হয়েছে:

ইনসানের লহু চুষে বাড়ায়েছি দৌলৎ কেবল;/ ভাবিনি কখনো আমি আখেরাতে পাব প্রতিফল।

জীবনে করিনি দান... ভুখা ফাঁকা পেরেশান দিল/ পায়নি আমার কাছে শস্য-দানা, ছিলাম বখিল।

শুধু বাড়ায়েছি পুঁজি, করিনি কখনো নেক কাজ,/ বরং বিপক্ষে তার ক্রমাগত তুলেছি আওয়াজ।[২০৬]

শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য হাতেমের সমবেদনা :

রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও/ এই পৃথিবীতে? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,/ ষড়যন্ত্রজাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি, মাঠ/ কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,/ উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে?[২০৭]

আবার হুস্না বানুর তৃতীয় সওয়াল নিয়ে সপ্তাহকাল অবিরাম পথ চলার পর উঁচু পাহাড়ে এক বিরহী সওদাগরের সঙ্গে হাতেমের সান্নিধ্য ঘটে। সওদাগর পরীরানী আলগুণের প্রেমে কাতর। হাতেম তার ব্যথায় মমের মত গলে গিয়ে আলগুণ পরীকে খুঁজে বের করেন এবং সওদাগরের সাথে তার মিলন ঘটান। এই পরীর সাহায্যেই তিনি দুর্গম হামির ময়দানে পৌঁছে পিঞ্জরাবদ্ধ এক অন্ধ কয়েদীর মুখ থেকে এই সওয়ালের মর্মলাভ করেন। সেখানে অনুতপ্ত কয়েদীর উক্তি:

কোরো না অন্যের ক্ষতি, কোরো না অন্যায়। পৃথিবীতে
যে করে অন্যের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে নিজে, আর
বদ কাজে বদী ফলে, মন্দ কাজ দেয় না সুফল/ কোনদিন।[২০৮]

এবার চতুর্থ সওয়ালের রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হয়ে হাতেম জনশূন্য ময়দানে এক রক্তপ্রবাহিত নহর দেখে বিস্মিত হন। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান এক বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় শাখায় অগণিত নারীমুণ্ড ঝুলন্ত রয়েছে। সদ্যছিন্ন এদের রক্তেই নহরের স্রোতধারা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে । এ ঘটনার মর্ম সন্ধানে তিনি পাতালপুরীতে গমন করেন। সেখানে জ্ঞানী দরবেশের কাছে অবগত হন যে, হৃদয়হীন পিতা কুখ্যাত যাদুকর শাম আহ্মরের চক্রান্তে তারই কন্যা জরিনপোশ ও তার সহচরীদের এই কর্তিত মস্তকগুলি নির্মম অত্যাচরের শিকার। মানবপ্রেমিক হাতেম এদের উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, দরবেশের কাছে সততার শিক্ষা ও যুদ্ধের উপায় অবগত হন। তারপর লড়ায়ের ময়দানে শাম যাদুকর ও তার গুরু কামলাককে নির্মূল করে, যাদুর ফাঁদে বন্দিনীদের মুক্তি ঘটান। সেখানে তিনি কোরম শহরে উপনীত হয়ে একজন প্রবীণ বৃদ্ধের কাছে সওয়ালরে উত্তর লাভ করেন। এই বিজ্ঞব্যক্তি স্বীয় জীবনের যে কাহিনী হাতেমের কাছে বর্ণনা করেছেন, তা লোভ-লালসায় আচ্ছন্ন প্রতিটি মানুষের চরিত্র সংশোধনে সহায়ক :

...আমীরনা ঠাট হতে পারে লোভনীয়, তবু/ অন্তরের দীনতা সে ঢাকে না কখনো। শুধু জানি
সত্যের কণিকা তাকে তুলে নিতে পারে উর্ধ্ব স্তরে,/ মুছে দিতে পারে তার গ্লানিমা সে আলোর প্রচ্ছদে।[২০৯]

এরূপে পঞ্চম সওয়ালেরর উত্তর অন্বেষণে তাকে আরো নব নব অভিজ্ঞতার সিঁড়ি অতিক্রম করে এগুতে হয়। সেপথে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণান্তে বহু সভ্যতা, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এর এক পর্যায়ে তিনি অরণ্যের একটি হিংস্র দানবের বাধার সম্মুখীন হন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে, বনের পশুদের জীবন রক্ষা করেন। এখানে বজ্রদৃঢ় অস্ত্রের আঘাতে ধাউলের মৃত্যুদৃশ্যে হাতেমের বীরত্বের পরিচয় ধরা পড়েছে:

তখন কাঁপায়ে বন মুণ্ডহীন দেও অষ্ট পদে/ প্রাচীন সেগুন, শাল ওপড়ায়ে তৃণের মতন
ধূলি ঝড় তুলে সেই মৃত্যুক্ষুব্ধ অরণ্যের মাঝে/ ছাড়িল অন্তিম শ্বাস...।[২১০]

অতঃপর অরণ্য পাড়ি দিয়ে তিনি পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত বিচ্ছিন্ন এক লোকালয়ে হাজির হন। সেখানে এক জ্ঞানীর কাছে তাঁর সওয়াল- 'কোহে নেদা'-র সন্ধান পান। কোহে-নেদার ডাক অর্থাৎ আহ্বানকারী পাহাড় থেকে মৃত্যুর ডাক। এ ডাক পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে, যার নাম ধরে ধ্বনিত হয় সেই উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে কোহে-নেদার গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। হাতেমও একদিন এমনি একজন মৃত্যুপথযাত্রীর অনুগমন করে, কোহে-নেদার পাতল পুরে পৌঁছে মানুষের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। তা হল:

কুল মখলুকের ভাগ্যে মৃত্যু, তবু জানি/ কি ভাবে কখন কার মৃত্যু আসে কোন উসিলায়
সে কথা জানে না কেউ।[২১১]

এ মৃত্যুকে জয় করে কারো পক্ষে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন না করলে সে ভাগ্যহত। তার মৃত্যু অপমৃত্যুরই সামিল। কোহে-নেদার এ রহস্য নিয়ে তিনি শাহাবাদে ফিরে এসে হুস্‌না বানুর কাছে কীভাবে মর্ত পাতাল ভেদ করে জ্বিন-পরী, দেও-দৈত্য, বাঘ-রাক্ষস, দরিয়া-পর্বত ও যাদুর দেশ অতিক্রম করে পঞ্চম সওয়াল পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার রোমাঞ্চকর ইতিহাস বর্ণনা করেন। হুস্‌না বানু এতগুলি সওয়ালের জওয়াব পেয়ে মুগ্ধ হন এবং এখানেই সওয়ালের পরিসমাপ্তি টানতে আগ্রহী :

মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তোমার মুখে,/ আহা মুছাফির! ঘুরেছ অনেক দেশ
শশম সওয়াল জেনে আর কাজ নেই;/ ছিল যা জানার এখানে হোক শেষ।[২১২]

কিন্তু হাতেম তাতে সম্মত হননি। কেননা জ্ঞান আহরণের অদম্য স্পৃহা তাকে জীবনের পূর্ণতার পথে আহ্বান করেছে :

যা কিছু জানার জেনে যেতে হবে, আর/ থেমে যাই যদি মিটবে না ব্যর্থতা;
পেয়েছি সবক দুনিয়া জাহান ঘুরে/ কি লাভ যদি না প্রাণ পায় পূর্ণতা।[২১৩]

ফলে হুস্‌না বানু বাধ্য হয়ে ষষ্ঠ সওয়াল স্বরূপ একটি অমূল্য মোতি সামনে রেখে তার জোড়া এনে দিতে বলেন :

শশম সওয়াল... দেখ তবে এই মোতি,/ সারসের ডিম মনে হয আচানক
এনে দিতে হবে এ মোতির জোড়া, আর/ অজানা কাহিনী জানার রয়েছে সখ।[২১৪]

হাতেম মোতির জোড়া সংগ্রহের জন্য যাত্রা করে, অরণ্যপথে নাতেকা নামে এক পাখির কাছে মোতির ইতিহাস ও প্রাপ্তির সন্ধান লাভ করেন। তারপর বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে জ্বিন-দৈত্যের দেশ অতিক্রম করে কোকাফ শহরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি জ্বিন-শাহ্‌জাদা মেহের ওয়ারের সাক্ষাৎ পান। এই জ্বিন-শাহ্‌জাদা বাদশাহ্‌ মাহেয়ারের কন্যার প্রেমাসক্ত, কিন্তু মোতির ইতিহাস বর্ণনায় ব্যর্থ হয়ে বিরহী হয়েছেন। হাতেম তার সাহায্যে মাহেয়ারের রাজ্যে উপনীত হন এবং মোতির সঠিক ইতিহাস বর্ণনা করে তা হস্তগত করেন। হাতেমের ইচ্ছায় মেহেরওয়ারের সঙ্গে মাহেয়ার-কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ স্তরে নাতেকা পাখির কণ্ঠে হাতেমের চারিত্রিক মহিমা ফুটে উঠেছে:

নাতেকা তার সঙ্গিনীরে বলে,/ গাছের নীচে দেখছো তুমি যাকে
য়েমেন দেশের বাদশাজাদা সেই,/ পরের কাজে সর্বত্যাগী প্রাণ
এই জামানায় তুলনা যার নেই,[২১৫]

মোতির জোড়া পেয়ে হুস্‌না বানু সন্তুষ্ট হন এবং আখেরী সওয়াল বাদগর্দ হাম্মামের রহস্য জানতে চান। এ হাম্মামের রহস্য আবিষ্কারের পথে তিনি পুত্রশোকে কাতর এক রাজা-রানীর দুঃখ মোচনের জন্য তাঁদের পুত্রকে মোহাচ্ছন্ন এক পরীর মায়াজাল থেকে উদ্ধার করেন। সেখানে আর এক প্রবীণ জ্ঞানীর কাছে, তিনি কাতান দেশের বাদশাহ্‌ হারেসের রাজ্যে বাদগর্দ হাম্মামের সন্ধান লাভ করেন। এদিকে অগ্রসর হয়ে এক বিশাল দুষ্ট জ্বিনের অত্যাচার থেকে, একটি লোকালয়কে উদ্ধার করেন। তারপর অনেক ঝঞ্ঝা-ঝাপট পাড়ি দিয়ে, অনন্ত যাদুর মায়ায় আবিষ্ট বাদগর্দ হাম্মামের রহস্য উদ্ধারে সমর্থ হন। এবং সেখানে পাথরে রূপান্তরিত বহু মানুষকে নূতন প্রাণ দান করেন। ফলে সে দেশ অভিশাপমুক্ত হয়ে জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এদিকে হুস্‌না বানু তার সমস্ত সওয়ালের জবাব পেয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং সেইসঙ্গে জীবন ও জগতের বৃহত্তর জ্ঞানের সন্ধানলাভ করেন। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, হাতেমের অভিপ্রায়ে সংসারত্যাগী মুনীর শামীর সঙ্গে হুস্‌না বানুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর হাতেম তা'য়ী আবর সর্বান্তকরণে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার একমাত্র লক্ষ্য :

আল্লার সৃষ্টির প্রতি যে করে জুলুম, অশান্তি যে/ আনে এই জনপদে, আমি তার দুশমন জানের।
জুলুমের দাদ নেব কিম্বা হব শহীদ এখানে।[২১৬]

কবি পুঁথিনির্ভর হাতেম তা'য়ী কাহিনীকে স্বীয় কল্পলোকে, আধুনিক শিল্পাঙ্গিকে নানা ছন্দে,[২১৭] নানা বিষয়ের বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য[২১৮] রূপে-রসে অভিনব করে তাতে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরেছেন। ফলে এ কাব্যে সাত সওয়ালের উত্তর বড় কথা নয়, বড় কথা সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও পরিশেষে সত্যের বিজয়।[২১৯] সেজন্য হাতেম মহৎ ভাবের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবপ্রীতির যে নিদর্শন রাখা হয়েছে, সে সমস্যা যেমন অতীতের তেমনি সাম্প্রতিক কালেরও। তাই তাঁর যাত্রা অনন্তের পথে প্রবাহিত। স্রষ্টার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পরোপকার মনোবৃত্তি, জ্ঞানান্বেষণের অদম্য স্পৃহা প্রভৃতি কর্তব্যজ্ঞানের অন্তরালে কবির মনোগত চিন্তারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। সাত সওয়ালের রহস্য উদ্ধারে বিভিন্ন অভিযানের

বিচিত্র ঘাটে ঘাটে, মনুষ্যত্বহীন কার্যকলাপের প্রতিবাদে তাঁর মহান ত্যাগ, অসীম সাহস, অবিচল ধৈর্য, বিরল ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ সংঘর্ষের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তার জবিনের নিশানাই ছির সকল প্রকার জুলুম অশান্তির বিপক্ষে লড়াই করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, কিংবা নিজেকে উৎসর্গ করা, তথাপি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা নয়। যারা নীরবে অত্যাচারীদের নির্যাতন মুখ বুঁজে সহে যায়, হাতেম তাদেরকে ক্লীব-কাপুরষ বলে তিরস্কার করে, সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জেগে উঠতে বলেছেন:

সয়ে যাও কেন এ জুলুম/ শয়তানের? কেন সও অত্যাচার জালিম পাপীর?

যত সয়ে যাবে পাপ, অত্যাচার সয়ে যাবে যত/ জালিম প্রশ্রয় পাবে; অত্যাচার বাড়াবে ততই।[২২০]

অথবা:

মানিনা এ দুর্বলতা, মানিনা কখনো অসম্ভ্রম/ আশরাফুল মাখ্‌লুকাত ইনসানের। জানে না আপোষ

এখানে সংগ্রামী সত্তা দীনতায়/ বুঝি না সুদীর্ঘ কাল সয়ে যাও কেন এ লাঞ্ছনা।[২২১]

মানুষের স্বার্থপরতা, পাপ-প্রলোভনের কারণেই সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। হাতেম কিন্তু এ সব সঙ্কীর্ণতার বহু উর্ধ্বে। তিনি ধর্ম-বর্ণ সকল ভেদাভেদে মানুষ তথা সমস্ত সৃষ্টিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তার মতে:

আল্লার সৃষ্টিকে তুমি ভালবেসে জানাও স্রষ্টাকে/ ভালবাসা। যে খালেস মুহব্বতে পয়দা হল এই

দুনিয়া জাহান, জ্বিন, প্রাণী-কুল আর আশরাফুল/ মুখলুকাত এ মানুষ, ভালোবাসো, ভালোবাসো তাকে

প্রেমের সান্নিধ্যে যেন দূরে যায় সব সঙ্কীর্ণতা।[২২২]

মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক সত্তাকে তিনি বিকশিত করতে প্রয়াসী। সে লক্ষ্যে মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানের আরাধনা তাঁর জীবনের অভীষ্ট। কেননা:

অনাগত:

সন্ততিরা, আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে/ ...মুক্তি যেন পায় সে আউলাস

সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, অবিচার থেকে।[২২৩]

এভাবে হাতেম চরিত্রে অবিমিশ্র মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে কবি তাঁকে অতুলনীয় মর্যাদা দান করেছেন। আসলে চরিত্রটি কবির আপন মনে লালিত স্বপ্নের প্রতিনিধি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর হুস্না বানু শাশ্বত মানবতার প্রতিনিধি, তাকে অর্জন করে মানুষের দুঃখোমোচন ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় হাতেম অক্লান্ত সৈনিক।[২২৪] তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেম ভালবাসা ও সেবার নীতিকে আঁকড়ে পরিচ্ছন্ন সমাজজীবন গড়ে উঠুক এ ছিল কবির কাম্য।

নয়.

সিরাজাম মুনীরা (প্র. ১৯৫২) কাব্যে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি কবিপ্রাণের মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার সে অনুভূতির আরো ব্যাপক-প্রসারিত অভিব্যক্তি ঘটেছে *কাফেলা*-য় (প্র. ১৯৮০) এসে। সময়ের ভিন্নতায় ভাবগত ঐক্যে কাব্য দুটি যেন সন্ধ্যা-প্রভাতের একই তারা।[২২৫] *কাফেলা*-য় অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি *সিরাজাম মুনীরা*-র (র. ১৯৪৩-৪৬) সমসাময়িক এবং কিছু কিছু পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রচিত।[২২৬] এর কবিতাবলীকে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে মুখ্যত নিসর্গ, সাধারণ মানুষ ও ইসলামি ঐতিহ্য-আদর্শভিত্তিক শ্রেণীপর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়।[২২৭]

পৃথিবীতে বিশ্বনবির আবির্ভাব মানবসমাজ থেকে সমস্ত কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস দূর করে, পূর্ণজীবনের আলো জ্বেলেছিল। তাতে সকল প্রকার অত্যাচার অপসারিত হয়ে, ঘরে ঘরে চিরকালীন শান্তি নেমে এসেছিল। কিন্তু দুশ্চরিত্র লোকের নিষ্ঠুরতায় জগতে আবার মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিপন্ন হয়েছে। বিশেষত পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণে সমাজের দুর্দশা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অতীত ইতিহাসের হীনতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

দুই মৃত্যুর মাঝখানে মোরা দাঁড়ায়েছি আজ এসে-

হে মুসা কালীম। দেখ চেয়ে পিছু কারুণের বেষ্টনী।/ জাগে ফেরাউন নির্ভীক সম্মুখে।[২২৮]

এ অত্যাচার থেকে জাতীয় নিষ্কৃতির জন্য ধর্মের ঐতিহাসিক বার্তাবাহী মুসার (আঃ) মতো ব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখানে:

ফেরাউন আছে, রয়েছে কারুণ/ শুধু যে মুসা-ই নাই।[২২৯]

গ্রীষ্মের খরতাপে সমগ্র ভুবন দগ্ধীভূত হয়ে রিক্তশূন্য হাহাকার রূপ ধারণ করে। তেমনি বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি দলিত-মথিত হয়ে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সে দিকে দৃষ্টি কবি :

রৌদ্রদগ্ধ পৃথ্বিতল দেখে শুধু অপমৃত্যু মওতের জিঞ্জির, জিন্দান
শত বিকৃতির ছাপ, পঙ্গুতার ম্লান ছায়া পৃথিবীতে জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
পঞ্জীভূত হতাশায় বিষবাষ্প জমে ওঠে লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত জীবনে,
গতিহীন জড়তায় বিকলাঙ্গ জীবনের পথে জমে ক্লেদ, গ্লানি, পাঁক;[২৩০]

চৈত্রের দগ্ধীকৃত নৃশংসতার পাদপৃষ্ঠে বৈশাখের আগমন পোড়া মাটিতে নতুন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসে। তার তাণ্ডবলীলায় সব বিপত্তি চূর্ণ হয়ে জরাগ্রস্ত জগৎ আবার নবীন সাজে সজ্জিত হয়। রুদ্র বৈশাখের এ প্রলয়ংকরী মূর্তি মানবসভ্যতায়ও আঘাত হানে। মানবিকতার অগ্রপথিক জীবনের ক্লেদ কালিমা ভেঙে মুক্তির উল্লাসে নির্বোধের অহংকারের বিপক্ষে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। তাদের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে কবি বলেছেন:

মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি, ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা জালালী ফকীর
মুসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙে তেমনি বৈশাখ এস খর রৌদ্রে... এস ঘরে ঘরে।[২৩১]

সমাজের বিকারগ্রস্ত অধ্যায়ে আত্মার অপমৃত্যু থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। যার মধ্যে সকল মতবাদের অসারতা বিদূরিত হয়ে, ইসলামের আচ্ছাদনে মানুষের পরিত্রাণ আসবে। মুক্তির এ আকাঙ্ক্ষা 'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা', 'আরিচা', 'পারঘাটে', 'দ্বীপ নির্মাণ', 'সৃষ্টির গান', 'স্বর্ণ-ঈগল', 'ইনকিলাব', 'মেঘনা তীরের চাষীকে', প্রকৃতিনির্ভর, কবিতাগুলিতে রূপকে-প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ:

১. বাধাবন্ধনহীন নদী, গতিবেগ উন্মুক্ত, অবাধ/ মুক্ত জীবনের কিম্বা আজাদীর যেন সে প্রতীক...।[২৩২]

২.আকাশে, মাটিতে আসে বদলের পালা,/ কত তারা নেভে, জ্বলে কত শশী রবি,
প্রবাল কীটের দ্বীপেরা ভিত্তি গড়ে/ ধৈর্য, ত্যাগের সহিষ্ণুতার ছবি।[২৩৩]

৩. পউষের মাঠ মুখ তুলে চায়/ চলে যায় মাঘ, ফাল্গুন ফিরে আসে;
নব সৃষ্টির বুনিয়াদ গড়ি/ আমরা কজন কারিগর এক সাথে।[২৩৪]

৪. প্রাচুর্যে, অজন্মায়, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে/ তুফানে বন্যায়,
কোন দিন শেষ হয় নাই/ তোমার সংগ্রামী ভূমিকা।
মেঘনার উদ্দাম প্রবাহের মতই/ খরস্রোতা, প্রবাহমান তোমার জীবন ধারা।[২৩৫]

কবিমানসের এ অভিযাত্রা সত্রের সন্ধানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে 'কাফেলা', 'কাফেলা ও মঞ্জিল', 'তায়েফের পথে', 'মদীনার মুসাফির', 'খলিফাতুল মুসলেমিন', 'এজিদের ছুরি', 'বেলাল', 'নতুন সফর', 'জাগো সুর্য', 'প্রদীপ্ত গৌরবে', 'ঈদের কবিতা' প্রভৃতি ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন কবিতাসমূহে। এখানে তার বক্তব্য মানুষের নিষ্কৃতির পথ ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসে:

যেখানে বহিয়া বোঝা একমনে চলিয়াছে খলীফা ওমর
যেখানে সত্যের সঙ্গী সিদ্দীক বেঁধেছে তার ঘর
যেখানে সিংহের মত ফিরেছে নির্ভীক আলী হায়দার।[২৩৬]

খলীফা ওমরের (রা.) চারিত্রিক বিভূতি তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। সুখভোগ ত্যাগ করে তিনি রাত্রির অন্ধকারে মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতেন। মানুষের দুঃখমোচনে তাঁর নিদর্শন পৃথিবীতে অপ্রতুল। তার জীবনদর্শনের আলোকে কবি মোহগ্রস্তদের চক্ষু ফিরাতে চেয়েছেন :

যে মানবতার বহ্নি নিত্য তুমি করেছ বহন/ তার কাছে অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর শাহীতাজ
মানুষের প্রেমের আসনে/ তুমি বন্ধু রাজ অধিরাজ।[২৩৭]

ইসলামের উন্মেষকালে ধর্ম-সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা রাখায় বেলাল (রা.) ভয়ঙ্কর রকমে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তথাপি অন্যায়-অসত্যের কাছে কোনোদিন আত্মসমর্পণ করেননি। নির্মম অত্যাচারে হুঁশ হারিয়েও ইমানের পথে নিষ্ঠাবান থেকেছিলেন। তাঁর নমুনাকে সামনে রেখে মক্কা-মদীনায়

জুলুমের দাসত্ব থেকে মানুষের পরিত্রাণ এসেছিল। ধনতান্ত্রিক কৃত্রিম সভ্যতার নিগড়ে বাঁধা, আজকের মুসলমানের ভ্রান্তি মোচনেও বেলালের (রা.) ন্যায় সাধকপুরুষের প্রয়োজন। তাই কবির আক্ষেপ :

ঘিরেছে কুফরী কালো উই পোকা শাদা হেলালের শেষ মিনার
আজ আমাদের সর্দার নাই হাবসী বেলাল ঈমানদার।[২৩৮]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলাদেশকে শোষণক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। নিষ্ঠুর এজিদ-সীমারের মতোই তারা এদেশের জনসাধারণকে স্বৈরাচারী শাসনের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল। সেজন্য কবিহৃদয়ের বেদনা:

আমর দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রুর এজিদের ছুরি/ আজ সীমারের তীক্ষ্ণ খঞ্জরের নীচে কাঁপে সংখ্যাহীন
ভারাক্রান্ত প্রাণ/ কাঁদে আজ স্বৈরাচারী তামসিকতায়
মানুষের আজাদীর ঘর।[২৩৯]

তাঁর কাছে অধঃপতিত সমাজের রুচিবিকৃত রূপ :

ঢাকা পড়ে গেছে আজ, নর্তকীর নূপুর নিক্বণে/ কোরানের ধ্বনি
জালিমের বজ্রমুষ্টি ঢাকিয়াছে নবীজীর উন্মুক্ত সরণি।[২৪০]

অবশ্য তারা যে একেবারেই কোনো প্রকার জনহিতকর কাজ করে নি, তা নয়। তথাপি দেশে তাদের মদতপুষ্ট পুঁজিপতি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এ অর্থলোলুপগোষ্ঠী শোষকের রূপ ধরে গোটা সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছিল :

শিকল যদিও শিথিল হয়েছে বণিক রাজার/ পুঁজিবাদ তবু শতমুখে তার বিষ ছড়ায়,
বর্গীরা লোটে দুই হাতে ধান, শূন্য খামার/ বিরান বাগের বুলবুল হল শকুনি হায়,[২৪১]

ফলে দেশের অর্থসম্পদ একদিকে মজুদদারিদের হাতে স্তূপীকৃত হয়, অপরদিকে ক্ষুধিত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলে। এ অবস্থায় তিনি স্বাধীনতার পতাকাবাহীকে নিগৃহীতের পক্ষে রণতূর্য বাজিয়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন :

আবার তোমার তূর্য বাজাও নবীন নকীব,/ তিমিরাবর্তে এখনো রাতের হয়নি শেষ,
পদতলে পড়ে আছে জনগণ বিশীর্ণ ক্লীব/ অনাবিষ্কৃত আমর স্বাধীন স্বপ্নদেশ।[২৪২]

অথবা :

হে সূর্য! বঞ্চিত সেই বিষতিক্ত প্রাণের প্রদাহ/ এখনো কি হবে না প্রকাশ?
কত কাল সয়ে যাবে এই অপমান?[২৪৩]

এ অভিশাপ ঘুচানোর জন্য তিনি ইমাম হোসেনের মতো স্মরণীয় ব্যক্তির নেতৃত্ব সমাজে দেখতে চেয়েছেন:

হে ইমাম! উঠো এসো, উঠে এসো, শোন.../ মানুষের মুক্ত সূর্য নেভেনি এখনো
আজো শত মুজাহিদ খুঁজে ফেরে তার/ সিপাহ্সালার।[২৪৪]

নির্যাতিত দেশবাসীর নিস্তার পাওয়ার জন্য কখনো তিনি মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের ন্যায় বলিষ্ঠ পৌরুষের আবির্ভাব কামনা করেছেন :

নির্যাতিতের বোবা বেদনায় জমলো কৃষ্ণ মেঘ নিবিড়
এ মেঘ সরায়ে পাহাড় নড়ায়ে দেখা দাও এসে আলমগীর।[২৪৫]

নবজীবনের প্রত্যাশায় তিনি *আলিফ লায়লা*-র সিন্দাবাদকেও আহ্বান করেছেন। তার মনে হয়েছে, দুর্জয় প্রাণশক্তির আধার নাবিক সিন্দাবাদের মতো প্রবল পুরুষই সমুদ্রসঙ্কুল ঝড়-ঝঞ্ঝার ন্যায় সমাজের পুঞ্জীভূত বেদনা অতিক্রম করে শান্তির নোঙর ফেলতে পারে:

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও, সিন্দাবাদ।.../ বন্দী যেখানে বহু শতকের ক্লান্ত শ্বাস,
আবার সেখানে দিয়ে যাও তুমি প্রাণোচ্ছ্বাস,/ নতুন চেতনা গড়ে নিতে তার নয়া সমাজ।[২৪৬]

সমস্ত হতাশা থেকে প্রকৃত উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, মহানবির প্রদর্শিত পূর্ণমানবতার ধর্ম ইসলামি জীবনবিধানে। তাই নবিজির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ নিয়ে তিনি বলেছেন :

যে বিপুল প্রাণৈশ্বর্যে একদিন (বহু যুগ আগে)/ আকাশ জাগায়েছিলে, পৃথিবী জাগায়েছিলে আর

শূন্য মাঠে এনেছিলে যেমন সম্পূর্ণ মানবতা/ তেমনি আবার এসে জাগাও এ মরু পৃথ্বিতল

এ মাটিতে গড়ে যাও স্বপ্নসাধ নিখিল বিশ্বের।[২৪৭]

বিশেষ আনন্দঘন দিনেও সমাজের বিরূপ চেহারা তিনি অবলোকন করেছেন। রমযানের শেষে মুসলমানেরা পরস্পরের প্রভেদ ভুলে ঈদগাহে মিলিত হন। তখনকার খুশির ঢলে সমাজের কঠোরতা ক্ষণিকের তরে হলেও মিলিয়ে যায়। নির্দয়তার ছাপ যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাতেও কবির তিরস্কার :

ঘৃণ্ন কারুণ, হিসাবের খাতা ভোল,/ এই ঈদগাহে সকলের সাথে খুশীর ঝাণ্ডা তোল,

তিরিশ রাতের সাধনা যে মনে রেখে গেছে স্বাক্ষর/ তার সাথে এসে গুলজার কর এ খুশীর বন্দর।[২৪৮]

তিনি চেয়েছিলেন, ঈদের নির্মল আনন্দধারা বিশ্বের মানবকুলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক নির্বিভেদ জীবনের সন্ধান দান করুক:

সব অসাম্য পাহাড় চূড়ায়/ এই প্রাণ অভিযান

ন্যায়-সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের/ দিক নয়া ফরমান।[২৪৯]

এখানে ব্রিটিশ শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতার সামে পাকিস্তানি বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কবি ভেবেছিলেন, এবার সাধারণ মানুষ মুক্তির স্বাদ ফিরে পাবে:

দুশো বছরের সেই শৃঙ্খলিত প্রাচীন সড়ক/ বিগত দুঃস্বপ্ন আজ দিগ্বলয়ে নতু তর্জনী...

মুক্ত ঝরোকায় জাগে প্রাণবন্ত তারার চমক/ নতুন সড়কে ওঠে নতুন যাত্রীর জয়ধ্বনি।[২৫০]

শেরে বাংলা সব সময় দুর্গত মানুষের পাশে থেকেছিলেন। জনস্বার্থে তার সংগ্রামের ইতিহাস কারো অজানা নয়। পরাধীনতার কোনো চক্রান্তই তাকে ন্যায়ের পথ হতে অপসারিত করতে পারেনি। তার উপমা হচ্ছে:

সমস্ত ফসল বিলিয়ে দিয়ে

শস্যরিক্ত মাঠ যেন নিঃস্ব উদার...।[২৫১]

তিনি সেবার যোগ্যতায় সমুজ্জ্বল হয়ে, দেশবাসীর মনে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুতে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অবসান হয়েছে। তারপর আজ পর্যন্ত দেশের নেতা সেজে অনেকেই আবির্ভূত হযেছেন, কিন্তু সে শূন্যতা আর পূরণ হয়নি :

এখানে দেখি চারপাশে/ ক্ষুদ্র আর ইতর সত্তার আনাগোনা।[২৫২]

অথচ এ জাতিকে অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে'[২৫৩] রক্ষা করে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাতে হবে। আর এ পথে অগ্রবর্তী মহাপ্রাণ কর্মীরা শেরে বাংলার নিঃস্বার্থ জীবনাদর্শে তাদের চলার ঠিকানা পাবেন:

মৃত্যু যার প্রাণ স্পর্শে প্রাণ পায়, সে বীর মহান,/ মানব প্রেমিক সেই এ মাটিতে নিয়েছে বিশ্রাম,

মাজারে ঘুমায়ে শের সংগ্রামের শেষে, অনির্বাণ,/ এখানে নতুন যাত্রী পায় খুঁজে পথের সন্ধান।[২৫৪]

১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অবস্ত্রে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছিল। খাদ্য-বস্ত্রের অন্বেষণে কলকাতা শহরে তাদের ভীড় জমেছিল। কিন্তু সেখানেও তারা সহানুভূতি পায়নি। পরিণামে অসংখ্য মানুষ রাস্তায় পড়ে পশুর মতো প্রাণান্ত ঘটিয়েছিল। কালের ইতিহাসে তাদের স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে:

এই সব সড়কে এখনো/ মরা মানুষের ঘ্রাণ

সংখ্যাহীন করোটি অম্লান,/ পশুর মতন মৃত্যু সে খবর রয়েছে এখানে[২৫৫]

কবির প্রতীতি অনাগত মুক্তি ফৌজের বলিষ্ঠ জেহাদে উপেক্ষিত মানবাত্মা একদিন উদ্ধার পাবে :

হয়ত যুগান্ত বার্ত বাহুতে বহন করি লক্ষ আগন্তুক

আসিবে তাদের বুকে যে স্বপ্ন দেখতে আজও পথেরা উৎসুক।[২৫৬]

দশ.

রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফররুখ আহমদ কালের পুঞ্জিত বেদনাকে রূপায়িত করতে গিয়ে, কবিতায় আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। *হাবেদা মরুর কাহিনী* (প্র. ১৯৮১)-র প্রতিছত্রে সে পরিচয় বিধৃত আছে। এ কাব্য তার গদ্যে লেখা রূপক কবিতা।[২৫৭] এতে মোট ঊনপঞ্চাশটি কবিতা

স্থানলাভ করেছে। কবিতাগুলির কোনো শিরোনামা নেই, সংখ্যাসূচক পরিচিতি দিয়ে পরস্পর অন্বয়ভাবে সাজানো হয়েছে। এগুলির রচনা কাল ১৯৫৭-৫৮ সাল।[২৫৮] পঞ্চাশদশকের বিভাগোত্তর বাংলাদেশে রাজনীতি-অর্থনীতি উভয়স্থলে দুর্নীতি দুঃশাসনে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে দেশপ্রেমিক নাগরিক মনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চেতনা জেগে উঠেছিল। সে অবস্থায় কবির অন্তরে যে শূন্যতার জন্ম নিয়েছিল, তার রূপকাশ্রয়ী অভিব্যক্তি ঘটেছে এ কাব্যে। এর আরো একটি পৃথক নাম কবি রেখেছিলেন *গদ্য পৃথিবী*।[২৫৯] তবে পাণ্ডুলিপির ভূমিকায় পূর্বোক্ত নামটি গৃহীত হয়েছে। হাবেদা মরুর অর্থ হাওয়ার ময়দান। এখানে রূপকথার হাবেদা মরু বলতে কবি বাংলাদেশকে বুঝিয়েছেন। তৎকালীন বাংলাদেশের হতাশাব্যঞ্জক নানা ঘটনার প্রতিবিম্বরূপে একে পাওয়া যায়। এদিকে দিয়ে তাঁর ব্যঙ্গকবিতার মতো সমকালসচেতনতা এখানেও বেশ প্রকট। তাই বলে তাতে শিল্পের দাবি উপেক্ষিত হয়নি, বরং কুশলী শিল্পীর নিপুণ হস্তে সে শর্তও অনেকটা পূরণ হয়েছে।[২৬০]

সে অভীষ্ট লক্ষ্যে সমুদ্রনাবিক সিন্দাবাদ দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি জমিয়েছিলেন, দেশবিভাগের ফলে সে স্বপ্ন তার আংশিক সফলতার পথে এগিয়ে গেলেও সামগ্রিকভাবে তা সার্থক হয়ে ওঠেনি। ফলে এ দেশের মাটিতে-আকাশ-বাতাসে যে হাহাকার, তা যেন বঞ্চিত হৃদয়ের আশা ভঙ্গের বেদনায় নিরূপায় মানুষেরই দীর্ঘশ্বাস :

এখানে এই অমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে/ কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে/ আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুর মাঠের/ বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে।[২৬১]

শোষণের অবসান ও ইসলামি শাসনের অঙ্গীকার নিয়ে পাকিস্তানি রাজনীতিবিদের উদয় হলেও, তারা স্বার্থরক্ষার পথ বজায় রাখার উদ্দেশ্য ইসলামের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। ফলে তাদের স্বার্থসিদ্ধির হিংস্র থাবায় জনসাধারণের আত্মবিকাশের পথ পুরাদস্তুর আড়ষ্ট হয়েছিল। মুক্তিকামী মানুষ মৃত্যুভয়ংকর এ অবস্থায় ফের শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন:

কাফেলা এসে দাঁড়ালো/ হাবেদার সেই মৃত্যু হিংস্র প্রান্তরে
এক দিকে যার ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া/ অন্য দিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম,
জেগে আছে দুই ধ্বংসের/ দুই অপমৃত্যুর ইশারা নিয়ে...।[২৬২]

ফলে:

এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো সবার মন/ আসন্ন মৃত্যুর আভাসে,
কেঁপে উঠলো কাফেলা-সালার/ সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে,[২৬৩]

এ সঙ্কটকালে সাত সওয়ালের জওয়াব দাতা হাতেমের তুল্য কোন সৎ নির্ভীকচিত্ত বীরপুরুষের অভ্যুদয় হলে, কেবল তিনিই পারবেন আসন্ন অপমৃত্যুর ফাঁদ থেকে সকলের নিষ্কৃতি আনতে:

সাত সওয়ালের মত/ যে করতে পারবে
এ মাঠের সাত সমস্যার সমাধান,/ জাগাতে পারবে যে এই মরা মাঠে
জিন্দেগীর নতুন আশা,/ সেই শুধু পারবে থামাতে এই দীর্ঘশ্বাস,
সেই শুধু পারবে থামিয়ে দিতে/ বাতাসের এই করুণ কান্না।[২৬৪]

কিন্তু যতদিন তা না হয়েছে, ততদিন শাসকের অত্যাচারে বিপন্ন হবে দেশের প্রশান্তি। সে সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবি জানালে, শাসকবর্গ কখনো ইসলামের মিথ্যা দোহাই দিয়ে কখনো বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে জনগণের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। এ শিক্ষা তাদের অতীতের নিষ্ঠুরতার ইতিহাস থেকেই পাওয়া:

...সত্যিকার মুক্তির পথে/ চায়নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত/ শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।[২৬৫]

কিংবা:

মনে হয় বন্ধ হয়ে আছি/ ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
বাদগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ।/ শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্য রাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি।[২৬৬]

প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি আর অপশাসনে সমাজের প্রতিরন্ধ্রে যে ঘুণ ধরেছিল, তাতে সম্পূর্ণ ভবিষ্যতই হয়ে উঠেছিল অন্ধতমসাচ্ছন্ন:

জীবনকে এখন আমরা দেখেছি/ সেই অতন্দ্র রোগীর মত

রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যার সামনে কেটে গেছে/ স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন

ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে/ অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।[২৬৭]

এর পাশাপাশি দারিদ্র ও অশিক্ষার ফলে সমাজের যে আবিলতা বা হিংসা ও বিদ্বেষ, তাকেও তিনি এঁকেছেন প্রগাঢ় উপলব্ধিতে:

... আমাদের নিম্নগতি/ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে না আর কিছুতেই

আস্তাকুড়-মুখী শকুনের দৃষ্টি/ কিছুতেই আর ফিরছে না উর্ধ্ব আকাশের দিকে।...

...আমরাই ঘুরিয়েছি আমাদের দৃষ্টি/ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু তলা থেকে

পাতালের সবচেয়ে নীচু নর্দমায়,[২৬৮]

বস্তুত ত্যাগে-সেবায় যথার্থ নেতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু উক্ত সময়ে রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ভোগবিলাসে ও লোভে মত্ত হওয়ায়, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের নিদর্শন ছিল না। সাধারণের কল্যাণে তাদের দৃষ্টি নিয়োজিত হয়নি। পক্ষান্তরে অশ্লীল-অপকর্মের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্বের ফলে, সমাজঅঙ্গনে কালিমা লেপন হয়েছিল। এমনি পঙ্কিলতায় কবির অন্তর্দাহ:

১. দুর্ভিক্ষ আর মড়কের দিনে/ যতবার আমি শুনেছি ক্ষুধিত শিশুর কান্না

ততবার তাকিয়েছি ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে,[২৬৯]/

২. সূচীভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে/ যতবার আমি দেখেছি

পাপলুব্ধ পিশাচের নির্লজ্জ পৈশাচিকতা,/ ততবার আমি তাকিয়েছি শংকিত, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে,[২৭০]

তা সত্ত্বেও:

দূরদর্শীর ভান করছি আমরা সকলেই/ শুধু দেখছি না কাছের পাপগুলোকে,

দেখছে না দুর্নীতির কত পুঁথিগন্ধময় অন্ধকার/ ছেয়ে ফেলেছে আমাদের নির্জীব সমাজ সত্তা

যে দুর্নীতির অভিশাপ.../ এ দেশের মাটিতে হাওয়ায়...[২৭১]

খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগে, একদল সত্যান্বেষী অতিমানব ইসলামের একত্ববাদী শক্তিতে জুলুমের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাঁদেরই অনুসরণে বর্তমান সমাজেও শান্তি ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু সে সব ঘটনা এখন কেবলমাত্র:

বহুদিন আগেকার/ এক বিস্মৃত যুগের হারানো কাহিনী।[২৭২]

অথচ মুসলিম সমাজ একদিন বিশ্বের সবচেয়ে গৌরবময় জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছিল। শুধু শান্তির ঋজুপথ থেকে অপসৃত হওয়ার দরুণই এত দুর্দশা :

যে দিন থেকে আমরা নিয়েছি/ ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী,

একতার পরিবর্তে অনৈক্য,/ আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা।

শুরু হয়েছে সে দিন থেকেই/ আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।[২৭৩]

ধ্বংসোন্মুখ এ জাতিকে সমৃদ্ধজীবনের আস্বাদ দিতে হলে, প্রকৃত সৎ-নির্মোহ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তেমন লোকের অধিনায়কত্ব যদি সমাজে ফিরে আসে তবে :

সেই শুধু পারে/ কাহিনীর বিশালপক্ষ রক পাখীর মত

তুলে নিতে অধঃপতিত জাতিকে/ পতনের গভীর খন্দক থেকে

মুক্ত আলোর নীল আকাশে।[২৭৪]

অন্যায়-অধর্ম কিংবা মিথ্যার সাথে আসল সত্যের কোনোদিন আপোষ হয় না। কেননা সব যুগেই কারুণ, ফেরাউন, নমরুদ অথবা সাজাহ্‌, মুসায়েলেমা, তোলায়হার অনুরূপ অহংকারী, প্রতারক ও মিথ্যার সেবক সমাজে সক্রিয় থাকে। তাই আপোষহীন সংগ্রামের পথেই সত্যের কর্মীকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। এ পথে সকলের অনুসরণযোগ্য যাঁর নেতৃত্ব তিনি হলেন:

মানুষের পূর্ণতার ইতিহাসে/ আবু বকর সিদ্দিক নামেই পরিচিত

আখেরী নবীর সেই শ্রেষ্ঠ উম্মৎ।

সেই শ্রেষ্ঠ মানব।[২৭৫]

নিজেদের দুঃখ-দৈন্য সম্পর্কে নিজেরা সজাগ না হলে, প্রকৃতির রাত্রিদিনের নিয়মানুসারে স্বাভাবিক গতিতে কখনো ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য সযত্ন প্রয়াস চাই:

কওমের তক্‌দির পরিবর্তিত হয় না তত দিন/ অধঃপাতিত জাতি যতদিন না হয় সজাগ

কঠিন প্রয়াসের পথে/ একাগ্র সাধনার পথে।[২৭৬]

মানবকুলের হিতার্থে ইকবাল বিশ্বইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফররুখ আহমদও বিশ্বাস করতেন ইসলামই একমাত্র উপায় 'সকল জালিমের জুলুমশাহী শেষ করে।'[২৭৭] মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনতে। তবে সেজন্য একতার প্রয়োজন। তা হলেই সে মহাসমুদ্র-স্রোতের উন্মত্ততায় ছুটতে পারে সার্বজনীন কল্যাণের উত্তরণে। কিন্তু আজ মুসলমানের পারস্পরিক বিভেদের কারণে এর জাতিগত নিস্তরঙ্গ আবদ্ধ জীবনে শত্রুরা আঘাত হানতে সক্ষম:

এখন আর আমাদের দেখে/ কেউ চিনতে পারবে না

সেই তৌহিদবাদী বিশ্ব মুসলিম সত্তাকে,/ ভূগোলের সীমান ভেঙে...

বিরাট দ্বীপে যারা গড়েছিল সবুজ প্রাণের বস্‌তি।

হিংস্র নরখাদককে করেছিল মার্জিত, সভ্য, শান্তিপ্রিয়।[২৭৮]

আবার সে জ্ঞানের ফসল সংগ্রহ করে স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাঁধন থেকে ইসলামকে মুক্তি দিতে পারলে তখনই সমাজদেহ হতে শয়তানের আধিপত্য, অন্যায়ের প্রতিপত্তি, অশান্তির প্রতিচ্ছায়া দূর হয়ে, সকল নারী-পুরুষ চরিত্রবান-চরিত্রবতী হয়ে গড়ে উঠতে পারবে:

কাজেই আল্লার নামে শুরু হোক সেই সফর/ যাতে এই তৃষ্ণাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ

আবার হতে পারে/ সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত

দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে/ দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।[২৭৯]

এগার.

ফররুখ আহমদ সমাজের শাসক-শোষক, খল-প্রতারকদের দুর্নীতি-দুরাচারে দারুণভাবে আহত হয়েছিলেন। সেজন্য কাব্যাঙ্গনে রূপান্তর ঘটিয়ে ঐ সকল চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহস্রাধিক ব্যঙ্গকবিতা[২৮০] রচনা করেছেন। এ সমস্ত তাঁর *অনুস্বার*, *বিস্বর্গ*, *তসবির নামা*, *নসিহত নামা*, *টুকরো নসিহত*, *টুকরো কবিতা*, *কয়েকটি কবিতা*, *ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য* গ্রন্থশিরোনামায় *মাসিক মোহাম্মদী*, *পুবালী*, *সাপ্তাহিক আজ*, *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৮১] কিন্তু আজ পর্যন্ত কেবল *তসবির নামা* (১৯৮৬) ও *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংকলনে সংগৃহীত কিছু কিছু ছাড়া সবগুলি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রয়েছে। ব্যঙ্গ কবিতা রচনার সময় তিনি হরেক রকম ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তবে হায়াৎ দারাজ খান, নামে লিখিত কবিতাবলীকেই শুধু স্বীকৃতি দানে সম্মত ছিলেন।[২৮২] সমাজের অশোভন রূপ নিয়ে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আজিজুল হাকিম, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, আশরাফ সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ কবিগণও ব্যঙ্গ রচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[২৮৩] তবে সংখ্যায় ও কলাকৌশলে ফররুখ আহমদের সফলতা অনেক বেশি। এখানে তিনি পচনশীল সমাজের ক্ষত সারানোর জন্য অস্ত্র হাতে অনেকটাই যেন চিকিৎসকের ভূমিকায় উপনীত হয়েছিলেন। ফলে এ সব কবিতা প্রসাদগুণে কিছুটা ম্লান হলেও জাতীয় চরিত্রের অকপট দলিল হিসেবে অমূল্য সম্পদ। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি:

কবিকে যখন হতে হয় কবিরাজ/ মহাজন বাক্য মতে বাঁশী হয়ে বাঁশ,

তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ।[২৮৪]

কবিতাগুলি আসলে আমাদের চারপাশের পরিচিত জগতের প্রতিচ্ছবি। এ সবের দ্বারা তিনি রূপকের আশ্রয়ে স্বার্থম্বেষী মহলের মানবেতর জীবনের পরিচয় এঁকে তাদের সম্বিৎ ফিরাতে চেয়েছিলেন:

চেনা দুনিয়ার রঙে আঁকা তসবির/ যদি খুলে দাও না বোঝার জিঞ্জির,

সংলাপে আজ করে পথ সন্ধান/ খোদার বান্দা হায়াত দারাজ খান।[২৮৫]

অন্যায় তার ধাঁচেই সইত না। সত্য-ন্যায়ের অনুসারী ছিলেন বলে যেখানে যত অকল্যাণ-অধর্মকে দেখেছিলেন, সেখানে তত তীব্র আঘাত হেনেছিলেন:

অনেকেই বলে : হায়াত দারাজ একরোখা,/ মতান্তরে সে তীর ছুঁড়ে মারে চোখা চোখা।

ঈমানে জমিনে লাগলে আঘাত ছাড়ে না সে/ ব্যঙ্গের বেত অহেতুক কখনো নাড়ে না সে।।

অকারণে তীর ছোড়ে না অধীর একরোখা/ মন্দ না হলে করে না দ্বন্দ্ব একরোখা।।[২৮৬]

কিংবা:

কৃষ্টির সড়কে দেখে কদভ্যাস সেই বাজারের/ অথবা চিন্তার মাঠে দেখে সেই ধূর্ত মোনাফেকী

বাধ্য হয়ে নিতে হল এ ভূমিকা ব্যঙ্গ রসিকের...[২৮৭]

এর প্রয়োজনীয়তা:

ব্যাঙ্গমী ॥ ব্যঙ্গোক্তির আছে কোন প্রয়োজন?/ ব্যাঙ্গমা ॥ কাটাতে ধরার দুর্নীতি অসহন।[২৮৮]

সমকালীন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এমন দুঃসময়ে ধনিক-বণিক ও শোষকশ্রেণির আত্মসুখ প্রবণতাকে মানবতার চরম অবমাননা স্বরূপ বক্র দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

শুনি বৃদ্ধ ভৃত্যমুখে এবার কঠিন মন্বন্তর/ কী আমার আসে যায় যদি ডোবে পল্লী ও শহর?...

ব্যাঙ্কের জমানো স্তূপ, আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রচুর.../ কুকুর লেলায়ে দাও। পলাতক ভিখারীর দল।[২৮৯]

প্রাচীন যুগে বাংলা যেমন নিম্নগোত্রের মুখের ভাষা হিসেবে পরিজ্ঞাত ছিল, তেমনি এ কালেও এক শ্রেণীর বাঙালি মুসলমান বাংলাকে পরিত্যাগ করে, আভিজাত্যের প্রতীক রূপে উর্দু ভাষার চর্চা শুরু করেছিলেন। মর্যাদালাভের এমন অপপ্রয়াসকে কবি চমৎকারভাবে পরিহাস করেছেন:

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন/ বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,

আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?/ পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন,

নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।।[২৯০]

বাঙালি হয়েও যারা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, তাদের কাছে কবির অনন্ত জিজ্ঞাসা :

দুশো বছরেও শেষ নাই জের?/ গোলামী শিকল নিতে চাও আজ ফের?

জ্ঞান-পাপী তুমি পেয়েও পাওনা টের।।[২৯১]

এবং ভাষা আন্দোলনে:

যে হানে তোমার ভাইয়ের গলায় ছুরি/ তারি দালালীতে খোঁজ তুমি বাহাদুরী।[২৯২]

তারপর ধর্মের অজুহাতে:

কৃষ্টিকলায় অনাসৃষ্টি যা করো,/ অখণ্ড নামে যে বিষপাত্র ধরো/ তার ভিত্তি যে কেঁপে ওঠে থরো থরো।[২৯৩]

কবির ধিক্কার :

এই জমিনের নুন খেয়ে অম্লান/ কোন বিদেশের গেয়ে যাও গুণ-গান

সকলেই জানে কোন দিকে হাত-টান।।[২৯৪]

তাঁর মনস্তাপ :

শিরদাঁড়াহীন লুব্ধ তোমার পাপ/ টানিতে চেয়েছে ঘরে কোন কালসাপ

রয় না তা চাপা জমে তাই উত্তাপ।।[২৯৫]

এদের প্রতি হুঁশিয়ারি :

জানে ইতিহাস তোমার যা জানা নেই/ দরকার হলে আবার দেখবে সেই

রক্তবন্যা, পাপ ক্ষয় রক্তেই।।[২৯৬]

কেননা :

আবু লাহাবের মিরজাফরের সেনা/ চেহারা তোমার পুরাপুরি আছে চেনা,

এ স্বাধীন জাতি তাই আর ছাড়বে না ॥[২৯৭]

অতএব :

মানে নাই যারা গোলামীর জিঞ্জীর/ হারাবে না তারা গৌরব আজাদীর,

পোড়াবে না তার কওমের তকদীর ॥[২৯৮]

সুতরাং :

তোমার প্রভুকে একথা জানাতে পারো/ দালাল তোমার মজুরি বাড়াবে আরো

যে পাপের আর যে লোভের ধার ধারো ॥[২৯৯]

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে দেশবাসী সোচ্চার হলে, তাদের আন্দোলন নিস্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য জনতার উপর গুলি চালানো হয়েছিল। খুনিচক্রের এ নিষ্ঠুরতাকে বর্শাবিদ্ধ করে বলা হয়েছে:

মেনি বিড়াল ॥ পারবে না দিতে হুলোকে এ ঘরে তখ্‌ত,/ নিজের বাচ্চা খেয়েচে ও কমবখ্‌ত্।

টিয়া পাখী ॥ লেজ কেটে ফেলে কালি দাও ওর নাকে,/ সহজেই যাবে চেনা যায় খুনিটাকে।[৩০০]

যারা আয়েশি জীবনের অনুরক্ত, তারাই আবার দরদি নেতার ভান করে জনস্রোতে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়িয়েছিলেন। এদের ধূর্ত চেহারার খোলস উন্মোচিত হয়েছে এভাবে:

মানুষের লাগি কাঁদি ভিজায়েছি আমার আস্তিন/ কমরেড! বেরাদর...

জনতার মাথা বেচি আনিব মুক্তির লাল দিন।/ সেই সাথে মোর ট্যাঁক হবে জানি সম্পূর্ণ রঙ্গিন।...

আমার হউক সব তাই চষি সব মানুষের/ তোমাকেও দেব কিছু হও যদি আমার শ্যালক।।[৩০১]

ঘুষদাতা ও তোষামোদকারীদের খপ্পরে পড়ে যেভাবে অনাচার সৃষ্টি হয়েছিল, তার উপরও কবির কটাক্ষ:

তৈল মর্দনের ধারা প্রচলিত এখানে, কেননা/ এ মাঠে দেখেছি ঢের শ্রম-বিমুখের আনাগোনা।

উপরন্তু এ অঞ্চলে ভাগ্যবান আছে দেদার/ যাঁদের তৈলাক্ত মুক্ত করে যোগ্য-অযোগ্য বিচার।[৩০২]

ক্ষমতাসীনবর্গ ও তাদের দালাল-চাটুকারেরা জনগণের তমদ্দুনী আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে, বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছিলেন। এদের প্রতিও তার ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপিত হয়েছে:

হায়াত দারাজ জানে কি হেতু কুর্দন করে মেষ/ কার রথে সমাসীন শিখণ্ডীর চেহারা সরেশ।[৩০৩]

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে, যারা সমাজ তন্ত্র, ধনতন্ত্র বা অন্য কোনো ধার করা আদর্শ নিয়ে পরের ঢাক পিটায়, তারা শুধু উপহাসেরই পাত্র:

খান্দান ভুল না হলে তোমার হত না ব্যাপার হাস্যকর,

তুমিই জানাতে কুল পরিচয় ভুল পরিচয় দিতে না আর,[৩০৪]

এতে অজ্ঞদের অনেক কটুবাক্যই তাঁকে শ্রবণ করতে হয়েছিল। সেজন্য তাদের প্রতিও তার বক্রোক্তি:

মানতে চেওনা কোন সুযুক্তি/ বরং হামেশা কোরো কটূক্তি

প্রতিক্রিয়ার নামে কোরো পার/ করলে তামদ্দুনিক উক্তি ॥[৩০৫]

অথচ এ অবস্থা থেকে উতরায়ে উঠে, সঠিক পথ চিনে না চললে, আত্মরক্ষাও সম্ভব নয় :

তকদির ॥ যে কওম চলে বিপথে, বিষম ভুলে/ আহাজারি তার উঠে মৃত্যুর কুলে।[৩০৬]

এ সত্ত্বেও যাদের ভ্রম সংশোধিত নয়, তাদের দাসত্বস্বভাব ও কূপমণ্ডুকতাকে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় জর্জরিত করে বলেছেন :

তৌহিদে যার আছে সংশয়/ ঐক্য সূত্র তার তরে নয়

আরাধ্য তার অনুকারী মন, লেহন অথবা লোভ দুর্জ্জয়।[৩০৭]

এমনিভাবে *তসবির নামা* কাব্যের ‘মৃগ ও শাখা মৃগ’, ‘বানর ও হুমাপাখি’, ‘চড়ুই-বাবুই’, ‘পোষা ও জালালী কবুতর’, ‘বন গাঁয়ে’,‘রাজ হাঁস ও পাতি কাক’, ‘পিঁজরা ও পলাতক পাখি’, ‘নেকড়ে ও কুকুর’, ‘বাঘ ও বলদ’,‘ভাটিয়া ঘোড়া ও সিংহ’, ‘শকুনি ও স্বর্ণ ঈগল’, ‘বাছুর ও বিড়াল’, ‘চিলের আলাপ’, ‘ফিঙে ও চিল’, ‘কুমীর ও তথ্যজ্ঞানী’, ‘রাত্রি শেষে’, ‘সাপুড়ে ও সাপের পীর’, ‘ব্যাঙের মৃত্যু’, ‘ইঞ্জিন ও চাকা’, ‘খেয়া ঘাট ও খেয়া নৌকা’, ‘পাঁচিল ও দরজা’, ‘কড়িকাঠ ও চৌকাঠ’, ‘পিঁপড়ে ও প্রজাপতি’, ‘ইবলিসের বৈঠক’ প্রভৃতি কবিতায় মানুষের অসৎ উদ্দেশ্য, অনুকরণপ্রিয়তা, দাসত্ব প্রবণতা, পরাধীনতা, নির্জীবতা, চৌর্যবৃত্তি, ধূর্ততা, অজ্ঞতা, অত্যুগ্রবাসনা, কৃত্রিমতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা, পাশবতা, পরচর্চা, অহংকারিতা, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি অমানবিক প্রবণতাকে কবির ব্যঙ্গহূলের অসহায় শিকারে পর্যবসিত হতে হয়েছে।

বার.

ফররুখ আহমদ যেমন জীবনে, তেমনি কাব্যের অন্তর্দেশে তাঁর আপন বিশ্বাসকে যথাযথ প্রতিচিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে ইকবাল ও নজরুল ইসলামের উত্তরকালে মুসলিম জাগরণের অন্যতম কবি হিসেবে তাঁর অবদান সর্বজন বিদিত। ইসলামের ন্যায় বিচার ও মানবতাবাদী আদর্শে বিশেষত শেষ নবি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের দর্শনে দেশ শাসিত হলে, সমাজে অনাবিল সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, এ-ই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস । তাঁর কাব্যপ্রয়াসে অনুক্ষণ এই বিশ্বাসের উত্তরাধিকরই তিনি বহন করেছিলেন। কবি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ে বিচরণ করেছিলেন সত্য; কিন্তু সমাজের বিষাদ-বঞ্চনা ও দুস্থ-অসহায় অবস্থাকেও তিনি স্বচ্ছন্দে কবিতায় স্থান করে দিয়েছেন। একই কবির কাব্যসাধনায় এমন কালসংলগ্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে বলে সমালোচকমণ্ডলী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে কেউ কেউ তাঁকে ‘ইসলামী রেনেসাঁর কবি’, অথবা ‘মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর এ দুটি সত্তা সংঘাতমূলক বা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং উভয়ই সমকালীন সমাজের বাস্তবতার এদিক-ওদিক দুই পিঠ এবং একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে একটি অপরটিকে পূর্ণতা দান করেছে। জরাজীর্ণ সমাজের হতাশা তাঁর মনে যে গভীর বেদনাবোধের জন্ম দিয়েছিল, তাতে তিনি কবিতার মধ্যে একদিকে নির্যাতিত মানুষের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন, আবার অপরদিকে তাদের মুক্তির সন্ধানে ইসলামের ছায়াতলে সকলকে আশ্রয় গ্রহণের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক কেবল তাঁর শোষণ-পীড়নের কবিতাগুলি দিয়েই তাঁকে আধুনিকতাবাদী কবি হিসেবে খণ্ডিত করে দেখতে চেয়েছেন। অথচ তাঁর জীবনে অথবা কাব্যে, আধুনিকতার সঙ্গে বড় ধরনের কোনো সংঘাত ছিল বলে মনে হয় না।[৩০৮] সে কারণেই সম্ভবত ইসলামি রেনেসাঁর প্রবক্তা হয়েও তাঁর কবিতা আঙ্গিকপ্রকরণে, রূপক ও উপমা সংযোজনে আধুনিক কাব্যকলার উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। ফলে তাঁর সৃষ্টি প্রচারসর্বস্বতার অনেক উর্ধ্বে স্থানলাভ করেছে। তা ছাড়া মানবতার সার্থক উত্তরণে পাড়ি দেওয়ার জন্য যে নৈতিকতার প্রয়োজন, তা ইসলামি জীবনব্যবস্থায় যত সহজ, অন্য কোনো মতাদর্শে ততটা সম্ভব নয়। তাই প্রাচীন পুঁথি ও ইসলামি পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি আধুনিক শিল্পাঙ্গিকে ইসলামের বিপ্লবী আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। সার্বিকভাবে সমাজের পতন-স্খলনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাবধানবাণী সমকালীন বাংলা কবিতায় সম্ভবত আর কেউ উচ্চারণ করেন নি।

তথ্যসূচি:

---

১ আবু রুশদ, *জীবন ক্রমশ*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬

২ আবুল হাশেম, *আমার ছাত্র ফররুখ*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪, পৃ. ৬

৩ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, বিচিত্রা, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৪, পৃ. ৩৬

৪ মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, *চির সংগ্রামী কবি ফররুখ*, চট্টগ্রাম: নাবীলা প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ৫২-৫৪

৫ সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু, *আব্বাকে যেমন দেখেছি*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, পৃ. ২৮৯

৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ জীবনী গ্রন্থমালা*, ১৮ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ১৭

৭ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* ১ম খণ্ড, (২য় সংস্করণ, কলকাতা: নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৩৭৯), পৃ. ৩৩

৮ বানু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১

৯ দৃষ্টব্য: সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদ*, কলম, নভেম্বর, ১৯৮৮ পৃ. ৮-৯

১০ বানু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

১১ আব্দুল হক, *ফররুখ আহমদ কালের শিকার*, *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৯৩

[১২] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ১০৭
[১৩] গোলাম মঈনউদ্দিন, *কবি ফররুখ আহমদ: ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯), পৃ.
[১৪] মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, *কবি ফররুখ আহমদ সওগাত* (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৮৯), পৃ. ৫৩৩
[১৫] ফারুক মাহমুদ, *আমার ফররুখ ভাই*, সেবা সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ*, (ঢাকা: সেবা, সাহিত্য সংস্কৃতি জনকল্যাণ সংস্থা, ১৯৮৭), পৃ. ১০৫
[১৬] উদ্ধৃত: *তদেব*, পৃ. ১০৭
[১৭] ফররুখ আহমদ, *পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য, সওগাত*, (আশ্বিন, ১৩৫৪), পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৮১, পৃ. ৬০০-০১
[১৮] রফিকুল ইসলাম, *অনন্য পুরস্কার*, শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি* পৃ. ১৫৭-৫৮
[১৯] দ্রষ্টব্য: আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ২৭-২৮
[২০] রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮
[২১] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ফররুখ কাব্যে রূপক ও প্রতীক, সাহিত্যের রূপকার*, (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮১), পৃ. ২৪১
[২২] জাফর উল্লাহ, *চির সংগ্রামী কবি ফররুখ*, পৃ. ৮৯
[২৩] উদ্ধৃত: আখতার ফারুক, *এক বিস্ময়কর মানুষ*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৫৯
[২৪] আবুল ফজল, *প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, (ঢাকা: ফররুখ স্মৃতি তহবিল, ১৯৭৫)
[২৫] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, *হে বন্য স্বপ্নেরা* (কবির ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতাবলী নিয়ে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থের জন্য কবিপ্রদত্ত তালিকার অবশিষ্ট কবিতাগুলো পরবর্তীকালে প্রকাশিত ফররুখ রচনাবলীতে স্থানলাভ করেছে।)
[২৬] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *ভূমিকা*, ফররুখ আহমদ, *হে বন্য স্বপ্নেরা*, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, (ঢাকা: ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ, ১৯৭৬), পৃ. ১
[২৭] *যৌবসেনা*, তদেব, পৃ. ৯-১০
[২৮] *কাঁকড়া পাড়ায় রাত্রি, তদেব*, পৃ. ১০
[২৯] *সমস্যা*, তদেব পৃ. ১৩
[৩০] *শেষ মুহূর্ত*, তদেব পৃ. ১১
[৩১] *সমাপ্তি* তদেব পৃ. ১৬
[৩২] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *ভূমিকা*, তদেব পৃ. ৫
[৩৩] *নিষ্প্রদীপ*, তদেব পৃ. ২৮
[৩৪] *পটভূমি*, তদেব পৃ. ২৯
[৩৫] *সামুদ্রিক*, তদেব পৃ. ৩১
[৩৬] *প্রেক্ষণ*, তদেব পৃ. ৩৪
[৩৭] *পরিপ্রেক্ষিতে*, তদেব পৃ. ৩৫
[৩৮] *প্রেসম্যান*, তদেব, পৃ. ৪৯
[৩৯] *হে বন্য স্বপ্নেরা*, তদেব পৃ. ৫২-৫৩
[৪০] *দুর্ভিক্ষের সন্তান, হে বন্য স্বপ্নেরা, ফররুখ রচনাবলী* মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৯), পৃ. ১৮০-৮১
[৪১] *আসন্ন শীতে*, তদেব পৃ. ১৮৩
[৪২] তদেব, পৃ. ১৮৩
[৪৩] তদেব পৃ. ১৮৪
[৪৪] *নিমের ছায়ায়*, তদেব, পৃ. ১৯৪
[৪৫] *রক্ত হিংস্র মাঠে*, তদেব, পৃ. ১১৭
[৪৬] *নিজের রক্ত*, তদেব, পৃ. ১৯৭-৯৮
[৪৭] *কবন্ধ রাত্রি*, তদেব, পৃ. ১৯৯
[৪৮] *শকুনেরা*, তদেব, পৃ. ২০৭
[৪৯] *কবন্ধ রাত্রি*, তদেব, পৃ. ১৯৯
[৫০] তদেব পৃ. ১৯২
[৫১] উদ্ধৃত: সামসুল আলম সাঈদ, *ফররুখ আহমদ: তাঁর কাব্যবিশ্বাস*, চতুরঙ্গ, (জুন, ১৯৮৮), পৃ. ১৭৯
[৫২] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ফররুখ আহমদ কবি ও ব্যক্তি, বিচিত্রা*, (১৫ নভেম্বর, ১৯৭৪), পৃ. ৩৭
[৫৩] Syed Ali Ashraf, *Muslim Traditions in Bengali Literature*, (3rd. edition, Dhaka: Islamic Foundation, ১৯৮৩), পৃ. ৬৯.
[৫৪] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *ফররুখ আহমদের কবিতা: আলোচনার খসড়া*, শব্দের সীমানা (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬) পৃ. ১২৬
[৫৫] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *ফররুখ আহমদ: ব্যতিক্রমী শিল্পী*, বই, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭৫), পৃ. ৩৫।
[৫৬] আশরাফ সিদ্দিকী, *ফররুখ আহমদ*, মাসিক গণমন, (নভেম্বর, ১৯৭৪), পৃ. ১৪ এবং রুশ্দ, *জীবন ক্রমশ, পৃ.* ৬৬
[৫৭] শামসুর রাহমান, *একজন আধুনিক কবি প্রসঙ্গে*, দৈনিক মিল্লাত, ১৯৫৩, উদ্ধৃত: মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্যের রূপকার*, পৃ. ২১২-১৩
[৫৮] রুশ্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
[৫৯] এ কবিতাগুলি *হে বন্য স্বপ্নেরা*-র অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্বালোচিত
[৬০] সিকান্দার আবু জাফর, *নবাঙ্কুর, তিমিরান্তিক*, (ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ৫-৬
[৬১] পরিশিষ্ট, *ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৩০৪
[৬২] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *দরিয়ায় শেষ রাত্রি: প্রতিভূ কবিতা*, শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৫৪১
[৬৩] আশরাফ সিদ্দিকী, আর এক অগ্নিবীণা, *তদেব*, পৃ. ৩৭২
[৬৪] *লাশ, সাত সাগরের মাঝি, ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৬৫] তদেব, পৃ. ৩৯
[৬৬] তদেব, পৃ. ৩৯
[৬৭] কবিগৃহে পাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল মান্নান সৈয়দ তার *ফররুখ আহমদ জীবনী গ্রন্থমালা, ১৮ খন্ড, গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায়*
[৬৮] *আউলাদ, সাত সাগরের মাঝি, ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৫২
[৬৯] তদেব
[৭০] তদেব পৃ. ৫৩
[৭১] তদেব পৃ. ৫৪

৭২ *সিন্দাবাদ*, তদেব পৃ. ৫
৭৩ *আকাশ নাবিক*, *তদেব*, পৃ. ২১-২২
৭৪ তদেব, পৃ. ২৩
৭৫ *এই সব রাত্রি*, তদেব, পৃ. ৩৩
৭৬ *পাঞ্জেরী*, তদেব, পৃ. ৩৫
৭৭ তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬
৭৮ তদেব, পৃ. ৩৬
৭৯ *হে নিশান বাহী*, তদেব পৃ. ৪১
৮০ *নিশান*, তদেব পৃ. ৪৪
৮১ *সাত সাগরের মাঝি*, তদেব পৃ. ৫৪
৮২ তদেব, পৃ. ৫৬
৮৩ তদেব, পৃ. ৫৯
৮৪ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ, (জীবনী গ্রন্থমালা*, ১৮ খণ্ড), পৃ. ৪০
৮৫ পরিশিষ্ট, *ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৩৫৪
৮৬ *মৃত্তিকা*, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫৩, উদ্ধৃত: তদেব, পৃ. ৩৫৫
৮৭ কামরুল হাসান, *ফররুখ ভাই*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৫৪ এবং পরিশিষ্ট, *ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৩৫৬
৮৮ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ৮১
৮৯ *পথ, আজাদ করো পাকিস্তান*, *ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ২৯২
৯০ তদেব, পৃ. ২৯৩
৯১ তদেব
৯২ *নতুন মোহাররাম*, তদেব, পৃ. ২৯২
৯৩ তদেব
৯৪ *রাত্রির অগাধ বনে*, তদেব, পৃ. ২৯৫
৯৫ তদেব, পৃ. ২৯৬
৯৬ তদেব
৯৭ তদেব
৯৮ *কারিগর*, তদেব পৃ. ২৯৮
৯৯ *জালিম ও মজলুম*, তদেব পৃ. ২৯৮-৯৯
১০০ তদেব, পৃ. ২৯৯
১০১ *কারিগর*, তদেব, পৃ. ২৯৭
১০২ তদেব
১০৩ Sayed Sajjad Hussain, *Farrukh Ahmad, Pakistan Times*,(11th December, 1966),
উদ্ধৃত: পরিশিষ্ট, *ফররুখ রচনাবলী*, পৃ. ৩৩৫
১০৪ তদেব, পৃ. ৩২৯
১০৫ *উমর ফারুক*, *জিঞ্জীর*, *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, ২য় প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ১৮০
১০৬ *মোবারক বাদ*, *নতুন চাঁদ*, *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, ২য় প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৪১
১০৭ *আজাদ*, তদেব, পৃ. ৪৮
১০৮ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *কবি ফররুখ আহমদ*, সওগাত, (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৮২), পৃ. ৩৪
১০৯ মুহম্মদ মুস্তফা, *সিরাজাম মুনীরা*, ফররুখ রচনাবলী, পৃ. ৬৯, ৭২, ১১০, *তদেব*, *পৃ. ৬৭-৬৮*
১১০ তদেব, পৃ. ৬৭-৬৮
১১১ তদেব, পৃ. ৬৮
১১২ তদেব, পৃ. ৭৬
১১৩ তদেব, পৃ. ৭৭
১১৪ আবু বকর সিদ্দিক, তদেব, পৃ. ৮২-৮৩
১১৫ *উমর-দারাজ দিল*, তদেব, পৃ. ৮৭
১১৬ তদেব, পৃ. ৮৯-৯০
১১৭ তদেব, *পৃ.* ৯২
১১৮ তদেব, পৃ. ৯২
১১৯ *ওসমান গণি*, তদেব, পৃ. ৯৭-৯৮
১২০ তদেব, পৃ. ৯৯
১২১ *আলী হায়দর*, তদেব, পৃ. ১০১
১২২ তদেব, পৃ. ১০৩
১২৩ তদেব, পৃ. ১০৪
১২৪ তদেব, পৃ. ১০৪
১২৫ *শহীদে কারবালা*, তদেব, পৃ. ১০৯
১২৬ *গাওসুল আজম*, তদেব, পৃ. ১১৯
১২৭ *সুলতানুল হিন্দ*, তদেব, পৃ. ১২০
১২৮ হোসাইন আহমদ অনূদিত, *হালাতে মাশায়েখে নক্শবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: মাহবুব আর্ট পেন্টার্স, ১৯৭৮), পৃ. ৭৬
১২৯ মুজাদ্দিদে আলফেসানী, *সিরাজাম মুনীরা*, ফররুখ রচনাবলী, পৃ. ১২১
১৩০ আব্দুল কাদির, *ফররুখ আহমদের কাব্য-নাটিকা ও সনেট কাব্য*, পূবালী, (আষাঢ়, ১৩৭১), পৃ. ৮৮৫
১৩১ ফররুখ আহমদ, *কাহিনীর ইশারা*, *নৌফেল ও হাতেম*, (ঢাকা: পাকিস্তান লেখন সংঘ, ১৯৬১)

[১৩২] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ*, পৃ. ১৫৩
[১৩৩] আব্দুল কাদির, তদেব, পৃ. ৮৮৩
[১৩৪] *নৌফেল ও হাতেম*, পৃ. ৬
[১৩৫] তদেব, পৃ.৭
[১৩৬] তদেব, পৃ. ৯
[১৩৭] তদেব, পৃ. ১৩
[১৩৮] তদেব, পৃ. ১৫
[১৩৯] তদেব, পৃ. ২১
[১৪০] তদেব, পৃ. ২৭
[১৪১] তদেব
[১৪২] তদেব, পৃ. ২৮
[১৪৩] তদেব, পৃ. ৩৭
[১৪৪] তদেব, পৃ. ৪৭
[১৪৫] তদেব, পৃ. ৫৩
[১৪৬] তদেব, পৃ. ৫৫
[১৪৭] তদেব, পৃ. ৬১-৬২
[১৪৮] তদেব, পৃ. ৬১-৬২
[১৪৯] তদেব, পৃ. ৬৭
[১৫০] তদেব, পৃ. ৮৮
[১৫১] তদেব, পৃ. ৯১-৯২
[১৫২] আহসান হাবীব, *পূর্ব্ব বাংলার কবিতা*, *কাফেলা*, (২ মার্চ, ১৯৬৫), পৃ. ১৯
[১৫৩] এ কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫১-৫৯ সাল। দ্রষ্টব্য: আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *প্রবেশক*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*
[154] Satya Prasad Chatterjee, *Modern Bengali poetry in East Bengal.* Nirmal Ghose edited, *Studies in Modern Bengali Poetry*, (Calcuttai Novela, 1968), P. ২১৮; সিদ্দিকী, *শব্দের সীমানা* পৃ. ১৩১, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *মুহূর্তের কবিতা: একটি স্মরণীয় গ্রন্থ*, *পুবালী*, (কার্তিক, ১৩৭০), পৃ. ১৯৪
[১৫৫] সিদ্দিকী, তদেব, পৃ. ১৩০
[১৫৬] *মুহূর্তের কবিতা*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪৮
[১৫৭] *মুহূর্তের কবিতা*, তদেব, পৃ. ৪৮
[১৫৮] সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ*, পৃ. ১৯১-৯২
[১৫৯] *বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ*, *মুহূর্তের কবিতা*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৪৯
[১৬০] *কুতুব তারা*, *মুহূর্তের কবিতা*, ঢাকা: বার্ডস এ্যান্ড বুকস্, ১৯৬৩), পৃ. ৭৬
[১৬১] *তোমাকে জাগাবো*, তদেব, পৃ. ৮৪
[১৬২] *তুমি জাগলে না*, তদেব, পৃ. ৮৫
[১৬৩] *জিঞ্জির*, তদেব, পৃ. ৩৯
[১৬৪] *লালবাগ কেল্লা*, তদেব, পৃ. ৪০
[১৬৫] *সোনার গাঁও: একটি প্রাচীন স্মৃতি*, তদেব, পৃ. ৪১
[১৬৬] *ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ৪২
[১৬৭] *বন্দরের স্বপ্ন*, তদেব, পৃ. ৪৩
[১৬৮] *সাম্পান মাঝির গান*, তদেব, পৃ. ৭৪
[১৬৯] *দীউয়ানা মদিনা*, তদেব, পৃ. ২২
[১৭০] *পুঁথি পড়া: মুহার্রম মাসে* (১), তদেব, পৃ. ৫৫
[১৭১] তদেব (দুই), পৃ. ৫৬
[১৭২] *শহীদে কারবালা*, তদেব, পৃ. ৫৭
[১৭৩] *তাজকেরাতুল আউলিয়া*, তদেব, পৃ. ৫৮
[১৭৪] *কাসাসুল আম্বিয়া*, তদেব, পৃ. ৫৯
[১৭৫] *শাহনামা*, তদেব, পৃ. ৬০
[১৭৬] *আলিফ লায়লা*, তদেব, পৃ. ৬১
[১৭৭] *চাহার দরবেশ*, তদেব, পৃ. ৬২
[১৭৮] *শবে কদর উপলক্ষে*, তদেব, পৃ. ৬৬
[১৭৯] *সাতান্নর কবিতা* (এক), তদেব, পৃ. ৬৮
[১৮০] তদেব (দুই), পৃ. ৬৯
[১৮১] *শহীদ স্মরণে*, তদেব, পৃ. ৭০
[১৮২] *পূর্ণিমা*, তদেব, পৃ. ৭৯
[১৮৩] *প্রাচ্যের একটি বিধ্বস্ত শহর*, তদেব, পৃ. ৮৭
[১৮৪] *প্রাচ্যের একটি আধুনিক শহর*, তদেব, পৃ. ৮৮
[১৮৫] *বক পাখী*, তদেব,পৃ. ৮৯
[১৮৬] *অশান্ত পৃথিবী*, তদেব, পৃ. ৯০
[১৮৭] *হিংস্র ক্ষুধাতুর রাত্রি*, তদেব, পৃ. ৯৯
[১৮৮] *মুক্তি স্বপ্ন*, তদেব, পৃ. ৯৭
[১৮৯] *বিগত*, তদেব, পৃ. ৯২
[১৯০] *পরিচিতি*, তদেব, পৃ. ১৩
[১৯১] *রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে*, তদেব, পৃ. ২৭
[১৯২] *শতাব্দী*, তদেব, পৃ.৩১
[১৯৩] *প্রার্থনা*, এক, তদেব, পৃ. ৯২
[১৯৪] তদেব, দুই, পৃ. ৯৩

[১৯৫] *ভোরের গান*, তদেব, পৃ. ৯২
[১৯৬] সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ, *সতত স্বাগত*, (ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ১৪৬
[১৯৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন: হাতেম তা'য়ী*, মাহে নও, (আশ্বিন, ১৩৭৩), পৃ. ৩১
[১৯৮] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ২৯
[১৯৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *ফররুখের হাতেম তা'য়ী*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ২৯৪
[২০০] ফররুখ আহম, *হাতেম তা'য়ী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃ. ৩২
[২০১] তদেব
[২০২] তদেব, পৃ. ৪৩
[২০৩] তদেব, পৃ. ৫০
[২০৪] তদেব, পৃ. ৭৩
[২০৫] তদেব, পৃ. ৭৩
[২০৬] তদেব, পৃ. ৬৯
[২০৭] তদেব, পৃ. ৭৪
[২০৮] তদেব, পৃ. ১২৮
[২০৯] তদেব, পৃ. ১৭৬
[২১০] তদেব, পৃ. ১৮৮
[২১১] তদেব, পৃ. ১৮৮
[২১২] তদেব, পৃ. ২২৮
[২১৩] তদেব, পৃ. ২২৯
[২১৪] তদেব, পৃ. ২২৯
[২১৫] তদেব, পৃ. ২৩১
[২১৬] তদেব, পৃ. ২৮৩
[২১৭] দ্রষ্টব্য: আব্দুল কাদির, *কবি ফররুখ: দুই সমীক্ষণ*, শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৩০৭-০৮
[২১৮] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *ফররুখ আহমদের কবিতা*, তদেব,পৃ. ৪৩৬
[২১৯] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঐতিহ্যের সবমূল্যায়ন: হাতেম তা'য়ী*, মাহে নও, পৃ. ৩২
[২২০] *হাতেম তা'য়ী*, পৃ. ২৮২
[২২১] তদেব, পৃ. ২৮৩
[২২২] তদেব, পৃ. ২৫২
[২২৩] তদেব, পৃ. ২৬০
[২২৪] শাহাবুদ্দীন আহমদ, *মানবতার কবি ফররুখ*, সেবা সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ৪৫-৪৬
[২২৫] আফজাল চৌধুরী, *কাফেলার ফররুখ*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ৫৪৮-৪৯
[২২৬] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, কাফেলা প্রসঙ্গে, ফররুখ আহমদ, *কাফেলা*, ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১৯৮৭, পৃ. ৬
[২২৭] ঐ, ফররুখ আহমদের *কাফেলা*, *সাহিত্যের রূপকার*, পৃ. ২২৮
[২২৮] *দুই মৃত্যু*, *কাফেলা*, পৃ. ৩২
[২২৯] তদেব, পৃ. ৩৩
[২৩০] *বৈশাখ*, তদেব, পৃ. ৩৮-৩৯
[২৩১] তদেব, পৃ. ৩৯
[২৩২] *আরিচা পারঘাটে*, তদেব, পৃ. ৫৯
[২৩৩] *দ্বীপ নির্মাণ*, তদেব, পৃ. ৬৪
[২৩৪] *সৃষ্টির গান*, তদেব পৃ. ৬৬
[২৩৫] *মেঘনা তীরের চাষীকে*, তদেব পৃ. ৯৪
[২৩৬] *মদীনার মুসাফির*, তদেব, পৃ. ৯
[২৩৭] *খলিফাতুল মুসলেমিন*, তদেব, পৃ. ১৪
[২৩৮] *বেলাল*, তদেব, পৃ. ২০
[২৩৯] *এজিদের ছুরি*, তদেব, পৃ. ১৬
[২৪০] তদেব
[২৪১] *শিকল*, তদেব, পৃ. ৮৯
[২৪২] তদেব
[২৪৩] *হে আত্মবিস্মৃত সূর্য*, তদেব, পৃ. ৩৪
[২৪৪] *এজিদের ছুরি*, তদেব, পৃ. ১৭
[২৪৫] *আলমগীর*, তদেব, পৃ. ২১
[২৪৬] *নতুন সফর*, তদেব পৃ. ২৬-২৭
[২৪৭] *জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে*, তদেব, পৃ. ৩৬
[২৪৮] *ঈদের কবিতা*, তদেব পৃ. ৮২
[২৪৯] তদেব
[২৫০] *নয়া সড়ক*, তদেব, পৃ. ৮৩
[২৫১] *শেরে বাংলার মাজারে*, তদেব, পৃ. ৮৫
[২৫২] তদেব
[২৫৩] তদেব, পৃ. ৮৭
[২৫৪] তদেব, পৃ. ৮৮
[২৫৫] *বিরান সড়কের গান*, তদেব, পৃ. ৯২

[২৫৬] তদেব
[২৫৭] ফররুখ আহমদ, *হাবেদা মরুর কাহিনী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১), ভূমিকার পরে সংযোজিত কবির মন্তব্য, পৃ. ২৫
[২৫৮] তদেব
[২৫৯] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, প্রবেশক, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*
[২৬০] দ্রষ্টব্য: মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ভূমিকা; ফররুখ আহম্মদ, *হাবেদা মরুর কাহিনী*, পৃ. ১৭-২৪; আফজাল চৌধুরী, *ফররুখের স্বোপার্জিত ভুবন হাবেদা মরুর কাহিনী*, সেবা সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ৫৭-৬০
[২৬১] এক, *হাবেদা মরুর কাহিনী*, পৃ. ২৭
[২৬২] দুই, তদেব, পৃ. ২৮
[২৬৩] তদেব, পৃ. ২৯
[২৬৪] চার, তদেব, পৃ. ৩১
[২৬৫] পাঁচ, তদেব, পৃ. ৩২
[২৬৬] তদেব
[২৬৭] ছয়, তদেব, পৃ. ৩৩
[২৬৮] সাত, তদেব, পৃ. ৩৪
[২৬৯] আট, তদেব, পৃ. ৩৬
[২৭০] তদেব
[২৭১] নয়, তদেব, পৃ. ৩৬
[২৭২] এগারো, তদেব, পৃ. ৩৯
[২৭৩] বারো, তদেব, পৃ. ৪০
[২৭৪] তেরো, তদেব, পৃ. ৪১
[২৭৫] চৌদ্দ, তদেব, পৃ. ৪২
[২৭৬] সতেরো, তদেব, পৃ. ৪৫
[২৭৭] আঠারো, তদেব, পৃ. ৪৬
[২৭৮] তদেব, পৃ. ৪৭
[২৭৯] ঊনপঞ্চাশ, *তদেব*, পৃ. ৮৩-৮৪
[২৮০] মাহফুজউল্লাহ জানিয়েছেন, কেবল মাত্র টুকরো কবিতা-র সংখ্যাই সাড়ে বারোশো। উদ্ধৃত: আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *প্রবেশক*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*
[২৮১] পরিশিষ্ট, *তদেব*, পৃ. ১৭৯, আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ*, পৃ. ২৭, সাঈদ উর রহমান, *রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ১৬৬; ফররুখ আহমদ, *তসবির নামা*, (ঢাকা: নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬), প্রকাশকের অভিমত
[২৮২] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *প্রবেশক*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*
[২৮৩] দ্রষ্টব্য: সাঈদ উর রহমান, *রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ২৬৯-৭৭
[২৮৪] ভূমিকা, *অনুস্বার*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১২৬
[২৮৫] মুখবন্ধ, *তসবির নামা*, পৃ. ১৪
[২৮৬] ভূমিকা, *তসবির নামা*, পৃ. ১২
[২৮৭] *বিরস মন্তব্য*, তদেব, পৃ. ১৩
[২৮৮] *ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আলাপ*, *তদেব*, পৃ. ২৬
[২৮৯] *অভিজাত-তন্দ্রা*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১২৬
[২৯০] *উর্দু বনাম বাংলা*, তদেব, পৃ. ১২৭
[২৯১] *এক কৃষ্টি প্রসঙ্গে*, *তসবির নামা*, পৃ. ১১
[২৯২] তদেব
[২৯৩] তদেব
[২৯৪] তদেব
[২৯৫] তদেব
[২৯৬] তদেব, পৃ. ১২
[২৯৭] তদেব
[২৯৮] তদেব
[২৯৯] তদেব
[৩০০] হুলোর কীর্তি, *তদেব*, পৃ. ৪০
[৩০১] *নেতা*, *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১২৯
[৩০২] *তৈল*, *তদেব*, পৃ. ১৩২
[৩০৩] *শিখণ্ডীর প্রতি*, *তসবির নামা*, পৃ. ৯
[৩০৪] *মুখাপেক্ষীর প্রতি*, তদেব
[৩০৫] *বিশ্রম্ভালাপ*, তদেব, পৃ. ১০
[৩০৬] *কওম ও তকদির*, তদেব, পৃ. ৩৫
[৩০৭] *মার্ফিয়া খানের প্রতি*, তদেব, পৃ. ১০
[৩০৮] আবু রুশ্‌দ, *জীবন ক্রমশ*, পৃ. ৬৭

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

আবুল মনসুর আহমদ-এর আয়না: হাসির আড়ালে কান্না

আহম্মদ শরীফ*

সারসংক্ষেপ: আবুল মনসুর আহমদ একজন সমাজসচেতন শিল্পী। ঘুণেধরা সমাজকে এবং সমাজের পচে যাওয়া মানুষকে তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন লেখনির ধারালো ছুরি দিয়ে। সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে তিনি শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন তাঁর চারপাশের পরিবেশকে। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও মনন দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, মত ও পথের পার্থক্য, ধর্মীয় অজ্ঞানতা, রাজনীতির ভণ্ডামি, সাহিত্যের নকলনবিশতা ইত্যাদি কারণে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা বিবর্জিত ছদ্মবেশী পাশবিক মানুষের বাস্তবচিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। *আয়না* গল্পগ্রন্থে সে সমস্ত ছদ্মবেশী মানুষদের মুখোশ উন্মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। বস্তুত দর্পণ বা আয়নায় যেমন করে নিখুঁত ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আবুল মনসুর আহমদের *আয়নায়* সমাজের মুখোশধারী বকধার্মিক, ভণ্ডদের চিত্রই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন লেখক সুনিপুণভাবে। তীক্ষ্ণ স্থিতধীসম্পন্ন আবুল মনসুর আহমদ সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে বেছে নিয়েছেন হাস্যরসের কলানৈপুণ্য। সমাজের নানা অসঙ্গতি বিশেষ করে স্বধর্মের অবনতি ও নীতিনৈতিক জ্ঞানবিবর্জিত ধর্মগুরুদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডকারখানা লেখককে করেছে দুঃখভারাক্রান্ত, তাঁর অন্তঃকরণ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত; লেখকের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আত্মক্রন্দনের এ প্রতিরূপই স্যাটায়ারের বক্রবাণে *আয়না* গ্রন্থে চিত্রায়িত।

বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ লেখনি ধারণ করে কালজয়ী হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ছিলেন সাহিত্যের 'পার্থপ্রতিম সারথি'। জন্ম ধানিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ; বৃটিশ ভারতে; আর মৃত্যু ১৮ মার্চ, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ; ঢাকায়-স্বাধীন বাংলাদেশে। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের নানা আন্দোলন, পাকিস্তানের সংঘাতময় রাজনীতি, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়-এই সবকিছুরই কালের সাক্ষী হিসেবে তিনি অবলোকন করেছেন। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিক নানা পরিচয়ে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় তিনি একজন লেখক, সাহিত্যিক। রাজনীতিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ আবুল মনসুর আহমদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের লেখায় ফুটে উঠেছে। বিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের অবিভক্ত বাংলার ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের চিত্র পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। মুক্তবুদ্ধি ও উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার ধারক আবুল মনসুর আহমদ সমাজের নানা বিষয়কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং বিশেষ করে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে তাঁর অন্তঃকরণ বার বার হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। এ সম্পর্কিত সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য:

> আইন থেকে রাজনীতিচর্চা এবং সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্য, এই ছিলো তাঁর কর্মময় জীবনের চারটি স্তম্ভ। অবশ্যই সাহিত্য তাঁর মনের পিপাসা চরিতার্থের মূলস্তম্ভ। আর এই স্তম্ভের উচ্চশিখরে আরোহণ করে তিনি তাঁর পার্শ্বস্থ সমাজ ও ব্যক্তিকে অবলোকন করেছেন ভূয়োদর্শনের সূক্ষ্ম পরিচর্চায়। তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞার বিবেচনায় যে-সমাজ আর মানুষকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, তারা শুধু তাঁর আদর্শের আলোকেই নিরীক্ষিত হয় নি। তাদের তিনি দেখেছেন নানা অসঙ্গতির অভিব্যক্তিরূপে। তাঁর দেখা অসঙ্গতিগুলো তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে মানবকল্যাণ-বিরোধী এই সব অশুভ বিষয় সমাজ ও জীবনকে যে কী পরিমাণে কলুষিত করে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।[১]

আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যিক জীবনের শুরু গল্প লেখা দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। ১৯২২-১৯২৯ সাল পর্যন্ত রচিত এবং মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্পসংকলন *আয়না* (১৯৩৫)। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল বইটি। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরবর্তী সমাজের নানা অবক্ষয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রতারণা, রাজনৈতিক হতাশা এবং বঙ্গীয় মুসলমানদের জীবনচিত্র এই গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি, সমাজের অন্ধমানসিকতা ইত্যাদি এ সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। *আয়না* গল্পগ্রন্থে হুজুর *কেবলা*, *গো-দেওতা-কা দেশ*, *নায়েবে নবী*, *লিডরে-কওম*, *মুজাহেদিন*, *বিদ্রোহী* সংঘ এবং *ধর্মরাজ্য*-এই সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত গল্পে গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের রক্ষণশীল মনোভাব, ধর্মপালনের নামে বাড়াবাড়ি, স্বধর্মে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বিভাগ ও কলহ, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন গল্পকার। *গো-দেওতা-কা দেশ* এবং *ধর্মরাজ্য* গল্পদুটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ব্যঙ্গের মাধ্যমে। 'ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় দলাদলি, অজ্ঞতা ও ভণ্ডামি নিয়ে পীর মাওলানাদের যে ধর্মব্যবসা, তার উপর ভিত্তি করে *নায়েবে-নবী মুজাহেদিন* ইত্যাদি গল্প রচিত হয়েছে। এসব গল্পে হানাফি-মোহাম্মদি তর্কযুদ্ধের ভয়াবহতাকে সুতীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।'[২] *হুজুর কেবলা*, *লিডরে কওম* ইত্যাদি গল্পে চিত্রিত হয়েছে ভণ্ডপীর, বকধার্মিকের প্রকৃত চিত্র। তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে আলোচ্য গল্পগুলোতে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্প রচনা বা গল্পের মাধ্যমে হাসানো নতুন কোন ব্যাপার নয়। প্রাচীন-মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকালের অনেক সাহিত্যিকের রচনায় হাসির খোরাক পাওয়া যায়। বাংলা লোকসাহিত্য, লোকজ সৃষ্টি গম্ভীরা গানের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ। বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যে যাঁরা ব্যঙ্গ রচনাকার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ও আবুল মনসুর আহমদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুল মনসুর আহমদ ‘ফরাযী পরিবারে’ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহিম ফরাযী। তাঁর প্রপিতামহ আছরউদ্দীন মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর অন্যতম খলিফা মওলানা এনায়েত আলীর হাতে ‘শরা কবুল’ করেছিলেন। তাঁর পরিবারের সবাই ছিলেন গোঁড়া মোহাম্মদি। তাঁর চাচা (মুনশী ছমিদ্দরুদ্দীন) ‘ফেকায়ে মোহাম্মদী’ ‘রদ্দে মোকাল্লেদীন’ ও ‘দুররায়ে মোহাম্মদী’ ইত্যাদি বই কিনে রীতিমত পাঠ করতেন বাহাসে হানাফিদের পরাজিত করার জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি হানাফিদের শত্রু মনে করতেন। আবুল মনসুর আহমদ বাল্যকালে বহুবার এসব হানাফি-মোহাম্মদি বাহাসে গিয়েছেন। তাঁর পরিবারে এক ওয়াক্ত নামাজ কাযা করার দুঃসাহসও কারও ছিল না। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এমনই এক পরিবেশে। গোঁড়া মোহাম্মদি পরিবারে জন্ম নেওয়া আবুল মনসুর আহমদ প্রথম দিকে নিজেও ছিলেন গোঁড়া মোহাম্মদি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর মধ্যে উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার উদয় হতে থাকে। বিশেষ করে তাঁর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষক মৌঃ শেখ আবদুল মজিদ এবং হেড মৌলবি মৌঃ আলী নেওয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাচেতনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯১৮-১৯ সাল থেকে তিনি কবরপূজা এবং পীরপূজার সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতায় গিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), ডা. লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ‘আবুল মনসুর আহমদের নাম ছিল প্রথমে আহমদ আলী বা আহমদ আলী ফরাযী। তাঁর সাহিত্যিক নাম শুরুতে ছিল আবুল মনসুর আহমদ আলী জামী; পরে তিনি তাঁর নাম থেকে ‘আলী জামী’ অংশ বাদ দেন এবং আবুল মনসুর আহমদ নামেই পরিচিত হন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নামের সঙ্গে ‘ফরাযী’ ব্যবহার করতেন, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম থেকে ‘ফরাযী’ এবং ‘আলী’ আর সাহিত্যিক নাম থেকে ‘আলী জামী’ অংশ বাদ দিয়ে নিজেকে আবুল মনসুর আহমদ নামকরণ করেছিলেন।[৩]

আয়না আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনা সংকলন। এই গ্রন্থে তিনি পাঠকদের হাসিয়েছেন। *আয়না*র মুখবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেন,

> ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদী হাত। আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতই করুণ।’[৪]

প্রকৃত অর্থে *আয়না* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে হাসি থাকলেও তা লেখকের গভীর মনোবেদনাজাত। স্বজাতীয়দের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে দলাদলি, মানবতার পদদলিত রূপ, ধর্মের নামে অধর্ম, রাজনীতির নামে ভণ্ডামি, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেখককে করেছিল ব্যথিত। এই ব্যথিত রক্তক্ষরণরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করি *আয়না* গ্রন্থের গল্পগুলোতে।

> রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেছেন নির্বাচনের নামে প্রহসন, ভোট কেনাবেচার ব্যবসা, মন্ত্রিত্বের কল্যাণে পকেট ভারি করার কৌশল, শাসনের নামে শোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজের দলের প্রতি অপরিমেয় ভক্তি ও প্রীতি, পারমিটবাজদের তোষণনীতি, ফটকাবাজি ব্যবসায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ব্যাপার, দলীয় স্বার্থের খাতিরে দলন ও দমননীতি। সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলাদলি, দুর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন, ব্যভিচার, অনাচার ও মিথ্যাচার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখেছেন ভণ্ডামি, মূর্খতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, লোভ-লালসা, আসঙ্গ-লিপ্সা, কুসংস্কার ও মোল্লা-মৌলভীদের পারস্পরিক কুৎসা রচনা, হীনমন্যতা, ইসলামি শিক্ষার নামে প্রগতিবাদী ধ্যান-ধারণায় বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক কলহে ইন্ধন সৃষ্টি।[৫]

ক.

আয়না গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প *হুজুর কেবলা*। এ গল্পে গল্পকার হুজুর কেবলার মুখোশ উন্মোচন করতে চেয়েছেন কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। অশিক্ষিত, অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ সমাজে তা সম্ভবও নয়। এ দেশে ধর্মকে ব্যবসার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করে এক শ্রেণির মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের রুজি-রুটির ব্যবস্থা করে আসছে। বিশেষ করে অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে ধর্ম ব্যবসা চালানো যায় নির্দ্বিধায়। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ধর্মভীরু লোক এই সমস্ত বকধার্মিকদের চরিত্রে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত চরিত্রের সাক্ষাৎ কখনোই পায় না বা পেলেও তারা তা মানতে চায় না। ধর্মব্যবসা এ দেশে কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছে তা এ দেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দরগা, পীর বাবার আশ্রম, খাজাবাবার দরবার, মাজারের

প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই অনুমান করা যাবে। 'ধর্মাশ্রিত চিন্তা-চেতনার সিঁড়ি বেয়ে মুসলমান সম্প্রদায় কখনো কখনো যেমন গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে বিশ্বের বহু মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি কখনো কখনো মুসলমানেরা ধর্মোন্মাদ হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ডেকে এনেছে দারুণ বিপর্যয়।'[৬] এই বিপর্যয় মুসলমান সমাজে একদিনে সূচিত হয় নি। এর জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণই মুখ্য ছিল। '১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়ার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন।'[৭] দীর্ঘ ছয়শ' বছরের মতো সময় ধরে এ দেশে চলেছে মুসলিম শাসন। ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাই মুসলিম শাসনের সময়ে এ দেশীয় হিন্দুগণ মুসলিম শাসনকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি কখনো। আর তাই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতা যখন ইংরেজদের হস্তগত হয় তখন এ দেশীয় হিন্দুগণ অনেকটা স্বস্তিবোধই করেছিল। দেশীয় হিন্দুগণ ইংরেজদের সাথে নানা সহযোগিতা করে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে থাকে, অপর দিকে মুসলমানগণ রাজ্যহারা ও সম্পদহারা হয়ে অভিমানবশত ইংরেজি ও বাংলা শেখার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পশ্চাৎপদই রইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথমে সামরিক বিভাগে মুসলমানদের আধিপত্য খর্ব হল। এর পর বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগসমূহের পুনর্গঠনের ফলে ফৌজদারি, শিকদার, কাজি, মুফতি, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ মুসলিম সরকারি কর্মচারীগণ চাকুরি হারাতে থাকেন। পরবর্তীতে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের ওপর নেমে আসে মহাঘাত। মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় দেখা দেয়। আবার ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ মার্চ তারিখে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তিত হলে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা এবং ইংরেজদের সহযোগিতার ফলে হিন্দুগণ অল্পদিনেই বেশ এগিয়ে যায়। এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি। এই রক্ষণশীলতার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় পর পর দুটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। একটি হাজী শরীয়তুল্লাহ'র (১৭৮১-১৮৪০) নেতৃত্বে 'ফরায়েজী' আন্দোলন অন্যটি 'ওহাবী' আন্দোলন। আদর্শগত দিক থেকে ফারায়েজীরা সরাসরি ওহাবীদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাদেরই সমগোত্রীয়। ফারায়েজী ও ওহাবীদের লক্ষ্য এক তা ধর্মসংস্কার এবং আদি ইসলামের পুনঃসংস্থাপন। 'ইসলাম ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে কি ভয়ংকর পরিণাম ডেকে এনেছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওহাবী আন্দোলন। ইংরেজ শাসনকে শত্রুর শাসন ফতোয়া দিয়ে ওহাবীরা দারুণ উন্মাদনায় সদ্য-প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।'[৮] ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশকে ধর্মীয় জীবন যাপনের অনুপযোগী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এই বিধর্মী শাসিত (দারুল-হরব) দেশে জুমা ও ইদের নামাজ সিদ্ধ নয়। অধিকন্তু হিন্দু সমাজের সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মতো সমাজ আবির্ভাবও মুসলমান সমাজে ঘটে নি। শিক্ষার অভাবের ফলে মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি বাসা বাঁধতে থাকে। 'মুসলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা খসে গেলে শিক্ষা ও তবলিগের অব্যবস্থার ফলে তাদের মধ্যে এ অন্ধ মানসিকতা ও কুসংস্কার দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে।'[৯] এভাবে মুসলমানগণ প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে গিয়ে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মুসলমানরা যে কত বড় অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে এখনও রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনশ ষাট আউলিয়ার দেশ (সিলেট), বার আউলিয়ার দেশ (চট্টগ্রাম) হিসেবে পরিচিতি পাওয়া স্থানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে। বলাবাহুল্য এইসব মাজার কেন্দ্রিক ধর্মব্যবসায় অধিকাংশই ভণ্ড-প্রতারকের আশ্রয়স্থল। এবং একশ্রেণির লোক এইসব মাজারকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে আজও।

হুজুর কেবলা গল্পে হুজুর কেবলা কীভাবে অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজের হীন লালসা চরিতার্থ করার জন্য হযরত মুহম্মদ (সা:)কে নিয়ে তামাসা করেছেন এবং শেষে তার একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মুরিদ রজবের স্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করেছে সে চিত্রই উন্মোচনের ব্যর্থ চেষ্টা গল্পকার করেছেন এমদাদ চরিত্রের দ্বারা। গল্পের শুরুতে দেখা যায় শিক্ষিত যুবক দর্শন শাস্ত্রে কলেজ পড়ুয়া এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে সমস্ত বিলাসিতার পায়ে পদাঘাত করে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরে মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি নিয়ে মাথায় টুপি পরে পায়ে চটি জুতা দিয়ে যেদিন বাড়িতে এল 'সেদিন রাস্তায় বহু লোক তাকে সালাম দিল।' কলেজে 'সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশতা, ওহি, হজরতের মেরাজ লইয়া সর্বদা হাসিঠাট্টা করিত।'[১০] এহেন নাস্তিক এমদাদ আস্তিকে পরিণত হল। এমদাদ চরিত্রে লেখকের নিজের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। গোঁড়া মোহাম্মদি পরিবারে লালিতপালিত হওয়া আবুল মনসুর আহমদ পরবর্তী সময়ে উদার চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মসহ নানা ক্ষেত্রে এই উদার চিন্তার প্রতিফলিন ঘটতে শুরু করে। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব, হানাফিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ত্যাগও তিনি করতে

শুরু করেন। 'শুধু লেখাতেই আবুল মনসুর আহমদ এই সংস্কার-প্রয়াস সীমাবদ্ধ রাখলেন না, পোশাক-পরিচ্ছদ-চালচলনেও তার জের টানলেন। দাড়িতে কেঁচি লাগালেন, কোর্তা খাট করে পাঞ্জাবী বানালেন, তহবন্ধ ফেলে পায়জামা এবং বাবরি কেটে আলবার্ট ফ্যাশান করলেন।'[১১] গল্পের এমদাদ ভীষণভাবে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। সে গোলগাল করে বাঁশের কঞ্চি কেটে তস্‌বিহ তৈরি করে তার উপর আঙ্গুল চালনা করায় আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল কিন্তু কিছুতেই তার মনে শান্তি এল না। কাজেই এমদাদ নিরুপায় হয়ে 'সংসারের একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফি সাহেবের সঙ্গে পীর-জিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।' এই তথাকথিত সুফি সাদুল্লার কথা সবাই বিশ্বাস করত কারণ 'মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।' এবং তিনি 'এস্তেখারা' করে দেখেছিলেন যে, 'চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।'

সাদুল্লার সাথে হুজুর কেবলার বাড়িতে পৌঁছানোর পর এমদাদ রীতিমত বিস্মিত হয়ে যায়। তার জন্য আরও বিস্ময়কর ঘটনা অপেক্ষা করছিল। হুজুর কেবলাকে প্রথম দেখে তার মনে হয়েছিল, 'মেহেদি রঞ্জিত দাড়ি গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকারের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।' হুজুর কেবলা 'মোরাকেবা নেসবতে বায়নান্নাসে' সক্ষম। তিনি 'অপরের রুহ'-এর কথা সম্পর্কেই শুধু অবগত নন, পৃথিবীতে বসেই তার রুহ 'সাত হাজার বৎসর' দুনিয়া পরিভ্রমণ করে আসতেও সক্ষম। হুজুর কেবলা সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কঠিন আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলায় কথা বলেন। 'মোতাওয়াজ্জাহ', 'কুদরতে ইযদানী,' 'এলমে লাদুন্নি,' 'জযবায়েযাতী-বনাম হোব্বে এশক,' 'যেকের,' ফেকের', 'জেসম,' 'নূরে ইযদানী' ইত্যাদি দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেন। এইরূপ শব্দ ব্যবহারের সুবিধা হল সাধারণ লোকজন তাকে বড় কামেল পীর মনে করবে এবং সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। 'আবুল মনসুর আহমদ ভাষার ব্যবহারে সবচেয়ে সার্থক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার, তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় ধর্মব্যবসায়ীদের সংলাপে তিনি যে আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শুধু বাস্তব নয় তুলনাহীন। ঐ মিশ্র জবান ছাড়া ভণ্ড পীর বা বকধার্মিকদের চরিত্র এত জীবন্ত হতে পারতো না।'[১২] এই সমস্ত কঠিন কঠিন আরবি ও ফারসি মিশ্রিত বাংলা শুনে জনৈক মুরিদ তো বলেই বসল, 'হুজুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।' তখন হুজুর কেবলার উত্তর, 'অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।' কিন্তু শত চেষ্টা করেও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে এই সমস্ত কথার গূঢ় রহস্য হয়তো উন্মোচন করা সম্ভব হয় না।

এমদাদ হুজুর কেবলার মুরিদ হয়ে সেখানেই থেকে গেল। কিন্তু 'এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পীর সাহেবের মেহেদি রঞ্জিত দাড়ি ও তার রূপা বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।'[১৩] এমদাদ অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল সে তার অক্ষমতার কথা হুজুর কেবলাকে বলে বাড়িতে যাবে। কিন্তু বলি বলি করেও সে কথা তার বলা হয়ে উঠল না কারণ কোন এক দূরবর্তী স্থানে হুজুর কেবলা মুরিদানে যাবে তার সমস্ত ঘটনা লিখে কলকাতার পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রকাশ করার জন্য এমদাদকে তাদের সাথে যেতে হবে। কাজেই 'প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগি, সাতসের অম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ' নিয়ে হুজুর কেবলা মুরিদানে বের হলেন। পীর সাহেব উক্ত গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা গেড়ে সে এলাকায় তার মুরিদ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বাড়িতে হুজুর কেবলার দাওয়াত খাওয়া চলতে লাগল। তার খাওয়া দেখে এমদাদের অনুভূতি, 'পীর সাহেবের রুহানীশক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন, তার হজমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।'[১৪] সেখানে সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিশ বসত এবং রাতে এশার নামাজের পর পীর সাহেব দাড়িতে চিরুনি ও কাপড়ে আতর লাগিয়ে সুন্নত পালনপূর্বক অন্দর মহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ করত, মেয়েদের মজলিশে। মেয়েদের মজলিশে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এবং মেয়েদের ধর্মের কথা বোঝাতে পীর সাহেবের একটু বেশি সময় লাগত কারণ 'মেয়েলোকের বুদ্ধিসুদ্ধি বড় কম-তারা নাকেস-আকেল।' কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন সম্পর্কে পীর সাহেবের ধারণা উচ্চ। কারণ, 'তাসাউওয়াফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভাল করিয়া তাওয়াজ্জোহা দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।' অবশ্য গল্পের শেষে তিনি কলিমনকে 'আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছে দিয়েছিলেন বটে ! আর একটি বিষয় পীর সাহেব মজলিশে যখন ওয়াজ করত তখন তার জযবা (ফানাফিল্লা) আসত। এই সময় পীর সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম, 'পুড়িয়া গেলাম' বলে চিৎকার করত আর সে সময় তাকে এক খণ্ড মখমল দিয়ে ঢেকে দিয়ে তার হাত পা টিপে দেওয়ার ওসিয়ত ছিল। লক্ষণীয় বিষয় মেয়েদের মসলিশে ওয়াজ করার সময়ই এ রকমটা তার বেশি হত। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে এমদাদের মনে সংশয় দেখা দিল। শিক্ষিত এমদাদ পীর সাহেবের যৌন লিপ্সার বিষয়টি ধরতে পারলেও অশিক্ষিত ধর্মভীরু জনগোষ্ঠীর কাছে তা থেকে গেছে অজ্ঞাত।

অবশেষে পীর সাহেব হঠাৎ করেই সে স্থান ত্যাগ করতে চাইলে সে অঞ্চলের মুরিদগণ তাকে 'কেরামতে নেসবতে বায়নান্নাস' দেখানোর জন্য ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। আর তাই পীর সাহেব প্রধান খলিফা সুফি সাহেবের দেহে হযরত মুহম্মদ (সা:)এর রুহ উপস্থিত করালেন এবং সুফি সাহেব

মুর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি করতে লাগল। হুজুর কেবলার সাথে প্রধান খলিফার বিভিন্ন সময়ের কানাকানিতে এমদাদের কিছুটা সন্দেহ হওয়ার কারণে এবার এমদাদ স্বয়ং মূর্ছিত প্রধান খলিফা তথা হযরত মুহম্মদ (সা:)কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য এগিয়ে এলে তাকে প্রশ্ন করতে দেওয়া হল না। পীর সাহেবের ইশারায় প্রশ্ন করলেন মাওলানা বেলায়েতপুরী, 'আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব নুরে-ইজ্‌দানির জওয়াশা সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? তার আমলে কি কোন গলদ আছে?' তখন হযরতের রুহ পাক জানালেন, 'তুমি মারফত খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফত হয়?' আর এই মারফত পাওয়ার রাস্তা হল চার বিবি গ্রহণ করা কিন্তু হুজুর কেবলার মাত্র তিন বিবি। চার বিবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানানো হয়।

> কারণ চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। ...চার চিজ দিয়া খোদাতালা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কেতাব পাঠায়েছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এই ভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতালা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে আমরে-নূরে-ইজ্‌দানিতে ফানা হইতে হইবে, দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।[১৫]

কাজেই চার বিবি না হলে হুজুর কেবলা শুধু নিজেই নয় তার মুরিদগণ পরপারে ফুলসেরাত পার হতে পারবে না বলে জানানো হল। নিজের জন্য নয়, কেবল পীর দস্তগির কেবলা মুরিদগণের জন্য অগত্যা বিয়েতে রাজি হলেন এবং তিনি এক বুড়িকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু তা হবার নয়, কেন না হযরত নিজেই হুজুর কেবলার ভাবীস্ত্রীর ছবি দেখে এসেছেন বেহেস্তে সে হল এই বাড়ির রজবের স্ত্রী কলিমন। হুজুর কেবলা মুরিদের স্ত্রীকে বিয়ে করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে সেখানেও নবীর পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রীকে বিয়ে করার উদাহরণ টানা হল। নিরুপায় হয়ে দস্তগির কেবলা কেবল মুরিদগণকে রক্ষার জন্য কলিমনকে বিয়ে করতে রাজি হল। এক বছর আগে বিয়ে করা বউকে রজব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর তিরস্কার ও উৎপীড়নের ফলে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। ঘন ঘন মূর্ছার মধ্যে দিয়ে কলিমনের সাথে হুজুর বেকলার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। উল্লেখ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু*(১৯৪৮) উপন্যাসে মজিদ চরিত্রকে এমনি এক লিবিডো জনিত চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। মজিদের পূর্বের স্ত্রী রহিমা থাকা সত্ত্বেও সে জমিলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে ঘরে নিছক তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এমদাদ বুঝতে পারল পীর সাহেব তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য হযরত মুহম্মদ (সা:)কে নিয়ে মস্করা করেছে। তার যেন চৈতন্য ফিরে এল আর তাই সে বরাসনে উপবিষ্ট পীর সাহেবের মেহেদি রঞ্জিত দাড়ি ধরে টান মেরে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, 'রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?' কিন্তু আর বলতে পারল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে এসে এমদাদকে মারমার করে ধরে ফেলল। তাকে গ্রামের বাইরে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ভুলুণ্ঠিত পীর সাহেব ইতোমধ্যে উঠে হুকুম দিলেন, 'দেখিস বাবারা ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিজ দিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। খোদা যাকে সাফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে?' এমদাদ শিক্ষিত হওয়ার কারণে হুজুর কেবলার হীন মানসিকতার পরিচয় তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পক্ষান্তরে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা ধরতে পারে নি। হুজুর কেবলা সাত হাজার বছরের কাহিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেও এমদাদের দাড়ি ধরে টান মারার মুহূর্তটি দেখতে পায় নি। দস্তগির কেবলার মিথ্যা বলা, অতিরিক্ত ভোজন রসিকতা, দুনিয়ার ধনদৌলতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, নারী লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ভণ্ডপীর হিসেবে আমাদের কাছে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। "আবুল মনসুর আহমদ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর এক অসাধারণ চিত্র নিপুণতা ও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে *হুযুর কেবলা* গল্পে চিত্রিত করেছেন। দেশ কালের পটভূমিকা *হুযুর কেবলা* গল্প রচনাকে একটি দুঃসাহসী সফল সাহিত্যকর্ম বলা চলে।"[১৬] আলোচ্য গল্পে কাবুল নির্ভরতা ও এস্তেখারা, অসহযোগ আন্দোলনের বাড়াবাড়ি, মুসলমানদের অতিরিক্ত পিরভক্তি প্রভৃতি বিষয়ও দেখানো হয়েছে। হুজুর কেবলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন মুসলমান সমাজের জীবনচর্চার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সে জন্য হুজুর কেবলার কোন নির্দিষ্ট নাম নেই। পীরপূজা, কবরপূজা, ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস এই সমস্ত আমাদের প্রথায় পরিণত হয়েছে আর এই বিষয়গুলো সমাজে কী পরিমাণ ভয়বহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে তা গল্পকার ভাল করেই আমাদের দেখিয়েছেন।

খ.

আয়না গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প *গো-দেওতা কা দেশ*। আলোচ্য গল্পে মূলত হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়টি রূপকের আড়ালে তুলে ধরা হয়েছে। '*আয়না* গ্রন্থে তিনি যেমন ধর্ম ব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ মৌলবাদী ও স্বার্থপর দুর্নীতিপরায়ণ সুবিধাবাদী রাজনীতিক তেমন বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িকতাকে সমান তীব্রতার সঙ্গে ব্যঙ্গ পরিহাস সমালোচনা করেছেন।'[১৭] ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এদেশের রাজনীতিতে টিকে থাকতে চাইল। কিন্তু ভারতীয় জনগণ তাদের তাড়ানোর জন্য নানা আন্দোলনকে বেগবান

করতে থাকে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ গঠিত হলে ইংরেজ তাড়ানো আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে হিন্দু এবং মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে থাকে তবে তাদের এ দেশ ছাড়তে হবে। তাই তারা হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'Divide and Rule' 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিতে কাজ শুরু করে। এদেশে বহুযুগ থেকে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বসবাস করলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনও দেখা যায় নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যই ছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দেশবাসীকে বিভক্ত করার জন্য কৌশলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেয়। গরুকে হিন্দুরা দেবতা হিসেবে জানে ও মানে। তাদের কাছে গোহত্যা মহাপাপ। অন্যদিকে মুসলমানদের কাছে গরু জবাই করে খাওয়া, কোরবানি করা ধর্মীয় উৎসব, ধর্মের বিধান। কিন্তু এই গরুকে বাঁচাতে গিয়ে মানুষকে হত্যা করা মূলত মনুষ্যত্বের নামে অবমাননা। পশু বাঁচাতে গিয়ে মানুষ নামের যে পশুরা মানুষকেই হত্যা করেছে তাদের ব্যঙ্গ করেই এই গল্পটি লেখা।

গল্পটির শুরু হয়েছে ছোটগাল্পিক আবহে। গল্পের ঘটনা স্বপ্নে সংঘটিত। গল্পকথক স্ত্রীর উপর রাগ করে নৌকা ভ্রমণে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবি হল। নৌকাডুবির পর হঠাৎ ভেসে উঠে 'বহু কষ্টে পা টানিয়া দুগ্ধ-সাগর অতিক্রম করিয়া তীরে' উঠলেন। এবং সেখানে তিনি দেখলেন, 'পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দুধের নহর বহিয়া সাগরে পড়িতেছে।' গরুময় পাথরের দেশে এক গাভী তাকে দেখে হিন্দি ভাষায় বলল, 'তুমি দেখিতেছি মানুষ জাতি। তুমি কি করিয়া আজিও বাঁচিয়া আছ বাবা?' গাভীটি তার 'বাংলাদেশী' পরিচয় পেয়ে তাদের সরদারের কাছে নিয়ে গেল। 'সর্দার একটা বৃদ্ধ বলদ। তার কপালে চন্দনের ত্রিশূল ও মাথায় টিকি আছে এবং একটা বন্য লতা সামনের দুপায়ের ভিতর দিয়া শরীর বেষ্টন করিয়া বুঝি বা পৈতার কাজ করিতেছে।' সরদারসহ অন্যান্যরা কথকের 'মুসলমান' পরিচয় পাওয়ার পর 'অনার্য', 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে থাকে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মানুষকে যে পশুতে পরিণত করে দেয় সে দিকটিই গল্পকার আমাদের ব্যঙ্গের মাধ্যমে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, যে গাভীটি কথককে ছুঁয়েছিল তার অনুভূতিও ব্যঙ্গের সাথে চিত্রিত হয়েছে, 'আমার জাত গিয়াছে গো, মুচুনমানটাকে আমি ছুঁইয়া ফেলিয়াছি। কাশীও ডুবিয়া গিয়াছে। হায় হায়, আমি কোথায় গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব গো।'[১৮] মূলত হিন্দু সমাজে ছোঁয়াছুয়ির বাচবিচার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এমন ভাবে সমাজে জেকে বসেছিল তা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাউল সম্রাট লালন ফরিকসহ (১৭৭২-১৮৯০) অনেকেই এই সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ষাঁড়গুলো শিং বাঁকা করে কথককে তেড়ে এল। অবশেষে সরদারের হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় কথক বেঁচে গেলেন। সরদার বলদ যা বলল তার মর্মার্থ হল: ইংরেজরা ভারতবর্ষে টিকে থাকার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দেয়। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় বাস করত। গরুকে হিন্দুগণ দেবতা হিসেবে মানে অন্যদিকে মুসলমানরা গোমাংস খায়। কাজেই ইংরেজরা এই বিষয়টি নিয়ে তাদের স্বার্থের জন্য দুই জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে মারামারি করতে গিয়ে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান মারা গেছে। অন্যদিকে গোহত্যা বন্ধের কারণে গরুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গাভীদের দুধের টানাটানি শুরু হলে নিরুপায় গাভীরা নানা উপায়ে বাঁট ঘষে দুধ ফেলতে শুরু করে এবং খাল বিল পরিপূর্ণ হয়ে সমস্ত দেশ ডুবে গেল। আনাচে কানাচে দুচারজন মানুষ যারা দাঙ্গায় বেঁচে ছিল তারাও দুধের সাগরে ডুবে মারা গেল। সব গরু সাঁতরে এসে তাই হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। সরদার বলদের সাথে কথপোকথনের কালে এক সময় গল্প কথকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ইংরেজদের বিভাজন সৃষ্টির অপকৌশল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এ গল্পের অন্তর্গত। ইংরেজদের দুর্বল শাসননীতিরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ গল্পে। 'হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে 'ইংরাজ তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি রক্ষায় নিয়েজিত থাকিল। সুতরাং খুব শান্তির সঙ্গেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে উভয় পক্ষের সকললেই নিহত হইল, একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। সুতরাং যুদ্ধ থামিয়া গেল।'[১৯] 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আঘাতে সমাজ ও দেশের চৈতন্য জাগরণ তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।'[২০] গরুকে বাঁচাতে গিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হয় আর গরুর দুধে ডুবে বাকি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উভয় বিষয়ই কী হাস্যকর! ধর্মান্ধতাসৃষ্ট নির্বুদ্ধিতার কাছে মানুষের মূল্যবোধ পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হয়, ঘটে শোচনীয় পরাজয় মনুষ্যত্ববোধের, মানবজীবনের শোচনীয় পরাজয় ও ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত এ গল্পটি। ধর্ম বর্মের মতো মানুষকে রক্ষা করবে কিন্তু উল্টো যদি সে ধর্মকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হয় তাহলে ধর্ম থেকে লাভ কী? কাজেই লেখক যখন দেখেছেন ধর্মের নামে হিন্দু ও মুসলমান কাতারে কাতারে শহিদ হচ্ছে তখন তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছে।

গ.

নায়েবে নবী গল্পের মূল বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে দালাদলি। *নায়েবে নবী* গল্পটিসহ *মুজাহেদীন*, *লিডরে কওম* প্রভৃতি ‘গল্পগুলো মূলত লেখকের কিশোর বেলার (১৯১০-১২) হানাফি-মোহাম্মদি বিরোধের পটভূমিতে লিখিত। তৎকালে হানাফি-মোহাম্মদির মধ্যে মাযহাবি বিরোধ, বাহাসের সভা, সভাশেষে মারামারি এবং পরিণামে মামলা-মোকদ্দমা ও জেল জরিমানা ছিল সাধারণ ব্যাপার, মোহাম্মদিদের কারো কারো বক্তব্য ছিল ‘হানাফীরা হিন্দো-সে বদতর হ্যায় এবং হিন্দুদের আগে তারা দোযখে যাবে। পক্ষান্তরে, হানাফীদের কারো কারো বক্তব্য ছিল, অহানাফীরা মুসলমানই নয়।’[২১] *নায়েবে নবী* শব্দটির অর্থ হল নবীর প্রতিনিধি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স:)-এর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী বা রাসুল আসবেন না। কাজেই ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য যারা কাজ করবে তাদের বলা হয় নায়েবে নবী বা নবীর প্রতিনিধি। তাদের দায়িত্ব সমাজে ধর্মের অমিয় বাণী প্রচার করা, লোককে সৎপথে পরিচালিত করা। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে এক শ্রেণির লোক নিজেদের নায়েবে নবী হিসেবে দাবি করলেও তাদের কাণ্ডকারখানা তা সমর্থন করে না। কারণ তারা প্রায়ই নিজেদের স্বার্থের জন্য সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম করে চলে। তারা ধর্মকে বেছে নেয় তাদের জীবিকার বাহন হিসেবে। সে মুখোশধারী ভণ্ড, প্রতারকচক্রের প্রকৃত চিত্র লেখক আমাদের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন আলোচ্য গল্পে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মত ও পথের শেষ নেই। শরিয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত আরও কত কী? হানাফি, মোহাম্মদি, শাফি, হাম্বেলি, শিয়া, সুন্নি কত প্রকারের মত ও পথ। এই মতের অনুসারী হয়ে অনেকে মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। নামাজের সময় হাত বুকের ওপর বাঁধা বা নাভির নিচে বাঁধা, সুরা ফাতিহার শেষে দোআললীন বা যোআললীন, ইদের নামাজ ছয় তাগবির না বার তাগবিরে পড়া ইত্যাদি নিয়ে আজও তর্কের শেষ নেই। অনেকক্ষেত্রে এই সমস্ত তার্কিকদের বেশিরভাগই হয় বকধার্মিক। যারা হয়তো ইদের নামাজ ছয় তাগবির হবে না বার তাগবির হবে এই নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তারা ফরজ নামাজ না পড়ে ইদের নামাজ নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

গল্পের প্রধান দুই চরিত্র মৌলবি সুধারামী সাহেব ও গরিবুল্লাহ সাহেব। সুধারামী সাহেবের জন্মস্থান সুধারামে হলেও তিনি এ অঞ্চলে বসবাস করছেন ‘শরা জারির’ উদ্দেশ্যে। কাজেই শরা জারির উদ্দেশ্যে কোন এক শুভ মুহূর্তে তার এ অঞ্চলে আগমন। ‘কোথাও দীর্ঘ দিন থাকিতে গেলে তথায় বিবাহ করা সুন্নত। তা না হইলে শহওয়াৎ গালেব হয় এবং নফ্‌সে-আম্মারা দেহের মধ্যে শয়তানি ওয়াসওয়াসা ঢালিয়া দেয়।’ তাই সুধারামী সাহেব কেবল সুন্নতের ইয্‌যত রক্ষা করার জন্য দুজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ঐ গ্রামে বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছেন। সুধারামী সাহেব যে কয়টি গ্রামের মৌলবি তা অর্জন করতে প্রথম প্রথম ‘বাহাস’ করতে হয়েছে এবং শেষের কয়েকটি গ্রামের দখল নেওয়ার জন্য ‘হাদিস কোরআন রাখিয়া লাঠি-সোটার ও আদালতের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।’

> অবনতশীল সমাজকে এবং সেই সঙ্গে সেই সমাজের ত্রুটিপূর্ণ মানুষকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছেন তিনি; হয়তো তাঁর অবচেতন মনে এরূপ ধারণা সুপ্ত ছিলো যে, সেই আঘাত প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও ব্যক্তি শোধন-প্রক্রিয়ারই একটি দিক। হয়তো সমাজের ভূত তাড়ানোর অভিপ্রায়েই তিনি সমাজের বুকে তাঁর নিষ্করুণ বিদ্রূপ-বাণ হেনেছেন অবলীলায়, অকুণ্ঠিত চিত্তে।[২২]

ওয়াযের মাজলিশে সুধারামী সাহেব ওয়ায করছিলেন। টাকার অভাবে দেশে তার দুই স্ত্রী কেমন মানবেতর জীবন যাপন করছেন, পেটের চিন্তা করতে গেলে কীভাবে দীন দুনিয়ার কথা বলবেন? বেহেস্তের হুর ও গেলমানদের সুরত কেমন, বেহেস্তের শারাবনতহুরার মিষ্টতা ইত্যাদি বয়ান এবং তার কথা ধৈর্য ধরে শুনলেই যে সবকিছু পাওয়া যাবে তা গ্যারান্টিসহ বর্ণনা করছিলেন। এভাবে ‘ভূমিকাতেই ঘণ্টা দেড়েক কাবাব হইল। বাড়িওয়ালা পিছন হইতে বলিয়া গেলেন, খানা তৈয়ার। সুতরাং মৌলবি সাহেব ভূমিকা হইতে সটান উপসংহারে চলিয়া গেলেন।’ সুধারামী সাহেবের পরিবারকে উদ্ধার করার জন্য কোরবানির চামড়া বিক্রয়ের যে টাকা রাখা ছিল তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ঘটনাক্রমে খাওয়ার সময় উক্ত মজলিশে তুরস্কের জন্য চাঁদা আদায়কারী ভলান্টিয়ারা এলে তাদের সাথে সুধারামী বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বে যে কোরবানির চামড়া বিক্রয়ের টাকা তাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রকৃত অর্থে তা যুদ্ধরত তুরস্ককে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুধারামী সাহেব তুরস্কের যুদ্ধের অসাড়তা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এতে তার ধর্মান্ধতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। সুধারামী সাহেবের টুপির বর্ণনায় গল্পকার ব্যঙ্গের বাণ ছুঁড়েছেন, ‘বহুদিন ধরিয়া মৌলবি সাহেবের বাবরি চুল হইতে পরের বাড়িতে দেওয়া খাঁটি সরিষার তেল চুষিয়া চুষিয়া টুপিটি এমন সরস হইয়াছিল যে নিংড়াইলে বেশ দুই-চার ফোঁটা তেল বাহির হইত।’

গ্রামের জনৈক মাতবরের মৃত্যু ঘটলে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে মৌলবি সুধারামী সাহেব ও গরিবুল্লাহর স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি মূর্খতার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। সুধারামী সাহেব মাইয়াতের জানাজা পড়ানোর জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। কারণ ‘লাশ যতক্ষণ কবরস্থ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আযাব হতে থাকে।’ কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল সুধারামী সাহেব এই হাদিসের মর্মার্থও ভুলে গেলেন যখন গরিবুল্লাহ’র সাথে জানাযা দেওয়ার বিষয়ে

তর্কযুদ্ধ বাঁধল। জানাযা বিষয়ে সুধারামী সাহেব মাইয়াতের শির বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়ানোর পক্ষপাতি এবং গরিবুল্লাহ সাহেব মাইয়াতের সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়ানোর কথা উল্লেখ করলেন। তারা উভয়েই দাবি করলেন যে, 'শরিয়তের হুকুমটা কারও বাপের ঘরের কথা নয়।' অথচ একই বিষয়ে দুই নিয়ম প্রচলিত থাকতে পারে না এটাও স্বাভাবিক। অবশেষে তাদের মধ্যে কে 'বড় তার্কিক' তা প্রতিপন্ন করার বাহাসে উভয়ে লিপ্ত হল।

> তর্কে প্রথম প্রথম উভয় মৌলবিই পরস্পরকে 'মুনশি সাব' সম্বোধন করিতেছিলেন। কিন্তু বাহাস গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বোধন 'জাহেল' নাদানে নামিল। কে কতটুকু পড়াশোনা করিয়াছেন, কে কবে মাদ্রাসায় মার খাইয়া পালাইয়াছিলেন আর যান নাই, এসব পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। কে কবে কত টাকা লইয়া একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে আরেক জনের সঙ্গে নিকাহ দিয়াছিলেন, গ্রামের অনেক অজ্ঞের সামনে এই প্রকার অনেক নূতন তথ্যও প্রকাশ পাইতে লাগিল।[২৩]

এভাবে তাদের তর্ক 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা' চলতে লাগল। যারা কাজের চাপে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি এবার তারা তর্ক দেখার জন্য ভিড় শুরু করে দিল। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের বার বার তাগাদা সত্ত্বেও 'লাশ রৌদ্রের মধ্যে পড়িয়া রহিল।' বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার্কিকদের ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'বাহাসের' নিয়ম পরিবর্তন শুরু হল। 'বেলা যত উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, তার্কিকদ্বয়ের গালাগালিও ততই ধাপে ধাপে পরস্পর পিতৃপুরুষের উর্ধ্বদিকে উঠিতে লাগিল।' বাকযুদ্ধের গুদাম শেষ হওয়ায় মুখের স্থলে হাতের ব্যবহার শুরু হল। প্রথমে জুতো ছোড়াছুঁড়ি এবং পরে উভয় 'নায়েবে নবী'দ্বয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হল। তারা উভয়ই সমবেত জনতার কাছে এটা তাদের 'জিহাদ' বলে দাবি করল। শুধু তাই নয় সুধারামী সাহেব উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন, 'কোরানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কত মোজাহেদ জান নেসার করেছেন, আর আমরা হাতাহাতি করেই এমন কি অন্যায় করেছি? হাদিস কোরআন যে আমাদের জানের কতটা, তোমরা উম্মিলোক তা বুঝবে না।'[২৪] হায়রে ইসলাম! হায়রে মুসলমান! মুসলমানদের জেহাদ করার কথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু নায়েবে নবীদ্বয় জেহাদ করেছেন নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য। এলাকায় তাদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। 'সমবেত লোকেরা বহু কষ্টে জেহাদরত নায়েবে নবীদ্বয়কে পরস্পরের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্ত করিল।' সবশেষে মাওলানাদের তর্কযুদ্ধ ও হাতাহাতির মীমাংসা হল জনৈক উম্মিলোকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। জানাযায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা মাওলানাদের কিন্তু সিদ্ধান্ত দিলেন গ্রামের এক সাধারণ লোক। দুই মৌলবির মতেই জানাযা নামাজ পড়ানো সম্ভব বলে তিনি বললেন,

> শির আর সিনা খুব তফাৎ নয়: পা একটু ফাঁক করে দাঁড়ালেই এক পা শির বরাবর আর এক পা সিনা বরাবর থাকবে। এতে উভয়ের মতই বজায় থাকবে। আর এমামতি কে করেন সেটা ঠিক হয় এমামের পাওনা দিয়ে। এমামের পাওনা উভয় মৌলবির মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক, তা হলেই উভয়ের এমামতি ঠিক থাকবে। কারও হারজিৎ হবে না।[২৫]

এই ব্যবস্থা শরীয়তের বরখেলাপ হবে কিনা মাতবর সাহেব নায়েবে নবীদ্বয়ের কাছে জানতে চাইলে তারা পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করে প্রায় সমস্বরে বললেন, 'হাদিস শরীফে এ বিষয়ে কোন নিষেধ নাই।' চমৎকার সিদ্ধান্ত যেখানে অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপার রয়েছে সেখানে আর হাসিদ শরীফে কিই বা বাধা থাকতে পারে? মূলত গল্পকার গল্পের এই শেষ বাক্যের মধ্যে দিয়ে অর্ধশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পীর-মাওলানাদের চরিত্রকে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস চালিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার কৌশল তাদের ভালোভাবে রপ্ত করা রয়েছে। তারা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ধর্মকে নিয়ে ব্যবসায় লিপ্ত হয়। আবার প্রতিকূল পরিবেশে তারা বিভেদ ভুলে গিয়ে জোট বাঁধতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। লেখক আবুল মনসুর আহমদ চমৎকার ব্যঙ্গের মাধ্যমে নায়েবে নবীদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'আবুল মনসুর আহমদের দক্ষতা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে। তাঁর উজ্জ্বল পরিচিতিও এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই বিজ্ঞাত। শিল্পগত দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপেই তাঁর সিদ্ধ।'[২৬] ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মূলে যে অর্থপ্রাপ্তিই নিহিত তা স্পষ্ট হতে সময় লাগে নি। পীর মাওলানাদের প্রভাবে নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত বাঙালি মুসলমান কোরাআনের বাণীতে আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে অনেক সময় নিমজ্জিত হয়েছে অন্ধকারে। সাধারণ ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা শাসিত, শোষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে বারবার। 'ছোট-খাট ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মোল্লা-মৌলবীদের ব্যঙ্গ করা ছাড়াও, আবুল মনসুর আহমদ *নায়েবে নবী* গল্পে মোল্লাদের বিবিধ নোংরামির মুখোশ উন্মোচন ক'রে দেখিয়েছেন। মোল্লাদের একাধিক বিয়ে প্রীতি, ভোজন-লালসা, অর্থলোভ, দেশ দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক কিছু এ গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। ব্যঙ্গের ছুরির সাথে কৌতুক উপাদান মিছরির ভূমিকা পালন করেছে। ফলে ব্যঙ্গসমূহ পরিণত হয়েছে মিছরির ছুরিতে।'[২৭]

ঘ.

সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় মতবাদের পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সে অর্থ আত্মসাতের বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক *লিডরে কওম* গল্পটি। মাযহাবি বিরোধভিত্তিক পত্রিকা প্রকাশ করে কীভাবে বারবার স্কুল-মাদ্রাসা পরিবর্তনের মাধ্যমে শতবার চেষ্টা করেও ফেল করা 'ক্ষণজন্মা' ইসমাইল সাহেব 'মাওলানা' উপাধি ধারণ করলেন ও 'আহলে হাদিস গুর্য'-এর মালিক হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলেন তারই ইতিবৃত্ত আলোচ্য গল্পটি। ধর্মকে নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা বিভিন্নভাবে ধর্মকে তাদের অনুকূলে কাজে লাগায়। ধর্মের নামে তারা অধর্ম করে চলে ধর্মেরই আড়ালে। এই বকধার্মিকদের মুখোশ উন্মোচন করে আবুল মনসুর আহমদ তাদের চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মফস্বলের ইসমাইল সাহেব কোলকাতা শহরে গিয়ে প্রথমে কোন এক আহলে হাদিস মসজিদের মোয়াজ্জিন ও পরে এমাম নিযুক্ত হলেন। মসজিদ বা উপাসনালয়ে ইসলাম ধর্মে কুৎসা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসমাইল সাহেব ও তথাকথিত মুসল্লিদের প্রধান কাজই ছিল হানাফিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। 'হানাফি' ভাবাপন্ন ইসমাইল সাহেব রাতারাতি নিজের চরিত্র পরিবর্তন করে রাজনীতিবিদদের মত ভোল পাল্টিয়ে 'পাকা মোহাম্মদি' হয়ে গেলেন এবং অচিরেই তথাকথিত হাজি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। শুধু তাই নয়, হানাফি-মোহাম্মদি বাহাসেও তিনি নাম করলেন। অবশেষে হাজি সাহেবের অর্থানুকূল্যে ধর্মীয় কোন্দল ভিত্তিক পত্রিকা 'আহলে হাদিস গুর্য' প্রতিষ্ঠা করে 'বিনা বেতনেই' সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ধর্মীয় বিদ্বেষে জর্জরিত এক শ্রেণির সুবিধাভোগী লোক অর্থ-উপার্জনে ধর্মকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে। ইসমাইল সাহেবও ছিলেন এমন প্রকৃতির লোক। হানাফিদের নিন্দার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পত্রিকায় 'ইংরাজদের নিন্দাও কিছু কিছু' প্রকাশিত হতে লাগল। 'জাতীয়তাবাদী' চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইসমাইল সাহেব গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর কৌশল হিসেবে পত্রিকায় ইংরেজ নিন্দা প্রকাশ করে পত্রিকার মালিক বনে গেলেন। পত্রিকার মালিক হয়ে ইসমাইল সাহেব সম্পাদকের দায়িত্ব নিজের শ্যালকের উপর ন্যস্ত করলেন এবং পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা হল, 'মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব প্রতিষ্ঠিত'। পত্রিকায় ইসমাইল সাহেবের প্রশংসা করা হল, 'অকৃতিম হিতৈষী বঙ্গবিখ্যাত আলেম, মুসলিম বঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের ফলে 'আহলে-হাদিস গুর্য' আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল।' প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত প্রশংসা তার নিজেরই লেখা। এবার ইসমাইল সাহেবের নতুন চরিত্র প্রকাশিত হল। এতদিন তার পত্রিকায় মাযহাবি বিরোধ সংক্রান্ত মতামত প্রকাশিত হলেও এবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা দেখা গেল। ইংরেজ নিন্দার সাথে সাথে নতুন মাত্রায় যোগ হল খেলাফত আন্দোলন, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত মতবাদ। সম্পাদকীয়তে মওলানা ইসমাইল সাহেবের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে লেখা হল:

> সমস্ত মুসলমানদের জন্যই খোদা যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বীয় জ্ঞানের আলো হইতে অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত করিয়া খোদার আদেশ অমান্য করিতে পারেন না। সমস্ত বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অধঃপতিত অবস্থা দর্শন করিয়া মওলানা সাহেবের উদার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ সাধনের জন্য এহতেকাফে বসিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে মুসলিম-বঙ্গের সার্বজনীন কল্যাণ সাধন করা যায়, কি কর্মপন্থার দ্বারা খোদার প্রেম ইসলামকে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি তজ্জন্য কঠোর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। শ্রীঘ্রই 'গুর্যের মারফত তার ফলাফল সাধারণ্যে ঘোষণা করা হইবে। মুসলিম বঙ্গ প্রস্তুত হও।[২৮]

মওলানা ইসলমাইল সাহেবের ভণ্ডামির আরও একটি রূপ হল কথিত 'এহতেকাফ' করা। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি এই সমস্ত প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন এবং 'ধ্যান এহতেকাফ যা করিয়া সশরীরে গুর্য-এর কার্যালয়ে অবস্থান করিয়াই সব করিতেন।' লেখক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে ইসমাইল সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। ব্যঙ্গ রচনার জন্য 'তিনি রাজশেখর বসু ও প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গেও তুলনীয় হতে পরেন।'[২৯] 'আহলে হাদিস গুর্য' মুহাম্মদীয় মতবাদপুষ্ট পত্রিকা হলেও এখন থেকে এই পত্রিকায় হানাফি ও মোহাম্মদির সম্প্রতি প্রকাশ করায় হাজি সাহেব ব্যাপারটি ভালোভাবে গ্রহণ করলেন না। তখনও ইসমাইল সাহেব হাজি সাহেবের কাছে পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'মামুলি পন্থা' অবলম্বন করবেন না বলে মত প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়, 'উদারতার ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারেই সাফল্যের আশা অধিক' বলেও তিনি মনে করেন। অবশেষে অশেষ ধৈর্যের পরীক্ষার পর 'এহতেকাফ'-এর ফল বের হল। 'গুর্য'- এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় বের হল: 'যিনি সংগোপনে লোক-লোচনের অন্তরালে সমাজের কল্যাণে কঠোর সাধনায় শিবরাত্রির শলিতার মতো নিজেকে তিল তিল করিয়া বিসর্জন দিতেছিলেন, খোদার দরবারে হাজার শোকর, আমাদের সেই পূজনীয় নেতা হযরত মওলানা সাহেব তদীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।' প্রকৃত অর্থে 'সিদ্ধিলাভ'ই বটে! গুর্যের পাঠক বৃদ্ধি ও নতুন ফন্দি করে ধর্মপ্রাণ মুসলিম উম্মাকে প্রতারিত করার কৌশল হিসেবে আর একটি উপায় উদ্ভাবন করা সিদ্ধি লাভই বটে! মওলানা সাহেব এবার অর্থ উপার্জনের নতুন পন্থা হিসেবে 'বঙ্গের মুসলিমদের' পুনর্জীবিত করার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। ইসলাম জাতি আজ বিধর্মীদের বিশেষ করে খ্রিস্টান পাদ্রিদের ধোঁকায় পড়ে 'মুরতাদ' হয়ে যাচ্ছে কাজেই এই অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে জাগানোর

জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাই দেশদরদী ইসমাইল সাহেব এবার মুসলমানদের উন্নতির জন্য 'আঞ্জুমানে তবলিগুল' স্থাপন করলেন। বিভিন্ন জেলায় আঞ্জুমানের শাখা স্থাপন করে ত্রিশ টাকা মাইনের প্রচারক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এ জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার এবং 'তিন কোটি মুসলমান-অধ্যুষিত বাঙলায় ইসলামের খেদমতের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা যে কিছুই নয়' প্রবন্ধের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হল। শুধু তাই নয়, চাঁদা দানকারী সদস্যগণের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ইসমাইল সাহেব নিজেই 'আঞ্জুমানে তবলিগুল'-এর বিরাট দায়িত্ব সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করলেন। চাঁদা আদায় হল 'আশাতীত' সুতরাং সবাই এবার মনে করল ইসলাম প্রচারের কাজ নিশ্চয়ই বেগবান হবে কিন্তু আবার নতুন ছুতোয় ইসমাইল সাহেব এই সমস্ত কাজ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারে 'বেয়াক্কেলপুরে' হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও 'দুর্ভাগ্যপুরের' বন্যার অযুহাতে ইসলাম প্রচার কাজ স্থগিত রইল। বন্যার জন্য নতুন 'রিলিফ ফান্ড' খোল হল। রিলিফ কাজও চলতে থাকল, রিলিফও আসতে লাগল। কিন্তু 'সত্যিকার কর্মীদের জীবনে বিশ্রাম নাই।' ইসমাইল সাহেবেরও বিশ্রাম মিলল না। দুর্ভাগ্যপুরের রিলিফ কাজ শেষ না হতেই দেশে খেলাফত আন্দোলন শুরু হল। এবার তার নতুন রূপ দেখা গেল তিনি খেলাফত আন্দোলনের নেতা তথা 'লিডরে কওম' বা 'দলের পথনির্দেশকারী' রূপে দেখা দিলেন। তথাকথিত জাতির নেতাদের ধর্মকে অবলম্বন করে ভণ্ডামি ও মাজহাবি সৃষ্টির চক্রান্ত যে থেমে থাকে না তা ইসমাইল সাহেবের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক আমাদের কাছে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এছাড়াও তৎকালীন জীবনের নানা ছবি লেখক বাস্তবতার আলোকে আমাদের কাছে মূর্ত করে তুলেছেন কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল 'সমকালীন জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকাই নয় শুধু, এমন কি সামগ্রিক ছবি দেখানোও (দেওয়াও) নয়, তার কাজ সমকালীন জীবনকে আমূল কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে দেখানো, সবকটি স্তর, আঁশ, তার গভীরতম স্বরূপ, জীবনের সমস্ত তন্ত আলাদা করে ফেলা এবং একেবারে চোখের সামনে আনা।'[৩০] এত কিছু করেও মওলানার ভণ্ডামি বন্ধ হয় নি। জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তুলে তিনি সব কার্যক্রম বন্ধ করে রাচি চলে গেলেন। রাচি যাওয়ার আগে বিভিন্ন সময়ে উত্তোলিত অর্থের হিসেব নিয়ে 'কতিপয় দুষ্ট অখেলাফতী' নেতৃবৃন্দের আহূত সভায় মওলানা সাহেব 'রুগ্নশরীরে' সশরীরে হাজির হয়ে সন্দেহকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

> একটা প্রাণ তিনি কত দিকে দিতে পারেন। তবলিগ নয় ত রিলিফ, নয় ত খেলাফত-সবই ত তাঁহার একার ঘাড়ে। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শিবরাত্রির শলিতার মতো নীরবে লোক লোচনের অন্তরালে তিল তিল করিয়া সমাজ, দেশ ও ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়া শরীরের অবস্থা এই করিয়াছেন। অতগুলি তহবিল তাঁহার হাত দিয়া খরচ হওয়ায় তিনি যদি খরচাদির চুলচেরা হিসাব রাখিতে নাই পারিয়া থাকেন, তজ্জন্য কি তাঁহার দোষ দেওয়া যায়?[৩১]

কি চমৎকার যুক্তি! সত্যিই তো মুসলিম জাতির কল্যাণে যিনি নিবেদিত প্রাণ তার বিরুদ্ধে এত বড় দোষারোপ বড়ই অন্যায়। গল্পের শেষাংশে গল্পকারের শাণিত ব্যঙ্গের প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো, 'সশরীরে হজরত মওলানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকিবেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে মুসলিম বঙ্গ তার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং কোন ভয় নাই! মুসলমান সমাজ অগ্রসর হও! নসরুম মিনাল্লাহে ফৎহুন করিব।' বর্তমান সমাজেও কি এই তথাকথিত সমাজসেবীর দেখা পাওয়া যায় না? হয়তো তাদের ইসমাইল সাহেবের বেশে না পেলেও 'তারা সবাই অন্য নামে আছেন মর্তলোকে।' গল্পের বর্ণনায় কৌতুকের আধিক্য থাকলেও এর অভ্যন্তরে রয়েছে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরস। সমাজের মুখোশধারীদের মুখোশ উন্মোচনে গল্পটি বেশ ভূমিকা রেখেছে বলেই আমাদের মনে হয়।

ঙ.

ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় বৃহৎ কলহের সৃষ্টি হয় এরই প্রেক্ষাপটে *মুজাহেদিন* গল্পটি লিখিত। গল্পটি বাস্তবতার আলোকে রচিত। আলোচ্য গল্পটি লেখার কারণ ব্যাখ্যা করে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আত্মকথায়' বলেছেন,

> তৎকালে হানাফী মোহাম্মদীর বিরোধ, বাহাসের সভা, সভাশেষে মারামারি এবং পরিণামে জেল-জরিমানা ছিল সাধারণ ব্যাপার। আমার *আয়না* পুস্তকের *মোজাহেদীন* গল্পটা নেহাত কাল্পনিক গল্প নয়। ঐ ধরনের বহু সভায় আমি নিজে গিয়াছি। চাচাজী এই ধরনের বাহাসের নামে নাচিয়া উঠিতেন। উদ্যোগ আয়োজন করিতেন। বাহাসের সভায় গিয়া আগের কাতারে বসিতেন। হানাফীদের তর্কে হারাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এ সম্পর্কে বেশ কিছু পুস্তকাদি কিনিয়াছিলেন।... তিনি হানাফীদের উপর এত বিরূপ ছিলেন যে তাদের বুঝাইতে গিয়া রাগের চোটে উর্দু বলিয়া ফেলিতেন। তিনি বলিতেন, 'হানাফীরা হিন্দোঁ সে বদতর হ্যায়।' আমার মোজাহেদীন গল্পে উভয় পক্ষের যে সব তথাকথিত যুক্তির অবতারণা করিয়াছি ও সবই ঐ সময়কার বাহাসে দুই পক্ষের দেওয়া যুক্তি। যুক্তিগুলি খুবই লজিক্যাল এবং আমার এখনও মনে হয় উভয় পক্ষের কথার মধ্যেই আন্তরিকতা ছিল।[৩২]

গল্পের সূচনা হয়েছে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সম্প্রদায়ের মিলনের দেখাদেখি মুসলমান সমাজের 'বেদে' 'হাজাম' প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির সম্প্রদায়ের মিলনের প্রেক্ষাপটে। সমাজে যখন এরূপ পরিবর্তন তখন তরুণ সাদত ও তার সঙ্গীগণ সবাই মিলে তারুণ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে 'ঝড়ের বেগে' এলাকার সাহায্য সহযোগিতায় মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত করল শুধু তাই নয়, সে মাইনর স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার জল্পনা কল্পনাও করতে শুরু করল। সব

কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। পাশের গ্রামের 'খারেজী' মাদ্রাসার মৌলবি সাহেবের পক্ষ থেকে বাধা এল কারণ মাদ্রাসার ব্যয়নির্বাহের জন্য রাখা বাড়ি বাড়ি মুষ্ঠি যখন মাদ্রাসার পরিবর্তে স্কুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। খারেজি মাদ্রাসায় যা আয় হত তা মৌলবি সাহেব ভাগ পেতেন। মৌলবি সাহেবের শিক্ষা কতটা ছিল সে বিষয়ে কারও জানা ছিল না। কারণ,

> তালেব এলেমদের পড়ান অপেক্ষা দাওয়াৎ খাওয়াতেই তার অধিক সময় ব্যয়িত হইত। তবু দাওয়াতের নাগাড় মরিত না। কারণ দাওয়াৎ সংগ্রহ করাই ছিল তালেব এলেমদের প্রধান কাজ। এ কাজে তাদের উৎসাহ ছিল, কারণ মৌলবি সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও থোড়াবহুৎ রুখসতি মিলিত। আর এ কাজে তাদের দক্ষতাও ছিল যথেষ্ট, কারণ তাদের অধিকাংশেরই এমন বয়স হইয়াছিল যা ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রের বাপকেই মানায় ভাল।[৩৩]

পাশের গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় খারেজি মাদ্রাসার ছাত্রের অভাব না হলেও মুষ্ঠি সংগ্রহে বাধা হওয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠা যাতে না হয় সেই কারণে গ্রামে এক জবরদস্ত আলেমকে আনা হল। কথিত আলেম বাড়ি বাড়ি দাওয়াৎ খেতে লাগলেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে আধুনিক শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তাদের 'বেদীন' 'নাসারা' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয় তার মতে 'রোজ কেয়ামত' বেশি দূরে নয়, কাজেই আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেকেরই উচিত। কারণ, ''ইমাম মেহ্দি ও খারে দজ্জালের নাযিল হইবার আর বিলম্ব নাই। আরবি জানা না থাকিলে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যাইবে না। কারণ আরবি ভাষাতেই দজ্জালের কপালে 'কাফের' এবং ইমাম মেহ্দির কপালে 'মোমিন' লেখা থাকিবে।'' চমৎকার যুক্তি! যেখানে আসন্ন মুসলিম জাতির উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি জানা প্রয়োজন সেখানে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আরবি ভাষা শিখে রাখতে হবে। এভাবেই মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয়গোঁড়ামির মধ্যে নিমর্জিত হয়েছে। লেখক যথার্থ ব্যঙ্গের মাধ্যমে ঐসব চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

> আবুল মনসুর আহমদের গল্পের পেছনে তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা বা সমাজ-কল্যাণ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তাই দুঃখকে তিনি পরিহাস দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। আমাদের সমাজের কিংবা জাতীয় জীবনের এক সময়কার যে সব অসঙ্গতি লেখককে পীড়া দিয়েছে -তা-ই তিনি তির্যক বাণীভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। সাধারণত এ ধরনের কাশাঘাত গাম্ভীর্যপূর্ণ হলে বড়ই অপ্রিয় ঠেকে, কিন্তু রসোচ্ছল হলে একসঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য সফল হয়: অসঙ্গতি বা ভণ্ডামির বুকে কশাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসির খোরাক।[৩৪]

নবাগত আলেম সাহেব আরবি শিক্ষার গুরুত্ব, স্কুল শিক্ষার অসারত্ব বয়ান করার পরও অনেকের মত মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে থাকল তখন তিনি যুদ্ধের নতুন অধ্যায় সূচনা করলেন। তিনি কৌশলে মাযহাবি বিরোধকে জাগিয়ে তুললেন যদিও মৌলবি সাহেব প্রথম প্রথম এই ব্যাপারে আপত্তি করলেন। তিনি দেখলেন এটাই একমাত্র সুযোগ; কারণ স্কুলটা যে গ্রামে অবস্থিত ছিল সে গ্রামের অধিকাংশ লোকই ছিল মোহাম্মদি এবং খারেজি মাদ্রাসা যে গ্রামে ছিল তার প্রায় বেশিরভাগ জনগণই হানাফি। মাযহাবের ব্যাপারে প্রথমে অনেকেরই আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত সবাই মাযহাবের নামে নেচে উঠল। এর ফলে উভয় গ্রামের হানাফি ও মোহাম্মদিগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বাহাসের আয়োজন করা হল। বাহাসের জন্য টাকা পয়সা খরচ করে দূর থেকে আলেমগণকে আনা হল 'গ্রাম বড় বড় পাগড়িতে ভরিয়া গেল।' স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য দেওয়া না হলেও বাহাসের জন্য আলেমদের নিয়ে আসা, তাদের থাকা খাওয়া, বাহাসের স্থান সাজানোর জন্য অনেক টাকা খরচ করা হল। অবশেষে বাহাসের দিন এসে গেল। পুলিশের বড় দারোগা, স্কুল ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে বাহাস শুরু হল। বাহাসে প্রথমে তর্কাতর্কি ও পরে হাতাহাতি এবং শেষে হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠিতে ও রক্তারক্তিতে এসে পৌঁছল। মাওলানারা ইতোমধ্যে সভা ত্যাগ করেছিলেন কারণ কোন পক্ষের কথা কোন পক্ষই শুনছিল না। জনগণের মধ্য জেহাদ শুরু হলে ইংরেজ শাসনের দুর্বলতাও প্রকাশ পেল। পুলিশ জনতাকে থামানোর কোন চেষ্টাই করল না বরং 'ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দারোগা সাহেব কোতোয়ালিতে খবর দিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।' অবশেষে বাহাসের সমাপ্তি ঘটল কয়েকজনের মৃত্যু ও বহুজনের আহত হওয়ার মধ্যদিয়ে। বাহাস সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কর্তব্য শুরু হল। অনেককে ধরা হল। অন্যদিকে 'লাল পাগড়ির বৃদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম একদম সাদাপাগড়ি শূন্য হইয়া গেল।' অনেকের জেল জরিমানা হল। আশ্চর্য এই যে, তার পরও উভয় পক্ষই অর্থাৎ হানাফি ও মোহাম্মদি দু'দলই দুইটি পৃথক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাদের দল যে জয়ী হয়েছে তা সগৌরবে ব্যাখ্যা করে বিনা মূল্যে পুস্তিকা বিক্রি করতে লাগল। মূলত এই গল্পে গল্পকার রক্ষণশীল মৌলবি ও তাদের চক্রান্তকে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রসঙ্গত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক আক্কাস মহব্বতনগর গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু রক্ষণশীল শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে তার স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও ব্যর্থ হয়। তেমনি করে শিক্ষিত যুবক সাদতের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও হানাফি-মোহাম্মদি বিরোধের কারণে বাস্তবতার মুখ দেখতে পায় নি। গল্পের শেষে আছে, 'সাদত একা নদীর পারে স্কুল-গৃহের ছায়ায় বসিয়া সেদিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে একবার কারাগামী মুসলমানদের মিছিলের দিকে আর একবার নদীর ওপারে সর্বজনীন পূজারত হিন্দুদের দিকে এবং সর্বশেষে নিজের মাথার উপরকার সদ্য-পরিত্যক্ত স্কুল-গৃহটির

দিকে চোখ ফিরাইল।' গল্পটির প্রথমে হাস্যরস থাকলেও এর সমাপ্তিতে রয়েছে করুণ রসের প্রাধান্য। সমাজের এই সমস্ত ঘটনা লেখককে ব্যথিত করেছিল। তাই 'আবুল মনসুর আহমদ সমাজের সংস্কার চেয়েছেন, সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পে। এই উদ্দেশ্যমূলকতা যে শিল্পকে ছাড়িয়ে যায় নি, এটা তাঁর একটা বড় গুণ।'[৩৫] প্রকৃত অর্থে ইসলাম ধর্ম বিরোধীদের সাথে মুজাহেদীনদের যুদ্ধ করার কথা থাকলেও তথাকথিত মুজাহেদীনগণ যুদ্ধ করেছে নিজেদের মধ্যে।

চ.

আবুল মনসুর আহমদ-এর *বিদ্রোহী সংঘ* গল্পটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গল্পটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গ লক্ষ্য করার মতো। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ও শাসন ভারতবাসীগণ মেনে নিতে পারে নি। তাই তারা ইংরেজদের দুইশত বছর শাসনামলে নানা ভাবে বিদ্রোহ করেছে, গড়ে তুলেছে বিদ্রোহী সংঘ। কিন্তু অনেক সময় এই তথাকথিত বিদ্রোহী সংঘের ভূমিকা যে হাস্যকর সে চিত্রই আলোচ্য গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার ব্যঙ্গের মাধ্যমে। ভারতবাসীদের অনেকের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাবের কারণে সে সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আবার কেউ বা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজদের শাসনামলে ভারতবর্ষে যে সমস্ত আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ: স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। গল্পের শুরুতে গল্পকথকের দেশপ্রেমের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। বরং 'জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ড' (১৯১৯), 'বিশ হাজার ভারতবাসীকে কারানিক্ষেপ' ইত্যাদি সত্ত্বেও গল্পকথক ইংরেজদের গুণকীর্তন করা থেকে বিরত থাকলেন না, কারণ ব্যক্তিস্বার্থ। অর্থাৎ তার ধারণা ছিল ইংরেজদের তোষামোদ করে তিনি একটি চাকরি বাগিয়ে নিতে পারবেন। অবশেষে তাকে 'পুনঃ পুনঃ চাকুরির ভরসা দিয়াও' যেদিন জেমস সাহেব তাকে তার কামরা থেকে বের করার জন্য 'আরদালিকে হুকুম দিয়া বসিলেন' এবং সেসাথে 'বিনা টিকিটে ট্রামে চড়ার অপরাধে যেদিন গোরা চেকার' তাকে সার্জেন্টকে ধরিয়ে দিয়ে তার এক টাকা জরিমানা করাল তখন গল্পকথক ইংরেজদের প্রকৃত চেহারা উপলব্ধি করতে পারলেন। এই উপলব্ধি থেকে তার বোধস্বরূপ অনুভূতি,

> শোন ইংরাজ,
> আজ হতে আমি বিদ্রোহী উন্মাদ!
> আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
> গিয়াছে সব বাঁধ।

ডেপুটিগিরির স্বপ্নে বিভোর ইংরেজভক্ত গল্পকথক চাকুরি লাভে ব্যর্থ হয়ে এবার ইংরেজ তাড়ানোর জন্য স্বরাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। দীর্ঘদিন কারাভোগ করা একজন প্রকৃত বিদ্রোহীর সাথে দেখা করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী সম্পর্কে গল্পকথকের মনোভাব, 'ষড়যন্ত্রে তাঁহারা মজবুত বটে, কিন্তু তা রাজার বিরুদ্ধে নয়; নিজের সহোদরের বিরুদ্ধে; এবং যুদ্ধও তাঁহারা করেন বটে, কিন্তু তা রাজার সঙ্গে নয়, স্ত্রীর সঙ্গে-অধিকন্তু তা বাক্-যুদ্ধ!'[৩৬] চমৎকার ব্যঙ্গ। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে যারা ছিলেন বিশেষ করে মুসলমান ও হিন্দু তারা উভয়েই আলাদা আলাদা ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। অধিকন্তু ইংরেজও এই সুবিধা নিতে থাকে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান যেন একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে না পারে তাই তারা 'ভাগ কর ও শাসন কর' এই নীতিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভারতবাসী এই সত্যের উপলব্ধি করতে পারে নি। তাদের মধ্যে অনেকেই শুধু বৃথা আস্ফালন করেই আন্দোলনকে স্তিমিত করার চেষ্টা করেছে। এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে গল্পকথকের বক্তব্য, 'বাঙালির মেষ স্বভাবের উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলাম। মনে হইল: হাতে ক্ষমতা থাকিলে ইংরাজের আগে এই বাঙালি জাতিটাই নির্মূল করিয়া ফেলিতাম'। অবশেষে ইংরেজদের উপর চটে যাওয়া, 'সিগারেট বর্জন' করা গল্পকথক একদিন তথাকথিত বিদ্রোহী সংঘের সদস্যের (প্রকৃত তিনি ছিলেন সি.আই. ডি. অফিসার) মাধ্যমে বিদ্রোহী সংঘের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঢাকার 'বিদ্রোহী সংঘের' সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। বন্ধু আফতাব হোসেনের মাধ্যমে বিদ্রোহী সংঘের অফিসে গিয়ে তিনি বিদ্রোহী সংঘের সদস্যদের কার্যকলাপ দেখে আর্শ্চর্যান্বিত হয়ে যান। বিদ্রোহী সংঘের সদস্যগণ প্রচলিত নিয়মকানুনের কোন ধার ধারে না। তারা হৈচৈ করলে তাকে 'গান' বলে অভিহিত করে, প্রচলিত সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিনা চিনিতে চা খেতে অভ্যস্ত (যদিও সবাই নিজ নিজ পকেটে করে চিনি নিয়ে আসে চা খাওয়ার জন্য), সবাইকে ব্রাদার বলে সম্বোধন না করে 'ব্রাদার ইন ল' বলে সম্বোধন করে, গোলমাল আরম্ভ করা অর্থে সবাই শান্ত হওয়া ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে এই বিদ্রোহী সংঘ নামেই বিদ্রোহী কিন্তু তাদের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। তাদের বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, তার কারণ ইংরেজরা তাদের 'হাত পা-ই বেঁধে রেখেছে, আত্মা তো বাঁধে নি।' বরং 'বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকিয়ে যারা মানুষের আত্মাকে খর্ব করছে, তাদের সবারই বিরুদ্ধে' তথাকথিক বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ। কথক সুন্দরভাবে এই বিষয়কে ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্রোহী সংঘের সরদারের বক্তব্য,

> ইংরাজ আমাদের হাত-পাই বেঁধে রেখেছে, আত্মা তো বাঁধে নি। আমাদের স্থূল দেহই ইংরাজদের অধীন, আমাদের সূক্ষ্ম দেহের উপর তাদের কোন হাত নেই। যত সব বিধি-নিষেধই আমাদের সূক্ষ্ম দেহকে বন্ধনের অধীন করে রেখেছে। সে জন্য ইংরাজের চেয়ে আমাদের বড় শত্রু এই সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ বিধি-নিষেধ। এ সমস্ত নিগড় না ভাঙলে সভ্যতার পথে আমাদের পথ চলা অব্যাহত হবে না।[৩৭]

এই গল্পে কথিত বিদ্রোহীদের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন গল্পকার। এক শ্রেণির বিদ্রোহী আছে যাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল উচ্ছৃঙ্খলতা। রাজনৈতিক বিদ্রোহের ঝুঁকি থাকার কারণে তারা সামাজিক প্রথার ধুয়া তুলে নিজেদের নাম বাড়ানোর চেষ্টা করেন। লেখক তাদের যথার্থ ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকৃত চরিত্রের উন্মোচন করেছেন। 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ভেতর দিয়ে লেখক বাঙালী-চরিত্রের এই সাধারণ বাস্তব দিক দেখিয়ে পাঠকদের প্রচুর হাসিয়েছেন বটে, কিন্তু অবিমিশ্র হাসিই যে আসল ব্যাপার নয় হাসির পেছনে লেখকের অন্তরে বেদনার দরিয়া যে উচ্ছ্বসিত ধারায় বয়ে চলেছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকদের তা নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।'[৩৮] গল্পের শেষাংশে রয়েছে কীভাবে বিদ্রোহী সংঘের সদস্যগণ ইংরেজদের বিরোধিতা না করে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তার বর্ণনা। বিদ্রোহী সংঘের উদ্দেশ্য যে ইংরেজ বিরোধী নয়, বরং 'রাজভক্তি প্রচারই' তাদের জীবনের ব্রত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য তারা 'প্রাণ দিতে' প্রস্তুত এই সমস্ত তোষামুদে তথ্যও বের হয়ে এসেছে 'সরদারের' বক্তব্যে। অবশেষে ইংরেজরা তাদের বিদ্রোহী সংঘে আক্রমণ চালালে তারা অভিনব কায়দায় সে স্থান থেকে সরে পড়ে। মূলত বিদ্রোহীদের নামে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের ধান্দায় যারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাদেরকেই গল্পকার ব্যঙ্গ করেছেন এই গল্পে।

ছ.

ধর্মরাজ্য গল্পটি *আয়না* গল্প গ্রন্থের শেষগল্প। হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গল্পটির মূল বিষয়। 'ধর্মরাজ্যে'র অধিবাসীগণ ধর্মের ভিত্তিতে পরিচিত। প্রকৃত অর্থে ধর্ম মানুষকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু মানুষ এই ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গল্পটি রচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান অনাদিকাল থেকে পরস্পর সম্প্রীতিতে বসবাস করলেও ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজরা তাদের শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কৌশলে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঢেলে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে এদেশে হাজার হাজার মানুষের জীবন অকালে ঝরে পড়ে মৃত্যুর মুখে। শত শত মানুষ গৃহহারা হয়। গল্পে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ইংরেজদের ভেদনীতি ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থা। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯২৬ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৪৬ সালের কলকাতা বিহারের দাঙ্গা।

> ১৯২৬ সালে রাজ-রাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা নিয়ে কলকাতায় তৎকালের বৃহত্তম দাংগা হয়। উভয়পক্ষে এগারশত লোক হতাহত হয়। একদিকে মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে হিন্দুরা উগ্র হয়ে ওঠে; অন্যদিকে মসজিদের সামনে বাজানোর বিরুদ্ধে মুসলমানরা প্রবল আন্দোলন শুরু করে। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন স্যার আবদুল করীম গযনবী প্রমুখ। অন্যদিকে মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দুনেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রমুখ প্রসেশন করতে যান।... হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯৪৬ এর আগস্ট-অক্টোবর-নভেম্বর কলকাতা বিহার সাম্প্রদায়িক দাংগার ব্যাপারে একই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।[৩৯]

আলোচ্য গল্পে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার প্রেক্ষাপট উন্মোচিত। গল্পের শুরু হয়েছে ছোটগাল্পিক স্টাইলে। কোন এক পত্রিকার সম্পাদক লেখককে গল্পলেখার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করায় তিনি গল্পের প্লট ভাবার জন্য কাগজ কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসলেন। কিন্তু কিছুতেই তার গল্পের প্লট মাথায় এল না। কাগজে 'মানুষের মাথা' 'পাখির ঠ্যাং' অনেক কিছু আঁকা সত্ত্বেও গল্পের বিষয়বস্তু মনে এল না। অবশেষে 'বুকের নিচে বালিশ' দিয়ে উপুড় হয়ে লিখতে গিয়ে সহজেই বালিশ বুকের নিচ থেকে মাথার কাছে এল। গল্পকার ঘুমিয়ে গেলেন। পুরো গল্পটাই ঘুমের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। কলকাতার বিরাট কোলাহলে ঘুম ভেঙে গিয়ে লেখক দেখলেন বিরাট ব্যাপার। শহরের সমস্ত মুসলমান 'ইসলাম বিপন্ন' হওয়ায় 'ইট, পাটকেল, ছুরি, লাঠি, গাছের ডাল' ইত্যাদি নিয়ে শহরের পশ্চিমাংশে ছুটে চলছে। 'যদি মুরাদ থাকে, তবে ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়া শহীদ হইবার এই সুযোগ ছাড়িও না' যুদ্ধে গমনরত জনৈক ব্যক্তির এমন উদ্দীপনামূলক বক্তব্যে লেখকও তাদের শামিল হলেন। শহরের হিন্দুগণ মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্যবাজনা করতে করতে এগিয়ে যাবে আর সে জনস্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য মুসলমানেরা প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সেজন্য হাজার হাজার জনতা কাতারে কাতার হয়ে সারবেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। অন্যদিকে 'গুজরাটী, মাদ্রাজী, কাশ্মিরী, মাড়োয়ারী, বিহারী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, শুদ্র' তাদের জাতপাত ভুলে গিয়ে স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে পরধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য মসজিদের সামনের বাদ্যবাজনা করার জন্য বাদ্যবাজনার পরিবর্তে 'ছোরা-লাঠি' নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। কিছুক্ষণ উভয়পক্ষের 'আল্লাহ আকবার' ও 'কালীমায়কী জয়' ঘোষিত হওয়ার পরে দাঙ্গা শুরু হল। অপেক্ষমাণ পুলিশ জনতাকে থামানোর পরিবর্তে 'ফুটপাতে কাতার করিয়া উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। গোরা সার্জেন্টরা ঘোড়ায় চড়িয়া ধর্ম-যুদ্ধরত

ভারতবাসীর স্বর্গগমনের ধারা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।' এখানে লেখক ইংরেজদের দুর্বল শাসনকে ব্যঙ্গ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজরা এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম স্থির করার চিন্তাতেই ব্যস্ত থেকেছে। লেখক ইংরেজদের এই ভেদনীতি ব্যঙ্গের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। লেখকের ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ-গল্পের মধ্য থেকে 'ব্যঙ্গ' শব্দটি বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; 'ব্যঙ্গ' বর্তমান থাকে তো আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোও বর্তমান থাকে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় হাস্য-রস ও সমাজ চেতনা দুটোই মিলে-ব্যঙ্গকে বাদ দিয়ে নয়, ব্যঙ্গের মধ্যেই। এবং প্রায়ই তাঁর 'ব্যঙ্গের বাহন হলো গল্প।[৪০]

যুদ্ধের শেষে পুলিশের কর্তব্যের সময় এল কাজেই উভয় পক্ষের অনেক লোককে আটক করা হল। ধর্মযুদ্ধের ফলে 'হিন্দুপল্লীতে হিন্দুরা মুসলমানের ওপর এবং মুসলমান পল্লীতে মুসলমানরা হিন্দুর ওপর মারপিট ও লুটপাট' শুরু করল। ইংরেজরা এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে এলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই দাবি করল যে এটা তাদের ধর্মযুদ্ধ। মসজিদের সামনে বাদ্যবাজানো যাবে কীনা এ বিষয়ে হিন্দুদের দাবি তারা কখনও মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো বন্ধ করে নি আর মুসলমানেরা দাবি করল কখনো এমনটা হয় নি। কাজেই ইংরেজরা এই বিষয়ে নিরপেক্ষনীতি অনুসরণ করল। তাদের ঘোষণা মোতাবেক হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ থাকলে সেখানে মসজিদের সামনের বাদ্যবাজানো যাবে অন্যদিকে মুসলমান অভ্যুষিত এলাকায় যখন মুসলমানেরা নামাজ পড়বে না তখন হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসবে। ইংরেজদের এই ঘোষণার পরে

> কলিকাতার সেই বিরাট চৌতালা পাঁচতলা বাড়ির একটাও আর বাড়ি নাই, -সবগুলিই মন্দির ও মসজিদ হইয়া গিয়াছে। বাড়ি-ঘর স্কুল-কলেজ মকতব-মাদ্রাসা-অফিস-আদালত দোকান-পাট কিছুরই আর অস্তিত্ব নাই -সব মন্দির আর মসজিদ, মসজিদ আর মন্দির। আর হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-শিক্ষক, কেরানি চাপরাশি দোকানদার খরিদ্দার ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই যাহার তাহার কাজ ছাড়িয়া সেই সব মন্দির ও মসজিদে ননস্টপ পূজা করিতেছে এবং নামাজ পড়িতেছে।[৪১]

যারা এতদিন বিভিন্ন কারণে ধর্মকর্ম করার সুযোগ পায় নি বা ধর্মকর্ম করে নি। সে সমস্ত ধর্মের অবহেলাকারী জনতা এবার 'ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ, গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-ট্যাক্সি সমস্ত বন্ধ' করে নামাজ বা পূজায় রত হয়ে গেল। অবশেষে ধর্মের বাড়াবাড়ি অধর্মের মাধ্যমে তথা দাঙ্গার মাধ্যমে শেষ হল। দাঙ্গায় স্তূপাকারে পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখে লেখকের উপলব্ধি: 'তাহাদের পচা দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু মুখ তাহাদের ধর্মের জ্যোতিতে উজ্জ্বল। ... হিন্দু মৃতদেহগুলির বুকের উপরে এক এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্রে আবিরের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে-'আর্যবীর' এবং মুসলমানদের বুকের উপরে সবুজ সবুজ বস্ত্রখণ্ডে রূপালী হরফে লেখা রহিয়াছে -'শহীদ।' ভারতবর্ষে অবশেষে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু ধর্মরাজ্যের অধিবাসী সবাই লাশ। জীবিত মানুষদের নিয়ে অবশ্য একধর্মের সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নয়। লাটসাহেব লাশের স্তূপের মধ্যে সাইনবোর্ড পুতে দিলেন। সাইনবোর্ডে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'ধর্মরাজ্য'। গল্পের শেষে লাটসাহেবকে ব্যঙ্গ করার বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। 'বাঙালি জাতটা আজ ধর্মের জন্যই প্রাণ দিল। আফসোস! বড়লাট সাহেবের সংগে পরামর্শ করিতে করিতে দেরি হইয়া গেল। আর একদিন আগে আসিতে পারিলে এই মহান জাতির অন্ততঃ দু'একজন লোককে বাঁচাইতে পারিতাম।' 'আবুল মনসুর আহমদ প্রধানত ব্যঙ্গপ্রবণ সাহিত্যিক। তাই জীবনকে নিয়ে কৌতুক করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে কাজ করবে এটিই প্রত্যাশিত।'[৪২] গল্পের শেষাংশে দেখা যায় লেখকের রুমমেট তাকে হাত ধরে ডাকছে, 'সক্কলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে তুমি খাইবে কখন?' তার ডাকে লেখক জেগে উঠলেন।

আবুল মনসুর আহমদ শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকেই শিল্প রচনার চেষ্টা চালিয়েছেন। সমাজের যে সমস্ত বিষয় সমাজকে ক্যান্সারের মত ধ্বংস করছে সে অশুভ শক্তি, অন্ধমানসিকতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, মানুষে মানুষে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়কে তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছেন। সমাজের এই সমস্ত তথাকথিত ভণ্ডামি ও নোংরামি তাকে কষ্ট দিয়েছে। তিনি এই অভিশাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন অন্তর দিয়ে। *আয়না* গ্রন্থের গল্পগুলো হাসির গল্প। পাঠক প্রতিটি গল্প পড়ে আনন্দিত হন। হাসিতে পাঠকের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এই হাসিই শেষ কথা নয়, যেখানে সমাজের অসঙ্গতিগুলো লেখকের অন্তরাত্মাকে করেছে ক্ষতবিক্ষত সে হাসির আড়ালে যে কান্না লুকিয়ে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। *আয়না* গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'বন্ধুরা বলছেন, এই বইয়ে আমি সবাইকে খুব হাসিয়েছি। কিন্তু এই হাসির পেছনে যে কতটা কান্না লুকানো আছে তা তুমি যেমন জান, তেমন আর কেউ জানে না।' মূলত সচেতন পাঠকই কেবল তা অনুভব করতে পারেন। ঘুণে ধরা সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে যে পচন ধরেছে তার ইঙ্গিত প্রতিটি গল্পে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে দলাদলি প্রভৃতি বিষয় লেখকের সাথে সাথে আমাদেরও বেদনাদীর্ণ করে। শেষ করব 'আয়নার ফ্রেম' শেষাংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে যা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত। এই মন্তব্যটিই হয়তো আলোচ্য গ্রন্থটির সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন:

> যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোস পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোস-পরা এই বহুরূপী বন-মানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য-

> সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হয়।...আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যঙ্গ কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মত করুণ। কিন্তু সে হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তারাই। বন্ধুবরের এই রসাঘাত কশাঘাতের মত তীব্র ও ঝাঁঝালো। কাজেই এ-রসাঘাতের উদ্দেশ্য সফল হবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে।

আবুল মনসুর আহমদ সচেতন শিল্পী। সচেতন শিল্পীর অবচেতন মনে একটি অসম্প্রদায়িক, বিভেদহীন সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয় লালিত হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন বাস্তবতায় তার সে স্বপ্ন পূরণ হয় নি। তাই মনের গভীরে গোপন কোণে জমাট বাঁধা ব্যথা গুমরে উঠেছে বারবার। তারই বিহঃপ্রকাশ ঘটেছে আয়নায়।

<u>তথ্যসূচি:</u>

---

১. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫

২. তদেব, পৃ. ৪৯

৩. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮, পৃ. ৭৭১

৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আয়না* (কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত মুখবন্ধ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, নবম সংস্করণ, ১৯৮৮, ভূমিকাংশ, পৃ. ৫

৫. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৬. মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পা), *লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৯

৭. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, মে ১৯৯৮, পৃ. ১৩৫

৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১০. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৩

১১. তদেব, পৃ. ৮

১২. *তদেব*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৩. *তদেব*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৪. তদেব, পৃ. ১৯

১৫. তদেব, পৃ. ২৩

১৬. তদেব, পৃ. ৪৭১

১৭. তদেব, পৃ. ৪৭২

১৮. তদেব, পৃ. ২৯

১৯. তদেব, পৃ. ৩১

২০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান *আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য-চর্চা প্রসঙ্গে* 'দৈনিক দেশ' (১৮ মার্চ, ১৯৮০); পৃ. ৪

২১. ডক্টর রাজীব হুমায়ুন, *আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনা ও সংস্কৃতি চিন্তা, আয়না, বাংলাদেশের কালচার ও অন্যান্য*, মিনি ওয়ার্ল্ড, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭১

২২. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

২৩. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *তদেব*, প্রথম খণ্ড,পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৪. তদেব, পৃ. ৪৩

২৫. তদেব, পৃ. ৪৪

২৬. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

২৭. ডক্টর রাজীব হুমায়ুন, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২

২৮. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, তদেব, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৯. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৩০. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যে কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৭

৩১. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *তদেব*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩২. আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বও ১৯৯৯, পৃ. ১২৭

৩৩. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *তদেব, প্রথম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৩৪. নুরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*, অগ্রণী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪, পৃ. ১০১

৩৫. আনিসুজ্জামান, *আমার চোখে*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১০৫

৩৬. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *তদেব, প্রথম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৩৭. তদেব, পৃ. ৭৩

৩৮. তদেব, পৃ. ৯

৩৯. ডক্টর রাজীব হুমায়ুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৪০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত পৃ. ২০১

৪১. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, তদেব, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৪২. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

সোনালি কাবিন: আত্মসূত্রের লোকজ দলিল

রওশন জাহিদ*

সারসংক্ষেপ: *সোনালি কাবিন* কাব্যে আল মাহমুদ তাঁর দর্শনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি আত্মদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে শৈশব কৈশোরের নানা অনুষঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে। আবহমান বাংলার জীবন ও প্রকৃতি অকৃত্রিমভাবে উঠে এসেছে তাঁর লেখনিতে। কৃষি জীবনের রূপধারা থেকে শ্রমিকের শোণিতের দাম কোনোটিই তাঁর কাব্যে বাদ পড়ে নি। সমাজ-রাজনৈতিক জীবনের গতিশীলতা ও পরিবর্তন, জীবন বোধের আয়নায় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোজন দুরত্ব, নাগরিক জীবনের সংকট ও ঐতিহাসিকতার নিরিখে আত্মপরিচয় প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তিনি রূপক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। এই সফলতা লাভের কারণ লোক উপাদানের স্বরূপ সন্ধান। বিস্মৃতির নেশায় ডুবে যাওয়া নাগরিক কবি নিজেকে তুলে ধরেছেন লোকজ আয়নায় প্রতিবিম্বিত রূপে।

কবি আল মাহমুদের চেতনার গভীরে প্রোথিত যে বীজ তার মূল অনুষঙ্গ ঐতিহ্য চেতনা। মানবিক আবেদনের আকুলতা, ঐতিহ্য প্রীতি, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, ছন্দগত প্রয়াস, পাঠকের অন্তর রাঙানো রূপক-উপমা আর স্বভাব সুলভ কবিত্ব *সোনালি কাবিনের* মূল উপজীব্য। বাংলাদেশের যে গ্রামীণ সমাজকে মূল উপজীব্য করে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে তাতে আবহমান বাংলাদেশের রূপকে যেন হাতের মুঠোয় ধরা যায় অনায়াসে। প্রায় অর্ধশতক আগে রচিত এই কাব্যগ্রন্থে যে সমাজ চিত্রিত তার রূপ খানিকটা বদল হলেও এর মূলগত ধারা বহমান। কারণ দ্রুত বর্ধনশীল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতি শিল্প বিকাশের আওতাভুক্ত না হওয়া। অবশ্য শিক্ষার শতকরা হারের বড় ধরনের পরিবর্তন না হওয়াও অন্যতম কারণ। কবি চিত্রিত গ্রামীণ সমাজে কোন বিশেষ পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি কৃষি প্রযুক্তি প্রগতির এই বিশ্বায়নের যুগেও। তাই শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাতের এই বাংলায় কোচ, মুণ্ডার উপস্থিতি আজ যেমন পাওয়া যায় তেমন পাওয়া যায় তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা, আচার-আচরণের নানা উপলক্ষ্যও। কবিকে সম্পূর্ণ অতীতচারী কিংবা সর্বৈব ঐতিহ্য ঘনিষ্ঠ বলা যায় না বা তিনি গ্রামীণ জীবনের রূপকারও নন। তবে গ্রামীণ জীবনের বোধ সম্পর্কে তিনি যে সচেতন সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নাই। বাংলা কাব্যজগতে যাঁরা ঐতিহ্য সংলগ্নতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আল মাহমুদ অন্যতম। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তাঁর বর্তমান ব্যক্তি অবস্থান যাই হোক *সোনালি কাবিনে* আমরা কবিকে পাই বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার একজন পোড় খাওয়া সৈনিক হিসেবে। বাঙালিত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, হাজার বছরের ঐতিহ্যিক সূত্রবদ্ধতা আর সচেতনভাবে লোকায়ত জীবন চেতনার প্রতি ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস আমরা দেখতে পাই *সোনালি কাবিনে*।

দুই.

আর্থ-সামাজিক বিত্ত বৈভবের কূটচালে কোনোভাবে সম্পৃক্ত না হয়ে সহজ সরল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাতারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি ও নদীর উপর অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল মানুষেরা কবির একান্ত আপনজন। আদিম কৌম সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্য আজও তারা বহন করে চলেছেন। সময়ে অসময়ে যে-কোনো প্রয়োজনে তারা একাট্টা, আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজ নৃগোষ্ঠীর প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল। সমনৃগোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে কবি শ্রমজীবী মানুষের পেশা ও গাত্রবর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। আর শাসন-শোষণে সংগ্রামমুখর বাঙালি জীবনের ধারাকে কবি শাসকগোষ্ঠী নির্মিত দুর্ভেদ্য নগর তোরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
ক্ষেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কীভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।[১]

বাঙালি কবি আল মাহমুদ আত্মপরিচয়ের নিরিখে নৃগোষ্ঠীর পুরাণে অবগাহন করেছেন। বাঙালি পুরাণ 'চাঁদ বণিকের পালা'য় কবি জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গের সাথে মানবীয় প্রেমের ঐশ্বরিক ও বাস্তবিক ধারণার পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিজেকে চিহ্নিত করেছেন 'দেবদ্রোহী ভাটির কুমার' হিসাবে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।[২]

কৃষিজীবী সমাজ ব্যবস্থার আর্থ-সাংস্কৃতিক গঠনকে কবি এতোটা আত্মস্থ করেছেন যে পেশাভিত্তিক আচার নিয়মের প্রতিটি কলা কৌশল তাঁর অনায়াস আয়ত্তে, যেন শোণিতের ধারায় অবিরাম বয়ে চলেছে পূর্বপুরুষের টান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কবি আপনার স্মৃতি, শ্রুতি ও জ্ঞানকে নিবিষ্ট করেছেন কৃষি অর্থনীতির অংকুরোদ্গমে।

কতদূর এগোলো মানুষ!
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতোন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।[৩]

শস্যবীজের চেয়ে বেশি আপন আর কিছু নেই কৃষি-অর্থনীতির ধারক বাহকের কাছে। বীজের অংকুরোদ্গম থেকে শুরু করে শস্যবীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত সব কিছুই কৃষকের কাছে বড় আনন্দের। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের ধারাপথে যারা নিজেদের শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি মনে করেন তাদের কাছে কৃষি নিতান্তই গৌণ। শিল্প বিপ্লবের ধাত্রী জননী কৃষিকে তাদের আর ভাল লাগেনা, ভাল লাগেনা তাদের ধারক বাহক কৃষককেও। পূর্বপুরুষের আদিম কৌম সমাজের প্রতি কবি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে:

ধানের স্বপ্ন দু'চোখে আমার, এই নগণ্য–
দাবি তুলতেই কারা বলে ওঠে বন্য, বন্য।
ধান তোলবার অস্ত্র নিলাম বিপুল শব্দে
হঠাৎ তখুনি মনীষীরা বলে এ-ও জঘন্য।[৪]

বাস্তবে যা অধরা, অসম্ভবের গোলকীভূত তা কবি আপন মুঠোয় পুরে নিতে চান। তিনি কৃষির সাহায্যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নলোকের নরম জমিতে শস্য বীজের সফলতা চান। কবি নদীর রূপালি জলকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রত্যাশার বিষবাষ্প যেমন উর্ধমুখী হয়, চেতনার চূড়ায় যেমন অনবরত আঘাত করে তেমনি শস্য বিপ্লব ছাড়া আর সবকিছুই মানুষকে শুষে নেয়। তাই কবি স্বপ্নের সানুদেশে আদিম কৌম সমাজের কৃষি বিপ্লবের সবুজ হাতকে সফল হতে দেখেছেন:

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।[৫]

তিন.

জীবন ও জগতে উর্বরতার যে নিয়মতান্ত্রিকতা আছে কবি সে সম্পর্কে সচেতন। প্রাকৃতিকভাবে জীবজগতের বংশ পরম্পরা রক্ষার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সামগ্রিক পার্থিবতার ক্ষেত্রে তার বাস্তব সম্মত প্রয়োগ। জগতের যে কোনো সৃষ্টির মূলে মাতৃ সম্পর্ক ও উর্বরতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চল যেখানে বর্ষাকালে পানি জমে সে জায়গা বিল নামে পরিচিত। এই জলাবদ্ধতার প্রকৃতি এমন যে বর্ষা শেষ হলেই পানিও কমতে শুরু করে। চার মাস কিংবা ছয় মাস পানি জমে থাকার কারণে এস্থলে মাছের বেশ বাড়ন্ত ভাব লক্ষ করা যায়। আবার পানি শুকালে পলি মাটির কারণে ফসল উৎপাদনের হারও বেশ ভাল। অর্থাৎ জলাবদ্ধতা এই জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের এই ধরনকে কবি উর্বরতাবাদের দৃষ্টিতে দেখেছেন-

বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।[৬]

স্বাভাবিক নিত্য নৈমিত্তিক যে জীবন সেখানে কবি স্বপ্ন কিংবা চেতন্য সর্বত্রই উর্বরতার ছোঁয়া টের পান। মনুষ্য প্রজাতি উর্বরতার যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহে ধারণ করে তার প্রতীকায়িত রূপ উপস্থাপন করেছেন। কবি নিজের চিন্তার জগতকে স্বপ্নের ঘোর লাগা কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন মনে করেছেন-

বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য যাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।[৭]

যে শারীরিক সম্পর্কের আবর্তে উর্বরতার মূল কথা বারবার ছড়িয়ে পড়ে কিংবা জড়িয়ে যায় তাতে নারী ও পুরুষের একান্ত সংযোগ থাকে। এই সংযোগ প্রথমত মানসিক; তারপর শারীরিক। সংযোগের শুরুতে ঘটনার উপাদানগুলোর পক্ষে এর নিবিড়তা, গভীরতা ও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করার কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু এতে থাকে সীমাহীন আনন্দ, অবিরাম ভাললাগা আর নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অনন্ত বাসনা। ফলে সম্পর্কের সাগরে ভেসে যাওয়ার অনিন্দ্য আবেগ সৃষ্টিতে রূপ নেয়-

শব্দহীন ভুরভুরির গতি
হয়ে যায় আনন্দের ফুল
খায় এক মাছের যুবতী
ঠুকরে খায়, আমার আঙুল।[৮]

অপরূপ সুষমায় নারীকে একান্ত আবেগ দিয়ে উপস্থাপনের যে কৌশল কবি আয়ত্তে এনেছেন– সে সম্পর্কে জানা যায় কবির সাক্ষাতকারে– "নারীর প্রাকৃতিক মহিমা, সৌন্দর্য ও দায়িত্বজ্ঞান আমাকে অভিভূত করেছে। তদুপরি কৃষি ভিত্তিক গ্রামসমাজে নারীর একাধিপত্য আমাকে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল।"[৯] শুধু নারী নয় ঐতিহ্যের মাঝে বসবাসের জন্য কবি *সোনালি কাবিন*কে জমিন হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

মানুষের মনোজগতে বাস করে আরেকটি মানুষ- যাকে দেখা যায় না; কিন্তু সে অনুভব করে এবং দৃশ্যত একজন মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতেও সক্ষম। যে সমাজ একজন মানুষকে বড় করে তোলে; সে পরিবেশ কখনোই তাকে যে কোনো প্রতিকূলতার মধ্যে একাকী ছেড়ে দিতে পারে না। আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে থাকে চারপাশ। যদি ব্যক্তি কখনো নিজেকে নব পরিবেশের উপাদান ভাবতে শুরু করে কিংবা নিজেকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে তবুও তাকে অনবরত সাহায্য করে তার অতীত– যেখানে তার বড় হয়ে ওঠার ঐতিহ্য বিরাজমান। "তাঁর কবিতা যুগ-পরম্পরায় ঐতিহ্যের নিগড়ে বন্দী।"[১০] কবির ভাষায়-

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মতো টিপ টিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে! জমির কিনারা ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে[১১]

কিন্তু সব মানুষই কি পারে নিজেকে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর আসে ঋণাত্মক। কেউ কেউ নিজেকে পরিবর্তনের বেড়াজালে বেঁধে ফেলতে পারে আর কেউ কেউ আবার নিজের জায়গায় ফিরতে বড় লজ্জা পায়। যদি ব্যক্তি নিজেকে পরিবর্তিত একজন ভাবে তবে তার পক্ষে ঐতিহ্যের ঠিকানায় ফিরে আসা কঠিন। আর ঐতিহ্য যদি মজ্জাগত হয় তবে যে কোনো প্রকারে ফিরে আসাটাই তার কাছে বড়-

আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘষে ঘষে/ তুলে ফেলবো।[১২]

মনোজগতের পরিবর্তনহীনতা ঐতিহ্যের ঠিকানায় ফেরত আসার যে পথ নির্দেশ করে তাতে নিতান্তই আবেগের অবস্থান থাকে পারদ চূড়োয়। এই ঠিকানা ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। আল মাহমুদের কবিতার সাহায্যে 'পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের গভীর ঐক্যসূত্র'[১৩] প্রমাণিত। নাগরিক জীবনের কোলাহল, ব্যস্ততা-গ্লানি আর জীবন প্রদীপের অবারিত জ্বলে যাবার যে পথ থাকে তাতে ঐতিহ্যের পেলবতার সাজানো ভাব কতটা মিশে যেতে পারে সে ব্যাপারে কবি সন্দিহান:

পিঠার মতো হলুদ মাখা চাঁদ
যেনো নরম কলাপাতায় মোড়া;

পোড়া মাটির টুকরো পাত্রকে
স্মৃতি কি ফের লাগাতে পারে জোড়া?[১৪]

চার.

পার্থিবতায় সময় ও নদীর স্রোতের মতোই সব কিছু বহমান। এখানে কোনো কিছুই চিরকালের জন্য থাকে না। গ্রামের সব মানুষকে ছায়া দেওয়া বট গাছের বড় বড় পাতা ঝরে পড়ে, ভাঙনের কবলে পড়ে নড়ে বসে পুরনো গ্রাম। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পিতলের ঘড়া যেমন একদিন ফুটো হয়ে যায়, তেমনি হুঁকো হাত বদল হতে হতে তার আগুনও নিভে যায়। অর্থাৎ নশ্বরতার বড় উদাহরণ জীবন ও জগৎ। কবি আশা করেন সব কিছু রয়ে যাবে- যা কিছু ভালো; কিন্তু থাকে না, তাই তিনি নিরাশ– নৈরাশ্যের চাদরে মুড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে:

কিছুই থাকে না দেখো, পত্র পুষ্প গ্রামের বৃদ্ধরা
নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া আর হুকোর আগুন[১৫]

নৈরাশ্যের তরীতে যে ব্যক্তির পথ চলা তার যেমন কোন কিছু হারাবার ভয় থাকেনা তেমনি ব্যস্তানুপাতিকভাবেই ভোগের বাসনাও সুপ্ত থাকে কিংবা বাসনাগুলো সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। ইহলৌকিকতার বেড়াজালে সুখের নীলে যে অবগাহন তাতে নারী ও পুরুষ একান্তই আপনাদের-

যেখানে পাখি নেই রক্ত দ্রুতগামী
তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী
দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ;
তোমার নাভিমূলে দেখেছি একা আমি
নরম গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ।[১৬]

জীবন পরিক্রমায় নৈরাশ্যের যে হাতছানি তাতে ছানি পড়ে না, বরং উজ্জ্বলতর অগ্নিশিখার মতো আলোকিত হয় চারিদিক। কিন্তু যা কিছু অন্ধকার হয়ে আসে, নিবিড়তর হয় বেদনার গালিচা, ক্লেদাক্ত জীবন যেখানে বড় আপন হওয়ার চেষ্টা করে সেখানে নৈরাশ্যের ঘুড়ি সুতো কেটে চলে যায় অন্তহীন সীমানায়। সীমানা বিস্তৃত হয় শতক থেকে শতকে।

সকাল, সংবাদপত্র, রাজনীতি, ক্ষুব্ধ খোঁচাখুঁচি
যা কিনা রক্তাক্ত শার্টের মতো পরে আছে আমাদের ভয়ার্ত শতক–[১৭]

কালের সীমায় কালির আঁচড় যতই পড়ুক কবি কিন্তু সে কালি তুলে ফেলতে কোনো লজ্জা পাবেন না বলে জানিয়েছেন। এমনকি যাত্রা পথের প্রতিটি ঘটনা ঠিক কতটা তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছে সে ব্যাপারেও তিনি সচেতন। তাইতো আবেগের বশবর্তী হয়ে নগরায়ণের যে শকট কবিকে করেছিল আবেগের গতি ঘোড়ায় সমাসীন তার চেয়ে সেই পরিবেশ বেশি ভালো যা কবিকে পূর্বপুরুষের ঘ্রাণ নিতে সাহায্য করে-

তোমাকে বসতে হবে এখানেই,
এই ঠাণ্ডা ধানের বাতাসে।
আদরে এগিয়ে দেওয়া হুঁকোটাতে সুখটান মেরে
তাদের জানাতে হবে কুহলি পাখির পিছু পিছু
কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরোজ![১৮]

মৌলিক চাহিদার নিত্য অভাব যেখানে জীবনের অন্য নাম সেখানে শখের বশে কোকিলের পিঠে সওয়ার হয়ে ময়ূরের পেখম দেখা নিতান্তই স্বপ্নচারীতার উদাহরণ। স্থানিকতার সঙ্গে কালের চাহিদা মিলিয়ে নিলে তাতে জীবন ও জৈবিকতার উপাদানগুলো ছাড়া আর কিছুই থাকে না। জীবন রক্ষার উপাদানগুলো লাল হয়ে ভেসে আসে অনেক খরার পরে কালবৈশাখীর ঝড় সাথে নিয়ে আসা শিলা বৃষ্টির মতো। অন্ন গ্রহণের প্রতীকায়নে কবির ভাষায়-

সামনে দেখি ভরা ভাতের থালা
ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।[১৯]

যে ঝড় আদর্শের বাষ্পীভবন সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার প্রবাহ মণ্ডলে অন্যথা করার সুযোগ কমই থাকে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যে আদর্শের কারুকাজ খচিত হয় তা পরিবার ও সমাজে সংক্রমিত হয়। এমনি করে আদর্শের ঘূর্ণিজালে পুড়ে যায় বিপরীত আদর্শের ডালপালা। ফলে কখন যে সবে অঙ্কুরিত বীজ মহীরুহ হয়ে ওঠে তা কবি বুঝতে পারেন নি:

আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে ঘিরে
ঝিঁঝিঁর শব্দের মতো ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।[২০]

আদর্শের নেশা ধরা কারুকাজে যখন ভৌগোলিক পরিবেশ আলোড়িত হতে থাকে, ভেঙে পড়তে থাকে সম্মোহিত ব্যক্তিত্বের কলাকৌশল, যাদুকরী সম্মোহনকারী যখন আড়াল হতে শুরু করে তখন কেউ পুরনো অবস্থানে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেনা-

যখন নড়ছে ঘর, ইমারত বসে যাচ্ছে
দেয়ালের ফাট
বিশাল হা-এর মতো খুলে গিয়ে
মিশে যায় দৃষ্টির আড়ালে,
তোমরা কিভাবে, বন্ধুগণ
খাড়া আছো?[২১]

শান্তি বিনষ্টের যে প্রক্রিয়ায় মানুষের আত্মাহুতি বিরামহীন, মানবতা যেখানে নিবিষ্ট চিত্তে পদদলিত হয় সেখানে আদর্শের বুলি যেন বা উড়ে যাওয়া কর্পূর। কবি সমসাময়িক রাজনৈতিক ধারাকে অর্থাৎ মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী ঘরানার দোসর ইহুদি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের তাঁর নিজের আদর্শের শত্রু বলে মনে করেন। পুঁজিবাদের কাবুলিওয়ালা আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ, শান্তি ও ইহুদিবাদের কথা কবি স্পষ্ট করে বলেছেন-

কি ঘটবে এশিয়ায়–এ নিয়ে তর্ক করে আপনার যাওয়ার পর
পৃথিবীর সবকটি সাদা কবুতর
ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে মার্কিন জাহাজে।[২২]

মার্কিনিরা যখন ভিয়েতনামে নিজেদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ করছিল তখন আদর্শের যে বোমা কবি তার বুকে ধারণ করেছিলেন তা দিয়েই প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস করেছিলেন। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধহীনতায় মানুষের যে করুণতা সৃষ্টি হয়েছিল কবি তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে চান আদর্শকে বল করে:

কোনো কর্তব্য আমার জন্য নয়। বরং হৃদয়ের ভেতর
যে ব্রহ্মাণ্ডকে বসিয়ে রেখেছি তার গোলক
দ্রুত আবর্তিত হোক।
ভিয়েতনামে বোমা পড়ছে। আমি তার প্রতিবাদ করি।[২৩]

কবি অখণ্ড চেতনায় প্রতিবাদ করতে চান। প্রতিরোধের ভাষা যেন বা পরাজিত হলে তার গ্লানি নিয়ে আর ফেরত না আসার; প্রতিরোধে বিজয়ী কবি বাহবা পেতে চান। তা নাহলে তিনি আরফিরে না আসার ব্যাপারে কোনভাবে সন্দিহান নন। তার ফিরে আসা কিংবা মানুষে মানুষে সংগঠিত হওয়া আদর্শের পতাকা মিছিলের নামান্তর:

প্রতিটি নামের শেষে, আসবো না।
পাখি, আমি আসবো না।
নদী, আমি আসবো না।
নারী, আমি আসবো না, বোন।

আর আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা
তুলে নিই হাতে।
আর আসবো না বলে
সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভিতরে মানুষ।[২৪]

আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহারের উপর কবি স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তা যখন বস্তুবাদী আদর্শ বিরোধীদের দখলে চলে যায় তখন কবির অভিমান হয়। তাঁর ভাষায়–

নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
সে আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
গোপন দালাল যেন। পাটের চালান ভরা নাও
ভাসাও উদ্দাম গতি, হাসির গমকে নেড়ে পাল
পাটাতনে ভেঙে পড়ো বিশ্বাসঘাতক নীল জল।[২৫]

অবিশ্বাসের তিক্ততায় তিনি আদর্শের পক্ষের এক সময়ের সৈনিককে তীব্র বাক্য বক্রতায় আঘাত করেছেন–

আজ আমাদের নও, শোষণে ধর্ষণে কালোরেখা।
যেন চোরের সাহায্যকারী তুমি, কবির সন্দেহ;
বোনের শাড়ির মতো মায়ের দেহের মতো নও![২৬]

পাঁচ.

প্রকৃতির অবারিত আচ্ছাদন মানুষকে নানা বিপত্তি থেকে আড়াল করে রাখে। অপরূপ সৌন্দর্যের দিগন্ত বিস্তারিত সাগরে হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকৃতি প্রেমিক সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু সকলেই তা প্রকাশ করতে পারে না। কবির সেই ক্ষমতা আছে। কবি দেখেন যতটা তার চেয়ে বেশি আঁকেন শব্দাবলির সাহায্যে। ইট কাঠের খাঁচা থেকে বেরিয়ে মানুষ যদি প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস করতে পারে তাহলে দেখা যাবে উচ্ছ্বসিত-আহলাদিত-চমৎকৃত হওয়ার অনেক উপাদান তার খুব কাছাকাছিই আছে। কিন্তু অনেকেই তা বোঝেন না। কবিতার সাহায্যে তাদের বোঝাতে চান এভাবে-

ধানের সবুজ করলো কি যে আড়াল দিয়ে
যাসনে মেয়ে, মন্ত্র দিলো বনের টিয়ে।
নাওয়ের বাদাম ডাকলো তারে; চরের মাটি
আদর করে বিছিয়ে দিলো শীতল পাটি;
ভয় ধরিয়ে ডাকলো হুতোম ছাতিম গাছে
বন্য বাতাস কাঁপলো এসে বুকের কাছে।[২৭]

ধানের সবুজ পাতা কিংবা বন থেকে বের হওয়া গলায় লাল হার পরা টিয়ে পাখি কবির খুব পছন্দ। পাল তোলা নৌকায় করে চরের মাটিতে বসে শীতল পাটির ঠাণ্ডা অনুভূতির কথা বলেছেন কবি। ছাতিম গাছে হুতোম পাখির ডাক মেরুদণ্ডে ভয়ের শিরশিরে হাওয়া লাগিয়ে দেয় বলে কবি অনুভব করেন। তিনি ভুলে যাননি ধানের সবুজে হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কথা। এমনকি উঠতি বয়সী মেয়ের দল কিভাবে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সচেতন। ভরা মৌসুমের ইলিশের ঝাঁকের সঙ্গে পাড়ার উঠতি বয়সী মেয়ের দল কমে আসার তুলনা করেছেন:

উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে ইলিশের মৌসুমের মতো[২৮]

সবুজের প্রতি কবির আগ্রহ বেশি। কবি সবুজকে ভালবাসেন, সবুজেই বাঁচতে চান। আশা আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের মেল বন্ধন করেন সবুজেই। কবি যেদিকেই তাকান সবুজ দেখতে পান, সবুজের আহ্বান তিনি উদ্ভাসিত হন, উড়ে বেড়ান, ভেসে বেড়ান। এমনকি অন্য রঙও সবুজ বলে মনে হয়-

আমার স্ত্রী সবুজ হয়ে যান, ছেলেদের
সবুজ বলে মনে হয়।
যে মেয়েটি নীল ফ্রক পরে বারান্দায় খেলে
সেও যেন সবুজ প্রজাপতি।[২৯]

দিগন্তের বুক চিরে আলোর রেখা উদ্ভাসিত করে তোলে ধরা, কর্ম চঞ্চল হয়ে ওঠে লোকজন। প্রকৃতির আহবানে সাড়া দিয়ে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা আর অন্যান্য পশু পাখিও নতুন স্বপ্নের সৃজন করে চলে। আপন কাজে ব্যস্ত পৃথিবী আপনাতেই ছবি তুলে রাখে কর্মমুখরতার-

তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বাতাসে ধানের গন্ধ,
পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানী।
আমাদের সবার হৃদয় নিসর্গের এক অপরূপ ছবি হয়ে
ভাসতে লাগলো।[৩০]

শত ব্যস্ততার মাঝেও ভাটি অঞ্চলের কবি পুরুষ তাঁর শরীরে বয়ে যাওয়া জলের ধারা সন্ধান করেন। যে শোণিতে তাঁর প্রাণ উত্থিত হয়, যার কণায় কণায় আবহমানের চেতনার ধারা প্রবাহিত হয় তাকে তুলনা করেছেন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে। কবি নদীর জলধারায় আমাদের সভ্যতার বয়ে চলাকে ইঙ্গিত করেছেন:

সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া,
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে।[৩১]

আজ যারা শহুরে জীবন যাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছেন তাদের অনেকেরই শিকড় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোন গ্রামে। ধুলোমাখা পথ, বটের ছায়া, হাটুরেদের আসা-যাওয়া, নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি, অন্যের গাছের ফল চুরি করে খাওয়া–এসব স্মৃতি নস্টালজিক করে তোলে। কিন্তু উপায়হীন মানুষ নিজেকে আর ফেরাতে পারে না। নগরে হয়েছে তার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান, উত্তরাধিকারীর জীবনের সোপান এখানে চলে গেছে বহুদূর। তাই তালিকারূপে কাব্যে স্থান পেয়েছে গ্রামের যা কিছু প্রিয় -

আজকাল আমার মার সাথে আমার কদাপি দেখা হয়।
মাঝে মাঝে আসেন। গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন সরু চাল।
গাওয়া ঘি। খাঁটি সর্ষের তেল আর বিশুদ্ধ অনুতাপময় কান্না।[৩২]

নাগরিক জীবনে ক্লিষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বন্ধন আর আনুগত্যের সুতো ছিঁড়ে চলে যেতে গ্রামে যেখানে এখনও বাবার কবরের মাটি শুকায়নি কিংবা মা পাখা হাতে বসে আছেন খোকার ভাত খাওয়ার সময় একটু বাতাস করবেন বলে। কিন্তু যান্ত্রিক জীবনের রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ জীবন যেতে দেয়না তাকে শুধু এই কথা বলে যে সে কি আর নিজেকে গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে? যতসব পিছুটান শহরের। শহর তাকে দৌড়াতে শিখিয়েছে দাঁড়াতে দেয়নি, পুঁজির ঝুলি দেখিয়েছে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেনি। কিন্তু গ্রাম তার শিরা উপশিরায় বাহিত, আজন্ম ভালবাসায় সিক্ত করে তাকে পরম আপন করেই রাখতে চায়। কবির ভাষায়-

একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেনো ডাকলো তাকে; সস্নেহে বললো, বসে যাও
লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,[৩৩]

কবি নিজেই শুধু গ্রামের লোক নন, তিনি যেন পুরো গ্রামেরই উত্তরাধিকারী। যেমন তাঁর পিতার গানেমুগ্ধ ছিল পুরো গ্রামের মানুষ। যূথবদ্ধ হয়ে জীবন চালনার, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার শিক্ষা গ্রামের মানুষের অন্তরে লালিত-

আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেতো।
পুরনো সে কথা উঠলে এখনও দহলিজে
সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।[৩৪]

এইসব দৃশ্য কবির স্মৃতি জাগানিয়া। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে অনেক বেশি জীবন্ত মনে হয় কবির কাছে। কবি যেন গন্ধ শুঁকতে পারেন, ছুঁয়ে দেখতে পারেন। এমনকি কখনও কখনও মনে হয় পুরো ঘটনাই যেন চোখের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে-

আমার কৈশোর বুঝি বসে আছে চোখের ভিতরে
বিশাল ধনুক হাতে ক্লান্ত এক সবুজ বালক।[৩৫]

কবিতার সংজ্ঞা কিংবা কবিতা জিনিসটা কি এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কবি গ্রামীণ পরিবেশের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি এমন উদাহরণ স্মরণ করেছেন যার পরতে পরতে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়:

কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায়-ঢাকা-পথ, ভোরের আজান কিম্বা নাড়ার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ
মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর
বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর![৩৬]

ছয়.

মধ্যবিত্ত ধর্মভীরু মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া কবি আল মাহমুদ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি অন্য ধর্মকে সম্মান করেছেন তবে নিজ ধর্ম থেকেই মানব সৃষ্টির আদি রহস্য ইতিহাস কাব্যে বিবৃত করেছেন-

বাবেল থেকে মানুষের ধারা
ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।[৩৭]

কবি মানবেতিহাসের ধারাকে ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিজেকে ধর্মীয় পয়গম্বরদের মতো চরিত্রের অধিকারী হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছেন। আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা বোধের দিক থেকে সৃষ্টিকর্তার খুব কাছের ছিলেন তাঁরাই যাঁরা পৃথিবীতে ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। কবির মনোজগতে তাই ত্যাগের বাঞ্ছা-

কেবল লুতের মতো সদোমের সিংহদরোজায়
প্রভু, অনিদ্রায়/ আমি যেন থাকি।[৩৮]

ধর্মভিত্তিক মানবেতিহাসে বিশ্বাসী কবি ধর্মকে ধারণ করেছেন কিন্তু পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও ছিল। তাই তিনি পিতার নিকট আনুগত্যে ছিলেন খাটো। ধর্মীয় ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ নয় বলে ধর্মের বাণী কর্ণগহবরে প্রবেশ করলেও সে সবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেননি। তাই নারিকেলের পাতার ভাষা যেমন ছিল 'না না' তেমনি পিতার চাহনি ছিল অবজ্ঞা সূচক।

দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আব্বা
একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন
ফাবি আইয়ে আলা-ই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান...।[৩৯]

ধর্মভীরু পরিবারে জন্ম হলেও ধর্মের অন্তর্গত বিষয়কে কবি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন। যে বয়সে ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল, ধর্মসংলগ্ন হয়ে বেড়ে ওঠার প্রবল বাসনা ছিল, তা চলে যাবার পর ধর্ম ব্যবহারকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয় কবির কাছে। কবরে শুয়ে থাকা একজন মানুষকে ব্যবহার করে লোভের মাত্রা কতটা লকলকে হতে পারে কবি তার বর্ণনা করেছেন।

বোস্তামীর পুকুরের ঘোলা-ময়লা জলের কাছিম
হওয়ার সাধনা ছিলো, টকটকে লাল
মাংসের মণ্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো
থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।[৪০]

তবে তিনি ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে কখনও কখনও প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। ধর্ম বিশ্বাস তাঁর প্রশ্নের নিকট পরাস্ত হয়েছে। ফলে তিনি ধর্মের প্রচলিত বৃত্ত ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি সামাজিক বিশ্বাসকে অতিক্রম করতে। তাই পাড়ার মসজিদ ভেঙে পড়ার দৃশ্য তার কাছে বিশ্বাস ভাঙারই সমার্থক।

চিড় খায় পলেস্তারা বিশ্বাসের মতোন বিশাল
হুড়মুড় শব্দে অবশেষে
ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ![৪১]

পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে একে অন্যকে হেয় করার যে বাসনা তা মানবতার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। মানুষে মানুষে পাহাড়সম ভেদাভেদ তৈরি করে। একে অন্যের বিশ্বাসকে পায়ে ঠেলে নিজ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

আস্তিক সম্মান যদি পায় কোনো শূন্যের পূজারী
সাকার রূপের ভক্ত কেন তবে ঘৃণার্হ বলো না?[৪২]

সাত.

ব্রিটিশ শাসকেরা বেনিয়ার ছদ্মবেশে পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল। তারা এদেশীয় কুচক্রীদের সহায়তায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রদানের আগে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে। ফলে জাতিগত দাঙ্গার ধকল সইতে হয়েছিল জাতিকে। লণ্ডভণ্ড হয়েছিল কিশোরীর স্বপ্ন, যুবকের কর্মস্পৃহা আর মানুষের বসবাস।

কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।[৪৩]

যে বিষবাষ্পে স্বপ্নের বন্দর পুড়ে লাল হয়েছিল কিন্তু অদম্য শক্তিবলে প্রায় না পাওয়া সে স্বাধীনতা করায়ত্তে এসেছিল অনেক প্রাণের বিনিময়ে। চিতায় অনেক কাঠখড় জ্বালানোর পাশাপাশি জ্বলেছিল মানুষের হৃদয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে জাতি নোঙর করেছিল বন্দরে কিন্তু মূল্য দিতে হয়েছে অনেক:

গালি-গালাজের ঢেউ টলমলায় আমার উঠোনে
আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষোভের কাতারে
সাপের অঙ্গের মতো ভঙ্গি ধরে, টান মারে, মিছিলে রাস্তায়।
সাহস দেখো না মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
বে-তমিজ গাওয়ের পোলারা।[৪৪]

স্বদেশকে ভালবাসার যে প্রেরণা জাতির ছিল তাতে আগুনের শিখা জলে ওঠে, রূপ নেয় স্বাধীনতার। গ্রাম থেকে শহর, কৃষিক্ষেত থেকে কারখানা, শ্রমিক থেকে অফিসার সকলেই স্বাধীনতার আন্দোলনে নিজেকে শামিল করেছিল।

দিলো বাইন্ধা পথঘাট, বাস গাড়ি মোটর দোকান
গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরব্বির গায়।
সাহস দেখো না মিয়া, বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা
মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।[৪৫]

কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ন্যূনতম অনুকম্পা প্রদর্শন করেনি মানবতার কথা ভেবে। পেটোয়া বাহিনীর লাঠির পাশাপাশি সেদিন চলেছিল গুলি। কবি প্রিয়তম স্বদেশের কাতর চিৎকার ধ্বনি শুনেছেন কান পেতে-

বাঁচাও বাঁচাও বলে
এশিয়ার মানচিত্রে কাতর
তোমার চিৎকার শুনে দোলে বৃক্ষ
নিসর্গ, নিয়ম।[৪৬]

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছিশট্টির ছয়দফা, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান আর উনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সব কিছুতেই রক্ত ঝরেছিল। প্রতিটি কার্যক্রমে প্রাণ দিতে হয়েছিল অকুণ্ঠভাবে। সেদিন পিতা পুত্রের লাশ কাঁধে নিয়ে দেশের স্বাধীনতার শপথ করেছিল, নির্যাতিতা মায়ের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল প্রাণ উৎসর্গের বন্যা। স্বাধীনতার মূল্য তাই কবির কাছে নির্বাণ লাভের মতোই:

ধর্মগণ্ডিকায় গ্রীবা রেখে
নির্ভাবন দেখে যাবো
রক্তের ফিন্‌কিতে লাল হয়ে
ধুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্ভয়ে, নির্বাণে।[৪৭]

এত প্রাণ বলিদান হলেও শোকে কাতর হয়নি স্বদেশ, প্রাণ গিয়েছে কিন্তু প্রাণ কমেনি। কোন কমতি হয়নি প্রাণের আন্দোলনের। মনে হয়েছে পুরো দেশ স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। যেখানে প্রতিটি নিশ্বাসে প্রাণ হরণের ভাবনা সেখানে বিশ্বাসের চাঙড় যেন উঁচু হয়ে উঠেছে ক্রমাগত:

আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে
দাঁড়িয়েছে পাশে। নির্ভয়ে, আশ্বাসে
জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভাণ্ডের মতো নড়ে ওঠে বুক।[৪৮]

অনেক বিশ্বাসের মাঝেও কখনও কখনও নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় কবির। পারিবারিক বন্ধনের উপাদানগুলো যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তখন অস্থিরতা গ্রাস করে কবির মনোজাগতিক দেশকে। হতাশ কবির কাব্য হয়ে ওঠে রক্তস্রোত:

যখন সে ফিরে, দেখে, আচ্ছন্ন উঠোন। সে দেখে
শিশুর শব নিস্পৃহ মায়ায়। সে দেখে ধর্ষিতার শাড়ি
ছিন্ন ভিন্ন, হত্যায় ছাপানো। স্তব্ধতার মধ্যে তার ঠোঁট নড়ে।
ইতিবৃত্ত ভেঙ্গে পড়ে রক্তবর্ণ অক্ষরের স্রোতে।[৪৯]

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় পাক জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি ছিল সবার ঘরে। তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমীহ আদায়ও করেছিলেন বেশ ভালোভাবেই। কারণ তিনি মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড তৈরি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারই উত্তরসূরিরা বাঙালি জাতির উপর এমন নির্যাতন চালিয়েছেন যে জাতিগতভাবে বাঙালিরা স্বাধীনতার লড়াই শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল। উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানীরা বাঙালিদের উপর ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল। তাই জিন্নাহর ছবি সম্পর্কে কবি বিরূপ মন্তব্য করেছেন-

আমার ঘরে একজন জাতীয় নেতার ছবি রয়েছে
আমি সেদিকে তাকাতে ভয় পাই।
একবার সেদিকে চোখ পড়লেই ছবিটা
পঁচিশে মার্চের রাত্রি হয়ে যায়।[৫০]

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি নানা কারণে। কিন্তু প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল প্রতিনিয়তই। তাই কবি শুধু 'ভাঙনের শব্দ' শুনতে পেয়েছেন।

যেদিকে তাকাই, শুধু শুনতে পাই। শুনতে পাই।
দূরাগত ভাঙনের শব্দ। যেন বিশাল চাঙড়
ভেঙে পড়ছে কোথাও। আর ছিটকে পড়া জলের কণায়
আমি আর চোখ মেলতে পারি না।[৫১]

আট.

জীবন থেকে পালিয়ে মানুষ নিজেকে আড়াল করতে চায়। এই আড়াল করার প্রেরণা আসে পরাজিত হবার ভয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া, অথবা দর্শনগত পরিবর্তনের কারণে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করা থেকে। কবি একসময় বস্তুগত দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, চেতনার প্রবলতা তাঁকে বৈষম্যহীন সমাজের শব্দ সৈনিক হিসাবে পরিচিত করেছিল। কিন্তু পরিবর্তনশীলতার কারণে কবির চেতনার ভুবন আস্তিক্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। একারণে সমালোচকগণ কবিকে চেতনার আধারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা একজন পলাতক মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু কবি নিজেকে পলাতক বলতে নারাজ। কারণ তিনি এখনো নিজেকে জীবনের স্বাভাবিক নিয়ামকের অভ্যন্তরীণ বলে মনে করেন। কবি জীবন ও দর্শনকে আলাদাভাবে ভেবেছেন। বস্তুগত দর্শনের পরম্পরা থেকে নিজেকে আড়াল করলেও জীবন থেকে আলাদা হয়ে যান নি বলে কবিতায় বলেছেন-

পলাতক বলে লোকে, বুকে বড় বাজে। আমি তো এখনো

জীবনের জলাধারে হতে চাই তুমুল রোহিত।
কোথায় পালাবো আমি, যেখানে রাতেও
নারীর নিঃশ্বাস এসে চোখে মুখে লাগে। বুকে লেগে থাকে ক্লান্ত
শিশুর শরীর, বলো,/ পালাবো কোথায়?[৫২]

তাঁর কবিতায় নিজের জীবনবোধ বিশ্লেষণ করেছেন। মানবিকতার তেজদীপ্ত যে তরুণ একসময় সামাজিক বৈষম্যের কবর রচনায় নিজেকে অগ্রণী ভাবত, সে আত্মজৈবনিক বিবেচনায় নিজেকে এগিয়ে নিতে চায়-

সোনালি শঙ্খের লোভে জলদাসদের সেই একরত্তি মেয়ে
অকস্মাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ে আটকে গেলে
আমি কি নির্ভয়ে
বঙ্গোপসাগরের জলে নামিনি একাকী?[৫৩]

প্রখর যুক্তিবোধ কবিকে মানবিকতার গুণহেতু ছাড়পত্র দিলেও দর্শন বিচারের সমালোচকগণ তাঁকে মুক্তি দেননি। দর্শন পরিবর্তনের কারণে কবির মৃত্যু হয়েছিল সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের মানুষের নিকট। এমনটা হবে বলে কবির ধারণা ছিল।

সেই হাত জাপটে ধরতে ক্রোধ হলো। কিন্তু মৃত্যুর শক্তি
সম্বন্ধে আমি জানতাম, আমার ধারণা ছিল।[৫৪]

কিন্তু কবি বস্তুবাদী সমাজ দর্শন থেকে নিজেকে আড়াল করে ভুল করেছেন বলে বিশ্বাস করেন না। দর্শন বিচারে নিজের মৃত্যুকে খুব বেশি পাত্তা না দিয়ে নিজেকে নতুন কাজে নিবিষ্ট করেছেন-

আমি মৃত্যুর দিকে তাকালাম। দেখি কুকুরের লেজের
মতো সে জানালার দিকে গুটিয়ে যাচ্ছে। নখ কাটা হয়নি,
স্ফীত শিরা, রোমশ।[৫৫]

কবি এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান যে তিনি হারিয়ে যাননি। যা কিছু দেখা যায় আর যা কিছু উপলব্ধির জগতকে আলোড়িত করে তার কোন কিছুই হারিয়ে যাবার নয়। ভাল-মন্দ কিংবা জীবনের পক্ষে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা রয়ে যায় অনন্ত সময়ের স্রোতে-

চোখ বড়ো সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে–
নিসর্গ নিবন্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।
ধরে রাখে মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল
সমস্ত সম্বন্ধসূত্র ভেদ করে আনে তীব্র চাক্ষুষ প্রমাণ।[৫৬]

ধরায় নিজেকে অনেক কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে হলে শুধু সময়কে ধরে রাখলেই চলে না। সময়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে হয়। মিলিয়ে নেয়া বা মানিয়ে নেয়ার এই প্রবণতাই লেখকের লেখায় প্রকাশিত। অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতার অধিকারী মানুষ কিভাবে নিজেকে কালের ধুলার আড়ালে রাখে কবি তা বলেছেন এভাবে–

আমারি ছেলেকে দেখি টেরি কাটে ঘুরিয়ে দর্পণ।
কে জানে আমি কিনা, কিম্বা ঠিক আমিই রয়েছি।
ফিরিয়ে দিচ্ছি চুল সোজাসুজি তালুর ওপর।
সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতের বোতাম
ব্রাশ চালিয়েছি জোরে–বুঝিবা স্তিমিত গ্লাসকীড
চল্লিশ বছর থেকে ঝেড়ে ফেলবে বাপের বয়স।[৫৭]

শুধু অভিযোজনের মাধ্যমে নিজের স্থায়ী রূপে কবি সন্তুষ্ট নন। কবি মনে করেন মানুষের পুনর্জন্মও হয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে একবারই জন্মলাভ ঘটে। ত্রিপিটক মতে মানুষ পশুর উদরে জন্ম লাভ করে, কবিরও বিশ্বাস তাই-

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমি কি কেবলই
স্মরণে রেখেছি স্পষ্ট কোন্ গাঁয়ে জন্মেছি কখন?

অথচ মানুষ/ নিজের পাপের ভারে

শুনেছি জন্মায় নাকি পশুর উদরে–

বলে ত্রিপিটক।[৫৮]

আস্তিক কবি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। দেশ মাতৃকার প্রতি অনুরক্ত কবি মাতৃভাষার দেশে নিজেকে পুনর্বার দেখতে চান। তিনি পরিচিত ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখতে চান:

কী প্রপঞ্চে ফিরে আসি, কী পাতকে

বারম্বার আসি/ ভাষায়, মায়ের পেটে

পরিচিত, পরাজিত দেশে?[৫৯]

পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কবি মানব জীবন একবার পাওয়াতেই বিশ্বাস করেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ পাপ কাজ করে বলে তাকে পশুর উদরে জন্ম লাভ করতে হয়। তাতেও কবির কোন আপত্তি নেই। তিনি সমস্ত পাপ ও স্খলন স্বীকার করে নিয়েও পৃথিবীতে থাকতে চান একজন শব্দসৈনিক হিসাবে।

বাক্যের বিকার থেকে তুলে নিয়ে ভাষার সৌরভ

যদি দোষী হয়ে থাকি, সেই অপরাধে

আমার উৎপন্ন হউক পুনর্বার তীর্যক যোনিতে।[৬০]

নয়.

নাগরিক জীবনের কবি হয়ে আল মাহমুদ নিজেকে পরিবর্তিত সত্তার বাইরে তুলে ধরেছেন। নগর সভ্যতার জটাজালে যেখানে মানুষ ক্রমাগত নিজেকে কোটরাবদ্ধ করে রাখছে সেখানে তিনি নিজের জীবনকে মুক্ত করছেন শৈশব কৈশোরে দেখা গ্রামীণ পটভূমির আয়নায়। ধান ক্ষেত, খড়ের গাদা, নদী, চর, নদী ভাঙন কবলিত জীবন, নারীর প্রেম কবির শব্দে যেন নব জন্মলাভ করে। কবির সাক্ষাৎকারে পাই– "আমার সৌভাগ্য যে জীবনের একটা অনুসন্ধিৎসু সময়ে আমি গ্রামাঞ্চলে কাটিয়েছিলাম; যা আমাকে বাংলাদেশের আবহমানকালের লোকসংস্কৃতির লোকস্বভাব প্রকৃতি যথা নদনদী, নৌকা এবং পশুপাখি ইত্যাদি প্রাণীর সাথে সহ অবস্থান ও সহমর্মিতা শিখিয়েছে।"[৬১] আল মাহমুদ সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক গোলাম মুরশিদ বলেছেন যে, "তাঁর কবিতায় কোথাও কোথাও এমন আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার কোন বিকল্প ভাবা যায় না।"[৬২] দর্শনগত পরিবর্তন স্বীকার করেও কবি নিজেকে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। আলোড়িত জীবনের তুমুল বেগ সম্বরণ করে নিজেকে অবিরত কাব্যের কক্ষপথে সংযুক্ত রেখেছেন–যেখানে জীবন আর কবিতা হাত ধরাধরি করে চলেছে অনেকটা পথ। কাব্যের এই স্বআরোপিত কক্ষে নিজেকে বিচ্যুত হতে দেননি একটুও, কাব্য ভঙ্গিমায় নিজেকে অবিরত পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন আর প্রতিষ্ঠিত করেছেন অবলীলায়।

তথ্যসূচি:

---

[১]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২৪
[২]. *তদেব*, পৃ. ৫৬
[৩]. *তদেব*, পৃ. ৭
[৪]. *তদেব*, পৃ. ১৭
[৫]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২২
[৬]. *তদেব*, পৃ. ৭
[৭]. *তদেব*, পৃ. ৭
[৮]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ১৪
[৯]. "আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার", *স্বল্পদৈর্ঘ্য : আল মাহমুদ সংখ্যা-* ২, পৃ. ১০৩
[১০]. বিমল গুহ, *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ২
[১১]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৭
[১২]. *তদেব*, পৃ. ১৬
[১৩]. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "আল মাহমুদের কবিতা", *স্বল্পদৈর্ঘ্য: আল মাহমুদ সংখ্যা* ১ (বগুড়া, ২০০১), পৃ. ৪৪
[১৪]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২৬
[১৫]. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৮
[১৬]. *তদেব*, পৃ. ৩৩
[১৭]. *তদেব*, পৃ. ৩০

১৮. *তদেব*, পৃ. ৪৮
১৯. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২৬
২০. *তদেব*, পৃ. ২৪
২১. *তদেব*, পৃ. ২৫
২২. *তদেব*, পৃ. ৩০
২৩. *তদেব*, পৃ. ৩৮
২৪. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৪০
২৫. *তদেব*, পৃ. ৪১
২৬. *তদেব*, পৃ. ৪১
২৭. *তদেব*, পৃ. ২৪
২৮. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৮
২৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬
৩০. *তদেব*, পৃ. ২১
৩১. *তদেব*, পৃ. ২১
৩২. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৪৪
৩৩. *তদেব*, পৃ. ৪৮
৩৪. *তদেব*, পৃ. ৪৮
৩৫. *তদেব*, পৃ. ২০
৩৬. *তদেব*, পৃ. ১০
৩৭. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২৯
৩৮. *তদেব*, পৃ. ২৫
৩৯. *তদেব*, পৃ. ১৬
৪০. *তদেব*, পৃ. ২৩
৪১. *তদেব*, পৃ. ৮
৪২. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ৫২
৪৩. *তদেব*, পৃ. ১০
৪৪. *তদেব*, পৃ. ৫১
৪৫. *তদেব*, পৃ. ৫১
৪৬. *তদেব*, পৃ. ৪৬
৪৭. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২৭
৪৮. *তদেব*, পৃ. ২৩
৪৯. *তদেব*, পৃ. ৩৭
৫০. *তদেব*, পৃ. ৩৮-৩৯
৫১. *তদেব*, পৃ. ২৮
৫২. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ১৮
৫৩. *তদেব*, পৃ. ১৮
৫৪. *তদেব*, পৃ. ১৯
৫৫. *তদেব*, পৃ. ১৯
৫৬. আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৬), পৃ. ২০
৫৭. *তদেব*, পৃ. ২০
৫৮. *তদেব*, পৃ. ২৭
৫৯. *তদেব*, পৃ. ২৭
৬০. *তদেব*, পৃ. ২৭
৬১. “আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার”, *স্বল্পদৈর্ঘ্য : আল মাহমুদ সংখ্যা-* ২ পৃ. ১০৩
৬২. গোলাম মুরশিদ, বাংলা ভাষা কোন পথে?, মাসিক উত্তরাধিকার, শামসুজ্জামান খান, চৈত্র ১৪১৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে জীবনচিত্র ও সমাজবাস্তবতা

মো: রবিউল ইসলাম[*]

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১) এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভার নাম। সমাজসংক্রান্তির নানা জটিল আবর্তে অতিবাহিত হয়েছে তারাশঙ্করের শৈশব জীবন। রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত্বমণ্ডিত প্রকৃতি, বৈচিত্র্যদীপ্ত সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তারাশঙ্করের মানস বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শৈশবের এই পরিবেশ ও সমাজ তাঁকে রাঢ় অঞ্চলের নানামাত্রিক জীবনচিত্রায়ণে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্যের সাথে জীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা আমাদের মনকে আন্দোলিত করে। জীবনের যে অনুভূতি মানবহৃদয়কে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তা-ই একজন শিল্পী তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধহীনতা ও বিপন্ন অস্তিত্বের সংকটাকীর্ণ মুহূর্তে আবির্ভূত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনা ও সমাজবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন সময় ও সমকালের দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে বিক্ষত হয়ে। আবহমান গ্রামবাংলার জীবন ও সমাজকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন মানবাত্মার শাশ্বত জয়গাথা– যা জীবনসত্যের অপার রহস্য উন্মোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সঙ্গত কারণেই বর্তমান প্রবন্ধে উপরিউক্ত প্রসঙ্গটি আলোচনার যৌক্তিক বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে জীবনের বিশালতা ও গভীরতা উভয়ই ফুটিয়ে তুলেছেন অনন্য দক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর মত এত দক্ষতার সাথে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে আর কেউ মনে হয় জীবনের বিচিত্র বিশালতাকে এমন সফলভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। মানবজীবনের বিশাল রূপ কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সহজ এ সংবাদ তিনি পেলেন কল্লোলের দলে সাহিত্য রচনা করতে এসে। এখানে এসেই ধরা পড়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভা আর সাহিত্য রচনার স্বাতন্ত্র্য। তাঁর গল্প ও উপন্যাস শুধু বাংলাদেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করে নি, বাংলার বাইরেও তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত গবেষক ও সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন:

> সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতা তাঁর কাছে গভীর বেদনার বার্তা বহন করে এনেছে, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্বে পর্বে তিনি সেই বেদনার সমাধান প্রত্যাশা করেছেন। আর একান্ত আধুনিক মনন বলেই গণদেবতার অভিনন্দন রচনার ক্লান্তিহীন সাধনা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা হৃদয়ের ভাবাকুলতায় আস্থা তাঁর বেশি বই কম নয়। বিশ্লেষণের মনোভূমিতে স্বেচ্ছাবিচরণ অপেক্ষাও গোটা প্রাণবন্ত মানুষের সহচর্যই তাঁর অধিক কাম্য। অবক্ষয়িত বর্তমান তাঁকে জীবনবিরোধী না করে জীবনসন্ধানী করে তুলেছে।[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের মানসে জীবিত থাকবেন দীর্ঘকাল। তাঁর রচনায় সমসাময়িক দেশকালের মানবজীবনের স্বরূপ যেভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে একথা প্রমাণিত সত্য যে, তারাশঙ্করের মধ্যে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারিত্ব রয়ে গেছে। ছোট-বড়, ইতর ভদ্র, ভূস্বামী অভিজাত ও ভূমিহীন রায়ত-কৃষক সকলের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি যে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষরীতির সাহায্য নিয়েছেন তা অভিনব ও স্বকীয়তায় ভাস্বর। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন করেছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিবেশে কয়েকটি নরনারীর ব্যক্তিগত সমস্যা। তারাশঙ্কর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের একজন স্বভাবী পাঠক ও গুণগ্রাহী। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক:

> তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, কিছুটা তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতাও বটে, কিছুটা পূর্বসূরী নির্দিষ্ট প্রথার প্রতি আন্তরিক আনুগত্যও বলা যায়, লেখককে কিন্তু অন্য সতীর্থদের থেকে স্বতন্ত্র আসন দেয়।[২]

তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন গল্পে গান, ছড়া, পদ্য প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনবোধে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে পদাবলী, বাউলগান, শ্যামাসঙ্গীত, ঝুমুর, ভাঁজো, সাঁওতালী প্রভৃতি গানের প্রতি লেখকের অন্যরকম আকর্ষণ ছিল। গল্পের মূল রস আবেদন ঠিক রেখে তিনি তাঁর গল্পে এসব গান জুড়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে লেখক বাংলা গানের ভাণ্ডার থেকে কিছু গান যেমন নিয়েছেন, তেমনি নিজেও কিছু গান রচনা করেছেন। ফলে তারাশঙ্করের গল্পগুলি উৎকর্ষতায় অনন্য হয়ে উঠেছে। এসব গানগুলোতে সমকালীন সমাজজীবনের চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণের আগে নিম্নোক্তভাবে তারাশঙ্করের গল্পগুলোর একটি শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে:

ক. বিচিত্র পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষ

[*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

ভালচার ক্লাব, উপন্যাসের উপদ্রব, কলা কসরৎ, স্রোতের কুটা, উল্কা, রসকলি, স্থলপদ্ম, হারানো সুর, চোখের ভুল, শ্মশানের পথে, রাইকমল, মরুর মায়া, প্রসাদমালা, বড়-বৌ, মালাচন্দন, আলো-আঁধারি, সর্বনাশী এলোকেশী, সন্ধ্যামণি, ডাইনীর বাঁশি, মেলা, বাউল, শ্মশান বৈরাগ্য, খড়গ, আখড়াইয়ের দিঘি, মধু মাষ্টার, ব্যাধি, ট্যারা, ছলনাময়ী, পুরোহিত, জলসাঘর, নারী ও নাগিনী, মুহূর্ত, ঘাসের ফুল, টহলদার, বিষধর, কুলীনের মেয়ে, মহামারী, পুত্রেষ্টি, তারিণী মাঝি, পদ্মবউ, মতিলাল, রঙিন চশমা, আধলা ও পয়সা, প্রতিধ্বনি, চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস, প্রতীক্ষা, ডাক-হরকরা, রায়বাড়ি, তাসের ঘর, মাছের কাঁটা, তপোভঙ্গ, পণ্ডিত মশাই, অগ্রদানী, নুটু মোক্তারের সওয়াল, ভ্রমণ কাহিনী, প্রতিমা, রাজপুত্র, হোলি, কালাপাহাড়, মুসাফিরখানা, চৌকিদার, রাজসাপ, মা, রাধারাণী, সাবিত্রী চুড়ি, সুখনীড়, পিতা-পুত্র, বেদেনী, রাঙাদিদি, বন্দিনী কমলা, দিল্লীকা লাড্ডু, চোর, কবি, রাণুর বিবাহ, যাদুকরী, একরাত্রি, প্রত্যাবর্তন, সনাতন, শ্যামাদাসের মৃত্যু, জায়া, ময়দানব, মরা মাটি, অহেতুক, বোবা কান্না, দেবতার ব্যাধি, ইমারত, কান্না, নারী, আরোগ্য, কামধেনু, মাটি, বেদের মেয়ে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, বরমলাগের মাঠ, হেডমাষ্টার, জন্মান্তর, কালো মেয়ে, বিস্ফোরণ, আলোকাভিসার, কমল মাঝির গল্প, বিষপাথর, রবিবারের আসর, মানুষের মন, সাপুড়ের গল্প, কয়েক ফোঁটা রক্ত, শেষ অভিনয়, জগন্নাথের রথ, একটি প্রেমের গল্প, দীপার প্রেম, এক পশলা বৃষ্টি, প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি।

খ. জমিদার সংশ্লিষ্ট কাহিনীঃ

রসকলি, বড়-বৌ, সর্বনাশের এলোকেশী, খড়গ, পুরোহিত, ব্যাধি, জলসাঘর, মধু মাষ্টার, মুখুজ্জে মহাশয়, পুত্রেষ্টি, রঙিন চশমা, সমুদ্র মন্থন, চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস, রায়বাড়ি, মণ্ডিত মশাই, নুটু মোক্তারের সওয়াল, অগ্রদানী, রাজপুত্র, বন্দিনী কমলা, হরি পণ্ডিতের কাহিনী, সনাতন জায়া, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার, বরমলাগের মাঠ, জন্মান্তর, গোপালবাঁধের ইতিকথা, সখী ঠাকরুন প্রভৃতি।

গ. চোর-ডাকাত সম্পর্কিত গল্প

ব্যাধি, টহলদার, চৌকিদার, স্রোতের কুটো, মরুর মায়া, আখড়াইয়ের দিঘি, ডাক-হরকরা, চৌকিদার, চোরের মা, চোর, যাদুকরী, ইস্কাপন, সুরতহাল রিপোর্ট, বোবা কান্না, স্বাধীনতা প্রভৃতি।

ঘ. বৈরাগ্য জীবনাশ্রয়ী গল্পঃ

রসকলি, হারানো সুর, রাইকমল, প্রসাদমালা, মালাচন্দন, বাউল, চোখের ভুল, টহলদার, রাধারাণী, তৃষ্ণা, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

ঙ. তন্ত্র সাধনাভিত্তিক গল্প

ছলনাময়ী, পুত্রেষ্টি, প্রতিধ্বনি, রায়বাড়ি, ডাইনী, এক রাত্রি, প্রহ্লাদের কালী, শঙ্করীতলার জঙ্গলে, সখী ঠাকরুণ প্রভৃতি।

চ. বিশেষ প্রবণতাকেন্দ্রিক গল্পঃ বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য

চোখের ভুল, স্থলপদ্ম, সন্ধ্যামণি, ডাইনীর বাঁশি, মেলা, বাউল, পুত্রেষ্টি, মতিলাল, সন্তান, রাজপুত্র, চোরের মা, ডাইনী, কুশ-পুত্তলী, এক রাত্রি, অহেতুক, আখেরী, জুয়াড়ী প্রভৃতি।

ছ. দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক গল্প

স্রোতের কুটা, রসকলি, কুশ-পুত্তলী, প্রসাদমালা, মালাচন্দন, ছলনাময়ী, কুলীনের মেয়ে, তারিণী মাঝি, পদ্মবউ, মতিলাল, সমুদ্রমন্থন, প্রতীক্ষা, অগ্রদানী, ইতিহাস, প্রতিমা, কাঁটা, রাজপুত্র, হোলি, শ্যামাদাসের মৃত্যু, জায়া, দেবতার ব্যাধি, মানুষের মন, দেহের প্রদীপে রূপের শিখা প্রভৃতি।

তারাশঙ্করের গল্পে স্থান পেয়েছে সকল শ্রেণির গ্রামীণ মানুষ। বিচিত্র গার্হস্থ্য জীবনের পাশাপাশি সব ধরনের বৃত্তি পেশার মানুষ তাঁর গল্পের উপজীব্য। তারাশঙ্করের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নব্যযুগের মানুষ ও শ্রমজীবী শ্রেণির উপস্থিতি তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে। কিন্তু গ্রামীণ শ্রমজীবী বেকার মানুষ ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য রয়েছে তাঁর গল্পে। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ফসল দখল, তেভাগা, অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড় আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, মহাযুদ্ধের বর্ণনা প্রভৃতি তারাশঙ্করের গল্পের মৌল আকর্ষণ। উল্লিখিত পটভূমি ও পরিবেশের কথা তারাশঙ্করের গল্পে বহুবার এসেছে। ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজজীবন তাঁর গল্পে স্পষ্ট হতে থাকে। জমিদারী

ব্যবস্থার বিচিত্র বিন্যাসে জীবনচিত্র ও সমাজবাস্তবতাকে তারাশঙ্কর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। জমিদারী ব্যবস্থার স্বরূপের রকমফের, প্রজাসম্পর্ক, জমিদারীর অবক্ষয় ও পতন তাঁর লেখায় ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। তারাশঙ্করের গল্পে একদিকে বাউল-বোষ্টমদের গোষ্ঠীজীবন যেমন রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে তন্ত্রসাধনা ও শক্তিপূজার নানাদিকও ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব বাউল তান্ত্রিক পরিমণ্ডলের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় রাঢ়বঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতিতে। সমাজের অন্ত্যজ গোষ্ঠী– যেমন বেদে, পটো, যাযাবর, হাঘরে, নানাজাতের সাপুড়ে ও বাজিকরদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাঁর কিছু কিছু গল্পে। সব গল্পই এ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়, কেবল প্রধান প্রধান গল্পগুলোই এখানে আলোচিত হবে যেখানে সমাজবাস্তবতা ও জীবনচিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জলসাঘর তারাশঙ্করের একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যের এ শ্রেষ্ঠ গল্পটি রচিত হয় ১৯৩৪ সালে। এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে পতনোন্মুখ এক জমিদারের কাহিনী। তারাশঙ্কর সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক অভিধার অভিযোগটি বহুল প্রচারিত। তিনি সমাজতাত্ত্বিক কি না এর সত্যাসত্য বিশ্লেষণে না গিয়ে বলা যায় ঐশ্বর্য, মহিমা, প্রভূত আভিজাত্য -এসবের মিশ্রণে একটি ভিন্নতর আস্বাদন সৃষ্টিতে তারাশঙ্করের নিরলস প্রয়াস শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। তারাশঙ্কর মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের শর্তবন্দি না হয়ে তাকে স্বীয় জীবনরসে সিক্ত করে তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তারাশঙ্করের সাহিত্য ও শিল্পরীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Tarasankar could have made the most beautiful books, if he had chosen to work hard and long on one instead of hurrying through too many. As it is his old Bengle, like Priestley's old England, is new only in the sense of unfamiliar; it is morally conventional and psychologically poor; his Birbhum exists only in time and place, and not, like Hardy's wessex, in eternity...In perfect contrast to Probodh Kumar, Tarasankar has a lot to write about, but does seem to know how to write....he observes, but cannot judge; he visualizes well, but has no vision.[৩]

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রায়দের বিরাট একটি বাড়ি। এই বাড়িতে নিয়মিত আনন্দ আসর জমে উঠত। কিন্তু সময়ের পথ পরিক্রমায় আজ সেই রায় বাড়ির জৌলুস নেই। নবাবী আমল থেকে দু'শ বছরের জমিদারী রায়দের। সেই জমিদারীর পূর্বের জাকজমকতা ফিকে হয়ে গেছে। জলসাঘর আর আগের মত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না। বিশাল কিছু বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ার মধ্যেও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে। লেখক রায়বাড়ির সেই ভগ্ন হৃদয় ও ম্রিয়মাণ ঐশ্বর্যের ভিতর থেকে জীবনচিত্র খুঁড়ে বের করেছেন। এ জীবনচিত্রের কেন্দ্রে আছে সমাজের রূঢ় বাস্তবতা। যখন সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষের মন, পারিবারিক অবস্থা, চিন্তা চেতনাও যখন বদলে যাচ্ছে ক্যাপিটালিজমের নির্মম প্রভাবে, তখন রায়বাড়িতেও সেই ভাঙনের ঢেউ আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জলসাঘরের চোখ ধাধানো আলো বিশ্বম্ভরের চোখের সামনেই নিভে যাচ্ছে একটু একটু করে। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে জীবনের রঙ। জীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে বিশ্বম্ভর চরিত্রের মাধ্যমে। প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক সফীকুন্নবী সামাদী বলেন:

> *জলসাঘর* গল্পে জমিদার বিশ্বম্ভর অতীতের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে, সেখানে সে শ্রেণির প্রতিনিধি। তারই মধ্যে তার ব্যক্তিসত্তা নিজের জন্য একটি আড়াল তৈরি করেছে, সেখানে বস্তু থেকে ছাঁকা রস নিয়ে তার তৃপ্তি। ঘোড়া তুফানের হ্রেষা, হাতি ছোটগিন্নির চলনের ছন্দ, পাকা মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, বেলোয়ারি লণ্ঠনের টুং টাং– এই সবের মধ্যে তার আভিজাত্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকত।[৪]

একদিন আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল ছিল রায়বাড়ি। রায়বাড়ির দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রকম্পিত হয়েছে চারপাশ। রায়দের পত্তনিদার মহলে বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হতে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত খাজনা দিত, এমন পত্তনিদারদের আগমনে রায় মহল গমগম করত। বিশ্বম্ভর রায়কে পিঠে করে দুর্দান্ত তুফান প্রতিদিন ভোরে বের হত। *জলসাঘর* এ যে জীবনের চিত্র রয়েছে তা যাপিত জীবনের চিত্র। মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা ফুলের সুগন্ধে এক সময় যে অঙ্গন বিমোহিত ছিল, এখন সেখানে শাখাপ্রশাখাহীন কাণ্ডের প্রাণহীন, সৌন্দর্যহীন উপস্থিতিতে বিশ্বম্ভর রায়ের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। এখানে সেই যাপিত জীবনের জ্বলজ্বলে ছবিই যেন ভেসে উঠেছে:

> খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতলায় নামিলেন। চক-মিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথার খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলো চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এ পাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলোর ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানাঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাশঘর। জাজিম, শতরঞ্জি, গালিচা থাকে ঘরটায়।[৫]

বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতিদিনের অভ্যাস মত ভোর তিনটায় ছাদে পায়চারির সংবাদ দিয়ে *জলসাঘর* গল্পের শুরু। পায়চারিরত বিশ্বম্ভর রায় অন্যমনস্ক আত্মমগ্ন। ভোরের প্রাকৃতিক পরিবেশে চোখে পড়ে আকাশের কোণে উজ্জ্বল শুকতারা। রায়বাড়ি থেকে দূরে গাঙ্গুলীবাবুদের অকম্পিত বিজলীবাতি সগৌরবে গাঙ্গুলাবাবুদের বাড়ির দীনতার পরিচয় স্পষ্ট করে। একসময়ে তাদের ছাদের পেটা ঘড়িতে তিনটার সঙ্কেত বাজে। চারপাশে বসন্তের বিপুল সমারোহ তারপরেও জাঁকজমকপূর্ণ প্রকৃতিকে রায়বাড়ির জরাজীর্ণতা গ্রাস করে ফেলে। এক সময় রায়বাড়ির *জলসাঘর* প্রাণ প্রাচুর্যে মুখরিত ছিল। জমিদারদের বিলাসী জীবনে পরিপূর্ণ ছিল 'জলসাঘর'। বিশ্বম্ভর রায়ের কথাবার্তা, চালচলনে যে আভিজাত্য ফুটে উঠত আর্থিক টানাপোড়েনে তা ম্লান হতে থাকে। কিন্তু জমিদারী জীবনের প্রতি বিশ্বম্ভর বাবুর মোহ কাটে না। *জলসাঘরে* ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র পরিলক্ষিত হয়:

> *জলসায়* একা বসে সুরাপান আর এস্রাজ বাদনে বিশ্বম্ভর এখন এক মোহবদ্ধ রোমান্টিক আবেগের অন্য মানুষ, এক যুবক জমিদার যেন! জলসার মদ, উজ্জ্বল ঝলমল আলো আর বাইজীর কামনামদির রূপ-সৌন্দর্য ও নৃত্যের মধ্যে এস্রাজ বাজাতে বাজাতে প্রৌঢ় বিশ্বম্ভরের যেন নতুন বসন্ত জাগে, নতুন মোহ সঞ্চারিত হয়। তারই মধ্যে দেখে নবাগতা বাইজী কৃষ্ণবাইয়ের মধ্যে তার যৌবনকালের প্রেমমদিরার প্রিয়তমা চন্দ্রবাইকে। নবাগতা পিয়ারীর নাচের মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার ছবিও ভাসতে থাকে।[৬]

আভিজাত্য সংক্রামক এক ব্যাধির মত। এ শক্ত ব্যাধির নিরাময় অতি কঠিন। যে আভিজাত্য শৈশব থেকে বিশ্বম্ভর রায় লালন করে এসেছেন, রক্তের গভীরে যার ধারা প্রবহমান তাকে নির্মূল করা দুঃসাধ্য। মহিম গাঙ্গুলীর বাবা জনার্দন রায় বাড়ির কর্তাকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করত, কালের পথ পরিক্রমায় সেই গাঙ্গুলী আজ এলাকার সম্পদশালী মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মহিম গাঙ্গুলী তার অর্থগৌরব ও আভিজাত্যের প্রমাণ দিতে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী এনে নাচগানের আয়োজন করে এবং সেই নাচগানের অনুষ্ঠানে বিশ্বম্ভর রায়কে খুব দেমাকি স্বরে নিমন্ত্রণ করে আসে। মহিম গাঙ্গুলীর এই নিমন্ত্রণ বিশ্বম্ভর বাবুকে মানসিকভাবে খুব কষ্ট দেয়। কারণ, এক কালের দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী প্রভু বিশ্বম্ভর রায় তার ভৃত্যের গৃহে যাবে দীনহীন ভিখারির বেশে, এ শোচনীয় সামাজিক পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। যিনি এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন কেবল তার পক্ষেই এই কষ্টের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা সম্ভব। অর্থ মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করে দেয়। অর্থের মানদণ্ডেই একজন মানুষের সম্মান-গৌরব নির্ণীত হয়। জীবন ধারণে মহিম আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপোষক। প্রখ্যাত কথাকার ও প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র দত্ত *জলসাঘর* গল্পে মহিম গাঙ্গুলীর বাড়ির নাচের অনুষ্ঠানের বর্ণনার মাধ্যমে সমাজজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে:

> মহিমের বাড়ির আসর আলোর *ঐশ্বর্যে* আধুনিক জীবনকে তুলে ধরে। আসরে বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীর গানে ক্লান্তি এলে মহিম ভদ্রতায় প্রশংসা করে গান শেষ হওয়ার আগেই। পরের চপলগতি কণ্ঠসঙ্গীত আর চটুল নৃত্যে আসর জমে উঠলে মহিম তাদের আরও তিনদিন উৎসবের আসর মাতিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। জমিদারী *জলসাঘরের* পাশে মহিমের আসর যে একান্তই কৃত্রিম, একান্তই যান্ত্রিক, হৃদয়সর্বস্বহীন, তারাশঙ্কর মহিম চরিত্রের অন্তর-স্বভাবে তারই প্রতীকী চিত্র এঁকেছেন।[৭]

লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে জমিদারী জীবন যাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন *জলসাঘর* গল্পে। বিশ্বম্ভর রায় অবলোকন করছেন চোখের সামনে রায়বাড়ির আলো একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছেন অথচ কারো কাছে এই দীনতা প্রকাশ করতে পারছেন না বংশগৌরব খোয়া যাবার ভয়ে। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক স্বাদের গল্প *জলসাঘর*।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তারিণী মাঝি* গল্পটি তারিণীর জীবনচেতনা, সংগ্রামশীল জীবন ও বেঁচে থাকার অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রোজ্জ্বল। উচ্ছল, প্রাণবন্ত, তন্বী, শ্যামবর্ণা সুন্দরী স্ত্রী সুখীর জন্য তারিণী মাঝির আনন্দের সীমা নেই। অভাবের সংসার হলেও মাঝি দম্পতির কোনো কষ্ট ছিল না। তারিণীর প্রতি স্ত্রী সুখী গভীরভাবে আকৃষ্ট, স্বামীর প্রতি ছিল তার অবিচল ভক্তি আর ভালোবাসা। সুখীর অবিচল বিশ্বাসে সে ভালোবাসা হয়েছে গভীর ও সুখময়। সন্তানহীনা হয়েও তারিণীর ঘরে সুখীর দিন কেটেছে পরম আনন্দে। ময়ূরাক্ষীই বাঁচিয়ে রেখেছে তারিণীকে, ময়ূরাক্ষীর স্রোতোধারা থেকেই সে পেয়েছে বেঁচে থাকার শক্তি ও সুধা। তাই ময়ূরাক্ষীকেই তারিণী মাঝি জীবনদাত্রী জননী বলে জেনেছে। এই গল্পে যে জীবনচিত্র পাই তার কেন্দ্রে আছে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি এখানে নিয়তির ভূমিকা পালন করেছে। *তারিণী মাঝি* গল্পের জীবনচিত্র তুলে ধরতে গবেষকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক:

> তারাশঙ্করের গল্পে প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে মানুষের নিয়তি রূপে। নিয়তিরূপী এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই, প্রবৃত্তির কাছে সে অসহায় ও শক্তিহীন। মানবজীবনে এই নিয়তিলীলা কখনো পরিদৃশ্যমান, কখনো অপরিজ্ঞেয়, কখনো কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত, কখনো বা জীবনরহস্যের কৃষ্ণ-জটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন জীবন-রহস্যের সন্ধান করেছেন তাঁর ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। এই প্রবণতা সূত্রেই স্মরণীয় 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্প। এ গল্পে শিল্পিত হয়েছে শাশ্বত ও চিরকালীন জীবধর্মের জয়। চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে আপন জীবন ছাড়া অন্য কিছুই প্রিয়তর নয়– কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা, দাম্পত্যসম্পর্ক-কিছুই নয়।[৮]

তারিণী মাঝি গল্পে ময়ূরাক্ষী নামের যে নদীটির বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তার সাথে মানববৈশিষ্ট্যের সুন্দর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তারিণী এই ময়ূরাক্ষীর বুকে নৌকা চালিয়ে জীবন ধারণ করে। ময়ূরাক্ষীর শীতল জলে পরিতৃপ্ত হয় স্থানীয় মানুষ। ময়ূরাক্ষী মানুষকে সুখী করে, নদীতীরের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তার জল দিয়ে মায়ের মত পরম মমতায়। ময়ূরাক্ষী এখানে নদী নয়, পরিপূর্ণ একজন মানুষ- যার মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসা যেমন আছে, তেমনই আছে অপার হিংস্রতা। নিচের এই বর্ণনায় আমরা মানবরূপী ময়ূরাক্ষীকেই খুঁজে পাই:

> বারো মাসের মধ্যে সাত আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনো কখনো আসে ‘হড়পা’ বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়।[৯]

পিঙ্গল জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মাঝে মাঝে ডুবছিল। তারিণী ঠিকই বুঝতে পারে এটা একটা মানুষ। তারিণী ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতার কেটে স্থানীয় গৃহবধূটিকে টেনে তোলে জল থেকে। কিন্তু বাস্তবতা খুবই কঠিন ও নিষ্ঠুর। যে সুখী নিজের জীবন বিপদাপন্ন করে সেদিন ঘরের উঠানে এক কোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বামী তারিণী ফিরে আসার প্রত্যাশায় প্রহর গুনেছে, ময়ূরাক্ষীর অতল ঘূর্ণিজল যখন সুখীকে টেনে নিয়েছে, তখনও সুখী নাগপাশের মত তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে। জীবনসত্যের অমোঘ আবেদন সেদিন তারিণী উপেক্ষা করতে পারে নি:

> যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।[১০]

তারিণী মাঝি গল্পে লেখক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেম ও আত্মরক্ষার পরম নিষ্ঠুর জীবনসত্যের রহস্য উন্মোচন করেছেন। আত্মরক্ষার প্রবল প্রবৃত্তির কাছে পরম প্রেমের পরাভবই এ গল্পের মূল উপজীব্য। জীবনের শক্তি সৃষ্টিশক্তির কাছে কখনো কখনো হার মানে। তারিণীর মধ্যে জীবনের সৃষ্টিশক্তির যে প্রাণস্বভাব তা প্রেমশক্তিকেও অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে। আদিম জীবনযাপনে কোনো পাপ ছিল না। সব বহিঃপ্রকাশই প্রকৃতির মৌল শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করার মধ্যে তারিণীর কোনো স্বার্থপরতা নেই, আছে সচেতন ও অচেতন তারিণীর আদিম জৈববৃত্তির বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। এই গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে মানবভাগ্যের সংলগ্ন করে দেখতে উৎসাহী ছিলেন।

এই গল্পে তারিণীর জীবন সংগ্রামের মধ্যে ডারউইনের ‘Survival of the fittest’ তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে সত্য, কিন্তু এই তত্ত্বের চেয়েও যেটি বড় হয়ে ফুটে উঠেছে তা হলো-তারিণীর নিরলস জীবন সংগ্রাম। অন্যকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার, জীবনের শ্বাস নিজের মত করে গ্রহণ করার বাসনাতেই মানুষের স্বার্থ, মানুষের অস্তিত্ব। প্রকৃতির চরম সংকটময় মুহূর্তে মানুষ কেবল নিজের প্রাণের কথাই চিন্তা করে। প্রকৃতির নির্মম ও সংকটাপন্ন বাস্তবতায় দুর্বল প্রতিপক্ষকে সরে যেতে হবেই, এটাই প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। সুখীর প্রতি তারিণীর যে প্রেম তাও প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত চিরন্তন নিয়মের অনুসারী। এ প্রেমের উৎস পার্থিব সংসারের অপরিহার্য সূত্রে, জীবনস্বভাবের প্রয়োজনে। *তারিণী মাঝি* গল্পের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে প্রখ্যাত কথাকার ও প্রাবন্ধিক বীরেন দত্তের বর্ণনায়:

> প্রকৃতির নির্মমতা আর আদিম জীবন-স্বভাব-নিহিত জৈবশক্তির প্রকাশ একই। তাই ময়ূরাক্ষীকে প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কের এক জীবন্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তারাশঙ্কর কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণীকে আদিম প্রকৃতির অংকশায়ী করে এঁকেছেন। তারিণীর পেশা ও নেশার জীবন যে প্রাকৃতিক স্বভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তার কাছে সুখী কিছুই নয়। ময়ূরাক্ষীর পরিবেশ-কল্পনা ও সচল সপ্রাণ স্বভাব তারিণীকে কৃত্রিম জীবনাকর্ষণকে ত্যাগ করার শিক্ষা দেয়। এককথায়, তারাশঙ্কর বিশ্বাস করেন, আদিম জীবন প্রাণ সভ্য মানুষকেও জৈববৃত্তিতে পশুত্বের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে।[১১]

তারাশঙ্করকে যে বাস্তববাদী গল্পকার বলে অভিহিত করা হয় তার মূল কারণ তিনি সমকালীন গ্রামীণ শ্রমজীবী বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র অঙ্কনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন গ্রামীণ পরিবেশ ও মানুষজন খুবই বিশ্বাস্য। তারিণীর দৈনন্দিন কাজকর্ম, দুঃসাহস, সমস্যা, দারিদ্র্য প্রভৃতি একেবারে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে *তারিণী মাঝি* গল্পে। অসামান্য দক্ষতায় লেখক পরিপ্রেক্ষিতকে ব্যবহার করে গল্পের পরিণতিকে আভাসিত করে তুলেছেন। এই গল্পে ময়ূরাক্ষী নদীকে সাঙ্কেতিকতায় ব্যবহার করে গল্পের পরিণতিকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। ময়ূরাক্ষী এখানে শুধু নদী নয়- একদিকে জীবনপালনকারিণী, মাতৃরূপিণী নারী; অন্যদিকে ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী রাক্ষসী। মানব প্রবৃত্তির অতলান্ত রহস্যময়তার বাঙ্ময় প্রতিধ্বনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তারিণী মাঝি* গল্প।

কল্পনা, ঐতিহ্য ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ তারাশঙ্করের গদ্য সাহিত্যকে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় প্রাণবন্ত করে রাখে। *রসকলি* গল্পটিতে প্রাণবন্ত জীবন ও আস্বাদনযোগ্য শিল্পের অপূর্ব স্পন্দন প্রবহমান। এটি তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি গল্প। ত্রিকোণ প্রেমের এই গল্পে আছে এক নায়ক পুলিন দাস, আর দুই নায়িকা গোপিনী ও মঞ্জরী।

তারাশঙ্কর নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। জমিদারী সমাজ বাস্তবতার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন কমলিনী বৈরাগীকে। *রসকলি* গল্পের মঞ্জরী চরিত্রটি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত। গল্পের মধ্যে লেখক বৈষ্ণবীয় সমাজবৈশিষ্ট্য, নর নারীর বিবাহ ধর্ম ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় পরিবেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। *রসকলি* গল্পের মঞ্জরী সব ছেড়ে রসোচ্ছল যৌবনেই বৃহত্তর এক প্রেমের শান্তিতে বাউল মনে অনির্দিষ্টের পথে যায়। পুলিনকে নিজের কাছে পেয়েও, লোভ ও স্পর্শ সুখের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে কোনো প্রকার যৌনতার মধ্যে যায় নি। *রসকলি* তারাশঙ্করের প্রথম পথিকৃৎ রচনা হিসেবে এই গল্পে তাঁর জীবন দর্শনের উৎসমুখ চিহ্নিত হয়েছে। এই গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের অসাধারণ বর্ণনা কৌশলে। *রসকলি* গল্পের সমাজ ও জীবনদর্শন তুলে ধরতে গিয়ে প্রখ্যাত কথাকার ও প্রাবন্ধিক বীরেন দত্ত বলেন:

> তারাশঙ্করের মূল লেখক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে প্রধানত দুটি সূত্রে– ক. তাঁর রচনায় ব্যবহৃত গ্রামীণ মৃত্তিকাগন্ধী বিশেষ পরিবেশ– পটভূমি অবলম্বন করে; খ. তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাদের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রেমহীনতা, জীবনার্তি ও মৃত্যুচেতনা– এসব মিলিয়ে মিশিয়ে এক রহস্যময় দেখার দৃষ্টিতে। পটভূমি-ধৃত চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাঁর গভীরতম জীবনদর্শন উচ্চকিত। রসকলি লেখকের বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে আবির্ভাবের প্রথম রচনা, এ গল্পেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। আমাদের মতে, 'রসকলি' গল্পে লেখকের দেশভাবনা, কালচেতনা ও জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি উত্তরকালের স্থায়ী জীবনদর্শনের বীজ ধরিয়ে দেয়।[১২]

রসকলি গল্পের মূল ব্যঞ্জনা হলো– তত্ত্বহীন, ধর্মহীন এক গভীর বাস্তব মনস্তত্ত্বে নরনারীর চিরকালীন প্রেম সম্পর্কের আকাশপ্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর এই গল্পে সেই আকাশপ্রদীপ হলো- মঞ্জরী। কারণ, তার প্রেম সংকীর্ণতা ও সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত। পুলিন, মঞ্জরী, গোপিনী ও রামদাস চরিত্রের মাধ্যমে বৈষ্ণব সমাজ সংস্কৃতির সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *রসকলি* গল্পে। বৈষ্ণব জীবনদর্শনের কেন্দ্রে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত অভিঘাত অস্বীকার করার উপায় নেই। বৈষ্ণব সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। অনেকে বিধবা বৈষ্ণবীর দেহগত সৌন্দর্যের আড়ালে যৌনতার গন্ধ শুঁকে বেড়ান, কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ ধরনের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছেন। এই গল্পে তিনি জৈবিক আবেগের প্রাবল্যকে অতিক্রম করে শাশ্বত মানবধর্ম এবং মানুষের চিরন্তন গল্পই লিখতে চেয়েছেন। লেখক সর্প প্রতীকে জীবনের যে আবেগের কথা বলেছেন সেটা যৌনতা নয়, সন্তান কামনার উন্মুক্ত ঐকান্তিকতা। এই গল্পের জীবন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করা জরুরি:

> তারাশঙ্কর-কথিত মানবধর্মে দেহকে স্বীকার করেও যেখানে আত্মার প্রাধান্য, সেই অন্তর্প্রেরণা গল্পটির জীবন-সীমা নির্ধারক শক্তি। সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতায় আকৃষ্ট কিন্তু এক আদর্শবাদী জীবনবোধ দ্বিধা তৈরি করলেও নিয়ন্ত্রিত পরিণতি সমাজ-অনুগামী এবং আদর্শ মানবধর্ম কল্পনায় রোম্যান্টিক। ফলে তারাশঙ্করের বৈষ্ণব-জীবন তত্ত্ববহির্ভূত, পঙ্কসমাজমুক্ত এক শৈল্পিক সন্দর্ভ।[১৩]

রসকলি শব্দটির সাথেও সমাজ সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সুস্পষ্ট। *রসকলি* মিত্রতা বা বন্ধুত্বের প্রতীক। *রসকলি* শব্দটি বৈষ্ণবীয় আচার আচরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বৈষ্ণব সমাজে কোনো নারী তার নাকের আগায় গোপীচন্দন রসের পুষ্পকলিকার আকারে যে তিলক আঁকে , তা-ই রসকলি নামে পরিচিত। *রসকলি* গল্পে মঞ্জরী যথার্থ বৈষ্ণবীর মতই নাকে রসকলি কাটে, চূড়া আকৃতি করে চুল বাঁধে। পুলীন মঞ্জরীর বাল্যসাথী এবং মঞ্জরীর বাড়ি পুলিনের যাতায়াত আছে। পুলিন মঞ্জরীকে *রসকলি* সম্বোধন করে এবং মঞ্জরীও পুলিনকে একইভাবে সম্বোধন করে। এই 'রসকলি' পাতানোর মধ্যেই বৈষ্ণব সমাজের চিত্র ফুটে উঠে।

অগ্রদানী তারাশঙ্করের অন্যতম একটি প্রধান গল্প। গ্রামীণ জীবন ও সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এ গল্পটিতে। এই গল্পে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের আদিম স্বভাবের সঙ্গে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নিষ্ঠুর দিক নানাভাবে উদঘাটিত হয়েছে। *অগ্রদানী* গল্পের যে পরিবেশ ও মানুষজন তারা আসলে বীরভূম-বাঁকুড়া-বর্ধমান অঞ্চলেরই । বীরভূম অঞ্চলের মানুষ হিসেবে তারাশঙ্কর তাঁর দৃষ্টি শুধু বীরভূমের দিকেই নিবদ্ধ করেন নি, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন বর্ধমান ও বাঁকুড়ার দিকেও। সমাজ-অর্থনীতির বাস্তবতার আলোকেই গল্পকার এসব এলাকার মানবজীবন ও সমাজবাস্তবতার চমৎকার চিত্র এঁকেছেন। 'অগ্রদানী' গল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক, প্রাবন্ধিক বীরেন দত্ত বলেন:

> বিশ শতকের তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলির মধ্যে গ্রামীণ জীবন, মানুষ, বিশেষ করে বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়াঅঞ্চলের একটি স্থানিক ভৌগোলিক জীবন ও তার মানবস্বভাব, অঞ্চল ও তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, নিশ্চিত জায়গা করে নিতে থাকে। বোঝা যায়, তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে বিশেষ অঞ্চল, পরিবেশ এবং সেই সবের মধ্যে বিচিত্র স্বভাবী মানুষদেরই গ্রহণ করেছেন।[১৪]

অগ্রদানী শ্রমকাতর পূর্ণ চক্রবর্তী নামে এক পুরোহিতের জীবন আখ্যান। পূর্ণ চক্রবর্তীর স্বভাববৈশিষ্ট্য অঙ্কন করতে লেখক সমকালীন গ্রামীণ সমাজে সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষ অন্য মানুষের দুর্বল দিক তুলে ধরে রসিকতা করতে অভ্যস্ত। *অগ্রদানী* গল্পে দীর্ঘদেহী পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক তাকে ছয়/সাড়ে ছয় ফুট মাজা ভাঙা নোয়ানো কাঠির সাথে তুলনা করেছেন। ভোজনরসিক পূর্ণ চক্রবর্তী তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রী হৈমবতী কিংবা সন্তানদের বঞ্চিত করে হলেও পেটের পরিপূর্ণ পূজা করতেন। এই গল্পে সমকালীন সমাজের পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী শিবরানীর বাসনা তার সন্তান প্রসবের সময় যেন আঁতুড়ঘরের দরজায় অন্যান্য বারের মত এবারও পূর্ণ চক্রবর্তী শোয়। কারণ প্রচলিত প্রথায় সূতিকা ঘরের সামনে রাতে একজন ব্রাহ্মণকে রাখতে হয়। আর এ কাজের জন্য পূর্ণ চক্রবর্তীকে নির্বাচিত করার কারণ হল তার স্ত্রী হৈমবতীর একটি সন্তানও মারা যায় নি। এই মঙ্গলবোধে পূর্ণ চক্রবর্তীকেই শ্যামাদাস গৃহিণীর নির্বাচন। তাছাড়া শ্যামাদাসবাবুর একে একে পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা গেছে। শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছিল। স্ত্রীর অনেক অনুনয় অনুরোধে এ যাত্রা রক্ষা হয়েছে। যার কারণে এবার শিবরানী অতিরিক্ত সতর্ক। কারণ এই সন্তানের সাথে নিজের ভাগ্যও জড়িত। শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনের মধ্যে সমাজবাস্তবতার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে:

> ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পঙক্তির প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া দেখিতেছেন– কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটির অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি।[১৫]

উপরিউক্ত বর্ণনায় সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রামীণ অনুষ্ঠানে অতিথিদের খেতে দেয়া হত কলাপাতা, পদ্মপাতা প্রভৃতিতে। খেতে বসে অনেকের পাতার ফুটো দিয়ে ডাল বা তরকারির ঝোল গড়িয়ে পড়ে যেত। যার পাতায় এমন ফুটো থাকত সে এর অজুহাতে বাড়তি কিছু তরকারি বা খাবার দাবি করত। আবার যে ব্যক্তি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বেশি খাটাখাটনি করত, সে বাড়তি কিছু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করত। পূর্ণ চক্রবর্তী এ ধরনের একজন মানুষ। তার এমন কার্যকলাপে সমাজের অন্যান্য মানুষ কটাক্ষ করেছে, কেউ বা তাকে মোটা কথাও শুনিয়েছে কিন্তু পূর্ণ বাবু তা কখনো গায়ে মাখে নি। অন্যের অপমানজনক ব্যবহারেও সে অবদমিত হয় নি। পেট ভরে খেতে পেলে তার আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। শিবরানী সন্তান প্রসবের পরের দিন সন্তানের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সাথে সাথে ডাক্তার ডেকে আনা হয়। ডাক্তার এসেও কোনো কাজ হয় না। এ সন্তানও পূর্ববর্তী সন্তানগুলোর মত মৃত্যুপথযাত্রী। শ্যামাদাস বাবুর সন্তান মারা যাবার পেছনে তার নিজের জীবনাচরণই দায়ী। কিন্তু কৌশলে এটাকে দিব্যি নিয়তি বলে চালিয়ে দেন। শ্যামাদাস বাবুর এমন জীবনাচারণের মূলে দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাই দায়ী। কিন্তু সমাজে কখনো ছেলের দোষ হয় না, যাবতীয় অপরাধ ঐ পোয়াতীরই। শ্যামাদাস বাবুর মাসী ইঙ্গিতে শিবরানীকেই এই সন্তান মৃত্যুর জন্য দায়ী করে-

> শ্যামাদাস বাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে ? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা, আচার-আচরণগুলো মানতে হবে তো।[১৬]

ডাক্তার শ্যামাদাস বাবুর যৌবনের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানতে পারেন শ্যামাদাসের অনিয়ন্ত্রিত যৌন জীবনই এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কিন্তু তিনি কৌশলে নিয়তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। আবার শ্যামাদাসের মাসী সবকিছু বুঝেও আচার না মানাকে এই অসুস্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ধর্মীয় এই আচার হিন্দু ধর্মীয় লোকজনের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে লেখকের নিচের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে:

> আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে গৃহের বাহিরে বরান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দায়, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরানীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।[১৭]

অগ্রদানী গল্পে লেখক পূর্ণ চক্রবর্তীর লোলুপ অপরিমেয় খাদ্যবাসনা ও দুর্বার লোভী রসনাবিলাসের চিত্র পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। পূর্ণ চক্রবর্তী তার আদিম লোভ, ভোগ-বাসনার তীব্রতা নিয়ে জীবনের শক্তির দাসত্ব করে। বিশ্ব প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মের কাছে সে নির্মমভাবে পরাজিত। সে আদিম শক্তির স্রোতে ভেসে গিয়েই জীবিত নিজের সন্তানকে চুরি করে নিয়ে যায় শ্যামাদাস বাবুর বাড়ি এবং শ্যামাদাস বাবুর মৃত

সন্তানকে বদল করে নিজ স্ত্রী হৈমের কাছে নিয়ে আসে। এই গল্পটি লেখকের অনবদ্য সুন্দর একটি গল্প। জীবন ও সমাজ এই গল্পে কথা বলে জীবন্ত বাস্তবতায়।

প্রকৃতি লালিত পশু-হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা মানব স্পর্শে কত তীব্র হতে পারে তারই আলেখ্য *কালাপাহাড়* গল্পটি। এই গল্পে লেখক জৈব শক্তির মঙ্গলময় প্রকাশ দেখিয়েছেন। পশুহৃদয়ের অকৃত্রিম সহৃদয়তা লেখক চমৎকারভাবে এ গল্পে তুলে ধরেছেন। পশুদের মধ্যে যে অকৃত্রিম হৃদয় আছে, সখ্য ও স্নেহ মমতা আছে মানুষের সংস্পর্শে এসে তার কল্যাণকর জাগরণ ঘটেছে এই গল্পে।

কালাপাহাড় গল্পে লেখক সমকালীন সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন রংলালের অভিজাত্যবাদী মনোভঙ্গির উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এবং জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ নামক মহিষদ্বয়ের মানবীয় স্বভাববৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে। প্রকৃতি লালিত পশুরও হৃদয় আছে, যে হৃদয় ভালবাসতে পারে, যে হৃদয় প্রভুর প্রাণ রক্ষার্থে অকাতরে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। মানব সমাজের সমর্থন পেলে পশুপ্রেমও অনেক তীব্র হতে পারে। আদিম প্রাণীর মধ্যেও যে জৈবশক্তির বিকাশ ঘটে এক মঙ্গলময় স্বভাবে, তা আমাদের বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্তের নিম্নোক্ত মতামতটি উল্লেখ করা হল:

> পশুর আদিম, অকৃত্রিম ও অসীম অন্তর-লীলাকে ধারণ করা ও সংযত করার ক্ষমতা পার্থিব মানুষে নেই। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিচার করে, হৃদয় দিয়ে তাকে সামলাতে পারে না। রংলাল বুদ্ধি দিয়ে তার কাছ থেকে সরে এসেছে, হৃদয় দিয়ে তার অন্তঃশক্তির মঙ্গলময় দিকে জাগরণ ঘটিয়ে তার বেগ ও প্রতিবেগকে সামলাতে অক্ষম থেকেছে। এখানেই মানুষের জৈব শক্তির সঙ্গে পশুর আদিম জৈব শক্তির মূলগত প্রভেদ।[১৮]

কালাপাহাড় গল্পের প্রকরণ ও প্রকাশরীতি কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এই গল্পে লেখক সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

নারী ও নাগিনী গল্পে তারাশঙ্করের ভিন্নধর্মী জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সমালোচক লেখকের এই গল্পটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প বলে অভিহিত করেছেন। *নারী ও নাগিনী* গল্পের কাহিনী সামান্য ও সংক্ষিপ্ত আকারের। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খোঁড়া শেখ। একদিন খোঁড়া ইটের পাঁজা থেকে ইট ছড়াচ্ছিল। অদূরে অদাই শেখ গরুর গাড়িতে আসার সময় হঠাৎ একটা বিরল প্রজাতির সাপের বাচ্চা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবং সাপটিকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু খোঁড়া শেখ তাকে মারতে নিষেধ করে। পরের দিন ভোরে গাঢ় লাল রঙের সাপটা পাঁজা থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে খেলতে শুরু করলেই খোঁড়া শেখ তাকে ধরে ফেলে। ধরার পর খোঁড়া শেখ বুঝতে পারে যে, এটা সাপিনী। ছয়মাস সাপিনীকে বাড়িতে রেখে বড় করে তোলে। কারণ, খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা। সাপ নিয়ে সে খেলাও করে। এই কারণে সাপের প্রতি তার অন্য রকমের টান লক্ষ করা যায়। সাপুড়েদের জীবন সাধারণত বেপরোয়া প্রকৃতির হয়ে থাকে। খোঁড়া শেখও তার ব্যতিক্রম নয়। মদপান ও গাঁজা সেবন খোঁড়ার স্বভাবসিদ্ধ। লেখক খোঁড়া শেখের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে:

> খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখবন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূর মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম ঢাকি ও তুবড়ি বাঁশী লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে।[১৯]

খোঁড়া শেখ সাপটিকে ঠাট্টা করে সাপটার নাকে একটি নাকছবি পরিয়ে দেয়, তাকে ঠাট্টা করে আর এক বিবির সম্মান দিয়ে তার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সাপটির দুই ঠোঁট চেপে ধরে তার মুখে চুমু দেয়। এতে খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা ঈর্ষান্বিত হয় ও বিরক্তবোধ করে। সাপটাকে জোবেদা সত্যি সত্যি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে। সাপিনী খোঁড়া শেখের হাত জড়িয়ে ধরলে খোঁড়া শেখ সেটা তার স্ত্রীকে দেখায়। জোবেদা-খোঁড়ার মধ্যে পরস্পরের আদর চুম্বন বিনিময়ের সময় ক্রোধদীপ্ত ফণা তুলে সাপিনী জলের নালায় ফিরে আসে। ঝোলানো হাঁড়িতে বেড় দিয়ে নাগিনীর আশ্রয় গ্রহণ ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। এ যেন খোঁড়া শেখের বাড়িতে সাপিনীর আশ্রয় প্রার্থনা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি তুলে ধরা যেতে পারে:

> আমাদের মতে সাপিনীর এই যে বিবর্তন, চিত্ররূপ, তা তার স্বভাবেরই ক্রমপরিণতির পথ ধরেই ঘটেছে। খোঁড়া শেখ ও এই দম্পতির যৌথ জীবনে সাপিনীর এমন উপস্থিতিই গল্পের বাকি দুটি চরিত্রের ভিন্ন তাৎপর্য আনে। প্রকৃতির উপকরণ এক সরল পশু আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মানব দম্পতির গড়ে তোলা কৃত্রিম সংসারের যোগের ফলেই সাপিনীর গুরুত্ব অনেক বেশী। বস্তুত গোটা গল্পের যে বুনন তা তাকে নিয়েই, তাকে এক বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে তৈরি করা দিয়েই সম্ভব হয়েছে। আর এই সাপিনীর যে স্বরূপ ও বিবর্তন তার মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে জোবেদা ও খোঁড়া শেখ চরিত্র ও তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের শিল্পসীমা।[২০]

প্রকৃত পক্ষে বেদে জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা ছিল সমৃদ্ধ। রাঢ় অঞ্চলেই লোকায়ত জীবনের বিচিত্র সব শাখা আদিকাল ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। ডোম, সাঁওতাল, বাউরি, কাহার, বেদে বা সাপুড়ে ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে। তাঁর রচিত 'নারী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২) সাঁওতালীর বিষ-বেদের জীবনচিত্র অবলম্বনে রচিত । সমাজ বাস্তবতার চমৎকার চিত্র তুলে ধরে লেখক মানুষের অপার জীবনতৃষ্ণার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসটির শিল্প সার্থকতার মৌল উপাদান নিহিত শবলা ও পিঙলা চরিত্রের জীবনচিত্রণের দক্ষতার মধ্যে:

> বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই নারী নাগিনী কন্যাই মনসা দেবীর পূজা দেয়। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে তাঁকে মান্য করা হয়। তাকে থাকতে হয় কামনাবাসনাহীন। হৃদয়ে কামবাসনা জাগ্রত হলে আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে নাগিনী কন্যার আসনচ্যুত হয়। এ উপন্যাসে দুই নাগিনী কন্যার জীবনচিত্র বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হয়েছে।[২১]

একেবারে নিখুঁত শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্কর দেখেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষকে। যারা জীবন ধারণ ও জীবন যাপনে একই সূত্র ধরে চলে, সেই নিচুতলার মানুষ তারাশঙ্করের লক্ষ্য। সাপুড়েরা সমাজকেন্দ্রের জীবনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন। *নারী ও নাগিনী* গল্পের খোঁড়া শেখ এর কামনা-ব্যর্থতা, তার জীবন-স্বভাব সবকিছুই সমাজের নিচুতলার জীবনযাত্রার সাথে মানানসই। এই গল্পে তারাশঙ্করের লক্ষ্য সেই নিচুতলার মানুষের আদিম প্রবৃত্তির পাশবিকতাকে আদিম স্বভাবেই উপস্থিত করা। মানব প্রবৃত্তি পৃথিবীর সৃষ্টিমূলের সাথে সূত্রবদ্ধ বলেই তা মৌলিক। এই মৌলিক সত্তার স্বকীয়তাটিকেই উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। আদিমতার আবরণে এই গল্পের জীবনচিত্র বাস্তবতাকে স্পর্শ করেছে। এই গল্পে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে মূলত জোবেদা ও উদয়নাগের বৈশিষ্ট্যগত ও স্বভাবগত অভিন্নতাকে কেন্দ্র করে। সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে:

> জোবেদাকে যদি মানব নারী প্রকৃতির প্রতীক করা যায়, নাগিনী উদয়নাগ তেমনি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী সমাজের স্ত্রী স্বভাবের প্রতীকত্বে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ ও সরীসৃপ প্রাণীর স্বভাব এক হতে পারে না। নারীর মন, প্রাণ, আত্মা আছে, সরীসৃপ জাতীয় স্ত্রী নাগিনীর এসব থাকার কথা নয়। এরা আদিম স্বভাবের অনুবর্তী থেকে সেই আদিকাল থেকে তাদের বংশ রক্ষা করে চলে, তাদের বিবর্তন আছে, পরিবর্তন নেই। কিন্তু মানুষের সঙ্গ-বৈশিষ্ট্যে একজন মানবী নারীর যেমন বদল হয় মনের, তেমনি এক সরীসৃপ স্ত্রী নাগেরও লক্ষণীয় বদল ঘটে পোষ্য হওয়ার কারণে সেই আদিম স্বভাবেরই আনুগত্যের মধ্যে।[২২]

জোবেদা তারাশঙ্করের সৃষ্টি এবং খোঁড়া শেখের পাশে তার উপস্থিতির কারণ আদিম জৈব বৃত্তির ভয়াবহ দিক প্রতিষ্ঠার উপায়কে সামনে রাখা। গল্পের শেষে জোবেদা খোঁড়া শেখের পাশে একটা জীবনদর্শনকে তাৎপর্যদানের উপযোগী অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে। নারী ও নাগিনীর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা লেখকের বাস্তব সমাজ অভিজ্ঞতা প্রসূত। এ গল্পে রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতি ও জীবনচিত্র সুনিপুণভাবে লেখক উদ্ভাসিত করেছেন। কারণ রাঢ় অঞ্চলে এমন অনার্য ব্রাত্য জীবন সংস্কৃতির উপস্থিতি এখনও লক্ষণীয়।

তারাশঙ্করের *ডাইনী* গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিকগত বলিষ্ঠতা আমাদের আকৃষ্ট করে। এ গল্পের ডাইনী নামে এক বৃদ্ধার জটিল অকপট মনস্তত্ত্বই এর গৌরব। গল্পটিতে ভিক্টোর হুগো রচিত *হাঞ্চব্যাক অফ নটরডাম* নামের বিদেশি উপন্যাসের বিকৃত দর্শন কুঁজো মানুষটির প্রভাব রয়েছে। কদাকার পশুর মত বোবা সেই কুঁজো মানুষটির অন্তরলোকে ছিল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাইরের মানুষ তার অন্তরের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারে নি। সবাই তাকে অবজ্ঞা আর অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে। *ডাইনী* গল্পের বৃদ্ধাটিও এমনই এক চির অবজ্ঞার শিকার এবং এখানে অবজ্ঞার মূলে কাজ করেছে মানবতাবিধ্বংসী আদিম বিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কার।

নানা কুসংস্কার ও বিশ্বাসে অলৌকিক হয়ে ওঠা ছাতিফাটার মাঠের পূর্বপ্রান্তে রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেখানে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অভিশপ্ত জীবন কাটায় বৃদ্ধা সেই নারী। সংস্কারাচ্ছন্ন লোকবিশ্বাসের 'ডাকিনী' অভিধা হয় বৃদ্ধার ললাটলিখন। সামান্য কিছু ভিক্ষান্নে চলে বৃদ্ধার জীবন। নিঃসঙ্গ এই জীবনে সে কুড়িয়েছে মানুষের অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভয় ও তাচ্ছিল্য। তার চোখে নাকি সর্বনাশী লোলুপ শক্তি যা দিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে অবলীলায়। যে কোনো মানুষের খাওয়ার সময় বাইরের কোনো লোভী মানুষের নজর পড়লে তার ক্ষতি হয়, খাদ্য সহ্য হয় না–এমন অন্ধ লোকবিশ্বাসের শিকার এই বৃদ্ধা ছোটবেলা থেকেই। যখন সে পিতৃ মাতৃহীন দশ-এগার বছরের নিস্পাপ বালিকা, তখন প্রথম হারু চৌধুরী তার ছেলের খাবারের ওপর নজর দেওয়ায় তাকে ডাইনী বলে। তার ওপর শারীরিকভাবে অত্যাচার করে। কারণ, তার জন্যই তার ছেলের পেটে যন্ত্রণা হয়, যদিও পরে বার কয়েক বমি হওয়ার পর তার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়। সেই থেকেই বৃদ্ধার বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে যে সে ডাইনী। গ্রাম গ্রামান্তরে সে কথা প্রচার হলে সকলের কাছেই সে ভয়ঙ্কর বিষয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতি এবং মানুষ–দুয়ের সমান্তরাল ছায়া এবং পরস্পরের যোগ–এসব

দিয়েই *ডাইনী* গল্পে গল্পকার জীবনকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অবলোকন করেছেন। ডাইনী সাধারণের কাছে সর্বনাশী ও রাক্ষসী। কিন্তু এর অভ্যন্তরে লুকায়িত রয়েছে মানবিক অপত্য স্নেহের, শোভন জীবন আকর্ষণেরও এক আদিম বৃত্তির মহান তাগিদ। অর্থাৎ বাইরের বিকৃতি ভিতরের ভয়াল যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখে *ডাইনী* কে করেছে অসহায়। ডাইনীর এই অসহায়ত্বের মর্মমূলেই প্রোথিত রয়েছে এই গল্পের জীবন ও সমাজ বাস্তবতা:

> অর্থাৎ আদিম সংস্কার আর সৃষ্টিমূলের আদি মহৎ বৃত্তি – দুয়ের দ্বন্দ্বে তারশঙ্কর যে জীবনভাষ্য রচনা করেছেন গল্পে, সেখানেই তাঁর জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ। ছাতিফাটার মাঠের দিগন্তবিস্তারী নির্জন রূপ, ডাইনীর নিঃসঙ্গ জীবনবেদনা ও তারাশঙ্করের attitude গল্পের আত্মায় এক অভিশাপকেই স্থিত করে। এটা মানুষের ভাগ্য। ছাতিফাটার মাঠের ভয়াল বর্ণনার সঙ্গে এক সমালোচক হার্ডির 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ' উপন্যাসের 'এগডন হীথ' এর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ...আসলে তারশঙ্কর মানবপ্রেমিক এবং সে মানবপ্রেমেই দেখেছেন ডাইনী স্বভাবের মেয়েটিকে। প্রকৃতি ও মানবস্বভাবের আদিমতার সঙ্গে সর্বকালের মানুষের মহত্তম বৃত্তির যোগেই '*ডাইনী*' গল্পের সমূহ সর্বকালীন আবেদন।[২৩]

তারাশঙ্করের *ডাইনী* গ্রাম সমাজের একটি অপবিশ্বাস। গ্রামীণ জীবন-সংস্কার প্রতিটি উপাদানকেই তিনি অবলীলায় তুলে এনেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। এ গল্পের জীবনরস গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কারের এক ভিন্ন আস্বাদ এনে দেয়।

ডাইনীর বাঁশী তারাশঙ্করের আরও একটি গ্রামীণ অপবিশ্বাস ও সংস্কারকেন্দ্রিক গল্প। পুরাতনের প্রতি তাঁর বাড়তি আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু তাঁর এ আকর্ষণ কখনোই জীবনবিচ্ছিন্ন নয়, বরং জীবনের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থেকেই এমন উদ্ভট সামগ্রীকে জীবনরসে সিক্ত করে উপভোগ্য করে তুলেছেন। এমন বিষয়ের প্রতি তারাশঙ্করের আকর্ষণের কারণ সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী'র নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়:

> যে সকল গোষ্ঠী ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যে প্রাসাদ ধ্বংসোন্মুখ, যে আচার-সংস্কার-বিশ্বাস ক্রমে নবযুগের শিক্ষার আলোয় মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে তাদের ঘিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তাঁর গল্পে। পুরনো চলে যাবে তিনি তা জানেন, ইতিহাসের অমোঘ বিধান অলজ্ঘ্য বলে মানেন, তবু তার উপরে অস্তগামী সূর্যের যে রশ্মিপাত তার মনোহরী বর্ণোচ্ছ্বাস তারাশঙ্কর দুচোখ ভরে দেখে। তারাশঙ্কর মানুষের জীবনের ও মনের সেই শেকড়ের সন্ধানী যা অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত।[২৪]

ডাইনী গল্পের মত *ডাইনীর বাঁশী* গল্পেও তারাশঙ্কর সাধারণ তরুণী স্বর্ণ কিভাবে লোক-মুখে মুখে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ডাইনীর অস্তিত্ব অনুভব করে তার চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

লোকের কুৎসায় স্বর্ণের মা পরিণত হয় ডাইনীতে। ছোটখাট মন্ত্র জানত সে। মারণ উচাটনও নাকি জানত। এরকম গ্রামের লোকের বিশ্বাস। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে ব্যক্তিগত ও মানসিক বীজটি অনুসন্ধান করেছেন। এ গল্পে লেখক আতঙ্কের রস ছড়ানোর চেয়ে মনস্তাত্ত্বিকতার দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। গল্পকার এ গল্পে দেখাতে চেয়েছেন যে, ভূত বাইরে নেই, আছে মানুষের স্নায়ুকোষে জড়িয়ে, আছে মানুষের পাপবোধের সঙ্গে মিশে, আবার কখনো থাকে অনুশোচনার অংশ হয়ে। গ্রামের মানুষের বিশ্বাসে-সংস্কারে ভয়ে গুজবে ভর দিয়ে যাকে ডাইনী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে; তারাশঙ্কর সেই ডাইনীর বাহ্যিক বর্ণনায় না গিয়ে তার মনের গভীরে যে প্রক্রিয়া তার উন্মোচন করেছেন এ গল্পে। ডাইনীর অতিলৌকিক রহস্যের আড়ালে, আদিম অন্ধকার বিদীর্ণ করে রক্ত মাংসের স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠার যে আকুতি তা আমাদের মুগ্ধ করে।

স্থলপদ্ম গল্পে গল্পকার বাৎসল্য বুভুক্ষার চমৎকার ছবি তুলে ধরেছেন। শ্রমজীবী পল্লীর পটভূমিতে গল্পটি রচিত। রাজমিস্ত্রির কাজে মজুরি খাটা একটি মেয়ে, নাম তার বেলে। তার চরিত্রের দুর্নামও আছে। রোগাক্রান্ত পল্লীতে তার সেবাপরায়ণ রূপটি গল্পকার এঁকেছেন। বেলে সাহসী ও মুখরা মেয়ে। এই যুবতীর মনে সন্তান লাভের কামনাকে তীব্র করে তুলেছেন লেখক তাঁর অসীম দক্ষতা গুণে। প্রতিবেশিনীর মৃত সন্তানকে শ্মশানে পাঠানোর মধ্য দিয়ে বেলের এই বাসনা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই কারণে বেলের সাথে হারার কলহ হয়। ঘেঁটুগান সহযোগে এদের জীবনরসে কিছুটা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন লেখক। সব মিলিয়ে গল্পের মূল অংশটি আবেগাপ্লুত। চমৎকার বাৎসল্য রসের গল্প এটি। সমাজ ও জীবনের সুন্দর ছবি রয়েছে গল্পটিতে :

> তার বাস্তব ছবিটা লেখক অনায়াস দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এরা সুনির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী না হলেও এদের জীবনযাত্রায় কতকগুলো ঐক্য আছে; এদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, এদের বিনোদন-বিবাহ একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে যাতে এদেরও যেন একটা নরগোষ্ঠী বলে মনে হয়।[২৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে যা কিছু ভঙ্গুর, যা কিছু ধ্বংসোন্মুখ, যা নিয়তই বদলে যাচ্ছে, তারই জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প উপন্যাসে। ব্রাত্য জীবন, ঘেঁটুগান, ডাকিনী যোগিনীতে বিশ্বাস কালের করাল গ্রাসে ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত

বিশ্বাস ও সংস্কারের জীর্ণ দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জীবনবোধকে তাঁর গল্পে ধারণ করেছেন পরম মমতায় । *স্থলপদ্ম* নামকরণটির মাঝেও প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গল্পকারের এক ধরণের জীবনপ্রীতির পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁর গল্পে কিভাবে জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে তার নমুনা পওয়া যায় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের নিম্নোক্ত উক্তিতে:

> আধারই শুধু বদলে বদলে যায়– সময়, সমাজ, ভূগোল, রাজনীতি এইসব বিচিত্র আধারের মধ্যে একমাত্র জীবনের প্রবাহটিই অন্তহীন বয়ে চলে। নির্দিষ্টতা-অনির্দেশ্যতার এই দুমুখী বাস্তবের এক অসামান্য রূপকার তারাশঙ্কর জীবনের যে গাঢ়-গভীর স্বাদ সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনায় তার তুলনা মেলা কঠিন। অনুভবের কাছে নয়, বুদ্ধির কাছে নয়, বোধের কাছেও নয়, জীবনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে বস্তুশরীরীকরণের কাজ তিনি মহাবল শিল্পীর যোগ্যতায় সম্পন্ন করেছেন।[২৬]

স্থলপদ্ম গল্পের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র স্বকীয়তায় ভাস্বর।

সন্ধ্যামণি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্মশানকেন্দ্রিক জীবনস্পর্শী একটি গল্প। শ্মশানের বর্ণনা, শ্মশানের পাশের বাজার এবং বাসিন্দাদের খণ্ড খণ্ড ছবি নিয়ে গল্পটি নির্মিত। হাট-বাজার-বসতি নিয়ে জীবন এবং যাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে শ্মশানের সাথে, সেই শ্মশানযাত্রীদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বাজার। বসতির ও বাজারের মানুষজনের সঙ্গে সহমর্মিতায়, সহযোগিতা আর সহানুভূতিতে শ্মশানবাসীদের গভীর বন্ধন। গল্পের সূচনাতেই লেখক বাজারের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গল্পের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাজারের বর্ণনায় সমাজ ও জীবন যেন ঝলমল করে ওঠে:

> বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটিতে তিলধারণেরও স্থান থাকে না। চীৎকারে ,গুঞ্জনে সারা বাজারটা গমগম করে, যেন একটা মেলা। অস্তমান সূর্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। অন্ধকার জনহীন বাজারখানা হাঁ হাঁ করে। তখন দু'দশজন আগন্তুক যাহারা আসে–তাহারা শ্রান্ত শববাহকের দল। শব সৎকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ২৭

গল্পের বিষয়টি চমৎকার। কুসুম আর কেনারাম একই গ্রামের সন্তান। তারা স্বামী স্ত্রী। কিন্তু তাদের তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি আকস্মিকভাবে মারা যাওয়ার পর কেনারাম কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। মেয়ের মৃত্যুর পর সে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। কুসুমের সাথে তার আগের মত বন্ধন নেই। মেয়ের শোকে হতবিহ্বল কেনারাম কুসুমের সাথে ভালোভাবে কথা বলে না। গ্রামে কেনারামকে চাটুজ্জেমশায় বলে সম্বোধন করে। চাটুজ্জেমশায় কতকগুলো কুকুরের সাথে কথা বলে, আদর করে, কারো কারো নামও সে দিয়েছে। নাম ধরে ডাকলে কুকুরেরা তার ডাকে সাড়া দেয়। চমৎকার বন্ধুত্ব কুকুরগুলোর সাথে। চাটুজ্জে তার বাৎসল্য স্নেহ কুকুরের মাঝে বন্টন করে দেয়। অধিকাংশ সময় সে শ্মশানে কাটায়, যে শ্মশান একদিন তার সন্ধ্যামণিকে ভস্মিভূত করেছে। সন্ধ্যামণির সেই স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজও সে শ্মশানে পড়ে থাকে। সে কুসুমের মুখের দিকে তাকাতে পারে না, কারণ কুসুমের মুখের দিকে তাকালেই তার কন্যা সন্ধ্যামণির কথা মনে পড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে এমন বেদনার গল্প খুব কমই রয়েছে। *সন্ধ্যামণি* গল্পে গল্পকার যে সমাজের চিত্র এঁকেছেন, যে জীবনের ছবি এঁকেছেন, তা অতি বাস্তব। কুসুম কেনারামের যে প্রেম, তা পার্থিব আর পাঁচটা প্রেমের সাথে তুলনীয় নয়। উভয়ের একে অপরের প্রতি হৃদয়ের যে আকর্ষণ তার অভিব্যক্তি পাঠক অনুভূতিকে বেদনামথিত করে। যার কারণে *সন্ধ্যামণি* গল্পের জীবন ও সমাজ যন্ত্রণাবিধুর ও বাস্তবতামণ্ডিত। গঙ্গার বালুচরে শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গার যেন কুসুম–চাটুজ্জেরই সন্তানহারা যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়:

> নীচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গার– স্তূপ নিশীথ অন্ধকারের বুকে ধ্বক্ধ্বককরিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নি:শেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই–এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখা প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধূম পাক খাইয়া– খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নীচে নামিতেছে।[২৮]

কিন্তু এই গল্পের পজিটিভ দিক হল, কেবল অন্তহীন বেদনায় জীবন বিলীন হতে পারে না। তীব্র আশাবাদ দিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। গল্পের শেষের দিকের কয়েকটি চরণ এরকম:

> স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল। গত বছরের ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছি। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে।[২৯]

শত যন্ত্রণা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যেতে হয়– জীবনের সেই অমিত আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই 'সন্ধ্যামণি' গল্পে।

শাপমোচন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। এ গল্পে চেতন-অবচেতন মনের রহস্যলীলা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মনের ভেতরকার সূক্ষ্ম টানাপড়েনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে *শাপমোচন* গল্পে। নায়ক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে গল্পটি খুবই উঁচু মানের হয়েছে। কদাকার দেবীচরণের সুন্দরী স্ত্রী ভামিনী। দেবীচরণ সারক্ষণ হীনমন্যতায় ভোগে তার কুৎসিত চেহারার কারণে। অন্যদিকে ভামিনী নিজের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও দেবীচরণকে কিছুটা খুশি করার জন্যই:

> তার স্ত্রী দেখতে ভালো আর সে কদাকার কুৎসিৎ –এই ভাবনার পীড়ন– স্ত্রী তাকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারে না, যদি তার স্ত্রীর মন থাকে। এই বিষয়ে নিশ্চয়তা, তার প্রণয়-বাসনাকে বাড়তে দেয় না। বরং তীব্র সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে দেবীচরণ। বাড়িতে এলে স্ত্রী সংসর্গে তার মনের এই বহুমুখী প্রবৃত্তিগুলি পরস্পর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।[৩০]

দেবীচরণ ভেবে নিয়েছিল যে তার স্ত্রী গায়ক ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এটা ছিল তার নিছকই ভাবনা। ভামিনী ছিল স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, এটা পরিশেষে প্রমাণিত হয়েছে এবং চমৎকার পরিবেশ ও কাহিনী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গল্পটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মহামারী, যুদ্ধ, বন্যা ইত্যাদি খুঁটিনাটির জীবন্ত বর্ণনা নিয়েই *বোবা কান্না* গল্পটি নির্মিত। খুব বড় আকারের গল্প হলেও সবকিছু সাজানো গোছানো। মৃত্যু তারাশঙ্করের প্রিয় একটি প্রসঙ্গ। এ গল্পেও মৃত্যু প্রসঙ্গকে লেখক শিল্পসার্থক করে তুলেছেন। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য, মিহির ডাক্তার এবং শশী ডোমের ত্রিকোণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গল্পটির কাহিনীর বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন লেখক অতি নিপুণতার সাথে। একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত, একজন ডাক্তার যিনি নাস্তিক হিসেবে পরিচিত, একজন চোরের সর্দার–এই তিন ভিন্নধর্মী মানুষকে নিয়ে তিন স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ ও তাদের সমন্বয়ে একটি চূড়ান্ত বোধ নির্মিত হয়েছে গল্পটিতে। আনু ঠাকুরের সন্তানকে বাঁচাতে এই তিন পেশাদার যা করেছে তা তাদের সামাজিক ভূমিকাকে ছাড়িয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে তারা বাঁচাতে পারে নি। বোবা কান্নার জন্ম দিয়ে সে চলে গেছে পরপারে। শিশুটিকে বাঁচাতে না পেরে ডাক্তার তার ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার করে দেয়। তার বই, খাতা সব ছিঁড়ে আগুনে গুঁজে দেয়। এই মৃত্যুতে পৃথিবীও যেন কেঁদে ওঠে:

> তার কানের পাশে এখনও বাজছে সেই বোবা মেয়ের কান্না। ওই কান্নার মধ্যে থেকে সে শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী-মায়ের কান্না। তার চিকিৎসক জীবনে অনেক মায়ের অনেক শিশুকে সে মরতে দেখে, তাদের কান্নাও সে শুনেছে, কিন্তু এমন কান্না সে কখনও শোনে নাই; কোন কান্না এমনভাবে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশলোক পর্যন্ত পূর্ণ করে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত কাল থেকে প্রবহমান শোকপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ফল্গুধারার সন্ধান তাকে দেয় নাই।[৩১]

গল্পটির আকার বড় হলেও তা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল। আনু ঠাকুরের মৃত্যু থেকে তার শিশু পুত্রের মৃত্যু পর্যন্ত অজস্র চিত্র ও ঘটনামালার সংমিশ্রণ গল্পটিকে করেছে উপভোগ্য ও তাৎপর্যবহ। *বোবা কান্না* তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আশ্চর্য জীবনচিত্র ও সমাজবাস্তবতার গল্প।

গ্রামীণ শ্রমজীবী ও কৃষকের কথা তারাশঙ্কর বরাবরই পরম মমতা দিয়ে তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। *মাটি* গল্পের সম্পন্ন কৃষক মেওয়ালালের নিঃস্ব মাটি বেচিয়েতে রূপান্তরের কাহিনীটিও জীবনবাস্তবতার অসাধারণ দলিল। মেওয়ালালের জীবন ও চরিত্র গল্পকার এতে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। মাটি, মাটির ফসল ও খেতের সাথে মেওয়ালালের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু জীবিকা অর্জন নয়– মাটি, খেত, ফসল ও কৃষিকে ভালোবেসে পারিবারিক মুনশীগিরির ভদ্রলোকী অনায়াসে সে ছেড়ে দিয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত সমাজে অনেক রয়েছে। তবে, মেওয়ালালের ভালোবাসার মাটি চক্রান্তের জালে জড়িয়ে হারাতে হয়েছে। জীবনের এই দুঃসময়ে লছমনিয়ার সাথে তার প্রেম হয়। চক্রান্ত করে বাঁধ ভাঙার অপরাধের অজুহাতে তাদের দুজনেরই জেল হয়। প্রকৃতির মহাপ্রলয় তাদেরকে খুব কাছাকাছি এনে দেয়। এই গল্পের জীবন খুব করুণ ও মর্মস্পর্শী হলেও বাস্তবানুগ। লছমনিয়া একটি অবৈধ সন্তানের জননী হলেও সেই সন্তানই তাকে মাতৃত্বের আস্বাদ এনে দেয়। অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদীর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

> অবৈধ সন্তান হলেও একেই সে তার জীবনের পরম সার্থকতা বলে জেনেছে। মাতৃত্বে সে পূর্ণহৃদয় রমণী। মেওয়ালালের প্রতি তার তীব্র কামনা আর নেই, বিচ্ছেদের জন্য নেই মর্মভেদী শোক। অপর পক্ষে মেওয়ালালও এই বিচ্ছেদ-বেদনাকে সংহত-সংযত করে চিত্তের মধ্যে আত্মস্থ করে নিল। প্রেমকে রূপান্তরিত করল মমতায়।[৩২]

এই গল্পে তারাশঙ্কর জীবনের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা মাটির মমতারসে সিক্ত। সমাজের কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কবলে সেই মাটি মাঝে মাঝে কলঙ্কিত হলেও পরিণামে জয় হয়েছে মানব প্রেমেরই।

তারাশঙ্কর জীবনবাস্তবতার শিল্পী, সমাজ সচেতন গল্পকার। জীবন ও সমাজ তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। তাঁর অসংখ্য গল্পে ফুটে উঠেছে জীবনবাস্তবতার চিত্র। এর কারণ হিসেবে বলা যায় সমকালীন সমাজ, প্রবহমান সময় এবং নানা ঘটনার অভিঘাত তারাশঙ্করের চেতনালোক সংগঠনে

সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কালশাসিত সমাজের পরিবর্তন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। কালশাসিত সমাজের এই অনিবার্যতাকে গল্পকার শিল্পিত রূপদান করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। অবক্ষয় কবলিত ও ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক জীবনের চরম বাস্তবতার ছবি তিনি এঁকেছেন *জলসাঘর* গল্পে। বড় মাপের শিল্পী না হলে এমন সত্যকে জীবন্ত করে তোলা যায় না। এমন গল্পের প্লট তারাশঙ্করের চেতনালোকেই ছিল। অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরীর নিম্নোক্ত উক্তিতে এর সত্যতা মেলে-

> সামন্ত সমাজের অবক্ষয় এবং নতুন বাণিজ্যপুঁজিনির্ভর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয়-উন্মুখ কালান্তর-পর্ব তারাশঙ্করের সমকাল। বাণিজ্যপুঁজি যখন ক্রমশ শিল্পপুঁজিতে স্বরূপ সন্ধান করলো, তখনই সনাতন কৃষিসভ্যতার সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কৃষিজীবীর শ্রমজীবীতে গোত্রান্তর,– গ্রামীণ শস্যশ্যামল আরণ্য প্রকৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর কলকারখানা-সমাচ্ছন্ন বস্তিজীবনের বিস্তার।[৩৩]

তারাশঙ্কর বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির একটি নতুন ক্ষেত্র সংযোজন করেছেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রধান লক্ষণ তাঁর জীবনদৃষ্টি ও কল্পনাভঙ্গির গভীরতা। গল্পকার যে সমাজের জীবনকে তাঁর রসসৃষ্টির উপাদান করেছেন, তার সেই মাটি তিনি দুইহাতে ছেনেছেন, কোনো কৃত্রিম উৎস থেকে গল্পসৃষ্টির উপাদান গ্রহণ করেন নি। তাঁর রসসৃষ্টির উপাদান জীবনের গভীর ভূমি থেকে। যে মাটিকে তিনি চিনেছেন, যে মাটির সাথে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন হৃদয়ের গহীন গোপন বন্ধনে– সেই মাটির ধর্মকে, তারই তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে নিজহৃদয়ে পূর্ণ অনুভব করেছেন, তার প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করে তুলেছেন। যার কারণে, তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনের একটা নতুন রূপ ও নতুন রসাস্বাদ আছে। তাঁর গল্পগুলি জীবনের গভীর সত্যকে উন্মোচিত করে বলে তা জীবনস্পর্শী ও বাস্তবতার রস-রহস্যে লীন। তারাশঙ্করের গল্পের জীবনসত্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী তাঁর 'কবি' গ্রন্থের বাংলা কথাসাহিত্য সমালোচনা অংশে উল্লেখ করেছেন-

> যে সমষ্টিগত চেতনা একটা জাতির বিশিষ্ট জীবন-ধারায়–নানা যুগের নানা ভাব ও প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়াও নিজের সেই আদিম প্রাণধর্ম্মকে পুষ্ট অথচ অবিচলিত রাখে–ইতিহাস যাহার বিবর্ত্তনটাই বড় করিয়া দেখে, জীবিতের মধ্যে মৃতের সন্ধান করে, মৃতের জীবিত রূপকে দেখে না–তারাশঙ্কর তাহাকেই গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন এই বাংলাদেশের এমন একখণ্ড মাটিতে, যেখানে এই জাতির সেই আদি-প্রকৃতি, তাহার রক্তগত প্রবৃত্তি, এক কথায়, তাহার মানবতারই একটা অক্ষত এবং বিশিষ্ট রূপ বহু পলিস্তর ভেদ করিয়া, এখনও এই বিংশ শতাব্দীতে নিজের পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে।[৩৪]

বস্তুময় জীবনের ভিত্তির ওপরেই কথাসাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেই বস্তুদেহের শিরায় শিরায় জড়িয়ে দেন শিল্প-ভাবনার সঞ্জীবনী। কিন্তু কবির স্বপ্ন বস্তুর ভেতর থেকে বস্তুসারকে আহরণ করে। তারাশঙ্করের প্রত্যয়-সিদ্ধি এই কবি-স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়। তারাশঙ্করের সৃষ্টিসম্ভারে মিশ্রিত হয়েছে বিচিত্র সব সাহিত্যরস। বর্ণিল উপাদানে সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্য সম্পদ। সৃষ্টিবাসনার বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে তারশঙ্কর নিজেই বলেছেন-

> যেমন আধ্যাত্মিক সাধনায়, তেমনি সাহিত্যের সাধনাতেও–অধিকারীভেদে পথের ভেদ আছে। যাঁরা সুন্দর, শোভন, ললিত,সুকুমার বৃত্তির কারবারি, প্রসাদগুণ যাঁদের উদ্দিষ্ট, তাঁদের তুলনা করব বৈষ্ণব পন্থীদের সঙ্গে। আর যাঁরা রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানক রসের কারবার করেছেন, জীবনকে কেড়ে ফুঁড়ে রক্তমাংস-রস-মজ্জা-ক্লেদ-গ্লানির উপাদানের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছেন, তাঁরা তান্ত্রিক।[৩৫]

স্রষ্টা তারাশঙ্কর পরম ভাগ্যবান–পরস্পর বিরোধী উপলব্ধি ও মূল্যবোধের এক ঐতিহাসিক সন্ধিলগ্নে তাঁর ব্যক্তিমনের উদ্বোধন ঘটেছিল বীরভূমের লালমাটিঘেরা এমন এক পল্লীপ্রত্যন্তে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে প্রকৃতির হাতে পাতা হয়েছিল ইতিহাসের সেই সন্ধিলীলার সার্থক পীঠভূমি। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিকতার ক্ষয়িষ্ণু কূর্মপীঠে বণিকধর্মী আধুনিকতার জন্ম ও বিকাশের উৎক্ষেপ অভিঘাতের সন্ধিলগ্নেই তারাশঙ্করের শিল্পমানস বিকশিত হয়েছে। সুতরাং বীরভূমের প্রকৃতি, ইতিহাস ও মাটির গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে তাঁর সাহিত্য উপলব্ধি সম্ভব নয়। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন জমিদার শ্রেণির এক অন্তিম প্রতিনিধি–যার কারণে তাঁর সাহিত্যে জমিদার সমাজের যথার্থ ইতিহাস প্রীতি-প্রাচুর্যের পরিমণ্ডলে বিধৃত হয়েছে। শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে বলেন:

> মধ্যযুগের আলোচ্য জমিদারশাহীর মধ্যে উদার উদাত্ততা যেমন স্ফূর্তিমান ছিল, তেমনি ক্ষিপ্ত আক্রোশের বিভীষিকাও ছিল আদিম স্বভাবের দুর্দমনীয়তায় ভয়ঙ্কর। এই আদিম উদাত্ত প্রচণ্ডতা শ্মশানবাসী কাপালিকের স্মৃতিসান্নিধ্য হতে বাধা নেই। শুধু তাই নয়, বীরভূম শব্দের নামতাৎপর্য নিয়ে বিচিত্র জনশ্রুতির মধ্যে এ-ও একটি যে, এই রক্তপ্রান্তর তান্ত্রিক বীরচারীদেরই ছিল সাধনপীঠ; বীরভূমে তন্ত্রসাধনার পুরাতন ঐতিহ্য আজও দুর্মর। তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষেরাও বংশানুক্রমে ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁর গ্রাম একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম তীর্থ।[৩৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপরিউক্ত অভিঘাত দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর রচনায় স্বকীয়তার সৌকর্য প্রবল। রাঢ় জনপদের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন সাহিত্য রচনার উপাদান, কিন্তু সে উপাদানকে তিনি নিজের মাধুর্যে মণ্ডিত করে উপস্থাপন করায় তাতে অভিনবত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি মন্তব্য তুলে ধরা যায়:

> বিচার বুদ্ধির দ্বারা মানবজীবনের সার্থকতা বিচার করিলেও, মানসিক জীবনই যে মানুষের সর্বোচ্চ জীবন তাহা স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বে কোনও অনৈসর্গিক স্রষ্টার দ্বারা বা প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা, নৈসর্গিক স্তরেই রহিয়াছে, একমাত্র মানুষই তাহার মনের দ্বারা বিশ্বে নূতন জিনিষ আনিতে পারিয়াছে–যেমন মন্দির, প্রাসাদ, ক্ষেত ও উদ্যান, জীবনযাত্রার সহায়তার জন্য মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি।[৩৭]

তারাশঙ্করের গল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত মূল্যায়নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার বেদীতে তিনি তাঁর গল্পের ভিত্তি প্রস্তর রচনা করলেও, গল্পের আস্বাদনে রয়েছে এক ধরনের নতুন আমেজ। সাহিত্যে বাস্তবতা না থাকলে সেটি মানবজীবনকে স্পর্শ করে না। তারাশঙ্করের গল্পে যে বাস্তবতার ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তা লেখকের মানসরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত। তাই তারাশঙ্করের রূঢ় ও কর্কশ বাস্তবতার মাঝেও সাহিত্য-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক আকিমুন রহমান এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি-

> সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোনো স্বভাবগত বিরোধ নাই। তাই কঠিনতার মধ্যেও আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই। মানুষের সুখদুঃখের চিরন্তন রূপ তাই সুন্দর সমগ্রতার মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যও তাই আমদের মুগ্ধ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আমরা রূপ বা সৌন্দর্য্যের কোমলতাই দেখেছি, শক্তির চেয়ে মাধুর্য্যের কারুণ্যেই আমাদের মন বেশী সাড়া দিয়েছে। কোমলতা বা মাধুর্য্যের মূল্য অস্বীকার করতে কেহই পারে না; কিন্তু জীবন তো একরঙা ছবি নয়, তার পর্দায় পর্দায় বহু রঙের যে বিকাশ, তাকে কেবল একটি ধারার মধ্যে ফেলবার চেষ্টায় আমরা তার ঐশ্বর্য্যের হানিই করি।[৩৮]

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে জীবনের এই অমোঘ সত্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে বাস্তব জীবনের বর্ণিল বিকাশটি ফুটে উঠেছে সমাজ সংস্কৃতির ক্যানভাসে। রোমান্টিকতা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই তাঁর কথাসাহিত্যের নেই কোনো কল্পনা কাতরতা; বাস্তবতা যত বীভৎসই হোক–তার সাবলীল প্রকাশই তারশঙ্করের বৈশিষ্ট্য। কারণ-

> তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। জীবনের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যে ডুব দিয়েই তিনি তৃপ্ত। দেহ-মন-প্রাণধারী মানুষের ট্রাজেডিতেই তিনি কাতর। কোনো রোমান্টিক অনির্দেশ্য বেদনায় তিনি ভারাক্রান্ত নন।[৩৯]

তারাশঙ্কর সমাজ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। অনেক লেখক জীবনের বাস্তবতার কোনো দায়ভার নিতে চান না। তাই জীবন থেকে সরে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন গল্পকার ছিলেন না। তিনি সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার ক্রমবিবর্তমান রূপকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সমগ্র গল্পের পরতে পরতে পরিলক্ষিত হয় জীবন শিল্পের বাস্তব সাধনা। তাঁর গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবেই বিধৃত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ ও দেশবিভাগ, তেভাগা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, জমিদারী প্রথার দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস, বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক টানাপড়েন ও উত্থান পতন, গান্ধীবাদী আন্দোলনের সামাজিক প্রভাব, অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র, গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার চালচিত্র প্রভৃতি। তাঁর রচনায় রাজনীতি নিরপেক্ষ অথচ সমাজমুখ্য গোষ্ঠীজীবন কিংবা সমাজজীনের পটভূমিকায় স্থাপিত ব্যক্তিমানুষের হৃদয়গত ও অস্তিত্বগত সংকটের শৈল্পিক প্রকাশ তাঁর রচনাকে করেছে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। আবহমান ও শাশ্বত গ্রাম বাংলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের উত্তরহীন জিজ্ঞাসার কালজয়ী শিল্পগাথা সূচিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পগুলোতে। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে জীবনবোধ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-

> তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে দুর্লভ বলিষ্ঠতা ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, যে বিশাল মানববোধের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সমসাময়িক দেশ-কালের ঐতিহাসিক জীবনচিত্র যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাতে শরৎচন্দ্রকে হারিয়ে আমাদের আর ক্ষোভ নেই, তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারিত্ব তারাশঙ্করের মধ্যে রয়ে গেছে।[৪০]

তাঁর গল্পে চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্বের স্বাতন্ত্র্য, চলমান যুগের সংঘাত যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে শুধু তাঁকে নিছক একজন গল্পকার বললে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়; বরং তিনি বাঙালি জীবন ও বাঙালির সাহিত্য সাধনার একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তারাশঙ্কর শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান কথাকার। সমকালীন সমাজ ও জীবনবোধ তাঁর গল্পে যেভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, আর কোনো গল্পকার তাঁর নাগাল ধরতে পারেন নি। তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

তথ্যসূচি:

১. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ২য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৩৭

২. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ১৯৯

৩. Buddhadeva Bose, A Acre of Green Grass, Papurus Reprint Series ii, November 1982, P. 93.

৪. সফিকুন্নবী সামাদী, তারাশঙ্করের ছোটগল্প জীবনের শিল্পিত সত্য, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬৮

৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, জলসাঘর, অক্ষর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০২, ৩৬, শ্রীশদাস লেন, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ৯২

৬. বীরেন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৮. ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, ছোটগল্পের শিল্পরূপ: তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি', নবযুগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০১, ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১১০০, পৃ. ১০৭

৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, তারিণী মাঝি, পৃ. ২১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১১. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, তারিণী মাঝি, পৃ. ২১২.

১২. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

১৩. ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১৪. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৯

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৬

১৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৬

১৮. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প,নারী ও নাগিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২০. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

২১. ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২২. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, তারিণী মাঝি, পৃ. ৩১২

২৩. বীরেন দত্ত, প্রাগুক্ত, ডাইনী, পৃ. ২২৫

২৪. সফিকুন্নবী সামাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৬. হাসান আজিজুল হক, নির্বাচিত প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর: জীবনের সমাচার, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ১১৮

২৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৮

২৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প,সন্ধ্যামণি , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প,সন্ধ্যামণি , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩০. সফিকুন্নবী সামাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৩১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, বোবা কান্না , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৩২. সফিকুন্নবী সামাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

৩৩. ভীষ্মদেব চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, সমাজ ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯

৩৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী, কবি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য-সমালোচনা: প্রসঙ্গ কবি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, নভেম্বর ২০০১, পৃ. ১৫২

৩৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬২, পৃ. ৪৩০

৩৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

৩৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, আত্মঘাতী বাঙালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামচরন দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২৩ নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৯ , ১৯০

৩৮. আকিমুন রহমান, বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল, অঙ্কুর প্রকাশনী,৩৮/4 বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ৫০৮

[৩৯.] ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

[৪০.] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৬, পৃ. ৫৬০

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বনফুলের গল্প: বিন্দুতে সিন্ধু সন্ধান

মো: গোলাম কিবরিয়া*

সারসংক্ষেপ: বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বনফুল তথা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যস্রষ্টার অভিধা। ছোটগল্পের শরীরে যিনি দান করেছেন এক ব্যতিক্রমী সুষমা-সৌন্দর্য, যাঁর হাতের ছোঁয়ায় বাংলা ছোটগল্প সত্যিকারের ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। গল্প কত ছোট হয়েও কত বিশাল ব্যঞ্জনাময় হতে পারে, সংক্ষিপ্ত হয়েও হতে পারে সংহত– বনফুলের গল্পই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । বিবিধ বর্ণের, বিচিত্র পেশার, বহুমুখী চেতনার, বহুমাত্রিক দর্শনের বিভিন্ন মানুষ বনফুলের গল্পের এক ক্যানভাসে উঠে এসেছে। ব্যক্তি মানসের সংকট, পারিবারিক টানাপোড়েন, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, বিশ্বচিন্তা, আধিভৌতিক পরাবাস্তবতা– কী নেই তাতে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তার গল্পের শরীর মেদহীন, বাহুল্যবর্জিত, সূক্ষ্ম। আর গল্পকার হিসেবে বনফুলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বও এটাই যে, তিনি গল্পের এক বিন্দু শরীরে প্রোথিত করতে পেরেছেন জগৎ সভ্যতার বহুমুখী, বিচিত্র, বর্ণিল, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জীবন সিন্ধুকে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলেই বনফুলের গল্প শৈলী বিচারেও ন্যূন নয়। গল্পের ছোট্ট শরীরের ভাঁজে ভাঁজে তিনি বুনে দিয়েছেন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের বিচিত্র কারুকাজ; আর পাশাপাশি হিরকধারের মত স্যাটায়ার– যেটা কাটে কিন্তু এত গভীর দিয়ে কাটে যে বাইরে থেকে তার ক্ষরণ টের পাওয়া যায় না। বনফুলের গল্প তাই বার বার বাংলা সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠককে টেনে নেয় তাঁর রস আস্বাদনে।

এক.

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্রমবিকাশের ধারায় যে সাহিত্যিক ধুলি কালি ঘামের চিহ্ন আঁকা শরীরকেই সরাসরি গল্পে তুলে আনলেন, তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। সাজানো গোছানো বানানো কোন গল্প নয়, যে গল্প নিরন্তর তরঙ্গের মতো বয়ে চলেছে আমাদের চারপাশে, তাকে যেন ঠিক তেমনিভাবেই তুলে ধরেছেন পাঠকের দৃষ্টিপটে। বনফুল নামধারী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এই যে তিনি এই প্রচলিত ঘটনাধারার সাধারণ, প্রাত্যহিক, নৈমিত্তিক জীবনাচরণের ভিতর থেকেই খুঁজে ফিরেছেন মানব কর্মের ও চরিত্রের অনন্যতা, অবিকলতা। আর সাধারণ জীবনালেখ্যের ভাষা-ই তাঁর হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে শাণিত, ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মনিহারীতে ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই জন্ম বলাইচাঁদের। পিতার নাম সত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বনফুল প্রথমে মনিহারী স্কুলে লেখাপড়া করেন এবং পরে সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি স্কুল থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পাশ করেন। ১৯২০ সালে হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়তে আসেন কলকাতায়। অবশ্য এমবি ডিগ্রি লাভ করেন অর্থাৎ ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

কৈশোর থেকেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি বনফুলের। শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের পরিচয় গোপন করার জন্য তিনি বনফুল ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় 'মালঞ্চ' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। তারপর থেকে কবি হিসেবে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তবে, কবি হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও বনফুলের খ্যাতি মূলত ছোটগল্পকার হিসেবেই। বনফুল তাঁর সাহিত্যজীবনে হাজারেরও বেশি কবিতা, ৫৮৬ টি ছোটগল্প, ৬০ টি উপন্যাস, ৫টি নাটক ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেছেন। বনফুলের গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে–

বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দুবিসর্গ (১৯৪৪), অদৃশ্যলোক (১৯৪৭), অনুগামিনী (১৯৪৭), তন্বী (১৯৫২), নবমঞ্জরী (১৯৫৪), উর্মিমালা (১৯৫৫), সপ্তমী (১৯৬০), দূরবীণ (১৯৬১), বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প (গল্প সংকলন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), বনফুলের গল্প সংগ্রহ, প্রথম ভাগ (গল্প সংকলন–১৩৬২ বঙ্গাব্দ) বনফুলের গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ (গল্প সংকলন–১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থে।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–তৃণখণ্ড (১৯৩৫), বৈতরণীর তীরে (১৯৩৬), কিছুক্ষণ (১৯৩৭), দ্বৈরথ (১৯৩৭), নির্মোক (১৯৪১), সে ও আমি (১৯৪৪), জঙ্গম (১৯৪৪), অগ্নি (১৯৪৬), নবদিগন্ত (১৯৪৯), স্থাবর (১৯৫১), পঞ্চপর্ব (১৯৫৪), লক্ষ্মীর আগমন (১৯৫৪) ইত্যাদি।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উলেখযোগ্য হলো– বনফুলের কবিতা (১৯২৯), ব্যঙ্গকবিতা (১৯২৯), অঙ্গারপর্ণী (১৯৩৩), চতুর্দশী (১৯৪৭), করকমলেষু (১৯৪৯) ইত্যাদি।

আমাদের আলোচনা পরিসর বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য, প্রকরণ, শিল্পকুশলতা।

> যে আমি একদিন উদার আকাশের তলায় শ্যামল মাঠের সবুজ গমের শিষ ছিলাম, সেই আমি নানারকম 'মেক আপ' নিয়ে ওই শত রকম হয়েছি। আমার প্রত্যেক 'মেক আপ' টাই বাজারে চলছে।[১]

বৃত্তিসূত্রে চিকিৎসক হওয়ায় বৈজ্ঞানিক অন্বীক্ষা বনফুলের মজ্জাগত। "অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় চারদিকে বহমান অদৃশ্য জীবনলোকের এক অন্তর্লীন নির্ভুল পরিচয় প্রতিদিন আহরণ করেন চিকিৎসক বলাইচাঁদ; আর শিল্পী বনফুল অচেনা, অদেখা, অব্যবহিত জীবনের অজস্র রূপচিত্রকে আহরণ করে আনেন আপন জ্যোতির্ভিক্ষু চেতনার অণুবীক্ষণযন্ত্রতলে তাকে অনাবৃত করবেন বলে বিস্মিত বিমুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টির সামনে।"[২] "ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে তার নির্মম নিপুণ ব্যবহার হয়েছে ছোটগল্পে মানব জীবনের বিশ্লেষণে।"[৩] অন্তসারশূন্য জীবন, মুখোশধারী মেকি জীবন বনফুল তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তবে বনফুলের গল্পের সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো যাদের মুখোশ খুলেছেন তাদের প্রতি আমাদের ক্রোধ কিংবা ঘৃণা কোনটাই তৈরি হয় না বরং সহানুভূতি তৈরি হয়–গল্পকার হিসেবে এটাই বনফুলের অনন্যতা, প্রাতিস্বিকতা; এটাই তাঁর কৃতিত্ব। 'ক্যানভাসার গল্পে'– যে দাঁতের মাজন ক্যানভাসার হীরালাল বিক্রয় করে মানুষকে বলে বেড়ায় দাঁত হবে শক্ত, মজবুত– সেই হীরালালের বাঁধানো দাঁত যখন খুলে পড়ে তখন প্রকারান্তে হীরালালের ভণ্ডামির মুখোশই খুলে যায়; কিন্তু সাথে সাথে হীরালাল যখন বলে– "কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ– এই করে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে"[৪]– তখন হীরালাল যে ফাঁকি দিয়ে মাজন বিক্রি করে সেটার জন্য তার প্রতি রাগ বা ক্রোধ তো তৈরি হয়ই না বরং তার প্রতি কেন জানি একটু মমত্ববোধ তৈরি হয়। এখানেই গল্পকার হিসেবে বনফুলের সফলতা।

কিংবা 'হাসির গল্পে'র হরিহর বাবু। সেও কী মুখোশধারী মেকি জীবনের প্রতীক নয়? যার মেয়ের জ্বর ১০৫ ডিগ্রি, মুদির দোকানের বিল দিতে না পারায় মুদি কটূক্তি করে গালমন্দ করে চলে যায়, গিন্নির আস্ফালন যাকে হজম করতে হয় নিয়মিত; ঘরে হাতলভাঙা চেয়ারটি যার অনটনের বারতা প্রচার করছে– সে যখন মনে মনে হাসির গল্পের প্লট ভাবছে, ভাবতে হচ্ছে কারণ হাসির গল্প লেখায় তার সুনাম–"চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে, বারান্দায় ক্রন্দনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিবাবু বাম হস্তে রগ দুইটি টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়াছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হরিবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাহার নাম।"[৫] এর চেয়ে বড় আত্মপ্রতারণা, আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে!

অক্ষম মানুষের বিদ্রুপ বিড়ম্বিত জীবনের কাঁটা হাতে নিয়ে মালা গেঁথেছেন শিল্পী বলাইচাঁদ। 'পাশাপাশি' গল্পের বিকাশবাবু এই রকম আর একটি চরিত্র। যিনি অফিসে চাকরি করেন বলে সকলের কাছে প্রচার করেন এবং প্রতিদিন সকাল বেলা নাস্তা করে বাসা থেকে বের হন অফিসের উদ্দেশ্যে কিন্তু গল্পের শেষে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়; হিসেব-নিকেশ ওলটপালট হয়ে যায় যখন শোনা যায় তার অকপট স্বীকারোক্তি–

> বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না। সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটা পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে হৈ হৈ করে একটা ডাক্তার ফাক্তার ডাকতে হতো ধার করেও! ছিলাম না, নিশ্চিন্ত! চলুন একটু পা চালিয়ে– ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে– সেইটাতে গিয়ে শুয়ে বসে সারাটা দিন– বুঝলেন– লেট হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে দখল করে– বুঝলেন![৬]

সংসার বাস্তবতা তথা জীবনবাস্তবতার এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে কঠিন, এর চেয়ে মর্মস্পর্শী, নিদারুণ সত্য আর কী হতে পারে! আদতে হতে পারে কি না। জীবন কত বিচিত্র হতে পারে, কত জটিল হতে পারে, কত নিরাসক্ত হতে পারে বনফুলের গল্প পড়লে তা বোঝা যায়। মানুষ শুধু নিজের সুখের জন্য কতটা স্বার্থপর হতে পারে কতটা বিবেকবর্জিত হতে পারে যে অন্যায়টাও তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়– বনফুল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন 'মানুষ' গল্পে–

> আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকরি হইয়াছে। এই চাকুরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটি অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবল সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকরিটি পাইয়াছে। এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না। উপরন্তু খুশি হইলাম।[৭]

মানুষ কিভাবে বিবেকহীন, মানবতাবিবর্জিত হয়ে পড়ছে, সেটা জেনেও যে আমাদের কিছু করার নেই। সংসার নামক যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে বিচূর্ণ হয়ে আমাদের ভেতরের শুভবোধের যেন ঘটেছে অপমৃত্যু। আমরা যেন পরিণত হয়েছি প্রয়োজনের, চাহিদার হাতে বন্দি এক পুতুলে। আর তাইতো–

> উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।[৮]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে–

> বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানব চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।[৯]

দুই.

'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা/ ছোট ছোট দুঃখ কথা/ নিতান্তই সহজ-সরল'– ছোটগল্প বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এ আপ্তবাক্যের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পটিতে:

> কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
> পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।
> কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
> খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
> চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
> কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
> এমনি কাঁচাই...
> কিংবা ভেজে ভেগুন-সহযোগে।
> যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।
> কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক... দাঁত ভাল থাকে।
> কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
> বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
> বলে- নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।
> কাটে না, কিন্তু যত্নও করেন।
> আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।
> শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ – সে আর এক আবর্জনা।
> হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।
> মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না,পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।
> বলে উঠল,– বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলি... কি রূপ!
> থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার... এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ–
> খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
> কবিরাজ নয়, কবি।
> নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেকদূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
> ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।[১০]

সোয়া এক মিনিটের একটি গল্প। অথচ এই গল্পের মধ্য দিয়ে একজন বধূর জীবনসমগ্রতা যেন প্রকাশিত। পাঁচশত পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসে যা সম্ভব, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাকেই সম্ভব করেছেন সংক্ষিপ্ত সাতাশটি বাক্যে–"গল্প আকারে কত ছোট ও হাল্কা হয়ে জীবনের কত বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারে তা বোধ করি সে কথা বনফুলের কথাশিল্পে রয়েছে। কত কম বলে কত বেশি বলতে পারা যায় – এ পরীক্ষায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই।"[১১]

যার শেষ বাক্যটি বাদ দিলে একটি বিশুদ্ধ নিম গাছের বর্ণনা। তার উপকারিতার ফিরিস্তি, ফুল পাতার সৌন্দর্য বর্ণনা ইত্যাদি। কিন্তু শেষ বাক্যটি– "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা"– যেই না পাঠক পড়লো অমনি তার সমস্ত হৃদয় থেকে নিম গাছ উধাও হয়ে গেল, হৃদয়পটে ভেসে উঠলো এক অনাদ্রিত, অবহেলিত অথচ উপকারি, কর্ম সুনিপুণ কোন গৃহবধূর ছবি। যে নিজে সবাইকে খাবার পরিবেশন করে অথচ নিজে খায় সবার শেষে অথবা নিজের বেলায় হয়তো জোটে না; পরিবারের সবার রোগে শোকে সেবা করে, অথচ তার শরীর খারাপ নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। সংসারের সবাইকে খুশি করতে করতে ক্লান্ত এই বধূ যখন কোন সৌন্দর্যপিয়াসীর হাত ধরে চলে যেতে চায় অসীম সৌন্দর্যলোকে– যে দিকে দুচোখ যায়– তখন বুঝতে পারে বড্ড দেরি হয়ে গেছে, কারণ ততদিনে মাটির ভিতর অর্থাৎ এই পরিবারের গভীরে তার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। মাটির ভিতরে নিমগাছের শিকড়ের মতো এই সংসারের গভীরে তাঁর বন্ধনও অনেক ছড়িয়ে গেছে । মন চাইলেও আজ আর তাই পারিবারিক বন্ধনের এই শক্ত শেকড় ছেঁড়া সম্ভব নয়।

লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অবশ্য এত কথা বলেন নি। এগুলো পাঠকের ভাবনা, কল্পনা, পাঠকের অনুধ্যান; দরদী পাঠক যেন ডুবে যায় বোধের অনেক গহীনে। আর তাই বনফুলের গল্পের শেকড় ছিড়ে পাঠকও তাই আর বেরিয়ে আসতে পারে না। "বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোটগল্পগুলি এক অপরূপ বিস্ময়;– সে কেবল ঐ আশ্চর্য বাকসংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয় , – শৈলী এবং ভাবানুষঙ্গে এমন এক রহস্যকরতা রয়েছে, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন নিরন্তর গুঞ্জিত হয়ে ফেরে।"[১২] অনেক কিছু বুঝিয়েছেন অল্প কথায়, আকারে ইঙ্গিতে, ইশারায়। এক কথার মারপ্যাঁচে বুঝিয়েছেন অনেক কথা; একটু ইশারা, ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন অনেক ঘটনা। আর এই কৃতিত্বই বনফুলকে বাংলা সাহিত্যের হাজারো সাহিত্যিকের ভিঁড়ে করেছে অনন্য, প্রাতিস্বিক, স্বমহিমায় ভাস্বর।

আবার বর্ণনা যে একেবারে দেন নি এমন নয়। প্রয়োজনমত অনুপুঙ্খ বর্ণণা দিয়েছেন–

> গোমস্তার মত চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামাকাপড়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই।[১৩]

কিংবা,

> একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেন্ডারের ছবি– ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা।[১৪]

কিংবা,

> পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধুলি ধুসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও আবার ডান দিকে ডান্টাটা নাই, সেদিকে সুতা বাধা।
> সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা; চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয় গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতি ফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।[১৫]

কিংবা,

> হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বান্ডিল খালি বস্তা, দুই হাড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বাটি, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোচকা ও পুটলি ও একটিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্টক্লাসেই তুলিয়া দিল।[১৬]

অর্থাৎ বনফুল গল্পের প্রয়োজনে বর্ণনাও যে মাঝে মাঝে দেন নি তা নয়, দিয়েছেন– ততটুকু দিয়েছেন যতটুকু পাঠকের ঘটনা বা প্রসঙ্গকে বুঝতে প্রয়োজন, তার বেশি একটি শব্দও নয়। "বনফুলের গল্পে কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু তারা কিছু বলে না, বলিয়ে নেয়। বনফুল এমনভাবে বাক্য সাজান, ঘটনা তৈরি করেন এমনভাবে সংলাপের গুরুত্ব ও দায়িত্ব ওজন করেন, যা স্বর্ণকারের স্বর্ণ ওজনের সমতুল।"[১৭] "সাহিত্যজীবন গ্রহণের প্রথম থেকেই অঙ্গগঠনে সচেতন, সতর্ক, মিতবাক। একটি গোপন রহস্য সবসময়েই তাঁর গল্পে এমনভাবে অন্তর্গূঢ় অথচ গতিশীল থাকে যাকে বুঝতে হলে, ধরতে হলে গল্পের শেষ বাক্যটি পাঠকদের পড়তেই হবে।"[১৮]

তিন.

গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো– 'শেষ হইয়াও হইলো না শেষ'– কিন্তু বনফুলের গল্পের স্টাইল যেন শুরুই হয় মাঝখানে–

> কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী। (ক্যানভাসার)

কেউ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও মনে হয় এ বুঝি গল্পের মাঝখান। এর আগে বুঝি কিছু অংশ বাদ পড়েছে। কিন্তু বনফুলের গল্পের আসলে এটাই শুরু। বনফুলের এ এক আশ্চর্য কুশলতা। পাঠককে তিনি ধীরে ধীরে গল্পে টেনে নেন না, প্রথমেই গল্পের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেন। তারপর ক্রমান্বয়ে টেনে নেন বিস্তারে। সাহিত্যতাত্ত্বিক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প সম্পর্কে যেমন বলেছেন–

> পাঠকের মনোযোগকে ছোটগল্প সূচনাতেই আকৃষ্ট করবে । কখনোই তাকে ঢিলে হতে দেবে না এবং নির্ভুল দ্রুত পদক্ষেপে তা চূড়ান্তে, ক্লাইম্যাক্সে উপনীত হবে... ।[১৯]

বনফুলের গল্পে তার এতটুকুও ব্যত্যয় ঘটে নি। প্রায় সমস্ত গল্পেই তিনি এই বিশেষ প্রকরণকে এই বিশেষ শৈলীকে ব্যবহার করেছেন। আমরা কিছু গল্পের প্রথম বাক্যগুলোর উদ্ধৃতি দিতে চাই আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে–

> তর্ক হইতেছিল (তর্ক ও স্বপ্ন)
>
> কেনারামকে বিধূভূষণ বারণ করেছিল (মহামানব কেনারাম ও ক)
>
> শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল (শর শয্যা)
>
> কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। (নিম গাছ)
>
> দেখা যাক এইবার কী করে (মুহূর্তের মহিমা)
>
> জিৎ গিয়া হুজুর (চম্পা মিশির)
>
> হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা সাবানের বাক্সে নানারঙের 'রিবন' রয়েছে। (যেমন আছে থাক)

তাঁর গল্প আসলে শুরু হয় মাঝখান থেকেই। লেখকের অভিপ্রায় যেন এমন– শুরুতে কী ঘটেছে সেটা এবার ভাবতে থাকো। তর্ক হইতেছিল– কী নিয়ে তর্ক হইতেছিল? কেনারামকে বিধূভূষণ বারণ করেছিল– কী বারণ করেছিল? এই রকম নানা প্রশ্ন কিংবা কৌতূহল গল্পের শুরুতেই বলাইচাঁদ কৌশলে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেন। "ছোটগল্পকার গোড়াতেই 'এফেক্ট' নির্মাণে যত্নবান হন, তারপর ঘটনার ডালপালা সাজান। যদি প্রথম বাক্যে এই 'এফেক্ট' এর ইশারা না পাওয়া যায় তবে গল্প নির্মাণ বৃথা।"[২০]

পাঠকের ভাবনার ভীতকে আলোড়িত করা, কল্পনাকে উদ্দীপিত করা যেন বনফুলের সাহিত্যিক বীক্ষণ। অনেক কথা তিনি বলেন নি– বলতে পারেন নি এই জন্যে নয় বলতে চান নি। বলার মাঝে রেখে দিয়েছেন ফাঁক, শূন্যতা; যেটুকু পূরণ করার দায়িত্ব যেন পাঠকের। পাঠকও আসলে এখানে শুধু পাঠক নয়, পাঠককেও এখানে হতে হয় কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক, অনুসন্ধিৎসু– তা না হলে বনফুলের গল্প হৃদয়ে ঠিক জমে ওঠে না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলে বনফুলের গল্পের মূল স্বাদও যেন ঠিক ধরা দেয় না। বনফুল প্রকৃতপক্ষে জীবন ও জগতের প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহের 'কাটপিস' আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তার মধ্য দিয়েই আমাদের সমস্ত ঘটনাধারাকে মানসচক্ষে অবলোকনের প্রয়াস চালিয়েছেন। 'মানুষ' গল্পে–

> চীন জাপান যুদ্ধ
>
> স্পেন
>
> বাঙালির দুর্গতি ও তাহার প্রকাশ
>
> কংগ্রেস!

আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় ইতিহাস বর্ণনা করেছেন কয়েকটি শব্দে। চীন জাপান যুদ্ধ হচ্ছে – সেটা না হয় বোঝা গেল কিন্তু 'স্পেন'। একটি মাত্র শব্দ। কী ঘটছে স্পেনে? কিংবা আর একটি শব্দ 'কংগ্রেস'। কী করছে কংগ্রেস? কৌতূহলী পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। কিন্তু লেখক যেন মুচকি হেসে নির্বিকার। কারণ তিনি তো ইতিহাস বর্ণনা করতে বসেন নি, আর তাই ইতিহাসের ঝিলিক দিয়ে চলে গেছেন মূল ঘটনায়–

> দুয়ারে কড়া নাড়িয়া উঠিল

তাহলে কাহিনিতে ইতিহাসের এই খণ্ডচিত্রের কারণ কী? প্রয়োজন দুটো– একটি হলো জ্ঞানান্বেষী পাঠকের কৌতূহলে ঘটনাগুলো গোচরীভূত করা। পাঠক যদি কৌতূহলী হয় তাহলে তার বিস্তৃত বর্ণনা ইতিহাস থেকে জেনে নেবে। আর একটি উদ্দেশ্য বিশ্বের নানা প্রান্তের ঘটনাধারার সাথে মানুষ কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। মানুষের সভ্যতার যে বিকাশ বা পরিবর্তন কিংবা মন ও মনন বা চিন্তা চেতনায় যে পরিবর্তন– তাতে বৈশ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে– সেই বিষয়ে একটা যোগসূত্র তৈরি করা। মানুষের মন ও মনন বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা নয়, কিংবা মানুষের মনোজাগতিক যে পরিবর্তন তাও স্বয়ম্ভু নয়– সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বের কোন না কোন ঘটনার অভিঘাতেই মানুষের চৈতন্যকে নব নব রূপে রূপদান করছে। ফলে পরিবর্তিত

হচ্ছে মানুষের চিন্তা, চেতনা, বোধ, সর্বোপরি আচরণ। বনফুল বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ গোত্রের, বিভিন্ন মতের ও পথের নানা মানুষের এই পরিবর্তনশীল, বিচিত্র, বহুধাবিভক্ত, শত তরঙ্গিত জীবনাচরণের এক নিপুণ, বর্ণিল ছবি যেন এঁকেছেন তার ছোটগল্পে।

চার.

বনফুলের গল্পের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো সাহিত্যিক বৈপরীত্য বা Literary Contrast । ঘটনা বা সৌন্দর্য বর্ণনায় বিশ্ব সাহিত্যিকগণ প্রধানত দুই ঘরানায় বিভক্ত। এক ঘরানা অস্তিবাদী– তাদের উদ্দেশ্য পাঠকের হৃদয়ে শুভবোধের জাগরণ ঘটানো। আর তাই তারা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে বেছে নেন সমাজের, রাষ্ট্রের, পৃথিবীর শুভকর বা মার্জিত রুচির ঘটনা বা কাহিনিকে। অশুভ, অনাচার, অনাসৃষ্টি, অবিশ্বাস, অকল্যাণ, অবক্ষয়কে এড়িয়ে চলেন। অন্য ঘরানার সাহিত্যিকরা –যারা নেতিবাদী তাঁরা বেছে নেন সমাজের অবক্ষয়, অবিশ্বাস, অনাসৃষ্টি, অশুভ, অমার্জিত বিষয়কে। আর দু'এক জন আছেন এই দু'য়ের মাঝামাঝি। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। একই সঙ্গে তিনি জীবনের শুভ ও অশুভ, সুন্দর ও অসুন্দর, মানবিক ও অমানবিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন। পুরো সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন রচনায় নয়, এক গ্রন্থেও নয়, একই গল্পে, একই চরণে, পাশাপাশি–

> এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ লোক ও যুবতী ভিখারিনী ইতঃপূর্বে আরও দেখিয়াছি। কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম। ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে একই উদ্দেশ্যে।[২১]

বনফুলের গল্পে Literary Contrast বা সাহিত্যিক বৈপরীত্য কয়েক ধরনের । যেমন–

ক. চারিত্রিক বৈপরীত্য

খ. ঘটনার বৈপরীত্য

গ. চেতনার বৈপরীত্য

ক. চারিত্রিক বৈপরীত্য:

মানুষে মানুষে চরিত্রের কত ভিন্নতা, সেই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষের পরিচয় মেলে বনফুলের গল্পে। একই ঘটনাধারা বা কাহিনিতে দুই মেরুর দুটি চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে বনফুল মানুষের চরিত্রের বৈপরীত্যের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'মানুষের মন' গল্পে নরেশ ও পরেশ দুই ভাই, কিন্তু –

> "এক বৃন্তে দুইটি ফুল– এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি । নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এই – শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুনি সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মতো পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

আবার নরেশ ও পরেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

> পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা গোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি। কপালে চন্দন।

নরেশ ও পরেশের মানসিক বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

> মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।
>
> যখন নরেশের 'কম্বাইন্ড হ্যান্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাটলেট' বানাতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন।

কিংবা 'শ্রীপতি সামন্ত ' গল্পে–

> পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধুলি ধুসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও আবার ডান দিকে ডান্টাটা নাই, সেদিকে সুতা বাধা।'
>
> প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবি-পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালি। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন, দ্যাট কান্ট বি। আই কান্ট অ্যালাও। ... এই বৃদ্ধের সহিত বাগবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের প্রবৃত্তি হইলো না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

এই দুই বেশভুষায় সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মানুষ যখন এক কামরায় উঠলেন তখন দেখা গেল বেশভূষাধারী সাহেবী পোশাক পরা লোকটি আসলে অন্তঃসারশূন্য, কপর্দকহীন। আর জীর্ণ শীর্ণ বেশভূষার শ্রীপতি সামন্ত শুধু নিজের ভাড়া-ই কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিলেন না ঐ ভণ্ড সাহেবটিকেও বিনা টিকেটে ভ্রমণের সাজা ও লজ্জা থেকে বাঁচালেন।

'বিনোদ ডাক্তার' গল্পের শেষ বাক্যে তাই লেখকের সমাপনী বক্তব্য– "কত রকম মানুষ যে আছে এই পৃথিবীতে!" আর এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন–

> তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর দুলালটি সম্মোহিত করে ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির হলো যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না! এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে। ...ফিরবার সময় একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চেখে পড়ল একটি খবর একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

'পরিবর্তন' গল্পের কাহিনিতেও এমন চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। স্বামী হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে। স্ত্রী সরমার অক্লান্ত স্বামীসেবা ক্রুটিহীন। কিন্তু এত সেবা যত্ন সত্ত্বেও যক্ষ্মার যখন দিন দিন অবনতি ঘটছে ভালো হবার লক্ষণ নেই তখন স্বামীর মৃত্যুতে নিজের জীবনকে অসার মনে করে সরমা পতিহীন এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকতে চায় না । তাই সে হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ গোপনে পান করে এবং ফলশ্রুতিতে একসময় তার যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। তার দুটো লাঞ্চই আক্রান্ত হয়। তাকে আর বাঁচানো যায় না। কিন্তু হরিমোহন ধীরে ধীরে সেরে ওঠে। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে সে নিজেকে সারিয়ে নিয়ে আসে। সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে হরিমোহন দেশে ফিরে আবার সরমা নামেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করে। যে স্ত্রী স্বামীর কারণে, স্বামীহীন জীবনকে অসহ্য মনে করে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়– যার কারণে বেছে নেয় সেই পতিদেবতা আবার আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করে। জীবনাচরণের কী চরম বৈপরীত্য! বনফুল জীবন খুঁড়ে খুঁড়ে জীবনের গভীরে গিয়ে জীবনের এই অদ্ভুত বৈপরীত্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

খ. ঘটনার বৈপরীত্য:

বনফুলের গল্পে ঘটনাধারার বৈপরীত্যও লক্ষ্যযোগ্য। পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ঘটনাকে দুটি ভিন্ন স্রোতের মত পাশাপাশি প্রবাহিত করে তিনি ঘটনাগুলো আমাদের নিকট তুলে এনেছেন। 'তাজমহল' গল্পে সম্রাট সাজাহানের ভালোবাসার সাথে বৃদ্ধ ভিখারি সাজাহানের ভালোবাসা পাশাপাশি দেখিয়ে কার ভালোবাসা কত গভীর কিংবা ফকির সাজাহানের ভালোবাসা যে সম্রাট সাজাহানের ভালোবাসার চেয়ে ন্যূন নয়, সেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। ফকির সাজাহান তার স্ত্রীর জন্য তাজমহল হয়তো গড়তে পারে নি, কিন্তু ভাঙ্গা ইট আর কাদা দিয়ে ভালোবাসার যে কবর সে গেঁথেছে তার মূল্যই বা কম কিসে। লেখক ঘটনাধারাটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন–

> বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ। অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজি হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সে নিজে ভিজে অসুস্থ বউকে চাদরের আচ্ছাদনে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যদিও মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারে না কিন্তু তাতেও তার ভালোবাসা পরাজিত হয় না। ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষায় সে বেগমের সমাধিকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টায় রত থাকে–

> আরও কয়েকদিন পরে। সেদিনও কল থেকে ফিরছি– একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা দিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে!
>
> কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব?
>
> বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।
>
> বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর!
>
> কবর?
>
> হাঁ হুজুর।
>
> খানিক ক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম তুমি থাক কোথায়?
>
> আগ্রার আশে পাশে ভিক্ষা করে বেড়ায় গরিব-পরবয়।
>
> দেখিনি তো কখনো তোমাকে । কি নাম তোমার?
>
> ফকির শাজাহান!

'দর্জি' গল্পে মহাত্মা গান্ধীর আগমনকে কেন্দ্র করে দুই বৎসর আগের আর পরের ঘটনাটিকে পাশাপাশি দেখিয়েছেন লেখক। একই ব্যক্তি একই শহরের একই স্টেশন অতিক্রম করছে কিন্তু ঘটনাধারার পার্থক্য বিস্তর। দুই বছর পূর্বে শহরের সব লোক মহাত্মা গান্ধীকে দেখার জন্য জড় হয় । তাদের সকলের হাতে পতাকা। শহরে উৎসবের আমেজ। তাকে সবাই সংবর্ধনা দেয়। কিন্তু দুই বছর পরে তিনি যখন স্টেশনে আসেন তখন মানুষ তাকে কালো পতাকা দিয়ে শোক জানায়।

গ. চেতনার বৈপরীত্য–

চেতনার বৈপরীত্য বনফুলের গল্পের আর একটি চিত্তাকর্ষক দিক। সময়ের বিবর্তনে মানুষের ভালোলাগা, আকর্ষণ, চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে মানসিকতায়। দশ বছর আগে ও পরে মানুষের চৈতন্যের পরিবর্তনের দিকটি লেখক পাশাপাশি তুলে ধরেছেন 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পে–

> আমি তখন তন্ময়।
>
> চকিতে একবার হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনো ঘন্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্ধেকের উপর বাকি। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।
>
> অদ্ভুত বই। বাকি ঘন্টাটা যেন উড়িয়া গেল।
>
> আমার ট্রেনের ঘন্টা পড়িল।
>
> বই-এর তখন অনেক বাকি।
>
> রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।
>
> বলিলাম– নেক্সট ট্রেনে যাব– এ বই শেষ না করে উঠছি না!

কিন্তু দশ বছর পর একই বই যখন লেখকের হাতে আসে তখন তার আর আগের মত আগ্রহ থাকে না, কেমন যেন গোলমাল লাগে। লেখকের বর্ণনায়–

> তবু পড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হইলো – না, আর তো চলে না।
>
> একি সেই বই যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্ধ্বশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?
>
> এমন রাবিশ মানুষ লেখে!

এই বই সেই বই-ই; এই মানুষ সেই মানুষ-ই, তবে এই পাঠক সেই পাঠক নয়। ব্যক্তির ভিতরে পাঠকের যে সত্তা ছিল, যে চেতনা ছিল, ভালোলাগার যে অনুভূতি ছিল সময়ের বিবর্তনে তা বিবর্তিত হয়ে গেছে। চৈতন্যের পরিবর্তনের এই চিত্রকে বনফুল পাশাপাশি রেখে উপস্থাপন করেছেন, যাতে মানব চরিত্র ও চৈতন্যের পরিবর্তনশীল এই দিকটি আমাদের সামনে প্রকটিত হতে পারে।

'যুগল স্বপ্ন' গল্পে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে কিন্তু তাদের চৈতন্যে কত পার্থক্য সে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে দুজন শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। দাম্পত্য জীবনে বাহুলগ্ন, বক্ষলগ্ন হয়েও অন্তরের দিক থেকে, কামনার দিক থেকে কত দূরের, দুজনে যেন দুই দ্বীপের বাসিন্দা। স্ত্রীর মনে অন্য পুরুষ আর স্বামীর মনে অন্য মেয়ে।

আবার কখনো একটি গল্পের অবয়বে পাশাপাশি দুই ধরনের চেতনাকে তুলে ধরে দুই চৈতন্যের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বনফুল যেন চিরন্তন কল্যাণকামী, সর্বশুভকর, বৈশ্বিক কোন চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করার গোপন মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন পাঠককে। 'আত্মপর' গল্পে–

> সারা সকাল খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে– অমনি মুখের উপর খপ করে কি যেন একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই, ডানা নেই কিম্ভুতকিমাকার। রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠানে ছুড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল– টপ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখিদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। আমি এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।
>
> তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে।
>
> আমার বাড়িতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারো গেল। ... বাড়িতে কান্নার তুমুল হাহাকার।
>
> ভিতরে আমার স্ত্রী মুর্ছিত, অজ্ঞান। তাকে নিয়ে বাড়ির কয়েকজন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপরে শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।
>
> তখন বহুদিন পরে– কেন জানি না– সেই পাখির ছানাটির কথা মনে পড়ে গেল।
>
> সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে অসহায় পাখির ছানাটি, আর তার চারদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকার।

সন্তান হারানোর বেদনা যে কি ভয়ানক তা নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য অন্যের সন্তানের ক্ষেত্রেও তেমনই। এমনকি পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নিজের সন্তান না হারালে মানুষ সন্তান হারানোর ব্যথা বোঝে না। পাখির শাবককে তাই অনায়াসে তুলে দেয় বিড়ালের মুখে। পাখিদের কিচির মিচির, চিৎকার কোনো ভাবের উদয় ঘটায় না; কিন্তু নিজের সন্তান মারা গেলে সেই যন্ত্রণার গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। পাশাপাশি দুই চেতনাকে রেখে বনফুল পাঠকের চেতনাকে শাণিত, প্রদীপ্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন এক বৈশ্বিক মানবচেতনায় পাঠককে জারিত করতে।

পাঁচ.

বনফুল বৈঠকী মেজাজের মানুষ ছিলেন। আর পেশার কারণে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে ছিল তাঁর কারবার। ফলে সমাজের বারোয়ারী মানুষের মানসিকতা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ অথচ স্বচ্ছ। বনফুলের গল্পের পরতে পরতে এই সব বিচিত্র মানুষের বহুবিচিত্র কামনা-বাসনা,ধ্যাণ-ধারনা, বিশ্বাস-সংস্কারের নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে।

সমসাময়িক মানুষের সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতি বনফুলের গল্পে প্রচ্ছদের মতো উৎকলিত। বনফুল তাঁর গল্পের কাহিনিকে, ঘটনার প্রবাহধারাকে সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাস, নীতি ও প্রথার ভিতর থেকে দেখাতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ কত গভীর ও কত ভয়ঙ্কর– তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গল্প 'জাগ্রত দেবতা'। সনাতনপুরের অধিবাসীদের কেন্দ্র করে লেখক যে বিশ্বাসের, যে প্রথার কাহিনি তুলে ধরেছেন তা আসলে ভারতবর্ষের অনেক গ্রামেরই বাস্তব চিত্র। চিরাচরিত প্রথা ও বিশ্বাসকে মানুষ কেমন আঁকড়ে ধরে থাকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই সনাতনপুর গ্রামের অধিবাসীর, বিশেষ করে নীলমণি শেষ পর্যন্ত সংস্কারের মোহে পাগলপ্রায় হয়ে যখন প্রচণ্ড রোদ্রে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি চষে বেড়ায়–

> প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু, স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। সনাতনপুরের অধিবাসীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

গ্রামের আর সবাই স্বস্তি পেলেও পাঠকের ভাবনায় কিন্তু এ প্রশ্ন পাক খায় তবে এর পরে কার পালা? সংস্কার আর প্রচলিত বিশ্বাস আমাদের মনে এমনভাবে আস্তানা গেড়েছে এর থেকে আমাদের বুঝি মুক্তি নেই। জীবনের, পরিবারের, সমাজের, সংসারের সর্বক্ষেত্রেই এইরকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আর তার ফলশ্রুতিতে মানুষের নানা দুর্ভোগ ও দুর্গতি কতদূর পৌঁছেছে বনফুল তা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমাদেরও তা পরখ করিয়েছেন। 'কাকের কাণ্ড' গল্পে কাকের ডাক অশুভ– এই সংস্কারের বশেই জগত্তারিণী কাক তাড়ানোয় প্রবৃত্ত হয়। কর্তা যে অসুখে মারা যায় সে অসুখ হওয়ার পূর্বে কাক অমন অলক্ষুণে ডেকেছিল। আজ আবার কাকের ডাক শুনে তার মনে অমঙ্গল আশঙ্কায় ভরে ওঠে। কেননা তার সন্তানেরা সব বিদেশে থাকে। তার মনে হয় এই কাক বুঝি কোন অশুভ বার্তা নিয়ে এসেছে। আর তাই অসুস্থ শরীর নিয়েও সে কাক তাড়ানোয় প্রবৃত্ত হয় এবং তাড়াতে গিয়ে উঠানে পিছলে পড়ে এক কাণ্ড করে বসে। আর সেই খবরে তার ছেলেরা সবাই ছুটে আসে। সামান্য একটা কাকের ডাকের কুসংস্কারের ফলে কী একটা অঘটন ঘটে যায় পরিবারটিতে।

'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ' গল্পে প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বর বাবুর হঠাৎ নিরুদ্দেশকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের চিন্তা চেতনার দীনতা, নীচতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। তিলকে তাল করার যে স্বভাব মানুষের এবং একে অন্যের চরিত্রের ব্যাপারে কী রকম সন্দিহান সেই বিষয়ের এক চমৎকার মনোবিশ্লেষণাত্মক ঘটনাধারার সৃষ্টি করা হয়েছে–

> কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।
>
> যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমতো চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমায় তদ্বির করিতে খুলনা গিয়েছেন। যাইবার সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।
>
> কথাটা সর্বৈব মিথ্যা প্রবীণ হালদার মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল, তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে! ছি ছি!

এতৎ প্রসঙ্গে ভাদুড়ী মহাশয় য-ফলা আ-কার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করিলেন। বলিলেন, আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা–

পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বল তো হে?

> দেখা গেল, হালদার মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাসস্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, শৈলেশ যে ভেতরে ভেতরে এত জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অত বড় ছেলে, অত বড় মেয়ে–
>
> ভাদুড়ী মহাশয় আবার বলিলেন, ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!...

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের কল্পনা কত রকমের হতে পারে, সম্ভব অসম্ভব কোন কল্পনা করতেই সে যেন ছাড়ে না– বনফুলের গল্পে মানব চরিত্রের এই নিগূঢ় অথচ চিরন্তন সত্যটি চমৎকারিত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। যে কোন একটি বিষয় অর্ধেক দেখে বা বাইরে থেকে দেখেই আমারা মন্তব্য করতে শুরু করি। কিন্তু যখন বিষয়টি সামগ্রিক সত্যে উদ্ভাসিত হয় তখন দেখা যায় আমাদের কল্পনা সর্বৈব মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে ভরপুর।

'সুলেখার ক্রন্দন' গল্পে একটি ষোড়শী তন্বী জ্যোৎস্নামদির রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে কাঁদছে– এই রকম একটি দৃশ্য পাঠকের মনে কত ধরনের কল্পনার জাল বুনতে পারে তার একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। কেন তার এই ক্রন্দন?– এই প্রশ্নের উত্তরে মানুষের ভাবনা কত রকম হতে পারে তা গল্পকার দেখিয়েছেন এইভাবে–

> প্রেম! হইতে পারে বইকি। এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়নপলকে অশ্রুসঞ্চারের কারণ, প্রেম হইতে পারে। সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল তো!
>
> হয়ত এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণদাকেই তাহার বার বার মনে পড়িতেছে। নির্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়ত এই অশ্রু তর্পণ।
>
> অরুণদার কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস দুই পূর্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে।
>
> বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা-হাউসে দেখানো হইতেছে।... কিছুক্ষণ আগেই সিনেমায় লাস্ট শো হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নিচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোলাসে হলা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়ত তাহাতেই সুলেখার সিনেমা-শোক উথলিয়া উঠিয়াছে।
>
> আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণত যাহা করে, বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণত যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন, সুলেখা সম্ভবত তাহাই অবলম্বন করিয়াছে– অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কিন্তু শেষে যখন দেখা গেল সুলেখা কাঁদছে তার দাঁতের ব্যথায় তখন কল্পনা আর বাস্তবের তফাৎটুকু আমাদের সামনে প্রকটিত হয়ে ধরা দেয়। কল্পনায় আর বাস্তবে কত অসামঞ্জস্য সে বিষয়ের নিখাদ পরিচয় মেলে বনফুলের গল্পে। 'সমাধান' গল্পে নীহাররঞ্জনের কন্যা বুঁচি– 'কালো কুচ্ছিত মেয়ে'– যাকে নিয়ে পিতা নীহাররঞ্জনের যত না চিন্তা তার চেয়ে বেশি চিন্তা পাড়া প্রতিবেশীর–

> নৃপেন বলিল, এই দেখ না নীহারের অদৃষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে , তাও আবার এমন কদাকর–
>
> শ্যাম বোস বলিলেন, আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।
>
> হারু খুড়ো তামাকটাতে দুটো টান দিয়া কহিলেন, আরে ভাই আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়, রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরো মুশকিল কি না, কি যে হবে–

কিন্তু শেষে দেখা গেল সকলেরই চিন্তার অবসান ঘটলো একটি খবরে– "বুঁচি মারা গেছে কাল"। মানুষের অযথা কল্পনা, আগ বাড়িয়ে ফেনিয়ে তোলা ভাবনা যে কতটা নিরর্থক, কতটা অযৌক্তিক নিয়তির কষাঘাতে সেটাই যেন আমাদের বোধে আরো বেশি স্পষ্ট হয়। "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম/ সে কখনো করে না বঞ্চনা" রবীন্দ্রনাথের এই ব্রতের মতো গল্পকার বনফুলের ব্রতও যেন সত্য যত কঠিন বা নিদারুণ হোক না কেন তাকে মেনে নেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম, সাহিত্যিকের কর্ম। আর তাই জীবনের, সংসারের, সমাজের অনেক কঠিন সত্যকে বনফুল মেনে নিয়েছেন অকপটে; গল্পে গ্রহণ করেছেন নিষ্কম্পভাবে। লেখনি তার কাঁপে নি এতটুকুও। "বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে। কখনো তা সুন্দর কখনো কুৎসিত, কখনো তা উদার কখনো তা নীচ, কখনো আত্মসুখপরায়ণতায় অতি সংকীর্ণ কখনো পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত। মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয় আবার নরকের শয়তানও নয়। মানুষ মানুষই। সে ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচরণ করে, আবার ভুলের মাশুলও তাকে দিতে হয়, পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় মহার্ঘ্যমূল্যে। সব কিছু মিলিয়েই মানবজীবন, আবার তাই মানুষের নিয়তি। অদ্ভুত কিন্তু অত্যাশ্চর্য।"[২২]

অন্যায় ও পাপাচারীর পাপ শুধু দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি বনফুল হাতে হাতে তার শাস্তিও যেন দিয়েছেন। বিধাতার বিচারের আশায় বসে থাকা নয়, কিংবা অন্যভাবে বললে বলা চলে অপরাধের দণ্ড বিধাতা হয়তো দেন, তবে তার আগে প্রকৃতিই তার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করে থাকে। গল্পকার বনফুল নিজেই যেন এখানে বিধাতার কিংবা প্রকৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণ। শাস্তি তিনি দিয়েছেন আর সে শাস্তি কঠোর, নির্মম, নিষ্কম্প, নিরপেক্ষ। যার যেমন অপরাধ তার তেমন দণ্ড। সেখানে ক্ষমা নেই, শৈথিল্য নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই, অনুকম্পা নেই। 'আইন' গল্পে ডাক্তার টিসি পাল দুই হাজার টাকার

বিনিময়ে আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেআইনিভাবে একজনকে বাঁচাতে মিথ্যা সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয় এবং দম্ভ ভরে বলে–"এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।"[২৪] খুনের আসামিকে এভাবে মিথ্যা সাটিফিকেট দিয়ে অপরাধীকে বাঁচিয়ে যে অপরাধ ডাক্তার করলেন তার শাস্তিও হাতে হাতেই। কিছুক্ষণ পরেই পিয়ন একটি চিঠি দিয়ে যায় যার সারমর্ম হলো ডাক্তার টিসি পালের পুত্র রমেশ ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে বোঝা যায় সেই খুনি সেই ব্যক্তি যাকে ডাক্তার মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়েছে। অর্থাৎ নিজের পুত্রের হত্যাকারীকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বাবা নিজেই। মিথ্যাচারের, দুর্নীতির, লোভের এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে।

'চান্দ্রায়ণ' গল্পে আরএমএস এর শর্টার চন্দ্রবাবুর প্রায়শ্চিত্তটিও যেন প্রকৃতিবিধাতার দণ্ডবিধানেরই সার্থক উদাহরণ। চাকরির সুযোগ গ্রহণ করে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমপত্র পড়ার দুষ্প্রবৃত্তি তার মাথার উপরেই বজ্র হয়ে পড়লো যখন একদিন তার নিজের স্ত্রীর লেখা চিঠি তার কাছে এসে পড়ে যাতে অনঙ্গ নামক জনৈক প্রেমিকের উদ্দেশ্যে লেখা আছে–

> তোমারই আশায় পথ চেয়ে আছি। আর পারছি না তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি যেখানেই হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমনভাবে রাখবে সেখানেই তেমনিভাবেই থাকবো আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে।..আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।
>
> প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বাজ পড়িল।

বাজ আসলেই পড়ে তবে বাইরে নয়, আরএমএস এর শর্টার চন্দ্রবাবুর মাথায়। সুযোগের অপব্যবহার করে যে অপরাধ সে করে এ যেন তারই উপযুক্ত শাস্তি।

ছয়.

"বনফুলের গল্পের শরীরকে ঠিক নাট্যধর্মী বলা চলে না,– অর্থাৎ সংলাপ, সংঘাত সর্বত্রই অনিবার্য নয়,– কিন্তু নাটকীয়তা রয়েছে, বিন্যাসের কৌশলেও। Dramatic suspense কে ক্রমশই পুঞ্জিভূত করে অত্যন্ত সন্তর্পণে, অথচ স্বভাবসিদ্ধ আনমনে শিল্পী যেন সূক্ষ্মতন্ত্রী জীবনের ভাঁজ খুলে চলেছেন একের পর এক,– প্রতি ভাঁজে নতুন উৎকণ্ঠা নতুন কৌতূহল নতুন উদ্দীপনার পথে ঠেলে নিয়ে চলে। এই অর্থেই বনফুলের প্রকরণও বিজ্ঞানী প্রবণতার সৃষ্টি,– ভাঁজে ভাঁজে সংকুচিত গোপন জীবনসত্যকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল আঙ্কিক হিসেবে পরিচালিত– ফলে প্রত্যেকটি বাক্য, এমন কি প্রতিটি শব্দও গল্প রহস্যের উন্মোচনে যেন অনিবার্যতার কঠিন বন্ধনে সংলগ্ন। এই কারণে বনফুলের ছোটগল্পের শরীরে একটি শব্দকেও পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা পরিবর্জিত করবার উপায় নেই।"[২৪]

শাণিত, পরিশীলিত ভাষা দিয়ে ঘটনার নির্মিতি নয় বরং ঘটনার তাৎপর্যের অভিঘাতেই তাঁর ভাষা হয়েছে শাণিত, সুক্ষাগ্র। আর সমগ্রতার ভিতর দিয়ে পাঠকের 'মরমে পশে' যেন পাঠককে করে তন্ময়, বিহ্বল। বনফুলের গল্পের ভাষা তীক্ষ ও সুচাগ্র হলেও মাঝে মাঝেই তার ভাষা কাব্যধর্মী। সাহিত্য জীবনের শুরুতে যে কবি প্রতিভা নিয়ে তিনি সাহিত্য অঙ্গনে এসেছিলেন গল্পকার হয়েও যেন ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ ঝরণাধারার মতো তা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়েছে গল্পের নদীর বাঁকে বাঁকে। –

> পূর্ণিমার পরদিন । তখনও চাঁদ ওঠেনি; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনো। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মরধ্বনি কানে এল। ঝাউবিথী থেকে নয়– মনে হলো যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মরধ্বনি নয় যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জিভূত তমিস্রার মতো স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল– সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনাপটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহানমহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করল যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।[২৫]

আর একথাও সত্য যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গল্পের পট সাজিয়েও গল্পের চরিত্রগুলোকে পাঠকের মনের কাছে আনতে পেরেছেন বনফুল। আর পেরেছেন বলেই তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো আমাদের চৈতন্যে নাড়া দেয় বার বার। 'ক্যানভাসার' গল্পের ক্যানভাসার হীরালাল, 'নিমগাছ' গল্পের বাড়ির বৌটি, 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের নীল মণি, 'মানুষের মন' গল্পের নরেশ-পরেশ, 'তাজমহল' গল্পের বৃদ্ধ ভিখারি, 'পাশাপাশি' গল্পের বিকাশবাবু– সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিজেদেরকে মেলে ধরলেও এদের জীবনাচরণের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আমাদের দৈনন্দিন কোন না কোন আচরণেরই ছায়া। কাজেই তারা যেন সহজেই আমাদের হৃদয়ের গভীরে ঢুকে যায়– আমাদের ভাবায়, হাসায়, কাঁদায়; আমাদের বোধকে গৌরবান্বিত করে, কখনো ভরে দেয় গ্লানিতে, কখনো বেদনায়। সেই যে 'নিমগাছ' গল্পের বৌটি– কেন যেন আমাদের মনে লেগে যায়, কেবলই মনে হয়, আহারে বৌটির কী কষ্ট। কেন

সে মুগ্ধ হওয়া কবির সাথে চলে গেল না। কিংবা সবাই কেন তার সেবা চায় সে কেন কারো সেবা পায় না। আমরা কখনো ভুলতে পারি না। একটা সকরুণ, অনাদ্রিত বধুর ভেজা চোখের ছবি যেন লেগে থাকে মনের জানালায়। 'তাজমহল' গল্পের সেই বৃদ্ধ ভিখারি স্ত্রীর জন্যে যে জীবনের সব সুখ দু' পায়ে মাড়িয়েছে। যে প্রচণ্ড দুর্গন্ধে হাসপাতালের কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হলো না, সেখানে বুড়া নির্বিকারভাবে দিনরাত্রি সেবা করে, নিজের হাতে খাইয়ে গোসল করিয়ে, পোশাক পরিবর্তন করিয়ে তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়– পৃথিবীতে ভালোবাসার এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে। এই ফকির শাজাহানের ভালোবাসার কাছে তাই যেন সম্রাট শাজাহানের ভালোবাসাও ম্লান মনে হয়। ভালোবাসার রাজ্যে গল্পকার বনফুলের শাজাহানই যেন আর সবাইকে হটিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পায়।

গঠণকৌশলের অসামান্যতা, ভাষার সুষমতা, চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব, তির্যক অথচ সবল ঘটনাধারা, সর্বোপরি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের সুষম সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারায় গল্পকার হিসেবে বনফুলকে দিয়েছে এক অনন্য আসন। বনফুলের গল্প তাই এত বছর ধরে পাঠকের মনে জুগিয়ে চলেছে তৃপ্তির রসদ– আর তা যোগাবে অনন্তকাল।

তথ্যসূচি:

---

১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*, *ছোটগল্পের গল্প*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, জুন ২০১৩, পৃ. ২১গ

২. শ্রী ভুদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ৫৫২

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাঙলা ছোটগল্পের একশ' বছর/১৮৯১-১৯৯০*, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, প্রথম দেজ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০২, পৃ. ২৭৭

৪. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *ক্যানভাসার*, তদেব, পৃ. ৫৬

৫. তদেব, *হাসির গল্প*, পৃ. ১১২

৬. তদেব, *পাশাপাশি*, পৃ. ৬৬

৭. তদেব, *মানুষ*, পৃ. ৬৩

৮. তদেব, পৃ. ৬৩

৯. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৬৮৪

১০. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *নিম গাছ*, তদেব, পৃ. ১৫২

১১. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১৯

১২. শ্রী ভুদেব চৌধুরী, তদেব, পৃ. ৫৪৮

১৩. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, গণেশ জননী, তদেব, পৃ. ১৬৯

১৪. তদেব, পৃ. ১৭০

১৫. তদেব, শ্রীপতি সামন্ত, পৃ. ৫৯

১৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৫৯

১৭. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ৮ মে ২০০০পৃ. ৩১৩

১৮. তদেব, পৃ. ৩১৩

১৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭

২০. তদেব, পৃ. ৯

২১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *মানুষ*, তদেব, পৃ. ৬২

২২. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ৮

২৩. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, আইন, তদেব, পৃ. ১২২

২৪. শ্রী ভুদেব চৌধুরী, *তদেব*, পৃ. ৫৫৯

২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ৫৫৯

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

আল মাহমুদের কবিতায় নারী

ড. ফজলুল হক তুহিন*

[**Abstract**: Al Mahmud is one of the most famous poets in the realm of Bangladeshi poetry. He deals with poetry for long five decades and thus demonstrates his own uniqueness, individuality and poetic-power. As a traditional modern poet his reputation is sky-touching. His poetry mainly centers around women. He has observed women from different view-points and has embellished them in his own poetic style. Women, as drawn by him, sometimes represent domestic love and a sex-companion, sometimes a symbol of nature and yet sometimes as a symbol of heaven-fallen Hawa or Eve; symbol of an affectionate mother or of the mother-land as a whole; and ultimately they are represented exactly as they are – in the image of the universal womanhood. In modern bangla poetry, Al Mahmud holds a significant position because of his specialized poetic-pattern and individuality in building up the image of woman.]

বাংলাদেশের কবিতায় আল মাহমুদের (জ. ১৯৩৬) উত্থান পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। একজন স্বতন্ত্র কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩) প্রকাশ হলে তাঁর স্বকীয় কণ্ঠস্বর পাঠকসমাজে সহজে গৃহীত হয়। মৌলিক ভাবনাপুঞ্জ, নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণ এবং দৈশিক ও বৈশ্বিক সমাজের রূপান্তরশীল চৈতন্য অনুভবের মাধ্যমে কবি আপন কাব্যজগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হন। দীর্ঘ পাঁচ দশকব্যাপী কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধিত্বশীল ও শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় নারী। সেদিক থেকে নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার দাবি রাখে।

নারী ও পুরুষ মানবজাতির আদি-উৎস। এই উৎসধারায় পৃথিবীতে মানুষের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিস্তার ঘটেছে। এই প্রবাহের ধারাবাহিকতায় মানব সভ্যতারও সৃষ্টি। আর মানব সভ্যতার প্রকাশ শিল্প-সাহিত্যে সুচারুরূপে যতটা হয়েছে, অন্য কোনো মাধ্যমে তা হয়নি। শিল্পে, বিশেষভাবে সাহিত্যে মানুষের অন্তর ও বহির্জগতের সমগ্র ছবি অঙ্কিত হয়, যেখানে নারী বিশাল জায়গা জুড়ে আছে। তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নারীজাতির সম্বন্ধে শিল্প এবং ব্যবহারিক জীবনে দুই পরস্পর বিরোধী মনোভঙ্গির পরিচয়।

মানব সভ্যতার আদিপর্বে সামাজিকভাবে এবং বিধিগতভাবে নারীরা বেশি সম্মান এবং ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শ্রেণিভিত্তিক সমাজ তৈরি হবার আগের যুগে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ওপরেও তার প্রভাব দীর্ঘদিন এবং ব্যাপক হারে বিদ্যমান ছিল। এ-কারণে সমাজে নারীর সংস্থিতি নির্দিষ্ট হয়েছিল মাতা অর্থাৎ জন্মদাত্রীরূপে, গোষ্ঠীর সংরক্ষয়িত্রী হিসেবে। আদিম সমাজে নারীর সেই সুদৃঢ় মর্যাদার আসন, তাকে গোষ্ঠীমাতা এবং 'আদি প্রমাতামহী'তে রূপান্তরিত করে।[১] উর্বরতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে তার পরিণতি মাতৃদেবতা বা উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে। দৈনন্দিন জীবনে সে-ই সংসারের ভারকেন্দ্র, পরিবারের সম্পত্তিসমূহের সংরক্ষক হয়ে ওঠে। তার কাজকর্ম, কর্মনৈপুণ্য এবং শৈল্পিক গুণাবলি একত্রিত হয়ে গোটা সমাজের পক্ষে প্রধান এবং স্থায়ী ভিত্তিতে পরিণত হয়। ভারতের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলো এদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক; যথা: লোককাব্য, লৌকিক কাহিনি, লোকগীতি ও নৃত্য, লোকায়ত চিত্রকলা এবং কারুকৃতি সবকিছু সম্বন্ধেই আরো বেশিভাবে প্রযোজ্য। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীকে দেখা যায় তার পরিপূর্ণ কর্তৃত্বে, পূর্ণায়ত মর্যাদায়, পুরুষের সহযোগিতায় এবং দায়িত্বের যথাযথ পরিচালনার মধ্যে।[২] সেজন্য ভারতের সমস্ত রূপকথার নায়িকারূপে নারীর যে স্থান আছে, তার প্রকাশ বিচিত্ররূপে হয়েছে: কখনো রূপসী, কখনো চতুরা, কখনো যাদুশক্তিধারিণী অথবা দুঃসাহসিকা। সেই নারীর রূপ কোনো সময়ে কামনা বাসনায় উদ্বেল এবং মুক্ত জীবনের পিপাসার্ত, কখনো সে দেবী, কোনো সময়ে দানবী, সর্পকন্যা অথবা হংসবালা, রাণী কিংবা রাজপুত্রী। কিন্তু সে সরলা গ্রামবালিকা বা কল্যাণী গৃহবধূরূপেও বিরাজিত। ভারতীয় লোককাহিনির এই সমস্ত মূর্তির সারনির্যাসই নিবেদিত হয়ে আছে ভারতের শিল্পকলায় নারীর অনুভাবনায়।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এণ্ড কলেজ।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পতন ঘটে মূলত কৃষিপর্বের সম্প্রসারণে। কৃষিপর্বে কৃষক অনুভব করে নারী ও জমিন একই প্রকৃতির, উভয়ই উর্বর; চাষ করলে উভয়ই সোনা হয়ে ওঠে। নারী ও জমিতে সে ইন্দ্রজাল দেখেছে, যেনো কোনো অলৌকিক যাদুতে নারী সন্তানবতী হয়, জমিন ফসলভরানত। এ-সময় সন্তান ও ফসলের দায়িত্বও ছিলো নারীর; নারী শুধু সন্তান ধারণ করতো না, সে চাষের কাজও করতো। তাই তার মূল্য ও গৌরব ছিলো। এ-সময় মানুষের বিশ্বাসে জন্ম নেয় মহাদেবী বা মহামাতা, যে জীবন দেয়, জীবন হরণ করে এবং পুনর্জীবন দেয়। ব্যাবিলোনিয়ায় তার নাম ইশতার, সেমিটীয় অঞ্চলে আসতারতে, গ্রিকদের রিঅ্যা এবং মিশরীয়দের কাছে আইসিস। তবে ক্রমে ক্রমে সম্পদ বাড়তে থাকে, আর সম্পদই নারীদের শত্রু হয়ে দেখা দেয়। জমির মালিক যখন পুরুষ হয়, তখন সে নারীর মালিকানাও দাবি করে। সম্পদ যতো বাড়তে থাকে পরিবারে, নারীদের থেকে গুরুত্বও বাড়তে থাকে পুরুষের; এবং পুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্র বদলানোর উদ্যোগ নেয়। ফলে মাতৃধারা ভেঙে পিতৃধারার সৃষ্টি হয়। নীরবেই ঘটে যায় বিপ্লব।[৩] মায়েদের দিক থেকে বংশপরম্পরার হিসাব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার উচ্ছেদ হয়ে যায়। ফলে পুরুষের আধিপত্য বা পুরুষতন্ত্রের সূচনা হয়। 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদকে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেছেন: 'স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'[৪] – যার ভার এখনও বহন করে নারী।

আঠরো শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নারীর অধীনতা ও দুর্দশার কোনো পরিবর্তন হয় নি এবং এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উঠে নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী কামজ রূপের আধার, দানবী অথবা দেবী; বাস্তব নারীর ছবি সেখানে বিরল। তবে লোকসাহিত্যে রক্তমাংসের বাস্তব নারী-চরিত্রের অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। এই শতকে সমাজের কোনো কোনো জায়গা থেকে নারীশিক্ষা ও নারী অধিকারের বিষয়ে কথা উঠে। কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। উনিশ শতকে এসে সমাজের আমূল সংস্কারে একদল মহৎ মানুষকে মনোযোগী হতে দেখা যায়। নানা সমিতি, সংস্থা, সংগঠন গড়ে ওঠে এ-সময়। ১৯৩০ সাল ব্যাপী নারীর অবস্থার উন্নয়নের দাবিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' খুবই আবেগপ্রবণ এবং ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়েছে। এরাই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য মতাদর্শের ভাববাহী হয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের সর্বপ্রথম সমর্থক হয়ে ওঠে।[৫] ব্রিটিশ ভারতে, বিশেষত বাংলায় উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নারীর মর্যাদা হানিকর নিপীড়নমূলক সামাজিক প্রথা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও যুক্তিবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতকে এক 'আধুনিক' রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে উনিশ শতকে উদার সংস্কারের এক মহান যুগের সূচনা হয়। সব সংস্কারকই নারীর ভূমিকা ও মর্যাদাকে ঘিরেই আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। নারীর সমস্যা সমাজ প্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো। এ-সময় নারীমুক্তি আন্দোলন উদারপন্থী ও সংরক্ষণবাদী উভয় মনোভাব ও কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এছাড়া সমকালীন নারী আন্দোলনে 'উদার উপযোগবাদী' ইউরোপীয় চিন্তা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং গতানুগতিক পুরুষশাসিত সামাজিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ– এ সমস্তের সংমিশ্রণ ঘটে।[৬] তবে নারীমুক্তি আন্দোলন ও জাগরণে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) অবদান অসামান্য। সতীদাহ প্রথা ও বিধবা বিবাহ সমস্যার সমাধানের জন্যে রামমোহনকে তাত্ত্বিক ও আইনি লড়াই করতে হয়েছে; এক্ষেত্রে তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধে আইনগত দিক থেকে সফল হন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ রোধকল্পে বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা সফলতার মুখ দেখে এ-আন্দোলন। উনিশ শতকেই নারীমুক্তির অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়ায় নারীশিক্ষা। ফলে এ-শতক জুড়ে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা ও প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হয়; এর ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রাজনৈতিক, আইনগত, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রসমূহে বাংলার নারীসমাজ বেশ অগ্রসর হয়। তবে এই উন্নতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।[৭] আর মুসলিম নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই তিমিরেই থেকে যায়। তবে উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়।[৮] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) পূর্বে মুসলিম নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কুমিল্লার জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৪৭-১৯০৩), সিলেটের মুসাম্মৎ সহিফা বানু, খুলনার আজিজুন্নেসা, সিরাজগঞ্জের খায়েরন্নেসা খাতুন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আর রোকেয়া ছিলেন মুসলিম নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতায় তিনি নারীশিক্ষার সূচনা করেন 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল' (১৯১১) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (১৯১৬) স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে নারীশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। 'মতিচূর' (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড -১৯২২), 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি একদিকে নারীর যোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান; অন্যদিকে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবমাননা, পর্দার নামে অবরোধ প্রথা ও নানা বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, দ্রোহ ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ একজন যুক্তিবাদী লেখক, সমাজ সংস্কারক ও নারীশিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর অবদান অসামান্য।

উনিশ শতক থেকে নারী ভাবনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা তা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ও ভাবধারার প্রভাবে এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের ফলে পূর্বতন চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি পালটে যায়। শিল্প-সাহিত্যে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। নারীর প্রতি শিক্ষিত ও শিল্পিসমাজের দৃষ্টি ও ধারণারও পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) যেমন উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের প্রতীক, তেমনি 'প্রমিলা' নতুন ভাবচিন্তা ও ভূমিকায় এই শতকের নারী-ধারণার অগ্রবর্তী চরিত্র। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্যে। বঙ্কিম নারীকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারী পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে সরাসরি বিধবা-বিবাহের কুফল বর্ণিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে শাস্ত্রের কাছে নারীর মানবিক অধিকার মূল্যহীন। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যে নারীর বাস্তব ও যথাযথ মূল্যায়নে দ্বিধান্বিত। তিনি বাস্তবের ও কল্পনার নারীকে পৃথকভাবে এঁকেছেন। তিনি নারীর দুটি বিপরীত ধ্রুবরূপে বিশ্বাস করেছেন: প্রিয়া ও জননী, উর্বশী ও কল্যাণী, রূপজীবী ও গৃহিণী। প্রিয়া-উর্বশী-পতিতা নারীর একরূপ; জননী-কল্যাণী-গৃহিণী আরেক রূপ। প্রথম রূপটির স্বপ্ন তিনি কবিতার জন্যে দেখেছেন, দ্বিতীয় রূপটিকে তিনি বাস্তবে চেয়েছেন। তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যে এ-রূপ দুটি ফিরেফিরে এসেছে। এ-রূপ দুটি তিনি হিন্দুপুরাণের সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে পেয়েছেন এবং এদের শাশ্বত ও চিরন্তন মনে করেছেন। নারীকে তিনি স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, আর্থনীতিকভাবে স্বনির্ভর দেখতে চান নি।[৯] 'চিত্রা'র "উর্বশী" কবিতাটিতে পাওয়া যায় নারীর এক রূপ- 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ', সে 'সুন্দরী রূপসী'। 'মন্থিত সাগরে' তার জন্ম হয়েছিলো। 'বলাকা'র ''২৩" সংখ্যক কবিতায়ও মেলে নারীর দুই রূপ:

কোন্ ক্ষণে/ সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী/ অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,/ বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।/ অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,/ স্বর্গের ঈশ্বরী।[১০]

রবীন্দ্রচিন্তায় এই দুই নারী আদিম, চিরন্তনী, শাশ্বতী– এদের পরিবর্তন নেই। তাই নারী চিরকালই থেকে যাবে পৌরাণিক উর্বশী, যে পুরুষের কামনার তৃপ্তি যোগাবে; আর যে পুরুষের গৃহকে কল্যাণী স্বর্গের মতো সুখকর করে তুলবে। তবে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও চিন্তা-কর্মের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নারীকে অনেক দূর পর্যন্ত ভেবেছেন 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) কাব্যনাট্যে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় নারী বাস্তব জীবনের কঠিন পথে, চিন্তায়, ভাবে ও কর্মে পুরুষের অংশিদার ও সঙ্গী। সে মধ্যযুগের নারীর মতো দেবী, অবলা বা সামান্য নারী নয়; মানুষের মর্যাদা ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। যেমন:

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।[১১]

রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতায় যে 'চিত্রাঙ্গদা'কে এঁকেছেন, সে ভারতীয় সমাজে নবজাগৃতির প্রভাবে উজ্জীবিত নারী চরিত্র। সে দেবী বা দাসী নয়; সে পুরুষের সহচরী। সত্তর বছর বয়সে লেখা 'সানাই' কাব্যের ''নারী" কবিতায়ও কবি পিছিয়ে পড়া নারীকে পুরুষের 'নিত্যসহচরী'রূপে চিহ্নিত করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কাব্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ব্যক্ত হয়েছে। নারী তাঁর কবিতায় সৌন্দর্যে ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যে জীবন্ত। অধিকাংশ স্থানেই তিনি নারীকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তবে প্রেমিকসত্তা ও মাতৃসত্তার গৌরব তাঁর কাব্যে উল্লেখযোগ্য। তিরিশোত্তর কবিগোষ্ঠীর কাব্যে নারীরূপ ও নারীপ্রেমের চিত্র বদলে যায়। তাদের বিদ্রোহ যেহেতু রবীন্দ্র আদর্শের বিপরীতে, সেজন্যে তারা ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য পরিত্যাগ

করে গ্রহণ করেন পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ। রবীন্দ্রনাথের সৃজিত ভারতীয় নারীর পরিবর্তে সোনালি চুলের ও সাদা বর্ণের সদা লাস্যময়ী নারীর ছবি আঁকেন। এইসব নারী চিন্তা-চেতনায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, রুচি-অভ্যাসে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে মানানসই। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) "বনলতা সেন" এবং বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) "কঙ্কাবতী" এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নারীচরিত্র। ফলে আধুনিক বাংলা কবিতায় নারীর অবস্থান বিশাল আয়োতনের হলেও তা ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী নয়। উপনিবেশিক শক্তির সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের পরিবর্তিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কার ও মতবাদ সমাজমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সংবেদনশীল কবির মনেও তা অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে নতুন নৈতিক চেতনার জন্ম হয়। তিরিশোত্তর কালের ও পরবর্তী সময়ের কবিতায় নারী-চরিত্র বা নারীর সামগ্রিকতা শরীরী কাম ও যৌনতাসহ বর্তমান। এই কাব্যস্রোতধারায় বা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় আল মাহমুদ নিজেকে একজন উত্তরাধিকারী ভেবেছেন এবং বিচিত্র দৃষ্টিতে নারীকে চিত্রিত করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় অঙ্কিত নারীচরিত্রের রূপ ও প্রকৃতি আল মাহমুদের নারীচরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শাক্ত পদাবলি, সহজিয়া গান, বিদ্যাপতির কবিতা, বাউল গান, বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গল কাব্য, রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে শরীরী-সংরাগসহ বাস্তব নারীর প্রকাশ ঘটেছে। তবে নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব সেখানে স্বীকৃত নয়। নারী পুরুষের কামের সঙ্গী হয়েছে, সৌন্দর্য পিপাসা বা কামতৃষ্ণা মিটিয়েছে। তাকে কখনো দেবী, কখনো দাসী করা হয়েছে। তবে লোকসাহিত্যে নারীর মর্যাদা বা নারীর স্বাধীন সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের ধারায় আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এসে নারী ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত। তাই কবিতায় নারীর অবস্থানের বদল ঘটেছে। সেই সঙ্গে আল মাহমুদের কবিতার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নারীচরিত্রেরও বারবার পরিবর্তন ঘটেছে।

বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিতায় একজন স্বতন্ত্র কবি হিসেবে আল মাহমুদের উন্মেষ ও বিকাশ। এ-সময়ের অন্যান্য কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতায় নারীর প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩) থেকে 'তোমার রক্তে তোমার গন্ধে' (২০১০) পর্যন্ত দীর্ঘ কাব্যজীবনে আল মাহমুদ নারীকে কবিতার প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কবির ভাষায়:

আমার বিষয় তাই, যা গরিব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি, ফলবান মাটি আর
কালচে সবুজে ভরা খানাখন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।/ চাষীর বিষয় নারী
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী।[১২]

গদ্যে স্বীকারোক্তি:

ক. আমার কবিতায় প্রধান বিষয় হলো নারী। আমি এক সময় ভাবতাম একজন কবি-পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর কি আছে? না, কিছু নেই। পৃথিবীতে যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই। দয়িতার দেহের উপমা দিতে কবিরা পৃথিবী নামক এই গ্রহটাকে চষে ফেলেছেন।[১৩]

খ. আমি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পড়েছি। সেই চর্যাপদ থেকে ইউসুফ-জুলেখা, সব পড়েছি। এসব সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় ছল আসঙ্গলিপ্সা ও শারীরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ। তবে তা ছিল ইঙ্গিতময় কাব্যভাষায়। এটা আমার মনে হয় ঐতিহ্যবাহী। আমি আমার রচনায় এই প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি মাত্র।[১৪]

বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসের নারী আল মাহমুদের কবিতায় প্রধানরূপে বিবেচিত, তবে তাঁর নারী ভাবনার ক্রমপরিবর্তন লক্ষণীয়। স্পষ্টত কয়েকটি দিক থেকে তিনি নারীকে দেখেছেন– প্রথমত, গার্হস্থ্য প্রেম ও যৌনসঙ্গি; দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির প্রতীকে; তৃতীয়ত, বোনের দৃষ্টিতে; চতুর্থত, স্বর্গচ্যুত হাওয়া বা ঈভের রূপকে; পঞ্চমত, স্নেহ-মততাময়ী জননী ও দেশজননীর সামগ্রিক রূপকল্পে; ষষ্ঠত, শুধুমাত্র নারীরূপে।

এক.

আল মাহমুদ কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকেই নারীকে গৃহস্থ-প্রেমের প্রতীক ও যৌনতৃপ্তির আশ্রয় ভেবেছেন। তাঁর চিত্রিত নারী বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক জীবনাচারের সাথে সম্পর্কিত। তবে এই নারী কবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় অঙ্কিত সমাজের প্রকৃতি লালিত, বিরহে কাতর ও আনন্দে উদ্বেল নারী[১৫] নয়; এমন কি আনন্দ-বেদনায় নারীর চিরসৌন্দর্যরূপিণী ধারণার সাথেও মেলে না।

সামন্তবাদী সমাজের (Feudal System) নারী নয়; বরং এ নারী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের (১৯১৪-৭৬) আঁকা পরিবর্তিত সমাজের সংগ্রামী নারী, যাকে কবি ইতিহাসের ধারায় অনার্য বাঙালি[১৬] হিসেবে অভিহিত করেন। বর্তমানে বিরাজমান বাঙালি নারী 'হাতে লেপা' মাটির চত্বরে ধান-ব্যবস্থাপনায় কর্মরত, 'ধানের ধুলোয়' এ-নারীর শাড়ি ম্লান, অনাদরে পড়ে থাকা লাঞ্ছিত পতাকার মতো।[১৭] এই বদলে যাওয়া সময়কে 'ভয়ানক দিন' হিসেবে অভিহিত করে কবি জীবনের সজীবতার প্রতীক 'চালের লতানো ফুল' বৃষ্টির অভাবে মরে যাবার কথা বলেন। এখানে যৌবন কাঁটা-ঘাসে আক্রান্ত হয়ে মলিন, ছায়াহীন আঙিনায় রৌদ্রের আগুন ঠিকরে উঠে; এককথায় এই সময় ও সমাজকে কবি 'দুঃসহ দোজখ' রূপে চিহ্নিত করেন। তবুও এই নারী 'নির্জল নির্দয় দেশে' উত্তরাধিকারের আকাঙ্ক্ষায় গর্ভবতী হয়, আঙিনায় রক্ত ঢেলে সন্তান প্রসব করে, প্রার্থিত জলের প্রার্থনা ছেড়ে দেয়, আকাশে দ্রোহের তরবারি তুলে 'নিয়তির নিরুপম গান'-কে অস্বীকার করে। সেজন্যে দূরদ্বীপবাসী বা অচেনা কোন মানবীর প্রতি আকৃষ্ট নন কবি, নিজ ঘরের অতিচেনা আটপৌরে ও সংগ্রামী নারীর কাছেই তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন-স্তুতি। বাঙালি জীবনের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে কবি এই নারীকে স্থাপন করেন।

কী নিয়ে ঘর করবে? ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো
শানকিতে শাদা ভাত, একটি মাটির দ্বীপ জ্বেলে
যার মুখ ভালো লাগে, যদি তার চোখ দেখে ভোলো;
সে পুরুষ যে-ই হোক, সে যদি নিজেকে দেয় ঢেলে
আর সে আকাঙ্ক্ষা আনে, তৃপ্তি আনে, সান্ত্বনা, সন্তান
দিতে পারে তোমাকেও, তবে তার অভাবের ঘর
দীর্ণ করে গড়ে তোলো কোনো ভালোবাসার বাগান
তার দেহে দেহ রেখে একবার কাঁপো থরথর।[১৮]

দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার বৃহত্তর বাঙালি গৃহস্থ-জীবনের এক অতি পরিচিত দৃশ্য। ফুটো হাঁড়ি, ভাঙা চাল-চুলো দরিদ্র জীবনের সম্বল হলেও কবির কাছে সে অভাবের চিত্র বড় নয়। কবির অনুভবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না, তাই শত অভাবের মধ্যেও নারিত্ব ও নারীর অবদান স্মরণ করেন মাতৃত্বে, সহমর্মিতায় ও সহগামিতায়। সেজন্যে কবি শরীরী সংরাগে মত্ত হতে আহ্বান জানান নারীকে। 'অভাবের ঘর'কে 'ভালোবাসার বাগান' রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব এই নারীর ওপরই অর্পণ করেন কবি। আর এই নারী দেহের বিনিময়ে পেতে চায় মাঠ-ঘর-সন্তান। কবির মতে তাই এই গৃহস্থ নারীরা 'মৃত্তিকা, সন্তান আর শস্যের ওপরে' নিবদ্ধ হয়ে থাকে, পুরুষের কটিবন্ধ ধরে থেকে তারা ঢাউস উদরে কেবল পেতে চায় 'অনিবার্য জন্মের আঘাত'। তারপর গ্রামময় ভরে উঠে সেইসব সন্তানে। এর মাঝেই একজন নারী খুঁজে পায় প্রেমের স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ এবং জীবনের সার্থকতা। কবির এ ধরনের কবিতা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> আল মাহমুদের চিরকালের কবিতায় প্রেম যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে নারী। প্রেমিকতার চেয়ে সম্পূর্ণ নারিত্বই তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। আর সে-নারিত্বে প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে কামনা। নিষ্কাম প্রেমের কবিতা, মর্মচ্ছেদী বিরহের কবিতা, দিগন্তভেদী প্রিয়া-হারানোর ব্যথার কবিতা আল মাহমুদ কখনো লেখেন নি। আল মাহমুদের বহু কবিতা গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতা।[১৯]

গৃহস্থ-প্রেমের আধারে আল মাহমুদের নারী হয়ে ওঠে যৌনতা ও কামজতার প্রতিভূ। প্রথমপর্বে কবি রবীন্দ্রোত্তর কালের মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ও বুদ্ধদেব বসুর দেহাত্মবাদী ভাবধারার অনুগামী। ঘরের ও বাইরের জগতের নৈরাশ্য-নিঃসঙ্গতা-ক্ষোভ-বিচ্ছিন্নতা-সংকট থেকে কবি মুক্তি ও আশ্রয় এই নারীর মাঝে চেয়েছেন ও পেয়েছেন। কেননা এই নারী 'কোমরে পেঁচিয়ে নীল শাড়ি' কবির ঘরকে করে তোলে 'শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান'। বাঙালি ঘরের এই নারীই আবার নিজের শরীরী সৌন্দর্যে আহ্বান জানান পুরুষের যৌনতৃষ্ণা 'ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়' নিবারণ করার জন্যে।[২০] নারীর এই কামজ ডাক কবি-পুরুষের দেহ-মনে-চৈতন্যে সঞ্চারিত হয় শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে। প্রাচীন বাংলার পথ ধরে কবি এই নারীকে 'বাঙালি কৌমের কেলি' সজাগ করতে বলেন, যে কামকলা বিশ্বখ্যাত বাৎসায়ন ও আর্যের যুবতীরা পর্যন্ত জানে না। আবার 'সোনালি কাবিনে' (১৯৭১) 'দেনমোহর' ছাড়াই কবি তাকে শুধু দৈহিক আকর্ষণে বাঁধতে চান: 'দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন'। কবি এভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে অঙ্কিত করেন উভয়ের শরীরী-সংরাগ, সত্তার আনন্দ ও উচ্ছ্বাসময় প্রাধান্য। অভাব, দারিদ্র্য কিংবা পিছুটান পুরুষের ইন্দ্রিয়তাড়িত সত্তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না, সেজন্যে দেহের বিনিময়ে দেহ পাওয়ার শর্তে নারীর কাছে পুরুষের অকপট আর্জি। কেননা এই নারীই তাঁর সমস্ত আনন্দ, সংকল্প ও জৈবতৃপ্তির কেন্দ্রস্থল। যেমন:

ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ
তুলে মিলে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,

চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়।[২১]

নদীর ঢেউ মানুষের আবাস গড়ে, আবার ভাঙে। কবি-পুরুষের তাই আকুল আবেদন তার প্রার্থিত নারীর সাথে তিনি নতুন প্রতিশ্রুতিতে নদীর ঢেউয়ের মতো 'অকর্ষিত উপত্যকায়' যেন মিশে যেতে পারেন। সেই নারী চরের জমির মতো যেন উন্মুক্ত করে দেয় শরীরের সব বাঁধুনি-ভাঁজ। কাদার মতো নারীর দেহ-জমিনে কবি-পুরুষ যেন 'তৃপ্ত' হতে পারে। অতঃপর নারীর প্রতি কবি-পুরুষ 'ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়' ডুবে গিয়ে বংশধারায় চলমান হতে আহ্বান জানান। কেননা এই নারী একদিকে যেমন পুরুষের জৈবতৃষ্ণা নিবারণ করে, অন্যদিকে মানবপ্রবাহ সচল রাখে। কবি উভয় দিকের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশ্য 'কাবিনে'র মাধ্যমে কবি নারীর সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জৈবিক ক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন।

দুই.

কবি প্রকৃতির মধ্যে নারীকে এবং নারীর মধ্যে প্রকৃতিকে দেখেন। ফলে তাঁর নারীভাবনায় নদী ও মৃত্তিকা অর্থাৎ প্রকৃতির সাযুজ্যই প্রধান। 'তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী/ বুকে আমার জলের ধারা তোলে'– এমন অনুভবের পথ ধরে কবি নদী ও নারীকে একীভূত করেন। 'শিষ্ট ঢেউয়ের পাল' যেমন নদীর সমস্ত জলীয় শরীরের তোলপাড় করে প্রাণাবেগে আবিষ্ট করে, নারীর শরীরে কবির আবেগের 'চুম্বন রাশি' ও নারীর সহজাত লজ্জার আবরণ ভেঙে দিয়ে তাকে কামাসক্তির জোয়ারে তীব্র আহ্বান জানায়। আবার আবহমান বাংলার নদী, নদীর কল্লোলিত প্রাণ-প্রবাহ ও তীরবর্তী জীবনের প্রভাব সুগভীর। নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য, স্রোতধারা, কলতান ও জোয়ার-ভাটায় কবি আন্দোলিত। নারীর দৈহিক অঙ্গসৌষ্ঠবের কথায় কবি খুঁজে পান দুই কূলভাঙা নদীর আকর্ষণ। অর্থাৎ নদীর মতোই দুই কূল ভেঙে প্লাবিত হবে নারীর প্রজননোন্মুখ যৌবন। ভাবরূপ সৃষ্টিতে রূপক অলঙ্কারের মাধ্যমে কবি নারী-পুরুষের প্রজনন প্রিয় সত্তাকে কূল-ছাপানো নদীর প্লাবনের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেন।

জরির শাড়িটা পরো, রঙ মাখো, আঁচড়াও চুল
আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো বুকের গঠন
লুকানো যায় না তবু অনিবার্য যৌবনের ফুল
প্রতীকের মত যেন জেগে থাকে তোমার জঘন।
বুকে যদি হাত রাখো শুনতে পাবে ভেঙে দুই কূল
তোমার আয়ুর নদী পার হয় সোনার তোরণ।[২২]

লৌকিক সংস্কারে আকৃষ্ট হয়েও কবি নারীকে কূলপ্লাবী নদীর সাথে তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে কবি নদীর সঙ্গে নারীর স্বভাব ও হস্তনির্মিত কারুকর্মের সাযুজ্য সন্ধান করেন। কবির ভাষায় নদীর দু'পাড়ের শস্যখচিত সৌন্দর্যের অনুকরণে নিহিত রমণীর নকশা-কাটা শাড়ির বুননের এবং পরিধানের ধারণা। নদীর আকস্মিক বাঁকফেরার ভঙ্গি থেকে রমণীরা ঐ নকশা-কাটা শাড়ি দিয়ে তাদের শরীর বিচিত্র ভঙ্গিতে আবৃত করেন।

নদী, নদী-
সন্তানের উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।[২৩]

আবার সেই নারী কখনো সম্পূর্ণ বদলে নদী হয়ে যায়। কবির পছন্দ মতো শাড়ি কোনো নারী পরলে সেও নদী হয়ে যায়, কেননা কবি নদীকে ভালোবাসেন। পদ্মা ও করতোয়ার মৃত্যুতে কবি নারীকে নদী হতে বলেন। কারণ নারীকে কবি জীবনের উৎসস্থল ও উৎসধারা মনে করেন। নদীর মরণে কবি তাই উদ্বিগ্ন হয়ে নারীকে জীবনের স্রোত ও প্রাণধারারূপে সচল রাখতে আহ্বান জানান।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতো ইস্পাতের আবেগে গরম
ছুঁতে যাই দূরতর বালুময় পদ্মার ওপার,

ভাবি তুমি আছো নিচে শীর্ণ সবীজ কর্দম
অঙ্কুরের প্রতিশ্রুতি জীবনের আদিম আধার।
এরি মাঝে ঝড় হোক, মানুষের ভাঙুক আবাস
নিয়মের বরাভয়ে একদিন ফিরবে সবুজ
গাছমাছ নাওনদী পশুপাখি গন্ধময় ঘাস
সবি ফিরে আসে যদি তৃপ্ত থাকে তোমার ত্রিভুজ।[২৪]

নদী ও নারীর প্রবহমানতা মানেই প্রাণবৈচিত্র্যের গতিশীলতা ও সজীবতা। নদীরূপ নারীর অস্তিত্বের সঙ্গে কবি জগতের জীব-ব্যবস্থাপনার (Ecology) সম্পর্ক স্থাপন করেন। নদী ও নারীর টিকে থাকার বিষয়টিকে কবি অভিন্নরূপে উপস্থাপন করেন। কেননা কবি নদী ও নারীর প্রকৃতিকে একই মনে করেন। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) 'নদী ও নারী' (১৯৪৫) উপন্যাসটি স্মরণীয়।[২৫]

কবির শৈশব কেটেছে 'তিতাসে'র সংস্পর্শে। জীবিকার প্রয়োজনে যখন কবি শহরে এসে ঘর বেঁধেছেন, তখনও কবির হৃদয়ে 'গভীর জলধারা' ছড়িয়ে যায় 'শবরী তিতাস'। জীবনাভিজ্ঞতায় জড়িত তিতাসের সঙ্গে কবি তাই যৌবনের শ্রেষ্ঠ বিষয় নারীর উপমা নির্মাণ করেন: 'তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা'। কবি নারীকে সেই নদীতে এবং নদীকে নারীতে একাত্ম করেন। "নদীর ভিতরে নদী" বলতে কবি নারীকেই চিত্রিত করেন নদীর চিত্রকল্পে:

তোমার গোসল আমি দেখিনি কি একদা তিতাসে?
মনে পড়ে? শ্মশানঘাটের সেই সিঁড়ি ছুঁয়ে নেমে যাওয়া জল
ডোবায় সে পাদপদ্ম। সফরী পুঁটির ঝাঁক আসে
আঙুল ঠুকরে খেতে। নদী যেন নদীতে পাগল।
নদীর ভিতরে যেন উষ্ণ এক নদী স্নান করে
তিতাসের স্বচ্ছ জলে প্রক্ষালনে নেমেছে তিতাসই।[২৬]

কবি তিতাসকে আর নারীকে আলাদা ভাবতে পারেন না। পদ্মা ও করতোয়ার মতো কবি তিতাসকেও প্রিয় নারীরূপে দেখেন। দুই সত্তার মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক, স্বরূপ ও গুণাবলির কারণেই মূলত কবি এ রকম প্রতীকের আশ্রয় নেন।

অন্যদিকে লৌকিক সংস্কারে সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে নারীর ভূমিকা এবং ফসল ফলানোর ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা– এ দুয়ের মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ কল্পনা করা হয়। প্রকৃতি মাতার সঙ্গে মানবী মাতার, প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সঙ্গে মানবিক ফলপ্রসূতার, প্রকৃতির উর্বরা শক্তির সঙ্গে নারীর উর্বরা শক্তির, ভূমিকর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য কল্পিত হয়ে থাকে। আর নারীর মধ্যে একটি অদ্ভুত শক্তি লুকানো আছে যার দরুনই নারী সন্তানবতী হয় এবং যার প্রভাবে তারা পৃথিবীকেও ফলপ্রসূ করে।[২৭] এ ধরনের আদিম সংস্কারে আপ্লুত হয়ে কবি মৃত্তিকা কর্ষণের মতো নারীকে কর্ষণে ফলবান করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সমালোচকের মতে, "আদিমতাকে একটি প্রত্যয়ে উপস্থিত করার জন্য এবং সততায় নির্বাচিত করবার জন্য আল মাহমুদ অধিকাংশ কবিতায় যৌনতার আন্তরিক অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করেছে।"[২৮] অর্থাৎ বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করেই কবি নারীকে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে একীভূত করেন। কবির ব্যক্তিসত্তা এখানে উপমিত হয় কৃষিজীবনের অঙ্গীকারে। কর্ষণে যেমন ফসল ফলে মাটিতে, কবি নারীকে কর্ষণ করে 'পুণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে' ফসল ফলাবেন– কবি এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন:

আবার বুনবো তা-ই পুণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে,
তোমাকে জড়াবো বুকে হে প্রেয়সী, তোমাকে কেবল
রক্তের উত্তাপ দেবো, প্রেম দেবো, গান দেবো বেঁধে,
তোমাকে ফসল দেবো, গৃহ দেবো, তৃপ্তি দেবো নারী।
আপনাকে শান্তি দেবো আর নূহ, শক্তি দেবো আমি।[২৯]

কেননা নারী বসুন্ধরা, নারী জননী, নারীতে সুপ্ত প্রজন্মধারা। সে কারণে তিনি আকৃষ্ট হন খনার শ্লোকের প্রতি। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে বিদুষী নারী খনা ছিলেন জলবায়ু সচেতন। তিনি সঠিক ঋতু গণনায় ফসল ফলানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় নির্ধারণ করেন। তাঁর উচ্চারিত বচন বেদবাক্যের মতো পরম সত্য বলে বিবেচিত।[৩০] 'জ্যোতিষী' খনাকে সামনে রেখে কবি তাই বলেন, 'নারীর দেহের চেয়ে নম্য কিছু নেই পৃথিবীতে। সব মিলিয়ে কবির কাছে 'নারী এক রহস্যের নাম'। কৃষির সূচনায় নারী, সমস্ত শক্তির আধার এবং জ্ঞানীদের তৃষ্ণা নিবারনের পানীয় বিশেষ এই নারী; এমন কি নারীতে

জীবজন্তুও বশীভূত।[৩১] কৃষিব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলে প্রকৃতির বিষয় উত্থাপিত হলেই কবি খনার প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। কবি আবার নিজস্ব মানবীর সাথে সাযুজ্য কল্পনায় খনা ও প্রকৃতিকে একাত্ম করে গভীর উপলব্ধির নিরিখে।

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মতো টিপটিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে! জমির কিনার ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে
জলডোরা সাপের চলন নিঃশব্দে দেখেছি চেয়ে।[৩২]

খনাকে স্মরণ করে কবি মাটিতে কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণে আপ্লুত হন। তাই ‘মৃত্তিকা’কে ‘প্রিয়তমা কিষাণী’রূপে আখ্যায়িত করেন। মৃত্তিকার মতো নারীও উর্বর শরীরে আহ্বান জানান কবিকে। কবি এইভাবে ইন্দ্রিয়তাড়িত দুরন্ত কামনাকে জীবনের সঙ্গে শৈল্পিক সুষমায় ব্যক্ত করেন।

কতদূর এগোলো মানুষ!
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।[৩৩]

সমাজে ও সভ্যতায় মানুষ সামনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, কিন্তু কবি এখনও প্রকৃতির মাঝেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কেননা এই প্রকৃতিকেই কবির মনে হয় প্রিয়তমা নারী। প্রকৃতি যেমন বর্ষায় প্রাণ উদ্‌গমের জন্যে প্রস্তুত হয়, তার নারীও তেমনি প্রজন্মধারা রক্ষার লক্ষ্যে স্বভাবসুলভ লজ্জায় তার পুরুষের কাছে খুলে দেয় সবচেয়ে ‘উর্বর’ ক্ষেত্র। কেননা এই নারী ‘অঙ্কুরের প্রতিশ্রুতি জীবনের আদিম আধার’। বর্ষার বৃষ্টির কুয়াশায় ইন্দ্রিয় ক্ষয়প্রাপ্ত কবির কাছে ‘আইল বাঁধা জমিনের ছক’কে তাই মনে হয় ত্রিকোণ আকারে উন্মুক্ত হয়ে আছে ‘মৃন্ময়ী’[৩৪]– যার ‘ত্রিকোণ জ্যামিতি’ থেকে ক্রমাগত জন্ম নেয় ‘মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক’। অর্থাৎ কবির কাছে সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতি আর নারীর মধ্যকার বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার ধারণা একাকার হয়ে গেছে; যে কারণে কবির কাছে নারী এবং ‘মৃন্ময়ী’ পৃথিবীর রূপ অভিন্ন।

তুমি তো জান পৃথিবী ছাড়া তোমার তুলনা দেবার মতো
কোন গ্রহই আর অবশিষ্ট নেই।
পৃথিবীকে নগ্ন দেখার মানে হলো
তোমাকেই নিরাভরণ দেখা।[৩৫]

কৃষিপ্রধান এই বাংলাদেশে কবি চাষীর জীবনকে নিজের জীবন হিসেবে গ্রহণ করেন। সেজন্যে চাষীর মতো নিসর্গগামী কবি ‘সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত’ শিখেছেন। চাষী হাল ভেঙে মাটিকে উর্বরা করে, বীজ বোনে; এক সময় বীজ থেকে উৎপন্ন হয় ফসল। কবি চাষীর এই জীবনধারায় আলোড়িত হয়ে চাষীর মতোই নারীর দেহ-জমিনে ‘জন্মকণা’ রুয়ে দিয়ে বংশধারা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবপ্রবাহকে বজায় রাখেন। কবি তার প্রগাঢ় সততায় ‘অগণন আগামী কিষাণ’ সৃষ্টি করেন; আসলে এ তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনারই প্রমাণ। এ চেতনার পথ ধরে কবি ‘সৌন্দর্য পিয়াসী’ এক চাষীরূপে নিজেকে মেলে ধরেছেন– মানবীর দেহ-জমিনে ‘বীজ’ বোনার প্রত্যাশায়:

স্বপ্নের কিষাণ এক রহেস্যর বীজ নিয়ে হাতে
তোমার জমিনে এসে দাঁড়িয়েছে নীরবে নিভৃতে;
বুননের আয়োজন শেষে চোখ মেলে আসন্ন প্রভাতে
আমাকে কি দেবে বল তোমার মাটিতে চাষ দিতে?[৩৬]

সেই স্বপ্নের কিষাণ মাটির উপমায় গড়া তার প্রিয়াকে শুধু চাষাবাদের ক্ষেত্রই ভাবেন নি, তাকে ‘তৃষ্ণার চাপিত মাটি’, ‘স্নান আবগাহনের মৃৎকুম্ভ’ এবং ‘মাটির সানকি’ রূপে চিহ্নিত করেন– যে কলস বা সানকি ধারণ করে পৃথিবীর কবিদের ‘সব অন্নজল’।[৩৭] অর্থাৎ কবি সৃষ্টিশীল চেতনাধারায় নারীকে কর্ষণ উপযোগী জমিন বা মাটি, মাটির সানকি, মাটির কুম্ভ বা কলস– এক কথায় প্রকৃতিরূপে অঙ্কিত করেন। আবার প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে নারিত্ব

আরোপ করে কবি প্রিয়তমাকে সম্বোধন করেন নানা নামে: 'হরিণী', 'পানোখী', 'হংসিনী', 'কপোতী', 'বন্য বালিকা' ইত্যাদি।[৩৮] একই সঙ্গে কবি প্রকৃতির সবকিছুতে নারীর ঘ্রাণ অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিক ও শৈল্পিক উপলব্ধি অধিকাংশ স্থানেই একই সমান্তরালে এসে মিলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবির অভিমত স্পষ্ট: "নারীকে কবি প্রকৃতি বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা করেন না। অথচ নারী নারীই। সে গাছপালা বা নিসর্গ দৃশ্য, নদী-নালা-পর্বত নয়, নারীর মধ্যে পুরুষ যিনি কবি তিনি দেখতে পেয়েছেন নদীর অতলতা, পর্বতের প্রতিরূপ বক্ষ সুষমা। দেখেছেন এক অফুরন্ত গর্ভের অন্ধকার। দেখেছেন এক মহাছিদ্র। দেখেছেন আনন্দের সিংহদ্বার। একই সঙ্গে জন্মের দুয়ার। নারীর কেশ রাশিকে তার মনে হয়েছে নেবু ফুলের গন্ধে ভরা অন্ধকার গ্রাম্য পথের ঝোপ-ঝাড়ের মতো। এ রকম এক রহস্যময় লবণগন্ধি মাংসের পুতুলকে বুকে চেপে ধরতে পুরুষ মাত্রেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এটা শুধু কবির একার আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং পুরুষের আকাঙ্ক্ষা।"[৩৯] এক কথায়, প্রিয় নারী বা মানবীর রহস্য ও রূপের সাথে কবি প্রকৃতির রহস্য ও রূপের সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

তিন.

কবি নারীকে বোনের দৃষ্টিতেও দেখেছেন। আদর্শিকভাবে কবি পরিবর্তিত হবার ফলে নারী ভাবনায়ও রূপান্তর ঘটে। বোনের প্রতিমা নির্মাণ তারই বাস্তব রূপ। এই বোন অনার্য বাঙালি নারী; যে নারী কালো, দীর্ঘাঙ্গী, উদ্দামকেশী, যার বাহুতে সোনার বৈচা, কণ্ঠে সোনার হার; যার হাসি কীর্তিনাশার ঢেউয়ের মতো। তার উপমায় কবি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। সে পালযুগের জীবন্ত ও যৌবনময়ী এক মায়ামারীচির মতো অথবা কোনো বাঙালি দিগ্‌বিজয়ী রাজার অপাপবিদ্ধ ও কৃষ্ণকুমারী কন্যা। অর্থাৎ আবহমান বাঙালি নারী, যে নারী ধারণ করে আছে বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই নারী কবিকে 'ভাই' সম্বোধন করেছেন; আর কবি তাকে ভাবেন বোন। কবি এই নারীর এখানেই সমাপ্তি টানেন নি। তাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে বৃহত্তর সম্পর্কে স্থাপন করেন। এই বোনই হয়ে যায় কবির স্বদেশ।

কৃষ্ণা সে। কিন্তু আমার দেশ তা যত কালোই হোক।
কেশদামে কি উদ্দাম আর রুক্ষ সে। হোক, তবুও উত্তর বাংলার
গুল্মের মতোই সে পানির পিয়াসী, বৃষ্টিপ্রার্থিনী দেশ আমার
কী শীতল পয়োধরা সে। তবুও এই পর্বত ও পাথরহীন
তার উপত্যকাই তো শত সন্তানের আশ্রয়। তার বক্ষস্থল
বিপ্লবের ধাত্রী।[৪০]

কবির বোন প্রিয় বাংলাদেশ হয়ে যায়। কালো, রুক্ষ, পানির পিয়াসী, বৃষ্টিপ্রার্থী আর শীতল পয়োধরা এই দেশের প্রতীকরূপে এঁকেছেন কবি তার বোনকে। ইতিহাসের ধারায় যে দেশ ধারণ করে আছে বাঙালি প্রজন্ম; হাজার বছরে যারা দেশের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে গড়ে তুলেছে একটি ঐতিহ্যবাদী জাতি, যে জাতি দেশের অস্তিত্ব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে। কবির বোন, এই কালো নারীই বাঙালির ইতিহাসের প্রবহমান সন্তান। 'মিথ্যাবাদী রাখালে'র (১৯৯৩) "এক লায়লার কাহিনী" কবিতায়ও কবি একই দৃষ্টিতে নারীকে দেখেছেন। তবে শুধুমাত্র বোনের মধ্যে তা আবদ্ধ। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের কোনো কবিতায় এ ধরনের মনোভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

চার.

আল মাহমুদ কাব্যচর্চার শুরু থেকেই নারী ভাবনায় সৃষ্টিতত্ত্বের আদিম ইতিহাসের উপকরণ প্রয়োগে তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঐশীধর্মগ্রন্থগুলোতে আছে, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে আদম ও পরে আদমের বাম পাঁজর থেকে হাওয়া বা ঈভকে সৃষ্টি করে স্বর্গের উদ্যানে তাদের রাখেন। শুধু একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইবলিশ ঈভকে প্ররোচিত করে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল নিজে খায় ও আদমকে খাওয়ায়। এতে আদেশ অমান্য করার অপরাধে সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন।[৪১] আদি ইতিহাসে ঈভের যে ভূমিকা তা কবির আরাধ্য নারীর প্রতি আরোপ করেন। এ ব্যাপারে কবির ইতিহাস সচেতনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান–

> আদম ও ঈভ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের শ্রম, ঘাম ও দুর্ভাগ্যের উপার্জনের শস্য আহরণ করে পৃথিবীতে বাস করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ফেলে আসা স্বর্গের স্বপ্ন সুপ্ত হয়ে থাকল। এই স্বপ্ন তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও সঞ্চারিত থাকল। মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে আবার স্বর্গোদ্যানে ফিরে যাবে। এই স্বপ্নের নামই হলো কবিতা।[৪২]

অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীতে বিরাজমান ও চলমান মানবধারা সেই প্রথম মানব ও মানবীর উত্তারাধিকার। 'লোক লোকান্তর' কাব্যের ''অন্ধকারে একদিন'' ও ''শিল্পের ফলক'' কবিতা দুটিতে ঈভ আর বর্তমানে কবির আরাধ্য নারী একই সত্তায় লীন। কবির কাছে যখন গল্পের শয়তান প্রভুর নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে যাওয়ার প্ররোচণা দেয় তখন কবি প্রিয় নারীকেও সঙ্গে নিতে চান:

বললাম, তীক্ষ্ণধার আমার কিরিচে
অলৌকিক স্পর্ধা দাও। ঈশ্বরের অপরূপ ফল
আমি যেন বিদ্ধ করে নিতে পারি। যেন
ভাগ করে নিতে পারি– আমার সে প্রিয়তমা নারীকে কেবল।[৪৩]

প্রভুর নিষিদ্ধ বিতানে প্রবেশের ফলে যে পরিণতি বরণ করতে হবে তা তিনি প্রিয়তমা এবং নিজে বরণ করে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কবির একই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয় পর্বেও প্রতিফলিত। কবির মৌল চেতনায় এই আদি ইতিহাস কবিতার প্রতিতুলনার সাথে জাগ্রত। সে কারণে কবির উচ্চারণ:

বলো কাকে বলে প্রেম?
মনে কি পড়ে না বলো, আর কোন সুদূর স্মৃতিকে?
বিস্মৃত গন্ধের মতো ভাসে নাকি জ্ঞানময় বৃক্ষের নিষেধ?
কে তোমাকে বলেছিলো, অই ফল জাগায় তৃপ্তি,
দীপ্তি দেয় তনুমনে, অনন্ত হায়াতে
চিরঞ্জীব হতে পারে যে অস্তিত্ব মাটির নির্মাণ?[৪৪]

অর্থাৎ কবি প্রেমিকাকে স্বর্গচ্যুত ঈভ ভেবে প্রেমের আবেগ এবং প্রেমের স্বর্গের পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হন। কবি প্রশ্ন তোলেন নিষিদ্ধ ফল খেয়ে 'অনন্ত হায়াতে চিরঞ্জীব' হবার কথা তাকে কে বলেছিলো। প্রকৃত অর্থে কবি নারিত্বেই সৃষ্টির সূচনা নির্বাচন করেন– যে নারিত্বে মানব জাতি ও মানব সভ্যতার ক্রমধারা বিরাজমান। মাটি নির্মিত ও সকল পাপ-পুণ্যের আধার এই নারীই বাস্তব সত্য। আর 'প্রেম' বলতে কবি স্বর্গচ্যুত ঈভের মর্মযাতনাকেই বুঝিয়েছেন যা যুগ যুগান্তরে সুপ্ত নারী সত্তায়–

ভাবি প্রেম কি?
ভাবলেই তোমার বোনের পুরোনো ছেঁড়া তোবড়ানো চিঠিটা
খুলে পড়ি। অক্ষরগুলো কি স্পষ্ট আর
ভাষাটা কত পুরানো। যেন ঈভ আদমের জন্য
এইমাত্র একটা ফল পেড়ে গাছের আড়াল থেকে ইশারায় ডাকছে। আর ফলটার
হলুদ কষ গড়িয়ে পড়ছে তার নগ্ন উরু বেয়ে।[৪৫]

কবি প্রেমের সংজ্ঞায় আদম-ঈভের আদি ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন। যে নারী একদিন চিঠিতে কবিকে 'প্রিয়তম' বলে ডেকেছিলো সেই নারীর কথা মনে করে পুরনো চিঠিপত্র আবার খুলে পড়েন। আর তখনই সেই মানুষীকে কবির মনে হয় ঈভের অবয়বে ও চরিত্রে। এভাবে কবি আসলে নারীরূপ সৃষ্টি করেন ঈভের স্বভাব, পরিণতি ও শরীরী বৈশিষ্টের আঙ্গিকে। কোনো স্বর্গীয় দেবী বা অতীন্দ্রিয় মানবীকে কবি কখনোই ঐশ্বরিক মর্যাদায় নারীর সমতুল্য করে দেখেন নি; কবির দৃষ্টি সব সময় বাস্তব নারীর প্রতি।

পাঁচ.

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার পালাবদল স্বাভাবিক। একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে কবির ভাবনায় পরিবর্তন কবিতার ইতিহাসে সাধারণ ঘটনা। আল মাহমুদের নারীরূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অভিন্ন হয়ে গেছে। জীবনের গোধূলিলগ্নে এসে কবি নারীকে পরিপূর্ণ 'জননী', 'দেশমাতৃকা' এবং 'বঙ্গজননী'রূপে চিত্রিত করেন। যৌবনে কবির কাছে নারী ছিলো দেহজ ও কামজ সত্তার আধার। ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে কবি সেই সত্তাকে এড়িয়ে যান। নারীকে 'মা' ভেবে তার কাছে 'দয়া ও শুশ্রূষা' চান।

আদিম প্রেমকে ভয় পান। কারণ–

আসঙ্গলিপ্সা কবিকে অর্ধেক নারীত্বে নিমজ্জিত করে
এখন আমার নারীর কাছে একমাত্র কাম্য দয়া আর শুশ্রূষা
শিশুরা যেমন ক্ষুধার্ত হলে মাতৃস্তনের জন্য কেঁদে ওঠে, আমিও
মায়া ও মমতার জন্যে আমার দেশমাতৃকার নগ্ন ব-দ্বীপে
একাকী রোদন করি। আমার সাথে প্রকৃতি, পাখ-পাখালি
কীট-পতঙ্গ এবং শূন্য মাঠ মা মা করে কেঁদে ওঠে।[৪৬]

কবির কাছে পূর্বতন প্রেমের ধারণা বদলে গেছে। কবি যৌবনে 'সোনালি কবিনে'র মাধ্যমে যে নারীর সাথে বন্ধনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে শরীরী স্বাদ উপভোগ করেছিলেন, জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তার কাছেই 'মাতৃহারা বালকের মতো' সেবা-শুশ্রূষা চেয়েছেন। অর্থাৎ সেই নারীকে এখন তিনি 'মা' হিসেবে আর তার সেবা-যত্নকে 'প্রেম' বলে ঘোষণা করছেন।[৪৭] কবির কাছে এ এক নতুন উক্তি ও উপলব্ধি। তবে কবির মাঝে মায়ের প্রতি টান বা কৃতজ্ঞতাবোধ আগে থেকেই ছিলো। যেমন:

জন্মের জটিলতত্ত্ব যাকে লোকে মাতৃঋণ বলে,
অন্তত মায়ের বুক আমাদের কাব্যে লেখা হোক–
বলা হোক, কুসুমের কুটিল কাঁটায় পরাজয়
যদিও মেনেছি সত্য তবু এই গৌরব ভুলিনি
আমারও উদ্ভব মানি প্রেমময় নারীরই উদরে।[৪৮]

কবি 'মাতৃঋণে'র কথা স্মরণ করে গৌরব অনুভব এবং আমাদের কাব্যে মায়ের অবদানের বিষয় লেখার প্রত্যাশা করেন। কেননা প্রেমময় এই নারীর গর্ভেই কবির জন্ম। একইভাবে কবি হাসান হাফিজুর রহমানও (১৯৩২-৮৩) 'বিমুখ প্রান্তরে' (১৯৬৩) 'দেশজননী'র ঋণশোধের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন নিজস্ব ভঙ্গিতে।[৪৯] আল মাহমুদ নারীকে প্রথমে 'জননী', তারপরে 'দেশজননী' বা 'বঙ্গজননী' হিসেবে রূপান্তরিত করেন– যার উপমা পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই তিনি দিতে চান না। দেশের নিসর্গ-নদী-শস্যক্ষেত্র এবং কিষাণ-কিষাণীর ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্যে কবি উদ্বিগ্ন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশমাতার প্রতি কবির উচ্চারণ:

তুমি তো জানো তোমার সাথে তুলনা দিই এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।
চির দুঃখিনী মা আমার
তোমার ঐশ্বর্যই তোমার শত্রু। যেমন আপন মাংসে
হরিণী বৈরী।[৫০]

উপমাহীন দেশকে ঐশ্বর্যময়ী অথচ চিরদুখিনী জননী ভেবে কবি প্রবাদময় সত্যে উপনীত হয়েছেন। কেননা এ দেশ বা এ মায়ের শত্রু তার সম্পদই। একথা সত্য যে, পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই তার সর্বনাশ সংগুপ্ত। 'চর্যাপদে'র কবি ভুসুকু বাংলাকাব্যে সর্বপ্রথম এ সত্য ব্যক্ত করেন।[৫১] 'চর্যাপদে'র সময় ও সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে কবি দেশমাতৃকার বর্তমান রূপের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেন। একই সঙ্গে হাজার বছরের ঐতিহ্যময় দেশ ও জননী কবির কাছে অঙ্গাঙ্গীরূপে গৃহীত। এর মধ্য দিয়ে কবি মূলত সমকাল ও প্রাচীনকে এবং ব্যক্তিক মা ও সামষ্টিক মা-কে একই সমান্তরালে নিয়ে আসেন।

সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে রচিত 'জন্মদিনের কবিতা'য় কবি নারীর মাতৃরূপকে গভীর ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেন। কবি একদিন গভীর রাতে হঠাৎ বালক হয়ে যান, তখন শৈশবের পছন্দের খাদ্য 'বুনো ওল আর কাঁচা তেতুঁলের রান্না'র স্বাদ কবিকে বুভুক্ষ করে তোলে। তার অন্তর্গত ক্ষুধার্ত বালক 'মা মা' বলে চিৎকার করে ওঠে–

খেতে দে শিদলের স্বাদ, টাকি মাছের
মাথা ভেঙে সেই অদ্ভুত ঘেট, যা একদা
আমার অতি অনার্য পূর্বপুরুষেরা
মাটির সানকিতে পরমান্ন হিসেবে সাজিয়ে দিতেন।
অন্নপূর্ণা মা আমার, শাকন্তরি মা আমার
শত উদ্ভিদের, ঔষধের এবং কবিরাজ পত্রপল্লবের

রাঁধুনী তুই। এই শতাব্দীতে

আমার ক্ষিদে মেটাবার খাদ্য কে রাঁধবে

তুই ছাড়া জননী আমার।[৫২]

কবি এখানে ব্যক্তিগত জননীকে 'অন্নপূর্ণা'য় রূপান্তরিত করে নারীরূপকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেন। কেননা হিন্দুধর্ম মতে ও পুরাণে দুর্গা বা অন্নপূর্ণা হলো মানুষের অন্নদায়িনী, আহার্যে পরিপূর্ণ দেবী, যার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় অন্নের ভাণ্ডার মজুদ।[৫৩] মা যেমন সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেয়, অন্নপূর্ণা দেবীও তেমনি পৃথিবীবাসীকে আহার্য যোগায়। এ কারণে অন্নপূর্ণাকে 'মা' বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, আদিতে কৃষিকার্য আবিষ্কারের সময় দুর্গা, যার অপর নাম শাকম্ভরী, তিনি ছিলেন শস্যদেবী; এবং শাকম্ভরী বলেই দুর্গা হলেন অন্নদা বা অন্নপূর্ণা।[৫৪] কবি সনাতন এই বিশ্বাসকে ধারণা করেন নারীর 'জননী' পরিচয়কে ব্যাপকতা দানের উদ্দেশ্যে। রক্তাক্ত সমকালে ক্ষুধার্ত বালক 'স্বপ্নের খাদ্য' চেয়েছেন 'পৃথিবীর শেষ অন্নপূর্ণা'র কাছে। এক্ষেত্রে কবি ব্যক্তিক মা-কে সামষ্টিক মা-এ রূপান্তরিত এবং ব্যক্তিগত ক্ষুধাকে সকলের খিদেয় পরিণত করেন। অর্থাৎ যে নারীকে এক সময় তিনি ঘরের মধ্যে একান্ত সান্নিধ্যে দেখতে পছন্দ করতেন, এ পর্যায়ে এসে সেই নারী ঘরের ও বাইরের সকলের নারী অর্থাৎ জননী হয়ে যান। ভিন্নার্থে দেশ-মাতৃকার প্রতি কবির আত্মদানের অভিপ্রায়ও এ কবিতায় পরিস্ফুট। আধুনিক জীবনের প্রেক্ষিত থেকে কবি ঐতিহ্যকে নির্বাসন দিতে চাননি। মা তাই বাংলার লোকজ খাদ্য 'শত উদ্ভিদের, ঔষধির এবং কবিরাজ পত্রপল্লবের রাধুঁনি'। অর্থাৎ এই মা-রূপী নারীই 'বঙ্গজননী'র পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, কবি যৌবনে মায়ের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে নারীকে চিরদুঃখী জননীরূপে চিত্রিত করেন। এই দুঃখিনী জননী কবির ঘরের দেয়ালের ফ্রেমে টাঙানো, তাকে দেখে কবির মনে হয়েছে অভাবের আভায় দলিত 'বাংলার মানচিত্র'।[৫৫] কাজেই 'বঙ্গজননী'র ধারণা কবির মাঝে কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকেই সংগুপ্ত ছিলো। একদিকে 'বঙ্গজননী', অন্যদিকে 'অনার্য পূর্ব-পুরুষ'-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবি ঐতিহ্যলগ্ন এবং উত্তরাধিকারে আত্মস্থ হয়েছেন। এখানেই কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টির নতুনত্ব।

ছয়.

কবি শেষ পর্যন্ত নারীকে শুধুমাত্র মানবীয় নারী হিসেবে ভেবেছেন। কোনো উপমা, প্রতিমা বা প্রতীকের আশ্রয় নেন নি। যে নারী গার্হস্থ্য প্রেমের আধার, প্রকৃতির প্রতিরূপ, ঈভের উপমা বা বোনের প্রতীক হয়ে কবিতায় মূর্ত হয়েছে, সে এক পর্যায়ে সমস্ত উপমা-প্রতীক বা কল্পনা পরিত্যাগ করেছে। এ সবের পরিবর্তে সে এক মাত্র ও শুধুমাত্র মানবীরূপে বাঙ্ময়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে নারীকে বহুবার পরিপূর্ণ মানবীয় নারীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কবি যৌবনে প্রিয় নারীকে নদী, ফুল ও পাখির সঙ্গে তুলনা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সেই নারীও তাতে আনন্দ অনুভব করেছে অনেক। কিন্তু কবি সেইসব দিনের পটভূমি ফেলে জীবনের বহু দূরে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'প্রহরান্তের পাশফেরা' (১৯৮৮) কাব্যের "উপমা" কবিতায় কবির এই মনোভাব স্পষ্ট–

তোমাকে এখন নাম ধরে ডাকতেই ভালো লাগে।

মনে হয়, পাখি নদী আর ফুলের সাধ্য নেই

তোমার প্রতিচ্ছায়া হয়।

তুমি তো তুমিই।[৫৬]

কবির কাছে প্রিয়নারীর গৌরব, মহিমা ও মূল্য এতবেশি মনে হয়েছে যে পৃথিবীর কোনো উপমাই আর তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাই কবি প্রিয়তমার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নির্মাণ করতে চান না। তাকে মানবী রূপেই দেখতে, পেতে ও ভালোবাসতে চান। তার সমকালে বাংলা কবিতায় এ রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন বিরল।

একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তৃতীয় পর্বে। 'তোমার জন্য দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (২০০৫) কাব্যে কবি শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রিয় নারী কোনো উপমাতে সত্য ও যথার্থরূপে প্রকাশ পায় না; তাই সে শুধুমাত্র মানবী বা নারী; নারীর সমস্ত গুণ নিয়েই নারী। কবির ভাষায়–

তুমি প্রকৃতি নও, গাছ মাছ পাখি পতঙ্গ নও

তাহলে তুমি শুধুই মানবী।

সর্বদা আমার জন্যই প্রস্তুত।

আমার আদি ও অন্তের জন্যে উদারভাবে প্রসারিত।

তুমি শুধু তুমি।

একথা শত কবি বললেও কেন পুরনো হয় না।[৫৭]

কবি পূর্বতন সমস্ত ধারণা, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে এক জায়গায় থেমেছেন। প্রকৃতি এবং প্রকৃতি আশ্রিত জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে নারীর সাদৃশ্য কবি প্রত্যাখান করেন। সেই সাথে গ্রহণ করেন নারীর প্রকৃত স্বরূপ: 'অনার্য বাঙালি নারী'। কবি কল্পনা ও সাদৃশ্যমূলক অভিধা পরিত্যাগ করেন পরিণত জীবনে, যখন কবি নিরাসক্ত দৃষ্টি অর্জন করেন। ফলে পূর্ব-ভাবনা ছেড়ে কবি বাস্তবের নারীর ছবি আঁকেন, তাতেই কবি পরিতৃপ্ত; কেননা এই নারী কবির জন্যে সব সময় নিবেদিত।

আল মাহমুদ নারী-চরিত্র সৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা কবিতায় কারো প্রতিধ্বনি নন, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিকে তা প্রকাশিত। তবে তাঁর নারীরূপ এক জায়গায় স্থির থাকে নি, বারবার বদলে গেছে। আল মাহমুদের সৃষ্ট নারীকে সামগ্রিক অর্থে বিবেচনা করলে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। যথা:

ক. কবি অনার্য বাঙালি নারী সৃষ্টি করেন; এই নারীচরিত্র আধুনিক বাংলা কবিতায় কারো প্রতিকৃতি নয়, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিকে তা প্রকাশিত।

খ. কবির নারীরূপ এক জায়গায় স্থির থাকে নি, বারবার বদলে গেছে। গার্হস্থ্য প্রেম ও যৌনতৃপ্তির আধার থেকে প্রকৃতি; প্রকৃতি থেকে বোন, স্বর্গচ্যুত ঈভ, জননী, দেশজননী বা বঙ্গজননী এবং শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র নারীতে কবি রূপান্তরিত করেন।

গ. কবির নির্মিত নারীচরিত্র আবহমান বাংলার কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাংলার কৃষকের নারী সম্পর্কে যে ধারণা, সংস্কার ও চেতনা লালন করেন, কবি তার শিল্পরূপ দিয়েছেন জনজীবনলগ্ন বাংলার প্রকৃতি থেকে আহরিত উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প-রূপক ও প্রতীকে।

ঘ. কবির সৃষ্ট নারী স্বভাবে, মেজাজে ও ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, তিরিশোত্তর কবিবৃন্দ এবং জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে নির্মিত নারী থেকে স্বতন্ত্র।

ঙ. কবি অনার্য বাঙালি নারীকে 'শুদ্ধতম শিল্প'রূপে অভিহিত করেন। কাব্যচর্চার যাত্রারম্ভ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সৃজিত আল মাহমুদের কবিতায় প্রধান আরাধ্য বিষয় হলো নারী। কবি অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ও সন্ধান করেন না। তবে নারী-চরিত্র সৃষ্টিতে কবি শৈল্পিক সুষমা ও বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন। ফলে তাঁর নারীরা বাস্তবের রক্ত-মাংসের হয়েও শিল্পদৃষ্টিতে বর্ণিল। কবি কোনো অস্পষ্টতা ও দূরত্বের চিহ্ন রাখেন নি এই নারী-প্রতিমা নির্মাণে। কবি এই কবিকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের কবিতায় এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূচি:

---

১. হাইন্‌শ মোদে, "ভারতীয় নারী ও শিল্পকলা", অরুণ রায় (সম্পা.), *চতুষ্কোণ* (কলকাতা: শারদীয় ১৩৮৯), পৃ. ১৯-২০

২. *তদেব*

৩. হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (ঢাকা: নদী, ১৯৯২), পৃ. ৪৩-৪৭

৪. ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি", বদরুদ্দীন উমর (সম্পা.), *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে* (ঢাকা: শ্রাবণ ২০০৩), পৃ. ১০-১১

৫. সোনিয়া নিশাত আমিন, "নারী ও সমাজ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড (৩য় সং; ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৩৪-৫৪১

৬. সোনিয়া নিশাত আমিন, "নারী ও সমাজ", পৃ. ৫৩৪-৫৪৩

৭. *তদেব*, পৃ. ৫৮৮-৫৫৭

৮. দ্র. মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (ঢাকা: ডিসেম্বর ১৯৮৩), পৃ. ৬৩-১২৫

৯. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃ. ১১২

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "২৩ নং কবিতা", 'বলাকা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড (পু.মু.; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃ. ২৭৪-২৭৫

১১. রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রাঙ্গদা: ৬', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড (পু.মু.; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃ. ১৬৩-১৬৫

১২. আল মাহমুদ, "কবির বিষয়", 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭), পৃ. ১৮০

১৩. আল মাহমুদ, "আমি ও আমার কবিতা", মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন (সম্পা.), *উপমা*, আল মাহমুদ সংখ্যা (চট্টগ্রাম, ১৯৯৪), পৃ. ৫

[১৪] ঐ, সাক্ষাৎকার, আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম* (ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ২০০৫), পৃ. ৯১।
[১৫] দ্র., জসীমউদ্‌দীন, *নক্সী-কাঁথার মাঠ* (ষষ্ঠদশ সং.; ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৬-৭৬।

[১৬] ভারতে যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন অর্থাৎ বর্তমানের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের আর্য বলে দাবি করেন; বাকি সকলকে অনার্য বলা হয়। এই অনার্যরা ভারতের নিজস্ব লোক; আদিবাসী। অনেকের মতে আর্যরা ভারতে এসে এদের দমন করে নিজেদের উপনিবেশ গড়েছিলেন। সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক বা একাধিক অনার্য জাতির বাস ছিল। এরা লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার জানতেন এবং উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষরাও অনার্য নামে অভিহিত; এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুব উন্নত ছিল। আর্যরা এদের সকলকে পরাজিত করেন। অনেকে দাস রূপে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শূদ্র নামে পরিচিত হন এবং বহু অনার্য জাতি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। এদের বংশধররা আজ বনে বাস করছেন। বৈদিক সাহিত্যে এদের অনার্য, নিষাদ, দস্যু ইত্যাদি বলা হয়েছে। অনার্যদের কালো কুৎসিত চেহারা, অবোধ্য ভাষা ও ধর্মহীনতার বহু উল্লেখ এবং এদের অমিত সাহস ও শক্তিমত্তার কথাও বেদ ইত্যাদিতে আছে

বর্তমানের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, খাসিয়া, ভুটিয়া, নাগা ইত্যাদি বহু জাতি ভারতের সেই আদিবাসী; প্রকৃত ভারতীয় বা অনার্য। এদের ভাষা ভারতীয় ভাষা থেকে ভিন্ন; ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর ভাষাও নয়। নৃতত্ত্ব অনুসারেও এরা আলাদা উপজাতি। তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর ভাষা নয়। বর্তমানে এই অনার্যদের জীবন মাত্রায় ও ভাষায় আর্যদের সঙ্গে বহু আদান প্রদান ঘটেছে। অনার্য ভাষা অর্থে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, উত্তর ও মধ্য ভারতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা এবং হিমালয়ের পাদদেশে ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানের আর একটি মতে একমাত্র অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা অনার্য ভাষা; এবং এই গোষ্ঠীতেই সাঁওতাল মুণ্ডারি, খাসি ইত্যাদি পড়ে। দ্র. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ১ম খণ্ড (২য় সং; কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা.লি. ১৯৮৫), পৃ. ৫১-৫২
[১৭] দ্র. আল মাহমুদ, "প্রত্যাবর্তন", 'কালের কলস', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৬৯
[১৮] ঐ, "এমন তৃপ্তির", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৩৩-৩৪।
[১৯] আবদুল মান্নান সৈয়দ, "আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা", *উপমা*, পৃ. ৭২
[২০] আল মাহমুদ, "সাহসে আঘাতে স্পর্শে", 'কালের কলস', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৭০
[২১] ঐ, "সোনালি কাবিন: ৩", 'সোনালি কাবিন', পৃ. ১০০।
[২২] আল মাহমুদ, "অহোরাত্র", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৩০-৩১
[২৩] আল মাহমুদ, "স্বপ্নের সানুদেশে", 'সোনালি কাবিন', পৃ. ৯০-৯১
[২৪] ঐ, "খরা সনেটগুচ্ছ", 'দোয়েল ও দয়িতা', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৩৪০
[২৫] "পদ্মার কূলে দাঁড়িয়ে নজুমিয়া একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সামনে বিরাট নদীর প্রসার– জলের স্রোত চলেছে তো চলেছেই। আজ সকালে আলোর ছাড়াছড়ি, নদীর বুকে হাসির আভাস। দুরন্ত মেয়েটার মত নদী চঞ্চলা, কিন্তু সে চাঞ্চল্য খুসীতে ভরপূর। স্ফূর্ত্তি আছে, তেজ রয়েছে, কিন্তু আবেগ যতই থাক, সর্ব্বনাশী শক্তির ইঙ্গিত নেই।" দ্র. হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্‌, সাল নাই), পৃ. ১
[২৬] আল মাহমুদ, "নদীর ভিতরে নদী", 'নদীর ভিতরে নদী', *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৫২
[২৭] দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন* (২য় সং.; কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., ২০০০), পৃ. ৫৮-৭৩
[২৮] সৈয়দ আলী আহসান, "আল মাহমুদ", *উপমা*, পৃ. ২
[২৯] আল মাহমুদ, "নূহের প্রার্থনা", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৩৬-৩৮
[৩০] দ্র. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ডাক ও খনার বচন", 'বাংলা সাহিত্যের কথা', প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, *শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১২১-১২২
[৩১] দ্র. আল মাহমুদ, "খনার বর্ণনা: ৩", 'দ্বিতীয় ভাঙন', *কবিতাসমগ্র ২*, পৃ. ২৬
[৩২] আল মাহমুদ, "প্রকৃতি", 'সোনালি কাবিন', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৮৩
[৩৩] *তদেব*
[৩৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবী বা প্রকৃতিকে মা মৃন্ময়ী রূপে চিহ্নিত করেন এভাবে:
আমারে ফিরায় লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তরিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বসুন্ধরা", 'সোনার তরী', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (পু.মু.; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃ. ৯৯-১০০
[৩৫] আল মাহমুদ, "কে কার *উপমা*", 'বিরামপুরের যাত্রী', *কবিতাসমগ্র ২*, পৃ. ১১৬
[৩৬] ঐ, "স্তব্ধতার চাষী", 'নদীর ভিতরে নদী', *কবিতাসমগ্র ২*, পৃ. ৬৪
[৩৭] ঐ, "আমার মৃত্তিকা", 'বিরামপুরের যাত্রী', পৃ. ১১২
[৩৮] আল মাহমুদ, "সোনালি কাবিন: ১-১৪", 'সোনালি বাবিন', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ৯৯-১০৬
[৩৯] ঐ, *কবির কররেখা* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৮), পৃ. ২৪-২৫
[৪০] ঐ, "এক সুহাসিনী বোনের জন্য", 'এক চক্ষু হরিণ', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ২৬৯-২৭০
[৪১] দ্র. ক. *পবিত্র বাইবেল*, আদি পুস্তক: ২-৩, পুরাতন ও নূতন নিয়ম (ঢাকা: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১)
খ. *আল কুরআন*, ২: ৩৪-৩৮
[৪২] আল মাহমুদ, *কবির কররেখা*, পৃ. ৯
[৪৩] আল মাহমুদ, "অন্ধকারে একদিন", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ২২
[৪৪] ঐ, "ছিন্নভিন্ন স্মৃতিসূত্র", 'প্রহরান্তের পাশফেরা', পৃ. ২৬২
[৪৫] ঐ, "চিঠি", 'একচক্ষু হরিণ', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ২৭৬
[৪৬] আল মাহমুদ, "মেঘ থেকে মাটি পর্যন্ত", 'না কোনো শূন্যতা মানিনা', *কবিতাসমগ্র ২*, পৃ. ১৬৩
[৪৭] ঐ, "প্রেম", 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ', পৃ. ২১২।
[৪৮] ঐ, "কবিরা, বাঁচাও", 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', *কবিতাসমগ্র ১*, পৃ. ১৭৯
[৪৯] নির্বিশেষ স্তন দাও ক্ষুধার পাবকে
অকান্ত উৎস তুমি প্রাণের প্রপাতে
তোমার মর্তের ওই অমর্ত রোশনাই
মর্তের অবোধ ভোজে দুহাতে ছড়াই
দুহাতে আঁজলা ভরি তোমাকেই পাই।
জঠরের অন্ধ যেন ঋণ শুধে যাই ॥ দ্র. হাসান হাফিজুর রহমান, "স্বদেশ আমার", 'বিমুখ প্রান্তর', *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৭-১৮
[৫০] আল মাহমুদ, "দেশ মাতৃকার জন্য", 'দ্বিতীয় ভাঙন', *কবিতাসমগ্র ২*, পৃ. ৩৪
[৫১] অপণা মাংসেঁ হরিণী বৈরী।

খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥ দ্র. ভুসুকু, 'ইঁফফযরঃং গুংঃরপ ঝড়হমং', *শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৬১৬-১৭।

[৫২.] আল মাহমুদ, "জন্মদিনের কবিতা", 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ', *কবিতাসমগ্র* ২, পৃ. ২৩০-২৩১

[৫৩.] অন্নদানের দেবী 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'র বিশাল জায়গা জুড়ে বিরাজমান। সে কারণেই 'ঈশ্বরী পাটুনী' তার কাছে বর চেয়েছিলো এই বলে: "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥" 'অন্নপূর্ণা'ও 'তথাস্তু' বলে বর দিয়েছিলো এভাবে: "দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥" দ্র. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, "মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান", *অন্নদামঙ্গল কাব্য* (৫ম মুদ্রণ, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০০), পৃ. ১৭

[৫৪.] ক. অন্নপূর্ণা শক্তির একটি রূপ। দেবী রক্তবর্ণা, সফরাক্ষী, স্তনভারনম্রা, বিচিত্র বসনা, অন্নপ্রদান নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁর মাথায় বালচন্দ্র, একপাশে ভূমি, আর এক পাশে শ্রী। নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়। প্রাচীন কোন গ্রন্থে এই পূজা নাই। দক্ষিণা মূর্তি সংহিতাতে চার হাত; পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও দান। কাশীতে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাংলাতে পূজিত হন। দ্র. অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯

খ) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, পৃ. ৫৮-৭৩

[৫৫.] দ্র. আল মাহমুদ, "ফেরার পিপাসা", 'কালের কলস', *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ৫৭-৫৮

[৫৬.] আল মাহমুদ, "উপমা", 'প্রহরান্তের পাশফেরা', *কবিতাসমগ্র* ১, পৃ. ২৫৪-৫৫

[৫৭.] ঐ, "তোমার জন্য দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী", 'তোমার জন্য দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী', *কবিতাসমগ্র* ২, পৃ. ২০০-২০৪

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাংলাদেশের গণআন্দোলন এবং কথাসাহিত্য

ড. ফরিদা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ: যা কিছু সংরচন হয় তাই-ই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে- এমন কথা বোধহয় বর্তমান জনজীবনচারী মানুষের কাছে বলা যায় না- বলা উচিতও হবে না। সাহিত্য জীবনের জন্য আর জীবন যখন পরিবর্তমান- সাহিত্যও পরিবর্তনমুখী। সাহিত্যানুশীলন এবং সাহিত্য প্রয়োজনা কোনটিই লেখক পাঠকের শিথিল মনোভাব দ্বারা আজ আর গ্রাহ্য নয়। আয়াস-প্রয়াসসাধ্য শীলন-অনুশীলনে সাহিত্য বর্তমানে অতিমাত্রায় জীবনমুখী হয়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণে সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক দেশীয় পরিচয়, তথা আন্তর্জাতিক পট-পরিবেশ, ঘটনা-দুর্ঘটনা সমৃদ্ধ বিচিত্র জীবনরস, বিচিত্র মানব সংঘাত ও সংগ্রাম, এষণা, প্রতীচী, প্রকরণ। সাহিত্য হয়েছে সাংবাদিকতাধর্মী।[১]

কথাসাহিত্যের জন্ম আধুনিককালে। ইংরেজ প্রদত্ত নগর বন্দর মানুষের আধুনিকায়নের শিল্পরূপ কথাসাহিত্যে আজ দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপেই উপস্থিত। প্রাথমিক অবস্থায় রূপকথা উপকথা বা কবিতাকারে এর শিল্পগতি স্ফূর্তি পেলেও গদ্যভঙ্গীতে কাহিনি আকারে এর প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠতার পরিচয়সূত্রে হেনরী রিচার্ডসন, ফিল্ডিং স্টার্ন, সুইফট, থ্যাকারে, ডিকেন্স, জেন অস্টেন, স্কট মেরিডিথ, পার্ল এসবার্ক, জর্জ এলিয়ট, অ্যান্থনি ট্যলপ, ওয়াশিংটন আর্ভিং, এডগার এ্যালেনপো হয়ে যান বাংলা সাহিত্যের চরিত্র সংলগ্ন- বাংলা কথাসাহিত্য হয়ে ওঠে গতিময়। নব জাগ্রত জাতীয়তাবোধে পৃথিবী জেগে ওঠে- অনুপ্রাণিত হয় ভারত এবং ভারতের ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড পূর্ব বাংলার মানুষও।

'একাকী ন রম্যতে'। একাকী কেউ আনন্দ পায় না। সাহিত্য নান্দনিক এই অর্থে হয়তবা। তবে 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' অর্থে সাহিত্য আজ আর নন্দিত হয় না। প্রাচুর্য উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠিও নয় আজ। কিন্তু বাজারে চলতি সাহিত্যগুচ্ছের স্তুতি বা পরিচর্যায় তরুণ ছেলেমেয়েরা Without message যেভাবে উৎসাহিত হচ্ছে তাতে আর যাই হোক যথাথ পাঠক তৈরি হয় না, জাতিরও কোন কল্যাণ সাধন হয় না। জনৈক সমালোচকের মতে, বর্তমানে জীবনমানের নিম্নাচারের সাথে সাথে সাহিত্যের গতিও হয়েছে নিম্নমুখী।[২] তবে এ কথাও সত্য উনিশ শতকের কর্মযোগের মহামুহূর্ত পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ববঙ্গে কখনই দেখা যায় নি। দুবার স্বাধীন হয়েও এ ভূখণ্ডের মানুষগুলো পরবাসী-পরজীবী। শামসুর রাহমান ভবিষ্যৎহীন শব্দের আঘাতে আতঙ্কিত অনিশ্চিত এক স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁর কবিতায়। বর্তমান যে স্বদেশ তা কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার, মাহমুদুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রশীদ করীমকেও করেছে বিষাদগ্রস্ত। যে দেশ অনুৎপাদনশীল এক বুর্জোয়া বিলাস।

স্বর্গদীপ্ত প্রাণ নিয়ে এসে এ কোথায় কোন দেশে
হারিয়ে ফেলেছি রূপ পশুর রোমশ অন্ধকারে?
এখানে মরার খুলি ধুলোয় গড়ায় চারদিকে,
খেলার ঘুটির মতো অসহায় ভবিষ্যৎহীন।[৩]

ভবিষ্যৎহীন এ স্বদেশ এর জন্ম যাতনার ইতিহাস একদিনের নয়। প্রসববেদনা পার হয়ে বাঙালি দীর্ঘদিনের অতিক্রান্তিতে পূর্ণ করেছে তার ঐতিহ্যের সাধনাকে। গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি। নবজাতক বাংলাদেশের বয়স তেতাল্লিশ বছর হলেও এর জাতীয় পরিচয়ের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। আনুমানিক তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই অস্ট্রো-এশিয়াটিক বিভিন্ন সভ্য অসভ্য মানুষের বাস গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পলিবাহিত, সমুদ্র সমতটের এই উর্বর ভূমিতে। মুসলমানদের অধিকারে আসার আগে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট নামে যা পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্তর্বর্তী ছিল। মোঘল আমলে এরই নাম ছিল সুব-ই-বাঙলা। ব্রিটিশ আমলে হয়েছে বেঙ্গল- পরে তারই একটি অংশ পূর্ববাঙলা- ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগে- যার নাম হয়েছিল পূর্বপাকিস্তান- বর্তমানে বাংলাদেশ। বর্তমান বাংলাদেশের অতীত পরিচয় বিস্তারিত মেলে ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। এ ব্যাপারে ড. সুকুমার সেন এর একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করতে হয়-

> বঙ্গ জাতি হইতে দেশ বাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি। বঙ্গজাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে; সেখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং এই তিন জাতি হইতেছে পক্ষী অর্থাৎ পক্ষী সদৃশ যাযাবর বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ। পূর্বদিকে ক্রমশঃ হটিতে হটিতে এই যাযাবর বঙ্গজাতি এখন যে স্থানকে পূর্ববঙ্গ বলা হয় তথায় বাস করিতে থাকে, তাহা হইতে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় বঙ্গ।[৪]

---

* প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

উদ্বৃতাংশের পূর্ববঙ্গই বর্তমানের বাংলাদেশ। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালী' শব্দের উদ্ভব ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বলেন 'বঙ্গ' এর সাথে 'আল' শব্দ যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বঙ্গাল' বা 'বঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা'। সুকুমার সেনের মতে বঙ্গ থেকে 'বাঙ্গালা' বা 'বঙ্গাল্‌হ'। পারসিক এই 'বঙ্গাল্‌হ' শব্দ থেকে পর্তুগিজদের হাতে হয়েছে 'বেঙ্গলা', ইংরেজদের হাতে 'বেঙ্গল' যার পরবর্তী পরিণতি 'বাঙালা'য়। যদিও বিষয়গুলো বিতর্কিত তবু বাঙালি নিজস্ব আত্মপরিচয়ে নিজস্ব কৃষ্টিকে কালজয়ী করে রেখেছে। নিজস্ব চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা নিয়ে লালমাই-মধুপুরের গড় আর উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র খ্যাত সমভূমির অনুকূল আবহাওয়ায় এরা গড়ে তুলেছিল ঘনবসতিপূর্ণ নিজ বাসভূম। এই ভূমির প্রতি অতপর প্রলুব্ধ হয়েছে বিদেশিরা। আর্য সংস্কৃতির সাথে অনার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির হয়েছে সমন্বয়। অস্ট্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক, হিন্দু এবং জৈন ধর্মের লোকায়ত বৃত্তে তারা হয়েছে শংকরজাতি।[৫] সত্তরের দশকের লেখিকা রিজিয়া রহমান ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতা এনেছেন তাঁর 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮) উপন্যাসে। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে লেখিকা সুশীলার মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য।

> পরিবর্তন ও বিবর্তনকে গ্রহণই বাঙালি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে বঙ্গদেশে আর্য, আর্যেতর, বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও অপৌরাণিক ধর্ম এবং সংস্কৃতির এক বৃহৎ সমন্বয় ও সাঙ্গিকরণ সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সকল ধর্ম এবং সংস্কৃতিকেই আপন করিয়া লইয়াছিল।[৬]

নিজস্ব আচার-আচরণ ভাষাভঙ্গীতে একটি মিশ্রিত সংস্কৃতি সংস্থিত এ জাতি তার নিজস্ব ভৌগোলিক আবহে গাছ মাটি জলবায়ুর প্রভাবে নিজের পরিচয় থেকে কখনও সরে নি। বিস্মরণের অন্ধকারে হারায় নি তার অতীত ঐতিহ্য, ইতিহাস। ঐতিহ্যিক এ পরিচয়ই তাদের পৃথক একটি এষণায় চিরদিন উজ্জীবিত রেখেছে। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পূর্ববাঙলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ।[৭] এই নির্দিষ্ট কালগত চৈতন্যই এ দেশবাসীকে রক্ষা করেছে বিদেশি শাসন শোষণ থেকে। বাঙালির এ জাতিসত্তা এক কথায় তিনটি ধারায় হয়েছে বিবর্ধিত। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ থেকে বাঙালি মুসলমান বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং তারপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ এ। একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না, ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা-প্রেরণার পথ ধরেই শুরু হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমানদের আত্মপরিচয় আবিষ্কারের অভিযাত্রা।[৮]

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ থেকে এ ভূখণ্ডের বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলো আশ্রয় নেয় পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের চাঁদ-তারা খচিত পতাকার নিচে। দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে স্থিতি পায় দুটি দেশ পূর্ব এবং পশ্চিমপাকিস্তান। জীবনাচারণগত অসংখ্য অমিলের মধ্যে ধর্মই হয় ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনাচারের এ বৈপরীত্যে পশ্চিমারাই হয় লাভবান। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যে পূর্বপাকিস্তানকে করে তারা উপনিবেশ। সিন্ধি, বেলুচ, পাঠান, পাঞ্জাবি এমন কি এ ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী বিহারিদেরও তারা জ্ঞাতি ভেবে স্বস্বার্থগৌরবের অংশীদার করে। অথচ হাসান খুরশিদের ভাষায়–

> পূর্ব বাংলায় তখন এমন একজন অর্থনীতিবিদ; অথবা রাষ্ট্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ আমলা ছিলেন না, যিনি এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কথা অনভিজ্ঞ রাজনীতিকদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।[৯]

সমস্ত শাসন কাঠামোটিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। বাঙালি মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকায় [১০] বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা অর্থনীতি, রাজনীতি হয় বিপন্ন। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সাংস্কৃতিক নিপীড়নে পূর্ববাঙলার এই জনসমাজকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।[১১]

প্রথম আঘাত এলো ভাষার ওপর। অস্তিত্বের প্রশ্নে সজাগ হলো বাঙালি। এ ভূ-খণ্ডের জন্য সবচেয়ে গৌরবজনক এবং তাৎপর্যপূর্ণ এ ঘটনায় উন্মোচিত হলো 'আফাঁফাঁ তেরিব্‌ল' বিদ্রোহ বিপ্লবের জাতি বাঙালির আর এক পরিচয়। তারা সংগঠিত হলো, বিস্ফোরিত হলো। বাঙালির এ চরিত্র সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে আদিকাল থেকেই। পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলনকেও জীবনবিবিক্ষায় ধারণ করল সাহিত্য। লেখকরা এলেন এগিয়ে। সমসাময়িকতাকে ধরতে না পারলেও ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে, আশির দশকে এসে আত্ম-জিজ্ঞাসায়, আত্মোপলব্ধিতে, আত্মমর্যাদায় অতীত ইতিহাসই নতুন করে সংযোজিত হলো কবিতার মত কথাসাহিত্যে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ঘটনা সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে যথোপযুক্ত বক্তব্য প্রকাশে লেখকরা প্রায়শ তাদের লেখায় কুণ্ঠিত থেকেছেন। কখনও প্রতীক রূপকের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। কখনও হারিয়ে গিয়েছেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ অত্যাধুনিক জীবন জটিলতায়। প্রায় পাঁচ দশকের সাহিত্য সাধনায় চল্লিশের দশকে যে কর্ম তৎপরতাটি লক্ষিত হয়, সেখানে কথাসাহিত্যিক হিসেবে যাদের নাম আসে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, মাহবুব উল আলম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বুলবুল চৌধুরী, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সরদার জয়েন উদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক, শাহেদ আলী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই সমাজনিষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত হয়ে স্খলন, পতন, ধর্মীয় সংস্কারকে গল্পের কাহিনিতে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু পারেন নি

স্বাধীন মত প্রকাশের সৎ সাহস। দেশ-বিভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পঞ্চাশ দশকের ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে রয়েছেন তাঁরা বহুদূরে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি নিমগ্নতার মত গ্রাম নিমগ্নতা তাদের চেতনাকে করল সমাধিস্থ। সমকালের বাস্তবতা রইল পড়ে। সার্ত, কাম্যু, মালরো, হেমিংওয়ের সাহসী প্রতিবাদী চেতনার পাশে তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে 'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গণ-আন্দোলনের সমগ্র চেহারা কোথাও ফুটেছে? আংশিকভাবেও? কোনো মতেই কি আমাদের কথাসাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে, বাঁচার আনন্দ বেদনা-যন্ত্রণা উপভোগ-ভালোবাসা-ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না আমরা? ঊনসত্তরের দেশব্যাপী উত্তাল গণআন্দোলনও আমাদের ছুঁতে পারে না?'[১২] হাসান আজিজুল হক এর এ জিজ্ঞাসা আমাদেরও।

চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক ভণ্ডামি মধ্যশ্রেণিগত হতাশার ছবি নিয়ে পাঠক মন কেড়েছে হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প এবং জহির রায়হানের মহামৃত্যুসহ অন্যান্য কিছু গল্প। লেখা হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু লেখা। তবে চিত্তের ক্ষোভ-আছে পশ্চিমা শাসনের বৈষম্যতাড়িত জীবন অভীক্ষায়। নবলব্ধ স্বাধীনতার অর্থহীনতার অভিব্যক্তি তাই শওকত ওসমানের 'ইলেম' গল্পের জহির মিয়ার কণ্ঠে: ''ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে আঁরা আর কি খারাব ছিলাম'', শিক্ষার প্রতি খেদোক্তি, ''হালার ইলেম। সুট বুট আর গুস। আরে বুট সুট মারানির পুত... ইত্যাদি ইত্যাদি... এই এলমে হৈব কি?'' এই ক্ষোভের প্রকাশ আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'এক জোড়া প্যান্ট' গল্পে ভিন্ন স্বাদে। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের নিম্নমধ্যবিত্ত কেরাণীর প্রমোশন না পাওয়া বিদ্রোহে। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগের মহিমা চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে সংগঠিত চেতনায় এলো না সত্য, তবে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে আগত প্রগতিশীল তরুণ সাহসী কিছু সাহিত্যিকের লেখায় কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে যোগ হ'ল নতুন মাত্রা। এলো ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক দায়িত্ববোধ, নাগরিক জিগীষা, দ্বন্দ্বাত্মক জীবন অভীপ্সা, অত্যাধুনিক শিল্প কথন, বাঙালি ঐতিহ্যবোধের সাধনা। নতুন দিকবলয় উন্মোচিত হলো আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, মূর্তজা বশীর, সৈয়দ শামসুল হক, রাবেয়া খাতুন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শওকত আলী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ লেখকদের হাতে। স্থানীয় ঐতিহ্য আবহে শিল্পের আঙ্গিক হলো সমৃদ্ধ। ষাটের দশকে হাসান আজিজুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহবুব তালুকদার, হাসনাত আবদুল হাই, বশির আল হেলাল, রশীদ হায়দার, রাহাত খান, রিজিয়া রহমান আঞ্চলিক শব্দে, বিচিত্রগামী চেতনায় শাণিত মতাদর্শে বিশিষ্ট করে তুললেন কথাসাহিত্যের একটি ধারা ছোটগল্পকে। তবু বেদনার সাথে বলতে হয়, বাঙালির সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিষয়গুলো যে ভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল, গল্পে তা হয় নি। হলো না। সাংস্কৃতিক অধিকারের যুদ্ধকে অতিক্রম করে ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে জাত-অস্তিত্বের চেতনায় স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির উত্তরণের চিত্র এলো বরং গল্পে। ভাষা আন্দোলনের গণবিপ্লবী ভূমিকাকে উপেক্ষা করে গল্পে এলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বহু গল্প রচিত হলো। শওকত ওসমানের 'দুই ব্রিগেডিয়ার', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'রূপান্তর', জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে', হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু', শওকত ওসমানের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার', আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'কেয়া আমি এবং জারমান মেজর', হাসান আজিজুল হকের 'ফেরা', 'ঘর গেরস্থি', সৈয়দ শামসুল হকের 'কথোপকথন' 'তরুণ দম্পতির', শওকত আলীর 'কোথায় আমার ভালবাসা', রাবেয়া খাতুনের 'যে ভুলে যায়', রশীদ হায়দারের 'এ কোন ঠিকানা', সেলিনা হোসেনের 'ভিটেমাটি', মাহমুদুল হকের 'কাল মাফলার', বিপ্রদাস বড়ুয়ার 'সাদা কফিন', তাপস মজুমদারের 'মাটি', আখতারুজ্জামানের 'অপঘাত' ইত্যাদি গল্পে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ভাঙাগড়ার চিত্রসহ যুদ্ধপরবর্তী জীবন ও রণাঙ্গনের ছবি আছে। আরও আছে ইমদাদুল হক মিলন, হাসনাত আবদুল্লা, মুর্তজা রশীদ, বশীর আল হেলাল, সেলিনা হোসেন, রিজিয়া রহমান ও রাহাত খানের গল্প। বাঙালির জীবনঘনিষ্ঠ এ পরিচয় বাঙালির আত্মবোধন, ঋদ্ধচেতনারই প্রতিভাস। যা সমকালীন উপন্যাসে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মোহগ্রস্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদী এক ধরনের মানসিকতা কিছুদিন এদেশের লেখকদের আলোড়িত করেছিল। অভিনিবেশের পরিবর্তে কাল্পনিক মূর্তি রচনা, অন্ধ আবেগ প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল তাঁদের লেখায়। হাজার বছরের ঐতিহ্য বোধের আত্যন্তিক প্রীতিবোধে কেউ উদ্দীপিত হননি- এমন কথা বলা হয়ত সঙ্গত নয়, তবে উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসও ধারণ করেনি পঞ্চাশ-ষাটের দশক পর্যন্ত স্বদেশ স্বজাতির গ্রহণ বর্জনের পালাবদলের ঐতিহাসিক গতিবেগকে। অথচ জাতির ভাঙাগড়ার ইতিহাস জীবনবোধের আলোকে ঐতিহ্যের পটে ধারণ করার রীতি এবং আগ্রহ পাক-ভারত উপমহাদেশে যেমন- তেমনি গোটা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেই লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক পরিবর্তন লেখক সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ততা পাওয়া সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অনিবার্য ঘটনা। এ কারণেই দেশকালের সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচিত্রকর্ম আত্মিক সম্পর্ক রবি ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় অনায়াসেই এবং অনিবার্যভাবেই ধরা পড়ে। এ কারণেই কোন কোন উপন্যাস সমাজনিষ্ঠ-যুগনিষ্ঠ সমাজ বাস্তবতার পরিচয়ের Impartial দলিল হয়ে যায়। দান্তের মত লেখক সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়েই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন আর ইংরেজ জাতির বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের মুখে জন্ম নিয়ে শেক্সপীয়ার হয়ে যান মহিমময় শিল্পের সাধক- মহামতি গ্যেটে

ফরাসি বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ সমাজভাবনায় তৈরি করেন আর্টের চিত্তস্থৈর্য।[১৩] কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বিশাল জাতীয় ভাবনায় আন্দোলিত হয়েও অনুভূতির প্রগাঢ়তায় সমাজ সংলগ্ন বিষয়বস্তুর মহিমায়- সমসাময়িকতাকে ধরতে পারলেন না পূর্ব বাঙলার লেখকগণ। সমাজতন্ত্রবাদের চেতনায় স্থৈর্য, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব স্থির করলেন কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল। শওকত ওসমান লিখলেন 'জননী'।[১৪] আবুল মনসুর আহমদ লিখলেন 'জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবু ইসহাক লিখলেন 'সূর্যদীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), আবু রুশদ লিখলেন 'সামনে নতুন দিন' (১৯৫৫), সরদার জয়েন উদ্দীন লিখলেন 'আদিগন্ত' (১৯৫৬)', আকবর হোসেন লিখলেন 'মোহমুক্তি' (১৯৫২)', কিন্তু সংশয়ী, দ্বিধান্বিত সমাজবোধের কারণে সত্যসন্ধ হয়ে সমাজ সমীক্ষায় নামলেন না কেউ। আত্মবোধনের উপবিপ্লবময় যুগে ষাটের দশকেও আবার আত্মজিজ্ঞাসাহীন অনুভবহীন সন্দর্ভ সংরচন করলেন যেন তাঁরা। হারিয়ে গেলেন আন্তর্জাতিকতায় অথবা রিরংসাপ্রিয় ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শনে। অথচ বাঙালির নতুন উৎসমূল একুশ এল না চেতনায়। যা আসা উচিত ছিল। ভাষা আন্দোলনের পরিবর্তিত এ চেতনাটি সাহিত্যে যাঁরা আনলেন- তাঁরা প্রবীণ নন, প্রগতিবাদী উদারনৈতিক ষাটের দশকেরই তরুণ কিছু সাহিত্যিক। মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক চিন্তা আর ধ্যানধারণা হল যুক্তিবাদী, আধুনিক। তাঁদের দৃষ্টি শক্তি হল বিশ্লেষণী Analytical। যুগবাণী হল সুস্পষ্ট সত্যসন্ধ। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনও উপজীব্য হয়ে এল- তরুণ এসব লেখকদের লেখায়, সত্তর এবং আশির দশকে এসে। উপন্যাসের চরিত্র-ঘটনা-বিষয়বস্তুতে এল পরিবর্তন। একুশ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবজাত এ নতুন সাহিত্যচেতনা- যা ভাষা আন্দোলনেরই বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে দেশব্যাপী মানুষের মহৎ একটি জীবন লক্ষ্যে অভিযাত্রা। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' এ ব্যাপারে প্রথম দিক নির্দেশনা। নাট্যসাহিত্যের অঙ্গীভূত 'কবর' নাটকই জাতীয় চরিত্রকে উন্মোচিত করল। জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' প্রকাশিত হল ১৯৬৯ এ। বাঙালির উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রতন্ত্রের নির্বিচার অত্যাচারের চিত্র উঠে এল এ উপন্যাসে। নিয়ে এল বাঙালির মহৎ একটি জীবন লক্ষণ। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন—

> এ দেশের মানুষের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা পুলিশের লাঠি, গুলি আর বেয়নেটকে উপেক্ষা করে মিছিলে এগিয়ে এসেছেন ...যাঁরা স্বৈরাচারের বিষাক্ত ছোবলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ...তাদের উদ্দেশ্যে উপন্যাসটি উৎসর্গীত হয়েছে।[১৫]

ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকায় এবং বন্দী শিবিরের এ কাহিনিটিতে বন্দী রসুল-অপ্রশস্ত জেল সেলে বিস্ফোরিত গণচেতনার প্রতিনিধি। "জেলখানা আরও বাড়ান, এত ছোট জেল খানায় হবে না।" তীক্ষ্ণভাবে ঘোষণা দিয়েছে নির্ভীক বাঙালি। 'আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো।' বাঙালি জাতীয়তাবোধের এই ডাক উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসককুলকে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল। 'অস্তিত্বের প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। সরকারি নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছাত্ররা মিছিলে নেমেছে। স্লোগান তুলেছে। নিয়ম ভেঙেছে। মুক্তি সংগ্রামের একটি প্রামাণিক প্রতিলিপি হয়েছে এ উপন্যাস। শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ' সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' আর জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' একুশেরই একটি সংকলন গ্রন্থ। শওকত ওসমান বহুপ্রজ একজন লেখক হলেও তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে একুশ আসে নি। তবে এ দেশবাসীর গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার প্রাগ্রসরতার স্বাক্ষর তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৯)', 'রাজা উপাখ্যান', 'সমাগম' ইত্যাদি যা ফ্যান্টাসী বলে পরিচিত।[১৬] জীবন ভাবনার পূর্ণাবয়ব রচনার অনুকূল পরিবেশের অভাবেও শিল্পভাবনাকে সৃষ্টিমুখী রাখার এ প্রয়াস- আয়াসসাধ্য নিঃসন্দেহে। জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখনি There comes a moment of decision এবং শিল্পীমানস Either break through to socialism or symbolism, mysticism and reaction শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী মানস চেতনার জন্ম-স্বকাল সঙ্কট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যেই।[১৭] রাবেয়া খাতুনের 'রাজার বাগ (১৯৫৪), এলাকার একটি ছেলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, একুশের কিছু কথা এসেছে। তবে মুখ্য ঘটনা হতে পারে নি। বেদুঈন সামাদের 'শুনি সেই পদধ্বনি' (১৯৬৮) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ভাষা আন্দোলনের পরিচয় আছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সুদীর্ঘ এর কাহিনি। আনিস সিদ্দিকীর 'মন না মতি' (১৯৬৮) উপন্যাসে উর্দুভাষী অভিজাত নেতার সরকারি নিয়ন্ত্রণে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অপপ্রয়াসকে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যময় ইতিহাসের যুক্তিতে ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঐকান্তিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই উপন্যাসটি রচিত।

অজয় রায়ের 'পদধ্বনি' (১৯৬৯) জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের চিত্রঋদ্ধ। সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ বর্জিত এ লেখক তাঁর লেখায় সমাজ বাস্তবমুখী। ভাষারচেতনা থেকে স্বাধিকারের গণতান্ত্রিক উপলব্ধিতে এর কাহিনি বিবর্ধিত। সৃষ্টিশীলতার জোয়ারে জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' (১৯৬৯) আর একটি সংযোজন। পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয় থেকে এ দেশবাসীর উত্তরণের মানসিক, শারীরিক সংগ্রামচিত্র এটি। মধুরিনা, নার্গিস, মুনীর, বুলন, দীপক উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র। তারা এ ভূখণ্ডবাসী, মধ্যবিত্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাসে

অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামে নেমেছে ব্যানার নিয়েছে, শ্লোগান দিয়েছে। 'জাগো বাঙালি জাগো' বলে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। পুঁজিবাদের চেয়েছে ধ্বংস। 'লাখো মানুষে ভুখা রয়, এ আজাদী মিথ্যে হয়' বোধে স্বদেশ-স্বভূমি-স্বাধিকার চিন্তায় হয়েছে সচেতন। স্বাধীনতা উত্তর পূর্ববঙ্গে জাতীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে নায়িকার বাবার মন্তব্য "আমাদের অফিসারদের ঘুষের বহর দেখলে আমারই পথে নেমে আমলাদের কাণ্ডকারসাজি পোস্টারে লিখে মিছিল করতে ইচ্ছে যায়।" এখানে দেশের অর্থনৈতিক দৈন্যের পাশে অনৈতিক অচলাবস্থা লেখকের সমসাময়িক দেশীয় মূল্যবোধের বিবিক্ষার স্বাক্ষর। উপন্যাসে বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে স্বৈরাচার আইয়ুব সরকারের পতন কামনা থেকে, সাম্রাজ্যবাদের মুণ্ডুপাত, শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরোধিতায় উত্তেজিত বঙ্গবাসী, পুলিশ মিলিটারির উদ্যত বেয়োনেট, রাইফেল, কামান আর সাঁজোয়া গাড়িসহ ফ্যাসিস্ট দমননীতি; অন্যদিকে ছাত্রদের মিলিত শক্তির উদ্বোধন চিত্র। 'অগ্নিসাক্ষী, উপন্যাসে আরও চিত্রিত হয়েছে আইয়ুব দশকের উন্নয়ন প্রহসন, সংস্কৃতির উপর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ, রাজনৈতিক বিভিন্ন হামলা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, একশ চুয়াল্লিশ ধারা, কারফিউ, মিছিল, বিক্ষোভ, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঘটনার প্রভাব প্রতিক্রিয়া। 'কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী সবার মধ্যে কি এক অচেনা পরিবর্তনের উন্মাদনা।' ঢেউয়ের পরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মত আন্দোলন। শত শত বুলন, হাজার হাজার মুনীর যেন ঢাকার রাজপথে তাদের বিক্ষুব্ধ অন্তরের ভাষা দিনের পর দিন লিখে চলেছে।' বায়ান্নর শহিদ মিনারের সংগ্রামী চেতনার পূর্ণতায় উপন্যাসের বক্তব্য হয়েছে সমাপ্ত।

ইতিহাস এবং রাজনীতি কথাসাহিত্যের জন্য অবশ্যম্ভাবী দুটো শর্ত। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, বেদনা সংক্ষোভ লেখকমনের সচলতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। লেখকের সৌন্দর্যোৎকর্ষতায় রচিত হয় তার শিল্পশৈলী। শিল্পশৈলী আর তার যৌক্তিকতায় আস্থাবান হয় পাঠকমন। ভাষা আন্দোলন সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক, রচনাশৈলী ভাবকে করেছে অতিমাত্রায় সমাজনিষ্ঠ, বাস্তবমুখী এবং জীবনঘনিষ্ঠ; কেননা 'বাহান্নর আন্দোলন স্পষ্ট করে তুলেছিলো পাকিস্তানের প্রতি আমাদের অনাস্থা, স্বাধীনতার চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন- সব কিছু মিলিয়ে যা'কে বলতে পারি আধুনিকতা।[১৮]

প্রায় তেইশ বছর ধরে তদানীন্তন পাকিস্তানের জনগণ বিশেষ করে এ ভূখণ্ডবাসী মানুষগুলো একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য অব্যাহতভাবে আন্দোলন করে এসেছে। গণতন্ত্রকামী পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৪৮ সালেই অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন বোধ করেছিলো। সেলিনা হোসেন এর 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৪)' উপন্যাসটি একই সাথে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে আশ্রয় করেছে বিপন্ন অস্তিত্বের প্রকাশে। আশির দশকে লেখা এ উপন্যাসে ১৯৪৭ এর পূর্ব ঘটনার সূত্রে চিত্রিত হয়েছে ভাষা আন্দোলন। সমাজতান্ত্রিক চেতনার পাশে বিযুক্ত জাতীয়তাবাদী বাঙলা ভাষা আন্দোলন। সোমেন-মুনীর-সতীশরা ঐতিহাসিক চরিত্র। নাচোল নওয়াবগঞ্জে তেভাগা আন্দোলনের ক্রোমোলজিসহ বাঙালি জাতির ভাষাকে কেন্দ্র করে আত্মোৎবোধনের দুর্লভ চিত্র সংযোজিত এ উপন্যাসে। রমেশ মিত্র, ইলামিত্র, মুনীর চৌধুরী একে একে উন্মুক্ত করেছে বাঙলার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস। ভাষার জন্য আটচল্লিশের সংগ্রাম, ১১ মার্চের সংগ্রাম, ১৫ মার্চের চুক্তিপত্র, খাজা নাজিম উদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা, লিয়াকত আলীর রিপোর্ট, কেন্দ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমানের ভাষা সংস্কারের অপচেষ্টা, দমন, নির্যাতন, দুর্ভিক্ষ, লবনাভাব, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্র দিবস পালনের মহাপরিকল্পনা, রফিক, বরকতের ওপর গুলিবর্ষণ- ঐতিহাসিক ভাষা শহিদদের চিত্রসহ Analytical এ উপন্যাসে ঐতিহ্যপ্রীতি সুস্পষ্ট। অতীত ঐতিহ্যের সুগভীর অনুরাগ সেলিনা হোসেনের একাধিক উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ভাষা আন্দোলনের প্রভাবজাত বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্গত এ উপন্যাসে অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে স্বকীয়তাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যের নতুন একটি দিগন্তও উন্মোচিত করেছে। জীবনকে নতুনভাবে মূল্যায়িত করে ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটানো হয়েছে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদ বেনে', 'নীলময়ূরের যৌবন' এবং 'কাঁটাতারের প্রজাপতি' উপন্যাসত্রয়ে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের দুর্বিনীত চাঁদ সওদাগর হয়েছে আধুনিক চাঁদবেনে। দ্রোহে বিদ্রোহে সামন্তবাদের মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধচারণ করেছে আধুনিক চাঁদবেনে। ভাষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবজাত সাহিত্যিকের এ প্রতিক্রিয়া নতুন চেতনাঋদ্ধ। একই চেতনা শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে লব্ধ। 'আটশ বছর আগে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের সামন্ত মহাসামন্তদের অত্যাচারের ঐতিহাসিক আবহ এর উৎসভূমি। বংশ পরম্পরায় বাংলায় বেঁচে আছে মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য। বাঙালি মৃৎশিল্পের নায়ক শ্যামাঙ্গের জীবনাচারের, জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ সে চিত্রে লেখকের আহ্বান- যদি কোনো পল্লি বালিকার হাতে কখনও মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ করে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কি-না... আর যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বের শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগ্য মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালবাসাও।

প্রাকৃত জনজীবনের এ চিত্র নিগৃহীত মানবাত্মার সামন্ত অভিরুচির কাছে বাঙালির পরাভবের ঐতিহ্যিক আখ্যান। প্রাচীনের ওপর নতুন মূল্যবোধ তৈরির সাধনা। আধুনিকায়নের অভীপ্সা এবং নতুন আত্মোপলব্ধির চেতনাও। সেলিনা হোসেনের ইতিহাস স্বীকৃত চর্যাপদ আশ্রিত 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে আত্মঅন্বেষণের এই সাধনা। যা চিরকালের সংগ্রামী বাঙালি সত্তার আপোষহীন প্রতিবাদী এক মনোভাবের প্রাতিস্বিক রূপায়ণ। যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> That people were divided into classes and that the class struggle existed in society before the birth of Marxism. But being idealists in their understanding of social life, they were unable to find the objective / basis for the division of society into classes. They did not see that the reason for the class division of society should be sought in material production, the principal sphere of human activity. [১৯]

সৈয়দ শামসুল হকের 'আয়না বিবির পালা' এ জাতীয় ঐতিহ্যধারী আর একটি উপন্যাস। সরদার জয়েনউদ্দীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫) উপন্যাসসহ আরও একাধিক উপন্যাসে একুশ এসেছে কখনও পূর্ণাঙ্গ কখনও খণ্ডিত অবয়বে-বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাঝে। আশির দশকে একুশের সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ' উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে একুশের চেতনা এসেছে। উপন্যাসটি স্বল্প কলেবরের। বড় গল্প বরং বলা যায় একে। স্বাধীনতা স্বাধিকার চেতনার সংস্কৃতির বৈরী মনোভাবে মুসলিম লীগের থিওরিটিসিয়ান কর্মী নগীব উদ্দীনকে এনেছেন লেখক। গোঁড়াপন্থী তার পাশে ছাত্রনেতা আলাওল, আলী জাফরের মাধ্যমে এ উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়াকে আনা হয়েছে। ভাষার প্রশ্নে জাফর ভেবেছে:

> পূর্ব পাকিস্তানকে ওরা কলোনী উপনিবেশ- বানাতে চায়। তাই এই ষড়যন্ত্র। অবশ্যি বাঙলা ভাষাভাষী কিছু লোক পাবেন যারা পাকিস্তানী প্রভুদের গলায় গলা মিলিয়ে চলে। এদের চিনে রাখুন। আমরা যারা বাঙলায় কথা বলি। তারা যুগ যুগ পর পদানত- এক কথায় গোলাম।[২০]

সমাজের পরিচয়ই সংস্কৃতির পরিচয়। [২১] বাঙালি সমাজে চারিত্রিক বৈপরীত্যের এ পরিচয় অনায়াসলব্ধ। 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' উপন্যাসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত উত্তেজিত দেশীয় জনসাধারণের চিত্র যেমন এসেছে, রশীদ করীমের 'আমার যত গ্লানি (১৯৭৩)' উপন্যাসেও তেমনি সমসাময়িক সমাজ পরিচয়ই পাকিস্তান মোহ মুক্তির চিত্রসহ বিশেষ সময়কে ধারণ করেছে–

> ছোট নদীর মত অজস্র মিছিলে দেশ গেল ছেয়ে। আর সেই বুলিতে একটি কলধ্বনি: রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। হঠাৎ যেন সকলের শীর্ণ ধমনীতে রক্তের জোয়ার এসেছে সকলের দুর্জয় সংকল্প দেখে; শিরদাঁড়াটা সোজা হয়ে আসে। একটা অদ্ভুত আবেগও মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অত্যাচারের প্রতিবাদেই- বাঙালির আবেগের নয়, উত্তাপের ধ্বনি উঠেছে কণ্ঠে। কিন্তু সে উত্তাপ আর সৃষ্টির উত্তাপ থাকে নি। ভাঙনের বীজ উপ্ত হয়েছে সেখানে ক্রমে। সৈয়দ শামসুল হকের 'সম্রাট' গল্পে পঙ্গু পিতা জহির সাহেব ভয়ার্ত আতঙ্কিত মুহূর্ত অতিবাহিত করে মিছিলে যাওয়ার জন্যই ছেলের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেছেন- 'কালে কালে ছেলেগুলোর হলো কি? কথায় কথায় ধর্মঘট, মিছিল।... কয়েকটা বখাটে ছেলে মিলে গোটা দেশটাকে যেন উৎসন্নে ঠেলে দিচ্ছে।[২২] নিম্নগামী সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র আরও সুস্পষ্ট মাহমুদুল হক, রশীদ হায়দার, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্তের লেখায়। রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেন এর একাধিক উপন্যাসে একুশের চেতনার সাথে পরিবর্তিত মূল্যবোধের ধারণা মেলে। শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীনের পরবর্তী লেখাগুলোর সাথে পূর্ব লেখার পার্থক্য দুস্তর। একুশের চেতনায় সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' উপন্যাসটিও সমৃদ্ধ। সমসাময়িকতাকে ধরতে না পারলেও একুশ সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধে উপন্যাস এবং গল্পে একটি নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে বর্তমান সাহিত্যে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তারা আরও সতর্ক এবং জীবনঘনিষ্ঠ। ইতিহাসের সাথে বাঙালি ঐতিহ্যের ব্যবহারে আত্মপরিচয় অন্বেষণের একটি উদ্যোগও এখানকার কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলা যায়, একুশের চেতনা কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের কথাসাহিত্যে। চেতনা হয়েছে সামন্ততান্ত্রিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত। পরিশেষে শওকত আলীর ভাষায় বলতে পারি 'শিল্প তার মান যা-ই হোক, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জীবন বেশি, বানানো গল্প কম [২৩]। এই জীবনবোধের উত্তপ্ত বীজ প্রোথিত একুশেই- একথা আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূচি:

[১] নারায়ণ চৌধুরী, সাহিত্য ও সমাজ মানস, প্র. প্র ভাদ্র- ১৩৬৯, পৃ. ৭৬, ১০৭

[২] তদেব, পৃ. ১০০

[৩] শামসুর রাহমান, কবিতার নাম- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

[৪] মুস্তাফা নূর উল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ: বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, প্র. প্র, ১৯৯০, পৃ. ৬০

[৫] রশীদুল আলম লিখিত প্রবন্ধ, শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৪, পৃ. ১৫

[৬] সুশীলা মণ্ডল, বঙ্গ দেশের ইতিহাস, ১ম প্র. কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৮

[৭] রিজিয়া রহমান, বং থেকে বাঙলা, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য

[৮] বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫, পৃ. ৩

[৯] হাসান মুরশিদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি, প্র.প্র- কলিকাতা ১৩৭৮, পৃ. ৪৮

[১০] আহমদ ছফা, বাঙালি মুসলমানের মন, ১৩৮৭, পৃ. ২২

[১১] সুন্দরম, জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ, ১৩৭৯, পৃ. ২০

[১২] হাসান আজিজুল হক, কথা সাহিত্যের কথকতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৮

[১৩] নারায়ণ চৌধুরী, কথাসাহিত্য, ১ম প্র. কলিকাতা ১৯৬৩, পৃ. ১৩০

[১৪] শওকত ওসমানের জননী উপন্যাস, ১৯৬১ তে প্রকাশিত হলেও রচনা চল্লিশের দশকে

[১৫] জহির রায়হান, আরেক ফাল্গুন, ১৯৬৯, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য

[১৬] সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্র. প্র. ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২০

[১৭] তদেব, পৃ. ২৩

[১৮] একুশের প্রবন্ধ' ৮৮, ১ম প্র. ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ২৪

[১৯] V.G Afamasyev, Marxist Philosophy, First Printing, USSR, 1963, P. 239

[২০] একুশের উপন্যাস, সংকলন গ্রন্থ, ১ম প্র. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ. ৮৪

[২১] গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা- ১৯৭৪, পৃ. ৪২

[২২] সৈয়দ শামসুল হক, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্র. প্র ১৯৯০, পৃ. ১২

[২৩] নিসর্গ, শওকত আলী সংখ্যা বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, সম্পাদক সরকার আশরাফ, ১৯৯২, পৃ. সাক্ষাৎকার ২ (সা ২)

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য: বিষয় ও প্রকরণ

মোহা: ওলিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ: বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস অতি নিকটের হলেও এটি কথাসাহিত্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ছোটগল্পের মধ্যে যাপিত জীবনের সামগ্রিক চিত্র প্রত্যাশিত নয়। জীবনের নির্বাচিত খণ্ডচিত্র এতে বিধৃত থাকে। এতে জীবন-বোধের, অনুভবের, বিশ্বাসের, স্বপ্নের, দুঃস্বপ্নের, অতিপ্রাকৃতের, আত্মগত অতৃপ্তির, সহমর্মিতা ও অনুদারতার, অভিমান ও ক্রোধের, নান্দনিকতা ও মানবিকতার, মহান পিতৃত্ব এবং মহৎ ভালোবাসার জয় লেখকের নির্মোহ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিঘোষিত থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ছোটগল্পের স্থপতি। তাঁর ছোঁয়াতেই বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রোত্তরকালে যাঁদের হাতে ছোটগল্প একটি জনপ্রিয় সাহিত্য আঙ্গিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা স্পর্শে ছোটগল্প নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে লাভ করে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যের নানা আঙ্গিকের সাধক রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছোটগল্প হয়ে ওঠে এক সার্থক শিল্প-প্রতিমা। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে *একরাত্রি, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, অতিথি, ক্ষুধিত পাষাণ, স্ত্রীর পত্র, কঙ্কাল, সমস্যাপূরণ, মুসলমানীর গল্প* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গল্প বিষয়বৈচিত্র্য ও নির্মাণশৈলির যূথবদ্ধতায় বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বিশেষভাবে মূল্যায়নের দাবি রাখে।

তাঁর *একরাত্রি* গল্পে স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার-এর সুরবালার সাথে একত্রে পাঠশালায় যাওয়া, বউ বউ খেলা, তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা এবং বিশেষরূপ অবহেলা বশত সহজ ঐশ্বর্যটিকে তুচ্ছ করে; যে সুরবালাকে অবহেলা বশত বিয়ে করেনি, সেই সেকেন্ড মাস্টার সুরবালার জন্য পুকুরের ধারে রাত্রিবেলায় বসে আকাশের পানে চেয়ে হাহুতাশ করে সন্ধ্যাযাপন করেছে। *একরাত্রি* গল্পে লেখক যাপিত জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন-

> তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত; তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবালডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার! আর, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না।[১]

তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে সুরবালা ও সেকেন্ড মাস্টারের জীবন অন্য রকম হতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা দিক ব্যঙ্গের গভীরতর সংকেত দ্বারা স্পষ্ট করেছেন ভাষা ব্যবহারের অসাধারণ দক্ষতা ও মৃদু কৌতুকের অন্তরঙ্গ স্পর্শে। প্রেমকে ছাপিয়ে একরাত্রিই বড় হয়ে উঠেছে। এ দিক থেকে গল্পের নামকরণেও সার্থকতা এসেছে। তাঁর ভাষা তীর্যক, বাণীভঙ্গি সহজসরল, বর্ণনা কৌশল অসাধারণ। মূলত *একরাত্রি* গল্পের কাহিনীতে অতৃপ্ত আত্মার আকাঙ্ক্ষা ও আর্তি নৈঃশব্দে বিঘোষিত হয়ে গল্পটি শাশ্বত শিল্পনৈপুণ্য লাভ করেছে।

মধ্যবর্তিনী গল্পে নিবারণ ও হরসুন্দরীর সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের। কোন কাব্যরস ছিল না। হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হয়ে স্বামীর সেবার প্রতিদান স্বরূপ বড় কিছু একটা করতে চাইল কিন্তু তার সাধ্যাতীত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্বামীকে একটি সন্তান উপহার দেবার আশায় শৈলবালার সাথে বিয়ে দিল। তারপরই সে স্বামী ত্যাগের মর্ম উপলব্ধি করল। সন্তান সম্ভাবা শৈলবালা সংসারের সোহাগ আদর আর পরম অসুখ ও অসন্তোষ নিয়ে মারা গেল। সংসারে নিবারণ ও হরসুন্দরীর মাঝখানে শৈলবালার লাশ বাধা হয়ে দাঁড়াল। নান্দনিক ভাবে বিষাদময়তার চিত্র গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। *মধ্যবর্তিনী* গল্পে লেখক গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাধুভাষা গদ্যে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটিতে আবেগীয় পরিচর্যা লক্ষ করা যায়। যেমন হরসুন্দরী স্বামীর জন্য বড় একটা কিছু করতে চাইল কিন্তু সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটে না-

> ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধিনাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।[২]

শাস্তি গল্পের নায়িকা চন্দরা। স্বামী তাকে বড় বউ রাধা হত্যার দায় নিতে বলে। স্বামীর সাথে এমনিতেই একটু মনোমালিন্য ছিলই উপরন্তু স্বামী যখন হত্যার দোষ চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে স্বীকার করতে বলেছে; তখন চন্দরা অভিমান হত হয়েছে এবং দুখিরামের বউ রাধাকে হত্যা না করেও হত্যার দোষ স্বীকার করেছে। পুলিশ যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করল, চন্দরা কহিল, "হ্যাঁ আমি খুন করিয়াছি।"[৩] মানবজীবনের বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথ উদঘাটন করেছেন। *শাস্তি* গল্পের প্রকৃতি বর্ষার প্রকৃতি। বৃষ্টিতে ক্ষেতের ধান যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি মানব প্রকৃতিও বিকৃত হয়েছে। *শাস্তি* গল্প সাধু গদ্যে রচিত, কিন্তু গল্পটি গ্রাম

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

কেন্দ্রিক হওয়ায় একাধিক স্থানে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি'? কিম্বা 'মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে'।

সমাপ্তি ছোটগল্পে অপূর্ব ও মৃন্ময়ীর পারস্পরিক বোঝা পড়া ও দ্বন্দ্বের অপূর্ব শিল্প-সফল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অপূর্ব-মৃন্ময়ীকে কলকাতা নিয়ে যাবার কথা বললে মৃন্ময়ী যেতে রাজি হয়নি। প্রকৃতির স্বভাবে বেড়ে ওঠা উচ্ছ্বলা এবং প্রাণবন্তা মৃন্ময়ী শেষে ভালবাসার কাছে হার মেনেছে ।

> সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।[৪]

সমাপ্তিতে মৃন্ময়ীকে দেখানো হয়েছে প্রকৃতির কন্যা রূপে। নৌকায় মৃন্ময়ী আঁচল পেতে শুইলে প্রকৃতির স্নেহ লালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। *ক্ষুধিত পাষাণের* প্রকৃতি অতি মনোরম। পাহাড়ের নীচে বড় বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শুস্তা নদী। উপল মুখরিত পথে নর্তকীর মতো পদে পদে বেঁকে নৃত্যরত। এই প্রকৃতি তুলার মাশুল আদায়কারীর বর্ণনায় অপূর্ব মোহনীয় হয়েছে-

> আমার দিনের সহিত রাত্রির ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল । দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্ত দেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম।[৫]

অতিথি গল্পের অতিথি ব্রাহ্মণ বালক তারাপদ। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকায় ফিরিতেছিলেন। তারাপদ নন্দীগাঁয়ে নামার কথা বলে নৌকায় সঙ্গী হলেন। পরে কাঁঠালিয়ায় এসে গ্রামের সকলের হৃদয় জয় করলেন, কেবল জমিদার মতিলাল বাবুর কন্যা চারুশশীর ঈর্ষা ও বিদ্বেষকে জয় করার জন্য অপেক্ষা করলেন। তারাপদের অনেকগুণ, সে যাত্রাদলে যোগ দিয়েছিল, জিমন্যাস্টিকের সময় দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাত। কাঁঠালিয়ায় এসে ইংরেজি লেখাপড়া কিছু আয়ত্ত করে। বামুন ঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি চারুশশীর সমবয়সী -তার হৃদয় জয় করে। কেবল চারুশশীর ঈর্ষার অন্তর-রহস্য ভেদ হলে, বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বেই হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু বালক তারাপদ আসক্তি বিহীন পথে চলে যায়। *ক্ষুধিত পাষাণের* উপর্যুক্ত কাহিনী বিন্যাসের নৈপুণ্যে এবং তুলার মাশুল আদায়কারী মুসলিম চরিত্রের অনুভব কম্প্রতায় এবং দিন ও রাত্রি যাপনের শিহরণ মুখরতায় একটি নারী চরিত্রের নিভৃত গম্ভীর ক্রন্দনে, ভাষাবোধ এবং পরিবেশ নির্মাণের সৌকর্যে এটি একটি সফল অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।[৬]

> এক সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত-সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিস্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।[৭]

নিভৃত-নীরব বহুপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি প্রাসাদে একজন মুসলিম তুলার মাশুল আদায়কারীর রোমাঞ্চকর দিন যাপনের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত সার্থক অতিপ্রাকৃত ছোটগল্প হলো 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

পরিপ্রেক্ষিত এবং রজনীর রহস্যঘন আলো আঁধারীর পরিবেশ অতিপ্রাকৃত অনুভূতি প্রবণতা গল্পটিতে উচ্চকিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

স্ত্রীর পত্র গল্পটি মৃণালের স্বামীর উদ্দেশ্যে লেখা মৃণালের একটি চিঠি। পনেরো বছর মৃণাল তার স্বামী সংসারে ঘর-সংসার করেছে। মৃণাল ছিলো তাদের সংসারের মেজো বৌ। মৃণালের বুদ্ধি থাকায় তার বুদ্ধিমত্তার কারণে তাকে মাঝে মধ্যে গালমন্দ করা হয়েছে বটে; তবে সর্বোপরি গ্রামাঞ্চলের সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা তার শ্বশুরের সংসার খুব একটা করে নি। মৃণালের জা এর ছোট বোন বিন্দু-তার শ্বশুরের সংসারে আশ্রিতা হিসেবে আসায়; কেউ তাকে ভালো চক্ষে দেখেনি। স্বয়ং মৃণালের জা-ও তার বোনের ব্যাপারে স্বরূপদৃষ্টিভঙ্গির ছিলো না। বিন্দুর প্রতি তার শ্বশুর-পরিবারের অবহেলাকে মৃণাল সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। একটি আশ্রিতা নারীর প্রতি এমন কঠোর-নির্মম ব্যবহার কোনো সচেতন বিবেকবানের পক্ষেই মেনে নেয়া শোভন নয়। মৃণাল তার ঘরে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। তাকে ভালোবেসেছে। তার পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা পালন করেছে। এতে তাকে তিক্ততাও সহ্য করতে হয়েছে। বিন্দুকে একটি পাগল ছেলের সঙ্গে তার শ্বশুর-পরিবার বিয়ে দিয়েছে। কষ্টে ও অপমানে বিন্দু আত্মহত্যা করেছে। মৃণাল বিন্দুর অপমান ও আত্মহত্যার কষ্টে প্রতিবাদস্বরূপ স্বামীগৃহ থেকে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে। নারীকে যাতে সামাজিকভাবে ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয়- সেই বিষয়টিই এখানে মৃণাল চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টায়িত হয়েছে।[৮]

কঙ্কাল গল্পটি অতি প্রাকৃতের উপাদান সমৃদ্ধ একটি সার্থক ছোটগল্প। গল্পের মধ্যে ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ নির্মাণ, ভাষাশৈলী, জীবনবাস্তবতাসহ কাহিনীর একরৈখিক গতি এবং কাহিনীর লক্ষ্যমুখিতার যে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রিত থাকে- এ গল্পটিতে তার প্রতিটি অনুষঙ্গে অতি প্রাকৃতের উপাদান শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কঙ্কাল গল্পটির কাহিনী যে বর্ণনা করে- সে একজন নারী। তার ভাই এর বন্ধু, ডাক্তার শশিশেখরের প্রতি তার গভীর প্রেমবোধ ছিল; অথচ ডাক্তার যে দিন বিয়ে করতে যাবে-সেদিন সে ডাক্তারকে বিষপান করিয়ে মেরেছে এবং নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে- এভাবে কাহিনীটির মধ্যেই একটি শিহরিত স্তব্ধতায় অতিপ্রাকৃত ভাবনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

মশারির ভেতর থেকে গল্প শ্রবণকারী যে কঙ্কালটির আসল প্রেতাত্মার কথা শুনছিল, সে কঙ্কালটি তাকে বলেছে: "বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারিদিকে বিকশিত হইয়াছিল- একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"-এহেন রহস্য-সংলাপের মধ্যে কঙ্কালটির প্রেতাত্মামূর্তি এবং মশারির ভেতর থেকে শ্রবণকারীর যে অন্তর্গত শ্রবণবোধের শিহরণ-কাতরতা- এর মাধ্যমে সংলাপের মধ্যেও অতিপ্রাকৃত ভাব উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। গল্পটির পরিবেশ নির্মাণের মধ্যেও অতিপ্রাকৃত ভাব প্রকাশিত হয়েছে। রাত্রির প্রচ্ছন্ন আঁধার পরিবেশের মধ্যে জাগরণ এবং অর্ধজাগরণের, ভয়ের এবং ভয়হীনতার দ্বিধা-দোলাচলে যেভাবে গল্পটি পরিমাণমুখী হয়েছে, তাতে গল্পটির পরিবেশ নির্মাণের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ভাব আভাসিত হয়ে উঠেছে।[৯]

একটি কঙ্কাল যেভাবে তার আত্মগত স্বগতোক্তির মাধ্যমে তার জীবন, যৌবন ও ভালোবাসা এবং ভালোবাসার অপূর্ণতা ও প্রতিহিংসা এবং মৃত্যুর বর্ণনা করে যায়- তাতে গল্পটির জীবনদর্শনের মধ্যেও অতিপ্রাকৃত ভাবনা প্রস্ফুট হয়।

সমস্যাপূরণ গল্পে ঝিঁকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিন বিহারীকে জমিদারি দেখাশুনা ও সংসারের ভার দিয়ে কাশি চলে গেলেন। বিপিন বিহারী একটা প্রিন্সিপল ধরে কাজ করতে লাগলেন এবং বেহাত সম্পত্তি উদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন প্রায় সব সম্পত্তি উদ্ধার হলেও মির্জাবিবির পুত্র অছিমদ্দির সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ বাধল এবং মকদ্দমা পর্যন্ত চলল এতে অছিমদ্দি প্রায় নিঃস্ব হতে লাগল, দেনার দায়ে পড়ল। আদালতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারের দিন ঠিক হয়েছে- বিচারের পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণগোপাল আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে বিপিন বিহারীকে অছিমদ্দির সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন এবং এটাও বলেন অছিমদ্দি তারই সন্তান বিপিনের ভাই। গল্পে সমস্যার তৈরি হয়েছিল প্রিন্সিপল এর অভাবে।

মুসলমানীর গল্পে বংশী কাকা বাবা-মা মরা মেয়ে কমলাকে অত্যন্ত আদর যত্নে লালন করেছেন। কিন্তু সে কাকীর দু'চোখের বিষ, তার কাকী তাকে দেখতো সর্বনাশের প্রতীক হিসেবে। কাকীর সংসারে ভরাডুবির ভয়ে কমলাকে সব সময় দোষ মাথায় নিয়ে থাকতে হতো। সবাই কমলাকে তার কাকার ঘরে আপদ হিসেবে দেখতো। মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে কমলাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিয়ের পর বাড়ি ফেরার পথে তালতড়ির মাঠ পার হবার সময় মধুমোল্লার ডাকাতদলের হাতে পড়ে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে হবির খাঁ নামে এক দরবেশ তাকে রক্ষা করে তার কাকির কাছে ফিরিয়ে দিতে আসে, কিন্তু কমলাকে তারা ফিরিয়ে নেয় না; কারণ জাত যাবার ভয়ে। সে হবির খাঁর মোজো ছেলে করিম খাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে ফেলে। কমলা কোন লুকোচুরি না করে তার মনের কথা হবিখাঁকে জানায়। কমলার মুসলমান নাম হল মেহেরজান। বংশী কাকার দ্বিতীয় মেয়ে সরলার বিয়ে হয় এবং পূর্বের মত পথিমধ্যে ডাকাত দল আক্রমণ করে এবার কমলা স্বয়ং উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে। কারণ যে অবস্থায় পড়ে কমলা সমাজচ্যুত হয়েছিল, সরলাকে সে অবস্থায় সমাজচ্যুত দেখতে চায় না। সরলাকে উদ্ধার করে কাকার কাছে রেখে আসে এবং কাকাকে জানিয়ে যায় কাকা তোমার ভয় নাই, তোমার পা ছোবনা, একে ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে স্পর্শ করে নি। কমলা মেহেরজান হয়েও সে তার অতীতকে ভুলে যায় নি, বরং সে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তনে যোগদান করেছে। সে ধর্মকে বড় করে দেখে নি, মানুষকে এবং মানুষের মঙ্গল কামনাকেই বড় করে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি ও নারীমনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের চিত্র রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায়। '*শাস্তি*' গল্পে গ্রামের অতিসাধারণ মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। শ্রমজীবী মানুষ দুইভাই দুখিরাম ও ছিদাম রুই। দুই বউ এর মধ্যে কলহ নিত্যদিনের ব্যাপার। ক্ষুধার তাড়নায় অনেকটা আকস্মিক ভাবে দুখিরাম স্ত্রী রাধাকে খুন করে। ছিদাম বড় ভাইকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে সমাজের সাধারণ মানুষের মতই স্ত্রী চন্দরাকে খুনের দোষ স্বীকার করতে বলেছে। আবার যখন দেখেছে চন্দরার শাস্তি হয়ে যাবে তখন ছিদাম স্বাক্ষ্যস্থলে এসে কেঁদে জোড় হাতে বলেছে- "দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই"।[১০]

রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। *পোস্ট মাস্টার* গল্পে অতিসাধারণ একটি বালিকা রতনের পরিচয় মেলে। কলকতা থেকে উলাপুর গ্রামে এলে ছিন্নমূল অনাশ্রিত একটি বালিকা পোস্ট মাস্টারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় রতন সঙ্গে যেতে চাইলে পোস্ট মাস্টার তাকে সঙ্গে নিতে পারে নি। *একরাত্রি* গল্পে ভাঙ্গা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার এর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করে নি। *ক্ষুধিত পাষাণের*

মেহের আলী পলায়নপর জীবন যাপন করেছে। *অতিথি* গল্পের তারাপদকে এক স্থানে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে নি। বহুস্থানে বহু মানুষের স্নেহ ভালবাসা লাভ করেছে। *স্ত্রীরপত্রে* মৃণাল সমাজ ছেড়ে বেরিয়েছে। সে দেখেছে-বিন্দুর দুরবস্থা তাই সে জীবনের চিরন্তন সত্য উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। *একরাত্রি* গল্পের প্রকৃতি মানব মনের রহস্য উদঘাটনে সহায়তা করেছে। সেকেন্ড মাস্টার প্রকৃতির নিকট ঋণী হয়েছেন- "আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা"।[১১] *স্ত্রীর পত্রে* গাব গাছের রাঙ্গা পাতাদেখে বসন্তের আগমনি বার্তা পেয়েছে।

নারী মনের নিগূঢ় রহস্য রবীন্দ্র ছোটগল্পে ধরা পড়েছে। *কঙ্কাল* গল্পের নায়িকা বিধবা। কিন্তু মনের মণিকোঠায় ছিল এক পুরুষ। তাকে পাবার আশা নিঃশেষ হলে- নিজে সাজগোজ করে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়েছে। বানারসী শাড়ী পরে, সিন্ধুক থেকে গয়না বের করে পরে, সিঁথিতে সিদুঁর দিয়ে বকুল তলায় শেষে বিছানা পাতলে। *শাস্তি'র* চন্দরার মধ্যে প্রথম নারী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। *স্ত্রীরপত্রে'র* মৃণাল পনেরো বছররের সংসার এবং স্ত্রীর ভূমিকায় অবস্থানের পর সে বুঝতে পেরেছে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীতে নয় নারীত্বে। মৃণালের চিঠিতে স্বামী এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের প্রতি বিদ্রোহ ছিল। মৃণাল দেখেছে নারীত্বের অপমান । বিন্দুর জীবনের চরম মূল্যই তাকে বিদ্রোহী করেছে। তাকে মৃণাল আশ্রয় দিতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি। ফলে মৃণালের নারীত্বে সম্মানে টান পড়ে; জ্বলে উঠে মৃণাল আপন সত্তায়।

কঙ্কাল গল্পের নায়িকা কনক চাঁপার জীবনের স্বরূপ বর্ণনার মধ্যে গল্পটি হয়েছে শিল্প সফল। *সমাপ্তি* গল্পেও সাধু গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তবে কথ্য ভাষারও ব্যবহার হয়েছে যেমন- "দাদা কহিল, না, বাড়ি যেতে হবে; আজ কাজ আছে।"[১২] *সমাপ্তি* গল্পের পরিসমাপ্তি সার্থক ও শিল্পসফল হয়েছে। *অতিথি* গল্পের তারাপদের অতিথি হিসেবে আগমন এবং গানের পাখির মত প্রত্যুষে উড়ে যাবার মধ্যে যে শিল্পের অবতারণা লেখক করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। *ক্ষুধিত পাষাণে'র* কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গি, বিষয়বস্তুর রহস্যময়তা, একটি রসঘন ভৌতিক পরিবেশ, ভয় ও শিহরণের সঞ্চার, বাস্তবের সাথে অবাস্তবের মায়াজাল গল্পটিকে অতি উচ্চ শিল্পের আসনে বসিয়েছে। *স্ত্রীর পত্রে* নাগরিক সভ্যতার উপকরণ এসেছে। চলিত ভাষা এবং শিল্পরীতির দিক থেকেও নতুন টেকনিকের ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সমস্যাপূরণ* এবং *মুসলমানীর গল্পে* ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন। প্রসঙ্গত সমালোচক মন্তব্য স্মর্তব্য—

> রবীন্দ্রনাথের তৈরী করা শব্দ আমরা নিয়েছি ২৫ থেকে ৩০ হাজার । কিন্তু গোটা রবীন্দ্রনাথে কোথাও 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটি পাওয়া যায় নি।[১৩]

রবীন্দ্র গল্পের বিষয় ও প্রকরণগত আলোচনায় দেখা যায়, তাঁর বিষয়ভাবনা ও প্রকরণশৈলী বহুমাত্রিক, আধুনিকতার মর্মার্থ তাঁর গল্পমালার মুখ্য উপাদান। আত্মোপলব্ধি ও আপন অস্তিত্বের কেন্দ্রমূলে সর্বদা সৎ এবং তজ্জনিত প্রতীকী বিন্যাস, মানুষের অনুতপ্ত আর্তনাদ, অস্তিত্বের সত্যকে মেলে ধরে। সংসারের উদাসীন বাতাস, সামাজিক আইন-আচার রীতি-নীতি মূল্যবোধের প্রাচীরে তিনি বার বার বাধা পেয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রকৃতি ও মানুষ তাঁকে দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্পে বাস্তবজীবনের ঘটনাকে ছোটগল্পের আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের উত্তরাধিকার ছিল বাউল, বৈষ্ণব, ডোম, কাহার, সাঁওতাল, বেদে, বাগদি, ঝুমুর নাচিয়ে, বাজিকর, কৃষক প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ। তাদের জীবনচিত্র ধরা পড়েছে তারাশঙ্করের ছোট গল্পে।

তারাশঙ্করের *রসকলি*, *সন্ধ্যামণি*, *জলসাঘর*, *নারী ও নাগিনী*, *তারিণী মাঝি*, *পদ্মবউ*, *অগ্রদানী*, *ডাইনী*, *বোবা কান্না*, *মাটি* প্রভৃতি গল্পগুলো আলোচনা করে তারাশঙ্করকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতেপারে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে বাস্তবজীবনের ঘটনাকে ছোটগল্পের আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার রাজ্যে বসবাস ছিল বাউল, বৈষ্ণব, ডোম, কাহার, সাঁওতাল, বেদে বাগদি, ঝুমুর নাচিয়ে, বাজিকর, কৃষক প্রভৃতি নিম্নবর্গ মানুষ। খুব কাছে থেকে এসব মানুষ ও তাদের জীবনকে দেখেছেন তিনি। এছাড়াও চোর ডাকাত, লাঠিয়াল শ্রেণির অপরাধী মানুষের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছিল তার। এই শ্রেণির লোকদের জীবনের বাস্তবতার অস্তিত্ব ও মানবধর্মের প্রকাশ তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রসকলি গল্পে ত্রিভুজ প্রেমের ইঙ্গিত রয়েছে। পুলিন নায়ক তাকে ঘিরে-গোপনী ও মঞ্জরী। মঞ্জরী, পুলিন ছোটবেলা থেকে একে অপরের রসকলি। সাথে যোগ হয়েছে শ্রীমতি। পুলিন মঞ্জরীর বদলে গোপনীকে বিয়ে করায় গল্পে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। *রসকলি* গল্পে বৈষ্ণব জীবনে মাধুকরী বৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রামদাস ভিক্ষা করে অর্থ সঞ্চয় করেছে। পুলিন এই বৃত্তি করেই খেতে চেয়েছে; যখন তার স্ত্রী রামদাসের সমস্ত সম্পদের মালিক হয়। আর মঞ্জরী শেষে পথে বের হয়েছে একইভাবে কণ্ঠে গান নিয়ে জীবিকার্জনের জন্য। এ গল্পে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও বৈষ্ণবীয় প্রেমের অনুষঙ্গে লোকায়ত

সমাজ গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহের প্রচলন সম্পর্কেও জানা যায়। আবার নারীর অপছন্দ হলে বিবাহিত পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত- এ তথ্যও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্জরী জমিদারকে বলেছে 'আমারা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আবার নতুন গাঁথি'। বাবু তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। এমনকি নিজের গৃহে থাকার জন্য মঞ্জরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এতে মঞ্জরী বলেছে—

> আপনি রাজা, আপনিও শেষে। না হুজুর আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না। সে যে যা বলবে বলুক, তবে শেষ পর্যন্ত মঞ্জরী গ্রাম ত্যাগ করেছে। পুলিন গোপিনীর জীবন থেকে দূরে চলে যাওয়ার জন্যেই।[১৪]

সন্ধ্যামণি গল্পে হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য মহিমান্বিত একটি স্নানঘাট। ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটি বাজার। এই বাজারের বিড়ির দোকানদার ছকু। কুমোর বুড়ো পলি, পৈরু ও কুসুমকে নিয়ে গল্পের পটভূমি। কেনারাম চাটুজ্জের একমাত্র কন্যা সন্ধ্যামণি ৩/৪ বছর বয়সে মাস তিনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে। শোকে কেনারাম চাটুজ্জে ঘর ছেড়ে ভবঘুরে হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কুসুম ঘরেই থাকে মাদুর বোনে ও কষ্টে দিনাতিপাত করে। একে কন্যা মৃত্যুর শোক, উপরন্ত ঘরছাড়া স্বামীর শোক- তার পরও কুসুম মাদুর বোনে ও ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করে। স্বামী রাত্রে শ্মশান প্রহরী চণ্ডাল পৈরুর কাছে থাকে, রাত্রিবেলায় কুসুম স্বামীর জন্য গোপনে পৈরুর নিকট খাবার দিয়ে আসে। চাটুজ্জে দেখল নতুন করে কোন একটা ফসলে ফুল ধরেছে। বাড়ী এসে দেখল সন্ধ্যামণির ফুল ফুটেছে। খুকু গাছ পুতেছিল, কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হেসে তার ফিরে আসার প্রত্যাশায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সংসারে নতুন সন্তানের আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

জলসাঘর গল্পে রাঢ় বাংলার জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি এবং উঠতি পূঁজিপতি মহিম গাঙ্গুলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের সাত পুরুষের জমিদারি। তিন পুরুষ সঞ্চয় করেছেন। চার পুরুষ রাজত্ব করেছেন। ভোগ ও ঋণ করেছেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায় ঋণে জর্জরিত হয়ে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে দেবত্তর সম্পত্তিটুকু ছাড়া সব নিলামে চলে যায়। বলা হয় লক্ষ্মীহীন দেবরাজের কারণে। তবুও রায়বাড়ি রাজবাড়ি। উঠতি মহাজন মহিম গাঙ্গুলীর বাবা জনার্দন গাঙ্গুলী, রায় দপ্তরে মহাজনি করেছেন। মহিম গাঙ্গুলী আধুনিকতার প্রতীক। তার বাহন মোটরগাড়ি, তার বাড়িতে জেনারেটর এর আলো। মরা পাহাড়ের আড়ালে সোনার দেউল উঠেছে- কাজেই সে প্রতিযোগিতায় নামে রায় বংশের সাথে। রায় বংশের অর্থবিত্ত আজ অতীত তবুও অসম প্রতিযোগিতায় জলসাঘর আলোকিত করে। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের মোহ ছিল ক্ষয়িষ্ণু রায়বাড়ির দিকে।

নারী ও নাগিনী গল্পে খোঁড়া শেখ ও জোবেদা কেন্দ্রিয় চরিত্র হলেও নাগিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে গল্পের প্লট। খোঁড়াশেখ মজুর, জনখেটে যে টাকা পায় তা দিয়ে আফিম খায়, টাকা বেশি থাকলে মদ খায় তারপর বাড়ি এসে জোবেদার পা জড়িয়ে ধরে মাফ চায়, কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'তোকে খেতে দিতে না পেরে, আমি তোকে মেরে ফেললাম'। জোবেদা কিন্তু রাগ করেনা, 'স্বামীর কথার উত্তরে বলে খেপামি করিস না, আমাকে ছাড়- দুটো চাল দেখে আনি'।

খোঁড়া শেখ সাপ ধরে ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশি নিয়ে, আবার সাপের খেলা দেখায়। একদিন উদয়নাগ একটি সাপ ধরে দেখল এটি সাপিনী। সাপিনীর নাক ফুঁড়ে মিনি পরিয়ে দিল এবং মাথায় সিঁদুর দিয়ে নিকা করল। এবং জোবেদাকে বলল ও তোর সতীন হল। খোঁড়ার শুধু পা খানিই খোঁড়া নয়। নাকটা বসা এবং বীভৎস ফুটা, তাছাড়া মুখে বসন্তের দাগে খোঁড়া দেখতে কুৎসিত। তারপরও জোবেদার ভালবাসার কমতি নাই স্বামীর অংশ সে ছাড়বে কেন।

কয়েক মাস পর বর্ষার মাঝামাঝি খোঁড়া বাড়িতে ছিল না। খোঁড়া এসে আবিষ্কার করল নাগিনীর গায়ের গন্ধ। সাপিনী সাপের সাথে মিলিত হবার জন্য গন্ধ ছড়িয়েছে। খোঁড়া তাকে মুখে চুম্বন দিয়ে আদর করে জঙ্গলে ছেড়ে দিল। জোবেদা পরমসুখে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল ওটাকে আমি চোখে দেখতে পারি না, এত সাপ মরে, ওটা মরেও না। স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বসেছিল জোবেদা। নাগিনী ফিরে এসে নালার মধ্যে ফণা তুলে বেড়াচ্ছিল, জোবেদা ঘুটে ছুঁড়ে মেরে নাগিনীকে তাড়িয়ে দেয়। রাত দুই প্রহরে ফিরে এসে জোবেদাকে কামড় দেয়। জোবেদা মারা যায়। গল্পকার জোবেদার ঈর্ষা ও উদয়নাগের ঈর্ষাকে এক কেন্দ্রে দেখেছেন, ঈর্ষার সংঘর্ষে যে জ্বালা তাতে জোবেদার মৃত্যু হয়। খোঁড়া শেখের কথায় বলতে হয়, 'শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই'।

তারিণী মাঝি গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। তারিণী নিয়তির অনিবার্য পরিণতির কাছে কত যে অসহায় তা দেখান হয়েছে। তারিণী ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপারের মাঝি। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে মানুষ টিকে আছে। মূলত খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ কত অসহায়। বন্যায় গাছপালা তলিয়ে গরু, ছাগল, মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারিণী ময়ূরাক্ষীর খেয়াঘাটের মাঝি। নদীতে যাত্রী পারাপার করে সংসার চালায়, ঘোষ মশাইয়ের বধূকে উদ্ধার করে, এ ছাড়া গরু, গ্রামের ভূপ্তে ভল্লার ছেলে ও মদন গোপকে চোবন দিয়ে তুলে আনে গনুটিয়া ঘাটের খেয়াপারাপারের মাঝি। অথচ তার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী সুখীকে রক্ষা করতে পারে নি। যে সুখী ঘরে বান ঢোকার পরও স্বামীর

জন্য অপেক্ষা করে। সে সুখী নির্ভরশীলতার করুণ ট্রাজেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একদিকে ময়ূরাক্ষী নদী জৈব অস্তিত্বের প্রতীক, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসী।

পদ্মবউ গল্পে স্বামী চন্দ্রমশায়ের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হলে পদ্মবউ প্রথমে ভয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়েছে। পরে সে পাঠশালায় স্বামীকে সাহায্য করেছে । স্বামীর সেবা করে গ্রামে খ্যাতি অর্জন করেছে। নতুন পাস করা ডাক্তার এসে কুষ্ঠরোগীর কাছে না পড়ানোর পরামর্শ দিলে তার পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়। পদ্মবউ অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাতে ধানভানে, চাল পরিষ্কার করে, নিজে অভুক্ত থেকে স্বামীর সেবা করে। এবার নিজে কুষ্ঠব্যাধি ধারণ করলে তার মনে হয়েছে—

> স্বামী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ায় যা মনে হয়নি, রুজি রোজগারের– অক্লান্ত শ্রমে, অর্ধাহারে অনাহারে পদ্মবউয়ের যা মনে হয় নি, আজ নিজে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে পদ্মবউয়ের মনে হলো এ জীবন অর্থহীন, সে কি মনের গভীরে কুষ্ঠকে এত ঘৃণা করত, এত ডর ভয় পেত।[১৫]

অগ্রদানী একটি অতি লোভী ব্রাহ্মণের কাহিনি। একটি অসাধারণ বিকৃত চরিত্র। গ্রামের রীতি-নীতি, বিশ্বাস, রিচুয়াল, সংস্কার, বর্ণবাদ এই গল্পকে বাংলার গ্রাম জীবনের এক দলিলে পরিণত করেছে। মানুষের জৈব বৃত্তিগুলোকে তারাশঙ্করের বড় ভয়। এদের অসাধারণ শক্তি। অমানব জীবে এই বৃত্তিগুলোর মধ্যে থাকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।[১৬]

অনার্য ব্রাত্য জীবন ও তার সংস্কৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের গল্প। পূর্ণচক্রবর্তী গরিব ব্রাহ্মণ, তার বিলাস ভালো ভালো খাবারের প্রতি আদিম লোভ। ধনী শ্যামাদাশের কাছে ৪৫ বিঘা জমি, বছরে ৫০ টাকা জমিদারি সম্পত্তির মুনাফা, আজীবন সিংহবাহিনীর প্রসাদ ও প্রচুর দান সামগ্রী পেয়েছে। গল্পের শেষে ছেলের পিণ্ড পাত্রের *অগ্রদানী* তার হাতেই হয়েছে, পুরোহিতের ভাষায়- 'খাও হে চক্রবর্তী'। কাজেই *অগ্রদানী* অসাধারণ গল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মূলত *ডাইনী* গল্পে নিম্নবর্গ প্রান্তিক নারীর লাঞ্ছনা বর্ণিত হয়েছে। সমাজ কর্তৃক নির্যাতন সহ্য করে শেষ পর্যন্ত অভিশপ্ত জীবনকে ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছে সরা। মনোবিকারগ্রস্ততায় সে প্রকৃতই ডাইনী হয়ে উঠেছে লোকমুখের কথার সূত্র ধরে। সমাজই তাকে বিকারগ্রস্ত করেছে। হারু সরকারের ছেলের মুড়ি খাওয়াতে নজর দেওয়া থেকে শুরু করে স্বজাতীয়া সাবিত্রীর ছেলেকে আদর করে চুষে খাওয়ার উদগ্র বাসনা, তার ওপর গ্রাম সমাজে মানুষের ডাইনী আখ্যা, বোলপুরে স্বামীর মৃত্যুকে নিজের শোষণে মৃত্যু হিসেবে চিহ্নিত করা, ছাতিফাটার মাঠে আগত অপরিচিতা যুবতীর শিশুপুত্রের মৃত্যু, বাউড়ি জোয়ান যুবকের মৃত্যু এসব মৃত্যু দুর্ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেছে সরা। তার ডাইনী উপাধির প্রতিবাদ সে করে নি। বরং সমাজের বাইরে এসে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। তার সামনে থেকে পলায়নপর যুবককে সে বলেছে–

> 'মর-মর'। তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।' অবশেষে সন্ধ্যায় একটি ছোট পুঁটলি নিয়ে ছাতিফাটার মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে প্রবল ঝড়ে সে নিজেই অপমৃত্যুর শিকার হয়। তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, নিষ্ঠুর শোষণের প্রবৃত্তি সমাজই তৈরি করে দিয়েছে। নিঃসঙ্গ নারী ক্রমান্বয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে।[১৭]

এভাবে সম্পত্তি বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনুন্নত অঞ্চলের মানুষ কাউকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে হত্যা করবার জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে। *বোবা কান্না*তে অন্যতম চরিত্র চোর শশী ডোম। সে ধান চুরি করে, সকলেই তাকে চেনে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর খাদ্যাভাব, রোগ বালাই বৃদ্ধি অসুখের ঔষধ না পাওয়া, ধানের দাম বৃদ্ধি, চাল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা মন। কাপড়ের দাম বৃদ্ধি, চিনি নেই। কেরোসিন পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় শশীডোম চুরি করে জীবিকা অব্যাহত রেখেছে। গল্পের চরিত্র আনুর মৃত্যুর পর আনুর ছেলের মৃত্যুতে তার স্ত্রীর বোবার শোকার্ত চিৎকার। তার মধ্যে কথা নাই। শুধু একটা লম্বা বেদনার তরঙ্গায়িত কণ্ঠস্বর। এমন কান্না আর হয় না। কেউ কখনো শুনে নি। প্রবাহমান এরোপ্লেনের শব্দের মতো কান্না, এতে চোর শশী ডোম আত্মহত্যা করে। ফলে অপরাধী শশী ডোম হয়ে উঠে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র।

মাটি গল্পে-নিজগ্রাম, ভূমি ও বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে প্রিয়তম আকালু মুসহরের কন্যা লছমনিয়াকে হারিয়ে কলকাতায় এসে বস্তির বাসিন্দা হয় প্রাক্তন ভূমিপুত্র জীওনলাল। এ গল্পে জমিদার ও জাহাজ বা স্টিমার কোম্পানির জন্য গ্রামীণ কৃষক থেকে জীওনলালের কলকাতায় মাটিওয়ালায় পরিণত হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একই সঙ্গে ভূমি ও বাড়ী থেকে উচ্ছেদ- জীওনলালের অজান্তে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে।[১৮]

লছমনিয়া দুই বছর ও জীওনলাল পাঁচ বছর জেল খাটে। জীওনলাল জেল থেকে বেরিয়ে দেখে লছমনিয়া সাহেবের বেটার মা হয়ে বসে আছে। লছমনিয়ার মঙ্গল কামনায় জীওনলাল কলকাতায় চলে আসে এবং মাটি বিক্রি করে। আজও সে প্রতিমাসে দশ টাকা করে পাঠায় লছমনিয়ার কাছে।

মূলত মাটি বিক্রি করা এবং টাকা পাঠানোর মাধ্যমে মাটির প্রতি এবং লছমনিয়ার প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র অনন্যপূর্ব কথাকোবিদ।[১৯]

তাঁর ছোটগল্পগুলোতে শিল্পিত জীবনের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে–

> সময় ও সমকালের দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে বিক্ষত, প্রবৃত্তি তাড়িত ও নিয়তিশাসিত মাটিঘেঁষা মানুষের চারুশিল্পী তারাশঙ্কর । কল্লোলীয় নাস্তির কুণ্ডলী ছিঁড়ে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন মানবাত্মার শাশ্বত জয়গাথা, চিরায়ত মানবধর্মের মাঙ্গলিক মূর্ছনা।[২০]

মায়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের মাঝি তারিণী। সন্তানহীনা স্ত্রী সুখীর প্রতি ভালবাসার কমতি ছিল না তার। কিন্তু হরপা বান থেকে নিরাপদ ভূমির সন্ধান দিতে পারে নি স্ত্রী সুখীকে। আকুল সংগ্রাম করেও ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণি থেকে সুখী রাক্ষা পায় নি। নিজেকে মুক্ত করতে এবং আলো ও মাটির প্রত্যাশী হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে সুখীর গলা, খসে গেল সুখীর জীবনী। নিয়তি শাসিত মাটি ঘেঁষা মানুষের নির্মম নিয়তি অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর। জীবনকে দেখেছেন রাঢ়ের বৃহৎ জমিদার ও ক্ষুদ্র জমিদার ও ব্রাহ্মণ শ্রেণি ও অসংখ্য নিম্নবর্গের মানুষের দৃষ্টিতে। জলসাঘর গল্পে একদিকে বাইজি, অনন্ত, চাকর অন্যদিকে উঠতি জমিদার মহিম গাঙ্গুলী ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। রায়বাড়ী আজ নিঃস্ব, কিন্তু চিহ্নগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যের জমিদার বাড়ি হিসেবে। কিন্তু মরাপাহাড়ের আড়ালে মহিম গাঙ্গুলী সোনার দেউল তুলেছে। বাসা দাস-দাসীতে ভরা। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, মোটর গাড়ীর এবং জেনারেটর এর আলোয়:

> গাঙুলী বাড়িতে নাচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙুলীদের নিজেদের ডায়নামো। ইলেকট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।[২১]

তারাশঙ্কর গল্পের পরিচর্যা করেছেন নিজস্ব স্টাইলে। নবীন ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর সাথে প্রাচীন জমিদারের প্রতিযোগিতা প্রাচীন জমিদার-এর ভগ্ন জমিদারি এবং জলসাঘরের নাচ-গানের অসম প্রতিযোগিতার আসর। গল্পের শেষে জমিদারের পূর্ব স্মৃতির মতই চাবুক হাতে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া। শেষে কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন। মনে হয়েছে বিশ্বম্ভর রায়ের ট্রাজিক পরিণতি গল্পাকার আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

তারাশঙ্করের গল্পের দৃষ্টিকোণ Point of view *নারী ও নাগিনী* গল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। নাগিনীকে নাকে মিনি পরিয়ে কপালে সিঁদুর দিয়ে খোঁড়া সেখ নিকা করল। খোঁড়া সেখ এর স্ত্রী নিষেধ করেছে এবং সাপিনীকে তাড়িয়ে দিতে বলেছে কিন্তু খোঁড়া সেখ স্ত্রীকে বলেছে দেখ্ দেখ্ কেমন করছে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে; সাপ-সাপিনী যখন খেলা করে তখন এমনি জড়াজড়ি করে থাকে । খোঁড়া সেখ ও সাপিনীর অস্বাভাবিক হৃদয় বৃত্তি একে ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং জোবেদার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি তীব্র রোমান্স। ফলে দুই নারীর চিত্তের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। এর মূলে রয়েছে তীব্র আকর্ষণের মুগ্ধতা। নাগিনীও যে নারীর মত হিংসুক হতে পারে- এর গভীরে প্রবেশ করেছেন তারাশঙ্কর। তাদের জীবন একটিমাত্র সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তা হল প্রবল জৈবসংস্কার। বেঁচে থাকার তাগিদ আর সেই সঙ্গে বিচিত্র অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না-

> রাঢ়ের আঞ্চলিক জীবন- পরিবেশে লোকায়ত নরনারীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির অমোঘ রূপ তারাশঙ্কর গভীর বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন প্রবৃত্তিই মানুষের অনিবার্য নিয়তি। প্রবৃত্তির নিগূঢ় অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মানুষ আপন অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে ছুটে চলে।[২২]

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে রাঢ় বঙ্গের মানুষের মৃত্যুর প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করার মত। মৃত্যু চিরকালই তারাশঙ্করের প্রিয় প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছে। সবুজের বৈতরণী পরেই গ্রামগঞ্জ নয়, দেখা যায় শ্মশান। *রসকলি* গল্পে শ্রীমতী বৃন্দাবনে কলেরায় মারা গিয়েছে। *সন্ধ্যামণি* গল্পে-কেনারাম চাটুজ্জের একমাত্র কন্যা সন্ধ্যামনি তিন/চার বছর বয়সে মাস তিনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছে। *জলসাঘর* গল্পে কলেরা রোগে সাতদিনের মধ্যে রায়গিন্নী, দুইপুত্র, এক কন্যা ও কয়েকজন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছে। *নারী ও নাগিনী*'তে জোবেদার, *তারিণী মাঝি*'তে সুখীর, এমনিভাবে *পদ্মবউ, অগ্রদানী, বোবাকান্না, ডাইনী ও মাটি* গল্পে মৃত্যুর মিছিল চলেছে। মৃত্যুর মধ্যেই এসব মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহী হয়েছে। *মাটি* গল্পেও প্রতিবাদ ছিল। জাহাজ কোম্পানীর চক্রান্তে জীওনলাল ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। মোক্তার ঘুষ খেয়ে জমিদারকে মামলায় জিতিয়ে দিয়েছে। জীওনলাল প্রকৃতির কাছে বিচার চেয়েছে এবং বলেছে- মেরে জমিন, শিবমন্দিরের পাশের পাথর ভাঙ্গার সময় গহ্বর তৈরি হয়ে বাঁধ ভেঙ্গে যায় এর ফলে গ্রাম ভেসে যায় টিশনসহ প্রচুর ক্ষতি হয় এটাইতো ভূমিহীন কৃষকের প্রতিবাদ।

> নিজেরা যা পারে না প্রকৃতির মহাপ্রলয়ে তারই কলরোল। তার প্রণয় মিলনেরও যেন এই হল যোগ্য পটভূমি[২৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রসকলি ও সন্ধ্যামনি* গল্পে জীবন এবং সমাজের শিল্প সফল চিত্র ফুটে উঠেছে। ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে রাঢ় বাংলার মানুষের চরিত্রের উপযোগী। *জলসাঘর* গল্পের গদ্যরীতি সাধুভাষায় হলেও ব্যতিক্রমী: "রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে- জলসা ঘরের দরজা বন্ধ কর।"[২৪]

নারী ও নাগিনী গল্পের ভাষা ব্যবহারের চাতুর্য আছে খোঁড়া শেখ ও জোবেদার কথপোকথনে। *তারিণী মাঝি* গল্পে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের বিশেষ ভাষার বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে ফলে সাধুরীতির গদ্যেও বিশিষ্টতা পেয়েছে এবং নদীকে চরিত্রে রূপ দেওয়ায় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

পদ্মবউ গল্পটি সাধু ভাষায় লিখিত কিন্তু সংলাপে কথ্য ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। *অগ্রদানী* গল্পের ভাষার তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকের মিশ্রণে ছোটগল্পের প্রকরণের অসাধারণ শিল্পের পরিচয় ফুটে ওঠে। *ডাইনী* গল্পের ভাষা বিষয় ও পরিবেশের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গল্প বলার ভঙ্গি আয়াসহীন শ্বাসরুদ্ধকর। অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ—
"গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে।"[২৫]

বোবা কান্না'র শব্দ এরোপ্লেনের মত। *মাটি* গল্পে কখনো সাধু ভাষা আবার কখনো বাংলা হিন্দির মিশ্রণ আবার কখনো চলিত গদ্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাঢ় বাংলার লাল মাটির লোকজ সংস্কৃতি। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনে ভাষার প্রয়োগ ও শিল্পসৃষ্টিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মানুষের জীবনের বহু মাত্রিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্পের জীবন বৈচিত্র্য রূপায়ণে তিনি দক্ষ কারিগর। তাঁর গল্পে নিম্নবর্গের অন্ত্যজ, ব্রাত্য, প্রবৃত্তি চালিত, লোলুপ, ছোটলোক প্রভৃতি শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনের চাহিদা, জৈব আসক্তি, আদিম যৌন প্রবৃত্তির তাড়না স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের লোকায়ত জীবন ও সমাজ বিবেক তাড়িত নয়, নতুন পেশা গ্রহণ নিম্নবর্গের মানুষের জীবন শক্তির উৎস লীলার আদিমতায় ভরপুর। তারাশঙ্কর জামিদার ও ব্রাক্ষণ। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের প্রতি তাঁর দরদ ছিল। তিনি উচ্চবর্গের মানুষ হয়েও, উচ্চবর্গের মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণের পাশা-পাশি নিম্নবর্গের মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনের ফলে তাঁর গল্পে যেমন প্রকরণগত মাত্রা যোগ হয়েছে তেমনি তাঁর শিল্প সম্ভার হয়েছে সুষমামণ্ডিত।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) নতুন দৃষ্টিচেতনা ও প্রকরণকৌশলে রহস্যপ্রিয় শিল্পীসত্তা; যে জীবনকে তিনি বিচিত্র রকমে উপলব্ধি করেছেন, যে জীবনের বিচিত্র সমারোহ ও শূন্যতাকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করেছেন- সেই মুখর জীবনের বর্ণাঢ্য চালচিত্র বনফুলের গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। বনফুলের অসংখ্য গল্পের মধ্যে *ক্যানভাসার, মানুষের মন, মানুষ, নিমগাছ, তাজমহল, গণেশ-জননী, অর্জুন মণ্ডল, ছোটগল্পের গল্প, বুধনী, পাঠকের মৃত্যু* গল্পগুলো বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ক্যান্‌ভাসার বনফুলের একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এখানে ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া দুর্দশাগ্রস্ত এক অসহায় বৃদ্ধের কাতরোক্তি আমাদের বেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করে। উপযুক্ত ছেলেটি বুড়ো বয়সে মারা যাওয়ায় হীরালাল ক্যান্‌ভাসারী করে জীবনের চাকা ঠিক রেখেছেন।

মানুষের মন গল্পে মানুষের মানস রহস্যের চরম বিকাশ লাভ করেছে। নরেশ ও পরেশ দুইজনে সহোদর। কেউই সংসারী নয়। ছোট ভাই তপেসের পুত্র পল্টুকে দুই ভাই সমানভাবে ভালবাসতেন। নরেশ পরেশ দুই জনই এম.এ পাশ, কলেজের শিক্ষক। নরেশ কেমিস্ট্রি এবং পরেশ সংস্কৃতে। পল্টুর টাইফয়েড হলে দুই ভাই সমান অস্থির। একজন বৈজ্ঞানিক স্বভাবই এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার অপরজন বৈষ্ণব গেলেন কবিরাজের কাছে। জ্যোতিষী এবং তারকেশ্বরের দৈব ওষুধ। বৈজ্ঞানিকের ইনজেকশন বৈষ্ণবের চরণামৃত কিন্তু কিছুতেই পল্টুকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। আসলে বিপদে মানুষের আচরিত বিশ্বাস তিরোহিত হতে পারে। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত *মানুষের মন* গল্প।

মানুষ গল্পে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। গঙ্গাবক্ষে অস্তমিত রবির রশ্মিচ্ছটা। তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়, সম্মুখে রোমন্থনরত নধর দেহের গাভী। মুদিত নয়ন একটি মার্জার, দেবালয়ে পূরবীর অপূর্ব আলাপ স্বপ্নাচ্ছন্ন কি সুন্দর এই পৃথিবী। কিন্তু ঘোর কাটলে বাস্তবতায় দেখি তার উল্টোরূপ; স্বর্গীয় দেবালয়ের পাশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী এবং যুবতী ভিখারিণী। লেখকের ভাষায়- 'ব্যাধি স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে-একই উদ্দেশ্যে ক্ষুধার অন্ন চাই'। বিড়ালটা ইঁদুর ধরার জন্য উৎপেতে বসে থাকে। মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে বঞ্চিত করে মানুষ নিজের প্রয়োজনে দুধ দোহন করছে। পালতোলা

নৌকাগুলো জাল ফেলে মাছ ধরছে। পুত্র শোকাতুরা নিজ গৃহিনী; পাশের বাড়ির গৃহিনীর পুত্র সন্তান প্রসবে তার মঙ্গল কামনা করছেন। বিদ্যার জোরে নয় সুপারিশের জোরে চাকুরী হচ্ছে। বহু বাধা সত্ত্বেও সতীকে স্বামীর সাথে চিতায় তুলে দিচ্ছে। চিন-জাপানে যুদ্ধ। সুন্দর অসুন্দরের খেলার এই পৃথিবী।

নিমগাছ একটি ঔষধি গাছ। বনফুল পেশায় ডাক্তার, নিজে গল্পে উপস্থিত না হয়েও ডাক্তারির ভাষায় নিমগাছের উপকারিতা পাঠককে বলে চলেছেন। নিমগাছের ছাল ছড়িয়ে সিদ্ধ করে খায়, পাতা পিষে, ভেজে, বেগুন সহযোগে খায়। কচি পাতা এমনি এমনি কাঁচা খায়। খোস, দাদ, হাজা-চুলকানির মহৌষধ। নিম ডাল চিবালে দাঁত ভাল থাকে। কবিরাজেরা প্রশংসা করে। ডাল কাটে না, যত্নও নেয় না, আবর্জনা জমে। নতুন ধরনের লোক এসে আবিষ্কার করে কত সুন্দর গাছ, পাতাগুলো কত সুন্দর! কি রূপ! থোকা ফুলের কি বাহার! যেন নক্ষত্র নেমে এসেছে নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। লোকটার সাথে নিমগাছটা চলে যেতে চাইল কিন্তু পারল না মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে গেছে। গল্পের শেষ ব্যঞ্জনা গল্পটিকে অপূর্ব করে তুলেছে। শতগুণের তুল্য গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার নিমগাছের মত গুণ থাকলেও; আপন স্বাভাবিক অস্তিত্ব তার নেই। ব্যক্তিজীবনে সে অবহেলিত; আবর্জনার স্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা নিমগাছের মত। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মুক্তি পায় না, কারণ তার সংসার অনেক দূর গড়িয়েছে। লেখক প্রকৃতির সত্তায় মানুষের বাসনার পরিচয় দিয়েছেন- সেখানে প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে।

তাজমহল গল্পে সম্রাট শাজাহানের সাথে ফকির শাজাহানের তুলনামূলক চিত্র দেখিয়েছেন লেখক। সম্রাট শাজাহানের অমর কীর্তির মুগ্ধতার পাশে ফকির শাজাহানের প্রেমের মহিমাকে বনফুল শিল্পীত তুলির আঁচড়ে প্রাণদান করেছেন। ফকির শাজাহান প্রকাণ্ড ঝুড়ির মাঝে বোরখা পরিয়ে- ক্যাংক্রাম অরিস নামে দুরারোগ্য ব্যাধিতে মুখের আধখানা পচে যাওয়া, দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না, ডানদিকের গালটা নেই, দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে- এমন কদাকার স্ত্রীকে পিঠে বয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছে ফকির শাজাহান। দুর্গন্ধ ও তীব্র ঘৃণায় রোগীরা আপত্তি করল, কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজি হল না। বৃদ্ধ নির্বিকার। দিবারাত্রী সেবা করে চলেছে রোগীকে, একদিন তাকে বারান্দা থেকে গাছতলায় সরিয়ে দেয়া হলো। লেখক ডাক্তার হিসেবে নিজে গিয়ে ইন্‌জেকশন দিয়ে আসেন, সে হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে। গরিব বৃদ্ধের স্ত্রীর এভাবেই সেবা চলছিল। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি এল, বৃদ্ধ নিজে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তার স্ত্রীকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে পানি থামে না, অবশেষে স্ত্রী মার যায়।

ক্যাংক্রাম অরিস নামে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বেগমকে অবিরাম সেবা করেও যখন দরিদ্র বৃদ্ধ ফকির শাজাহান বাঁচাতে পারে নি, তখন ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে কতগুলো ভাঙ্গা ইট আর কাদা দিয়ে সমাধি নির্মাণ করে ফকির তার প্রেমের স্মারক গড়ে তুলেছে- সেই আগ্রার মাটিতেই। যেখানে সম্রাট শাজাহানের শ্বাশত প্রেমের মূর্তি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল। প্রকৃতপক্ষে গল্পাকার প্রেমের ঐশ্বর্যময় আড়ম্বরের পাশে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঐশ্বর্যহীন শ্বাশত প্রেমের মহিমা।

গণেশ জননী গল্পে গল্পাকারের পশুপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। গণেশ নামের একটি হাতির চিকিৎসায় ডাক্তার দূর মফঃস্বল গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী নিজের সন্তানের মতো গণেশকে সেবা যত্ন করছেন। 'ভিতরে গিয়ে দেখেন একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হয়ে বসে আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তার শুঁড়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে খাওয়ানোর জন্য সাধ-সাধনা করছেন:

> সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।[২৬]

বলাবাহুল্য এই ক্ষীণকায়া মহিলাই ভদ্রলোকের স্ত্রী গণেশ জননী। তিনি আরও কৌশল করে সন্তানের মত আদর করে গণেশকে বলছেন— "খাও লক্ষ্মী তো- লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু–।"[২৭]

গণেশের কাছ থেকে জননীও সেবা পেয়েছেন। যখন তিনি স্নান করতে যান গণেশ তার পিছু পিছু গামছা বালতি নিয়ে যায়। যখন রান্না ঘরে ঘর্মাক্ত হয়ে যান গণেশ শুঁড় দিয়ে পাখা ধরে হাওয়া করে। পূজার সময় এবার রূপোর ঘণ্টা গড়িয়ে দিয়েছে গণেশকে। গিন্নী বকেছে এজন্য ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ করে বসে আছে। একশ বিঘা জমির ফসল গণেশের পেটে যায়। গহনা বন্ধক দিয়া গণেশের জন্য চিকিৎসা করায়। আসলে সন্তানহীনা মহিলা সন্তানের আপত্য স্নেহের অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন হাতিটির সাথে এবং হয়ে উঠেছেন হাতি জননী বা গণেশ-জননী।

অর্জুন মণ্ডল গল্পে আছে একজন আদর্শবাদী মানুষের কথা। অর্জুন মণ্ডল সকলের কাছে অর্জুন কাকা নামে পরিচিত। তার জীবন সাধনা অসাধারণ। আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু সহজ জীবনের পথে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা অচল। তিনি নিজে এবং পরিবারের জন্য শিক্ষার পথ সৃষ্টি

করেছিলেন। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে বহন করতে চেয়েছিলেন এজন্য সর্বভার বহনকারী একটি সিন্দুক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বিরাটকায় সিন্দুকের ভার বহন করাই দুঃসাধ্য।

*ছোটগল্পের গল্প'*তে ছোটগল্পের স্বরূপ অবয়ব কেমন হবে তা বোঝাতে চেয়েছেন। ছোটগল্প অতি ছোট হবে এবং গল্প হবে। মুহূর্তের ঘটনা তার সম্বল হবে। কিন্তু প্রকাশকদের চাপে ছোটগল্প উপন্যাসের মেকআপে উপস্থিত হচ্ছে ফলে তন্বী কিশোরীটি মেদ বহুল উপন্যাসে পরিণত হচ্ছে। মূলত পূর্বে ছোটগল্পের যে আকার ছিল এখন তা নেই। আকৃতি পরিবর্তন করে উপন্যাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মূলত জীবনের সামান্যতম দোলায়িত সবুজ গমের শিষ হয়ে উঠতে পারে ছোটগল্প। মেকআপ ছাড়া গল্পই প্রকৃত ছোটগল্প।

বুধ্নী নামক গল্পে বিল্টু চরিত্রের একটি দিককে দেখানো হয়েছে হাজারীবাগের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সন্তান বিল্টু। প্রাণ-সংশয়ের শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিল্টু বুধ্নীকে জয় করেছিল। বিবাহের পর বিল্টু বুধ্নীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই। বনে-জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্নদেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করত। বুধ্নীর খোপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল, বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশি থাকত।

দু'বছর বাদে তাদের মিলিত জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটল। বুধ্নী এক সন্তান প্রসব করল। বুধ্নীর সেকি আনন্দ, প্রেয়সী মূর্তির পরিবর্তে জননী মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল। বুধ্নী স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল। গল্পের ভাষায়-'বিল্টু দেখিল-একি! বুধ্নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধ্নীতো তাহার আর একার নাই! প্রচণ্ড ক্রোধে অস্থির হয়ে হত্যা করল নিজ সন্তানকে। বিচারে বিল্টুর ফাঁসি হল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিল্টু চিৎকার করে গেল বুধ্নী-বুধ্নী-বুধ্নী'। দুর্বার জৈবিক তাড়না ছিল গল্পটির প্রাণকেন্দ্রে।

পাঠকের মৃত্যু আসানসোল স্টেশনে আরেক যাত্রীর কাছে গল্পকার একটি উপন্যাসের বই চেয়ে নেন। ট্রেন আসার পূর্বেই উপন্যাসটি পড়ে শেষ করার জন্য গোগ্রাসে গিলতে থাকেন। তিন ঘন্টা অতিবাহিত হলো কিন্তু পড়ার অনেক বাকী ছিল। বই পড়ে শেষ করার জন্য পরবর্তী ট্রেনে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। বই এর শেষ পাতাগুলো না থাকায় বই পড়ে শেষ করতে পারে নি।

দশ বছর পর ভাগিনেয়ীর শ্বশুর বাড়িতে ঐ একই বই পেয়ে গল্পকার সাগ্রহে পড়া শুরু করেন, কিন্তু বই পড়তে বসে গল্পকারের মনে হয়েছে- এমন রাবিশ মানুষ লেখে, এ শেষ করা অসম্ভব। বইটি পড়ার মতো উৎসাহ না পাবার কারণ দশ বছর আগেকার সেই উৎসুক পাঠকের মৃত্যু ঘটেছে।

বনফুলের গল্পগুলোর মধ্যে এক ধরনের চমৎকৃত আছে- যা তাঁর রচনার পরিকল্পনার মৌলিকতা আখ্যান বস্তু-সমাবেশ বিচিত্র উদ্ভাবনী-শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানা রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে মানব চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। অনেকগুলো গল্প মেডিক্যাল কলেজে লেখা পড়া করার সময় লিখেছিলেন এবং তার বিশ্বাসের সাথে কোন বিরোধ ছিল না । বনফুলের কৌতুক সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। গল্পের প্রকরণ শৈলী অসাধারণ-"বাক্যে, অলঙ্কারে আয়তনে তির্যকতায় ও জীবনবোধে বনফুলের গল্পসমূহ পরিপূর্ণ রসভারে দ্রাক্ষার মতো সরস বলেই মহৎ শিল্পাঙ্গিক হিসেবে গণ্য। ঐরাবত থেকে প্রজাপ্রতি সবরকম গল্প সৃষ্টি করে বনফুল যেন ব্রহ্মীর মতো গৌরাবান্বিত। চিত্রকরের নিপুণতা ও গল্পের বৈঠকী মেজাজ-মননের নিষ্কায়িত বেগ ও আবেগ একীভূত হয়ে আছে বনফুলের গল্পে"।[২৮]

বনফুলের ক্যানভাসারী জীবনের প্রতি দৃষ্টি ও সহানুভূতি ছিল *মানুষের মন* গল্পে দেখিয়েছেন মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরও মন আচরিত বিশ্বাসেই পড়ে থাকে। *মানুষ* গল্পে দেখিয়েছেন বেঁচে থাকার বিচিত্র লাড়াই। এরই মধ্যে কেও কেও মানুষের কল্যাণ কামনা করছেন। *নিমগাছ* গল্পে নিমগাছের সাথে মানুষের জীবন চরিত্রে মিল দেখানো হয়েছে। *তাজমহল* গল্পে প্রেমের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। *গণেশ-জননী'*তে পশুর প্রতি মানুষের সন্তান স্নেহের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। *বুধ্নী, অর্জুন মণ্ডল* গল্পে জীবন চৈতন্যে প্রাকৃতিক লীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *বুধ্নী* গল্পে আদিম জৈববৃত্তির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। *পাঠকের মৃত্যু* গল্পে মনের বিকৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বনফুল-এর গল্প গুলোতে মৌলিকত্ব বিদ্যমান। তিনি টেকনিকের দিক থেকে বাংলা ছোটগল্পে একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ২০ থেকে ২৫ লাইনের গল্প রচনা করেছেন নিজস্ব স্টাইলে। তাঁর গল্পগুলো আকারগত বৈশিষ্ট্যে ছোট হলেও, ভাষায় রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ। বৃত্তিতে চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক মেজাজের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বনফুল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণশৈলী অসাধারণ। কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। বন্ধুর জ্বরের পরে প্রতিবেশির বাড়ি থেকে অল্পপথ্য চেয়ে আনা, বন্ধুর বিয়েতে দেশি বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার তৈল উপহার দেওয়া রহস্যপ্রিয় শিল্পসত্তা ও নতুন দৃষ্টি চেতনা প্রকরণ কৌশলে জীবনকে কত বিচিত্র রকমে উপলব্ধি করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিস, বিজ্ঞানী মেজাজে অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্ণ কৌতূহলী মন, গল্পের পরীক্ষা নিরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং লিরিকধর্মী গল্প নির্মাণে বনফুল আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে অনন্য স্থানের অধিকারী।

কল্লোল ধারার সাহিত্যিক হিসেবে স্বকীয়তা লাভ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯০৪-১৯৮৮)। তিনি ত্রিশের দশকের লেখক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়। রাজনৈতিক অঙ্গনে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসুর সরব উপস্থিতি ছিল, স্বাধিকার আন্দোলনে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জিত হলে- মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত যে স্বপ্ন দেখেছিল তা পুরোপুরি পূরণ হয় নি। বেশি আশাহত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনচিত্র ধরা পড়েছে প্রেমেন্দ্রে মিত্রের ছোটগল্পগুলোতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শুধু *কেরানী, পুন্নাম, সাগর সঙ্গমে, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, পোনাঘাট পেরিয়ে, সংসার সীমান্তে, মৃত্তিকা, মহানগর, শৃঙ্খল, তেলেনাপোতা আবিষ্কার*-গল্পগুলো এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে।

কেরানী গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের শুরু করেছেন এভাবে—

> তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখিগুলো খড়ের কুটি, ছেড়া পালক, শুকনা ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।[২৯]

দুটি সাদাসিদে ছেলে মেয়ের বিয়ে হল। একজন কেরানী এবং তার স্ত্রী। এ গল্পে লেখক কেরানী জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিণতি বর্ণনা করেছেন। *কেরানী* গল্পে কেরানির বিবাহ, প্রণয়, বেঁচে থাকবার বুকভরা আশার নিদারুণ অপচেষ্টা অর্থাভাবে স্ত্রীর চিকিৎসাহীন মৃত্যু লেখক নিখুঁত বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। নিয়তির কাছে প্রশ্ন রেখে গেছে- সে যদি এমন গরীব না হত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখতো। যে নীড় তারা রচনা করেছিল, প্রচণ্ড কাল-বৈশাখীর আঘাতের মতই আকাশে সে নীড় উড়ে গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন।

পুন্নাম গল্পটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকের লেখা। বস্তুনিষ্ঠতার মাঝে মানুষে মানুষে হানাহানি রেষারেষি বেড়েছে। মানুষ অসৎ হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিত্বে অস্তিত্বে আঘাত লেগেছে। ফলে নগরজীবনে ভাঙন ও অবক্ষয়ের সূচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যে যে রেনেসাঁসের জন্ম হয়েছিল; কল্লোলীয় গোষ্ঠির লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে তার প্রভাব স্পষ্ট।

পুন্নাম গল্পে দারিদ্র্যপীড়িত নগরজীবনের বীভৎসতার মধ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ললিতের ছেলের অসুখ কিছুতেই সারে না- কাশি-সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে, তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে তো চলেছেই। ললিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছেলের হাওয়া বদলের জন্য চুরি করে লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করে সন্তানকে সুস্থ করে তোলে। খোকা পরকালে তাদের নরকের পথ রোধ করবে এই ছিল ললিতের আশা। তারপরও অবৈধ টাকায় সে তার সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলেছে। দারিদ্র্যের অসহায়তার মধ্যে লালিত নিজেকে বুঝায় এ জীবনের ঋণ শোধ। কিন্তু রূঢ় বাস্তব তার চিন্তার স্বচ্ছতাকে নষ্ট করে দেয়। অনুশোচনায় দগ্ধ হয় আর ভাবে- আমাদের ছেলের মতো আরও কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে।

সাগর সংগম গল্পে ব্রাত্যজীবনের অধিবাসী বাতাসী। সে প্রৌঢ়া বিধবা, হিন্দুধর্মের তথাকথিত শুদ্ধাচার অতিনিষ্ঠার অধিকারিণী দাক্ষায়ণীকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। দাক্ষায়ণী বাতাসীকে আশ্রয় দিতে চায় না, কারণ সে তাকে দেহ পসারিণীর দলে দেখেছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে নৌকা দুর্ঘটনায় পড়ার ফলে দাক্ষায়ণী ঐ দলের আট বছরের ফুটফুটে মেয়েকে উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। আসলে মনের অজান্তে মানবিকতায় এ কাজে দাক্ষায়ণীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মানবীয়তা ও মমত্ববোধের কাছে হার মেনেছে দাক্ষায়ণীর ধর্মীয়নীতি। মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসতে চায়। বাতাসীর ক্ষেত্রেও সে রকম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *সাগর সংগম* তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে গল্পে বিপর্যস্ত সামাজিক পরিস্থিতি অসামঞ্জস্য অর্থনৈতিক বণ্টন প্রভৃতির কারণে মানুষের শরীরও পণ্যে পরিণত হয়েছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র বেগুন সমাজের প্রান্তীয় অবস্থানের মানুষ। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক সময় শরীরকেই হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে হয়েছে। দু'মাসের ঘর ভাড়া বাঁকী। বাড়িওয়ালীর অর্থ আদায়ের চাপে পড়ে তাকে প্রতি সন্ধ্যায় বেরুতে হয় পুরনো ছেঁড়া, সেলাই করা সিল্কের শাড়ি পরে, খদ্দেরের খোঁজে। নিরাশ্রয় বেগুন একটু আশ্রয়ের জন্য অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়ায় বেঁচে থাকার অবলম্বন। শারীরিক ক্লেশ অবজ্ঞা করে বেগুন এগিয়ে যায় সামনের

দিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। ব্রাত্যজীবনের মানুষেরও একটি সুন্দর মন আছে। তারাও সুন্দরের দিকে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু কেন্দ্রের মানুষেরা তাকে ঠেলে দেয় বিপর্যয়ের দিকে।

পোনাঘাট পেরিয়ে গল্পটিতে ব্যবহার হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের কর্মহীন মানুষের চিত্র। তাদের নৈতিক আদর্শ- পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যের ভাবনার আদলে এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে । গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলাই। পোনাঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য। বড় বড় মহাজনী নৌকা আসে, বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা হয় তারপর একদিন চলে যায়। কিছু লোক সমাজের উচ্চবিত্তের সাথে অভদ্রচিত আচরণ করে। বলাই চরিত্রটি যাযাবর, নিরাশ্রয় প্রকৃতির। তার চরিত্রে বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। গল্পটির মাঝে ইতিবাচকতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের যুব সমাজের মাঝে যে সংকীর্ণতা, হতাশা এবং অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল সে তারই পরিচায়ক।

সংসার সীমান্তে গল্পে রজনী এবং অঘোর দাস প্রান্তীয় সমাজের লোক। সমাজের প্রান্তীয় শ্রেণির দুটি চরিত্র এবং তাদের স্বপ্ন ও সংসার গল্পের মূলবিষয়। রজনী যৌনকর্মী এবং অঘোর দাস একজন চোর। তারা সমাজে নিগৃহীত। তার দুজনেই অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তারা পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। রজনীর ঋণশোধ করার জন্য অঘোর দাস শেষ বারের মত চুরি করে। ধরা পড়ে, পাঁচ বছরের জেল হয়। দু'জনের সংসার গড়ার স্বপ্নভঙ্গ হয়। তারা অস্তিত্বহীন ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। রজনী এবং অঘোর দাস সংসার সীমান্তে একটি স্বপ্নের জন্ম দিয়ে হারিয়ে যায়:

> গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবন লীলায় অনুকরণ করিতে তাহাদের সাধ হয়।[৩০]

সংসার সীমান্তে গল্পে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের ব্যক্তির নিরাশ্রয়তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

মৃত্তিকা গল্পে রেনেসাঁসের অনুকরণে কল্লোলীয় ধারার প্রবাহে ব্যক্তির মূল্যায়নই প্রধান হয়েছে। এ গল্পে দেখানো হয়েছে পুকুর ভরাট করা আট কাঠা জমিতে মাটির দোতলা ব্যারাক তুলেছে জমির মাড়োয়ারি মালিক। আর নির্দিষ্ট স্বল্প ভাড়ার বিনিময়ে বিভিন্ন নিম্নবিত্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে এবং বাড়িটি এক সময় ধ্বংস হয় ভূমিকম্পে।

মৃত্তিকা গল্পে ব্রাত্যজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। রামচন্দ্র প্রান্তীয় এবং শশী কেন্দ্রিয় অবস্থানের মানুষ। রাত্রি নামের মেয়েটি তাই রামচন্দ্রের গভীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে ধনী ঘরের ছেলে শশীকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরলে, রাত্রি পুরনো প্রেমিক রামচন্দ্র বা বিজয়কে নিয়ে পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে বিজয়ের জেল হয়। বিজয় ও রাত্রি চেয়েছিল সুন্দর একটি জীবন; কিন্তু সামাজিক নীতি তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজয়কে যেতে হয় জেলে আর রাত্রিকে ঠেলে দেয় আত্মহত্যার পথে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতায় অবাঙালি ব্যবসাদাররা প্রবেশ করতে শুরু করে, মানুষের জীবনের মূল্য তাদের কাছে নেই। অর্থ উপার্জনই তাদের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া সে সমাজের মানুষের আর্থিক এবং নৈতিক অবক্ষয়- মানুষ ও সমাজকে ভীষণভাবে গ্রাস করেছে।

মহানগর গল্পে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার কথা সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহানগর গল্পে প্রধান চরিত্র চপলা কোন এক দুর্বৃত্তের দ্বারা অপহৃত হয়। তাই সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ সমাজ এর কারণ উদ্‌ঘাটন করে না। সমাজ ভাবে না চপলা তার নিজের ইচ্ছায় অপহৃত হয় নি। তাকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে। এর নিরাময়ের কথা না ভেবে তাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ফলে চপলাকে হতে হয়েছে ব্রাত্যজীবনের অধিবাসী। ছোট ভাই বালক রতন সামাজিক রীতিনীতি অত বুঝে না, সে দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এখন না পারলেও বড় হয়ে সে কারও কথা মানবে না। ঠিকই তার দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। দিদিও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন প্রধান বাধা।

শৃঙ্খল গল্পে ভূপতি ও বিনতির টানা সংসারের পোড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সাংসারিক জীবনের বন্ধন তাদের আকৃষ্ট করে নি। সামাজিক নিয়মে সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ থাকলেও মানবিক বন্ধন তাদের মাঝে গড়ে উঠে নি। সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়ে গেছে, বাঁচার আশ্রয় নেই। হৃদয় বৃত্তির দিক থেকে দুজনেই নিঃসঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে জীবনের মূল্যবোধকে পাল্টে দিয়েছে, কলকাতার নাগরিক জীবনের পটভূমিতে- সে সময়ের নিষ্ঠুরতার চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন *শৃঙ্খল* গল্পে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পটির নির্মাণশৈলী অপূর্ব। পলায়নপর উদাসীন মধ্যবিত্ত নাগরিকের- মানবিক বিপন্নতার ছবি গভীরভাবে এ গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। তেলেনাপোতা যাওয়ার যাত্রাপথের অপূর্ব বর্ণনা- ঘনজঙ্গল, জন-মানব নাই, পাখিদের স্থান পরিত্যাগ, মনে হবে- একটু একটু ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ফণা তুলে এগিয়ে আসছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, গরুরগাড়ী, কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ, মাছ ধরার দৃশ্য সবই মনে হবে চলচ্চিত্র।

সেখানে গিয়ে আবিষ্কার হবে যামিনী নামে এক অনূঢ়া গ্রাম্য শান্ত যুবতীকে। এক সময় বেড়াতে এসে নিরঞ্জন নামে দূর সম্পর্কের আত্মীয় যামিনীকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে যায়। কিন্তু সে ফিরে আসে নি। যামিনীর মাকে নিরঞ্জনের জন্য অপেক্ষা রত দেখে এক বিশেষ রোমান্টিক মুহূর্তে আবেগ মনস্কতায় যামিনীকে দেখে নায়ক নিজেকে নিরঞ্জন বলে পরিচয় দেয় এবং যামিনীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

শহরে ফিরে নায়ক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। রূঢ় বাস্তবে নায়কের রোমান্টিক কল্পনা ভেঙ্গে যায়। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আলোকে বেড়ে ওঠা কৃত্রিম শহরের মানুষগুলো অবসর আর বিনোদন ও বিলাসের জীবন কাটানোর জন্য ক্ষণিকের তরে গ্রামকে এবং গ্রামের মানুষকে ভালবাসে। কিন্তু নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা থেকেই যায়। এই রূঢ় বাস্তবতা, নিঃসঙ্গতা, মানবিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সার্থক গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিকোণ ও প্রকরণগত দিক আলোকপাত করলে দেখা যায় প্রবল বিরুদ্ধবাদ আর প্রবল ভাববিলাস- কল্লোলযুগের এ প্রধান সুরকে তিনি স্থিতিহীনতা ও হতাশার কবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন—

> কল্লোল তাই একটা সময়ের আবহকে ও একটা শ্রেণির অসহায়তাকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার এবং সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে সম্ভ্রান্তদের সরিয়ে সাধারণদের স্থান করে দেওয়ার আন্দোলন। এই আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্র।[৩১]

শুধু *কেরানী* গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। *পুন্নাম* গল্পে একদিকে দারিদ্র্যের অসহায়তা অন্যদিকে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। *সাগর সঙ্গম* গল্পে মাতৃত্বের কাছে শুদ্ধাচার হার মেনেছে। *বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে* গল্পে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ বিকৃত পথ বেছে নিয়েছেন এবং অন্ধকার গলিতে আশ্রয় হয়েছে তাদের। *পোনাঘাট পেরিয়ে* গল্পে আধুনিকতার ছোঁয়ায় কারও জীবনমান পাল্টালেও; মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিদ্রোহ ও অস্থিরতা বেড়েছে। *সংসার সীমান্তে* গল্পে অস্তিত্বহীন মানুষের নিরাশ্রয়তার চিত্র ফুঠে ওঠে। *মৃত্তিকা* গল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে আর্থিক ও নৈতিক অবক্ষয়ও শুরু হয়েছিল। মানুষ সমস্যার বেড়াজালে আটকা পড়ে। *মহানগর* গল্পে সমাজিক রীতিনীতির কারণে সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবন যাপনের পরিবর্তে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখা যায়। *শৃঙ্খল* গল্পে নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং নিষ্ঠুরতা, সামাজিক বন্ধনের শিথিলতা বেড়েছে। *তেলেনাপোতা আবিষ্কার* গল্পে একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা যেমন আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যায়, তেমনই গল্পের নায়ক পাঠক চরিত্রটি ক্ষণিকের জন্য অসাধারণত্বে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আবার মিলিয়ে যাবে অসাধারণত্বে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীবনের মূল্যবোধ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছু পরিচালিত হয়েছে ধনিকশ্রেণির দ্বারা। নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে ভেঙ্গেছে পরিবার, নিরাশ্রয় হয়েছে মানুষ। মনুষত্বের ভাষাহীন রিক্ততার অনুভব তাঁর গল্পগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। কলোনিয়াল কলকাতার নাগরিক জীবনের অন্ত্যজ স্তর প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তাঁর গল্পগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ, গল্পের বিভিন্নমুখী পরিচর্যা, গল্পের নামকরণ, গল্পের বিষয় ভাবনা, গল্পের প্রতীকী প্রতিবেশ, সর্বোপরি বিভিন্ন গল্পে ব্যবহৃত অলঙ্কার, চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলোকে শিল্প সফল করে তুলেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষয় ও প্রকরণের স্রষ্টা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালের ক্রান্তি রেখায় বিশ শতকের মানুষের বিশ্বাসে ভাঙ্গন, কল্লোল গোষ্ঠীর রেনেসাঁসের স্বপ্ন, কলকাতার নাগরিক জীবনের ব্যর্থতা ও বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই; মানুষের অবক্ষয়, বিপর্যয় ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে এক ধরনের তীব্র বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। জীবনের মূল্যবোধ মানুষের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ফলে বস্তুবাদী গল্পকার হিসেবে অনন্য সাধারণ হয়ে ওঠেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ।

তথ্যসূচি:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, জ্যোৎস্না পাবলিকেশন্স, ৮৫/সি পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৬১

২. তদেব, পৃ. ১০৯

৩. তদেব, পৃ. ১২৩

৪. তদেব, পৃ. ১৩৪

৫. ড. হাবিব রহমান সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত ছোটগল্প*, ভূমিকা, বুকস্ ফেয়ার ৩৭/১ বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে-২০১১, পৃ. ৯

৬. তদেব, পৃ. ১১

৭. ভূমিকা, তদেব, পৃ. ৯

৮. তদেব, পৃ. ৯

৯. তদেব, পৃ. ১০-১১

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃ. ১২৪

১১. তদেব, পৃ. ৬২

১২. তদেব, পৃ. ১৩৬

১৩. গোলাম মুরশিদ *আহমাদ মাযহারের কথা* ' দৈনিক প্রথম আলো' অন্য আলো, শিল্প সাহিত্য, শুক্রবার, ৪ এপ্রিল-২০১৪ পৃ. ০৩

১৪. ড. মিল্টন বিশ্বাস সম্পাদিত, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প*, ভূমিকা, সূচয়নী পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলবাজার, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, জুন-২০১৩ পৃ. ১৪

১৫. সফিকুন্নবী সামাদী, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: জীবনের শিল্পিত সত্য*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০৪, পৃ. ৯১

১৬. তদেব, পৃ. ১১১

১৭. ড. মিল্টন বিশ্বাস সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ২৪

১৮. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ২৭

১৯. ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত, *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০১ পৃ. ১০৪

২০. তদেব, পৃ. ১০৪

২১. ড. মিল্টন বিশ্বাস, তদেব, পৃ. ১১৯

২২. ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১৩১

২৩. সফিকুন্নবী সামাদী, তদেব, পৃ. ২৬২

২৪. ড. মিল্টন বিশ্বাস সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১২৯

২৫. তদেব, পৃ. ১৭৩

২৬. দেবাশীষ হালদার সম্পাদিত, *বনফুলের ছোটগল্প*, কে.এস. পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার ঢাকা, জুন-২০১৩ পৃ. ৫৬

২৭. তদেব, পৃ. ৫৬

২৮. তদেব, পৃ. ১০

২৯. তদেব, পৃ. ৫

৩০. তদেব, পৃ. ৭০

৩১. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, *বাংলা ছোটগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি-২০০৬, পৃ. ৭১

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

উপনিবেশিক যুগে রাজশাহীর পত্র-পত্রিকা ও মধ্যবিত্ত সমাজ

ড. ইয়াসমীন আকতার সারমিন*

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীর সর্বত্র সামাজিক স্তর বিন্যাস আছে যদিও দেশে দেশে এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ স্তর বিন্যাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে হয়েছে। মানুষের সামাজিক স্তরে বিভক্ত করার পদ্ধতির প্রথম উপাদানই হল মানুষের পেশা। এছাড়া ক্ষমতা মর্যাদা এবং সম্পদ প্রভৃতি উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের একস্তর অন্য স্তরে থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করে তখন সমাজে স্তর বিন্যাসের সৃষ্টি হয়।[১] এ স্তর বিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে মধ্যবিত্ত স্তর। প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় মূলত উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ বিদ্যমান ছিল। তবে আঠারো শতকে বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের গবেষণায় জানা যায়। এম.এ. রহিমের মতে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্তরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল যাদেরকে মধ্যবিত্ত সমাজের পর্যায়ে ফেলা যায়।[২] আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ঘটে ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতা দখলের পর। এদের বিকাশ সম্পন্ন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। উপনিবেশিক যুগে মধ্যবিত্ত সমাজ শুধু একটি নতুন শ্রেণিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি সমাজ সচেতন শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ের শিক্ষা ধর্ম, সমাজ রাজনীতি প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমকালের সাময়িকপত্রে। তাছাড়া সংস্কার আন্দোলনে রাজশাহী জেলার মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা ও অবদান রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলার অন্যান্য জেলার (ব্রিটিশ শাসনামলে জেলার সৃষ্টি) ন্যায় রাজশাহী জেলাতে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এ মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সামাজিক আন্দোলনে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যথেষ্ট অবদান রেখে ইতিহাসের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এ অবদানের ক্ষেত্রে বাংলার তথা রাজশাহী জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক ছিল পত্র-পত্রিকা। এ সব পত্র-পত্রিকাসমূহ নব্য শিক্ষিত উকিল, শিক্ষক, সমাজসেবী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এবং ব্যবসায়ী, মহাজন, চাকুরীজীবী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত সমাজের এ সকল পত্র-পত্রিকা প্রচার ও প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্য করতেন। উপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এর মাধ্যম হিসেবেও মধ্যবিত্ত সমাজের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকা। এছাড়াও উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানসমূহ ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরার ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট পত্র-পত্রিকার ভূমিকা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (২য় ভাগ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩০২) বলা হয়:

> ব্রিটিশ শিক্ষা প্রভাবে এদেশের শিক্ষিতগণের মতিগতি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষিতগণ বুঝিয়াছেন এ দেশের রীতিনীতি অপেক্ষা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। সেই সংস্কার প্রভাবে যাহাতে অশিক্ষিত জনগণ তাঁহাদের মহানুবর্ত্তন করে; তাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা তাঁহারা পাশ্চাত্য মতে সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে সচারচর এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে।”[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপনের ফলে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিক সূচিত হয়।[৪] তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত হতো। এ সকল পত্র-পত্রিকার ভাবধারা ও সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোর নীতি, আদর্শ ও মতের পার্থক্য থাকলেও মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

সংবাদ সাময়িকপত্র বিকাশের সাথে সম্পর্ক আছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের। এ আন্দোলন ও ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে উনিশ শতকে বেশ কিছু সভা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এ সকল সভা সমিতির মুখপত্র স্বরূপ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় ব্রাহ্ম বিরোধী গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরাও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। মোটকথা ব্রাহ্ম অনুসারী, রক্ষণশীল হিন্দু, ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সমাজের ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ বা উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজের হাতিয়ার বা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সংবাদ সাময়িকপত্র। অথবা বলা যেতে পারে সামাজিক কারণেই তা হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।[৬]

প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার বিবরণ:

পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার মধ্যবিত্ত সমাজও এগিয়ে এসেছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে এখানে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে বলে জানা যায়। প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথের মতে ‘হিন্দু রঞ্জিকা’ (১৮৬৬) ছিল, তবে মুনতাসীর মামুন ১৮৬৭ সালে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

প্রকাশিত 'রাজসাহী পত্রিকাটি' প্রথম পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] 'হিন্দু রঞ্জিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সময় রাজশাহী শহরে কোন প্রেস ছিল না। বাংলা ১২৭৮ (১৮৭১-৭২) সাল পর্যন্ত এ পত্রিকা ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হতে মুদ্রিত হত। এতে অসুবিধা ও ব্যয় অধিক হওয়ায় রাজশাহীর দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধী লাভ করে পুস্তক, সংবাদ পত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করতে এক হাজার টাকা ও গৃহনির্মাণের ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁর অর্থে প্রেস আনয়ন করা ও গৃহনির্মিত হয়। ঐ সময় হতে হিন্দু রঞ্জিকা রাজশাহী হতে প্রকাশিত হয়।[৮]

এ ছাপাখানার অনুকরণে পরবর্তীতে আরো অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং উনিশ শতকে মুদ্রণ শিল্প একটি বহুল প্রসারিত শিল্পে পরিণত হয়। জমিদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত- এঁরাই ছিলেন এসব মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। ১৮৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত এ জেলায় তমোঘ্ন প্রেস, বোয়ালিয়া প্রেস, রাজশাহী প্রেস, তাহেরপুর তত্ত্ব প্রকাশ প্রেস, সুধাকার প্রেস, বিনোদ প্রেস, নওগাঁ প্রেস, সরদিন্দু প্রেস স্থাপিত হয়।[৯] এছাড়া 'সমিতি প্রেস' নামে একটি প্রেসের নাম জানা যায়। ১৯০৪ সালে এ প্রেস থেকে ব্রজসুন্দর স্যান্যাল রচিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' মুদ্রিত হয়।[১০]

রাজশাহী জেলা থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু রঞ্জিকা' পত্রিকাটি মূলত ব্রাহ্ম ধর্ম বিরোধী পত্রিকা ছিল।[১১] ১৮৬৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' 'হিন্দু রঞ্জিকা' সম্বন্ধে লিখেছেন:

> হিন্দু হিতৈষীণীর বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্ট হইল বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা হইতে হিন্দু রঞ্জিকা নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সিংহরায় উহার সম্পাদক। হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে।"[১২]

১৮৬৬ সালে ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে হিন্দু রঞ্জিকা মাসিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৬৮ সালে এটা সাপ্তাহিকীতে পরিণত হয়।[১৩] হিন্দু রঞ্জিকা সম্পর্কে দীনেন্দ্র কুমার রায় তাঁর 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন:

> ...সে সময়ে হিন্দু রঞ্জিকায় নীলামের ইস্তেহার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এবং হিন্দু ধর্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য দুই একটি পাণ্ডিত্য খচিত প্রবন্ধ থকিত, তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। এজন্য কাগজখানি কেহই প্রায় খুলিতেন না।[১৪]

লেখকের বক্তব্যে হিন্দু রঞ্জিকার সামাজিক অবস্থান ও সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মের আদর্শকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকায় কেবল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো।[১৫]

'হিন্দু রঞ্জিকা' মধ্যবিত্ত সমাজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সজাগ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে-

> মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারন তাদের ফাঁকা গর্ব এবং স্বাধীন ব্যবসায় নামার লজ্জা। ... মধ্য শ্রেণীর কেউ যদি একটি উঁচু চাকুরী করেন তা হলে সবাই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে তার উপর তবুও কেউ নামবে না স্বাধীন ব্যবসায়"।[১৬]

ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে হিন্দু রঞ্জিকা ঘোষণা করেছিল ইংরেজ শাসনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।[১৭]

'রাজসাহী পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের বিজ্ঞাপন 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (বৈশাখ ১২৭৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৮] এ মাসিক পত্রিকাটি ১৮৬৭ সালে বোয়ালিয়া মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।[১৯] এ পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয় যে, এর রচনা মন্দ হয় নাই, এতে যে বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে সমাজের উপকার হবার সম্ভাবনা আছে।[২০]

রাজশাহী ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ বোয়ালিয়া প্রেস হতে ১৮৭০ সালে 'রাজসাহী সম্বাদ' নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[২১] এ পত্রিকাটি শ্রী জগৎচন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।[২২]

শ্রীকৃষ্ণদাস এর সম্পাদনায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকাটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাসিক আকারে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে সাপ্তাহিকীতে পরিণত হয়। এর প্রথম দুই সংখ্যা বোয়ালিয়ার মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম বর্ষের পত্রিকায় তারানাথের 'স্বর্ণলতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় এর রচনা 'মসলা-বাঁধা কাগজ' এতেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।[২৩] দীনেন্দ্র কুমার রায়ের মতে, রাজশাহী হইতে জ্ঞানাঙ্কুর নামক একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো।[২৪] পরবর্তীতে কলিকাতা থেকে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ এর সম্পাদনায় ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'প্রতিবিম্ব' নামক উৎকৃষ্ট পত্রিকার সাথে 'জ্ঞানাঙ্কুর' মিলিত হয়ে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।[২৫]

নাটোরের করচ মাড়িয়া থেকে ১৮৭৫ সালে বেনীমাধব নন্দী বাবুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাজসাহী সমাচার' নামক পত্রিকাটি এক বছর পর্যন্ত চলেছিল।[২৬] এ পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ বঙ্গাব্দ (১৮৭৫) সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, "রাজসাহী সমাচার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের

কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কাগজখানি মন্দ নহে, এরূপ কাগজ যত প্রকাশ হয় ততই ভাল"।[২৭]

বঙ্কবিহারী খাঁর সম্পাদনায় রাজশাহী জেলার তাহেরপুর দাতব্য কার্যালয় থেকে 'বৈষয়িক তত্ত্ব' নামক পত্রিকা ১৮৮৩ সালে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষে পত্রিকাটি ছিল অনিয়মিত এবং দ্বিতীয় বর্ষে তা রূপান্তরিত হয়েছিল ত্রৈমাসিকে।[২৮] এ পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা যায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে। এ বিজ্ঞাপনে 'বৈষয়িক তত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয় যে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বাংলা ভাষায় সহস্র পত্রিকা আছে কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকাও নেই। এ জন্য 'বৈষয়িক তত্ত্ব' নামে একখানি বৃহদাকারের মাসিক পত্রিকা সাধারণের সুবিধার লক্ষে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হবে। এ পত্রিকা ধনবান ও প্রবীণ এবং অল্প বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্র, অবস্থাপন্ন ও সর্ব্ব শ্রেণির লোকের পাঠোপযোগী করার সংকল্প করা হয়েছে।[২৯]

শিক্ষার প্রসার এবং সাহিত্যের সেবাকল্পে রাজশাহী জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে 'শিক্ষা পরিচর' নামে মাসিক পত্রিকাটি চিন্তাশীল সমাজের পরিচয় বহন করে। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থেকে শরৎচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৮৮৯ সালে শিক্ষা বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা প্রকাশ শুরু হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৩০] উক্ত পত্রিকাটি ঊনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ ছাপা হতো। 'শিক্ষা পরিচর' ১২৯৮ বঙ্গাব্দ (১৮৯১) সংখ্যায় 'গল্প নহে' নামক প্রবন্ধে রাজশাহী জেলার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়। এতে রাজশাহী জেলাকে বাংলার যতগুলি জেলা আছে তন্মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়।[৩১] 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়' প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা, গ্রন্থ, ইত্যাদির প্রশংসা ও সমালোচনা করা হয়। রাজশাহী জেলার অন্যতম কবি শ্রী রামজয় বাগছী প্রণীত 'সঙ্গীত কুসুম' নামক গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল এ পত্রিকাটি।[৩২] 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদী' কলামে বিভিন্ন লেখকদের রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে পাঠক সমাজে তার পরিচয় করে দেওয়ার মত মহৎ কাজ এ পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীশশধর রায় রচিত 'আদিম বৈদিক সময়ের আর্য সভ্যতা' এবং ডাক্তার বিনোদ বিহারী রায় রচিত 'আয়ুর্বেদ্দ মতে শিশু পালন' গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়।[৩৩]

উপনিবেশিক যুগের নীতির সমালোচক ছিল পত্রিকাটি। 'শিক্ষা পরিচর ১৩০২ বঙ্গাব্দ (১৮৯৫-৯৬) সংখ্যায় 'শিক্ষা সংবাদ' নামক কলামে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে রামপুর বোয়ালিয়া স্টিমার ঘাটে অথবা স্টিমারের লোকের সঙ্গে বিবাদ ঘটলে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লিভিংস্টোন পুলিশের পক্ষাবলম্বন করলে এর কঠোর সমালোচনা করে এ পত্রিকাটি।[৩৪] ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (১৮৯০) সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'শিক্ষা পরিচর' পত্রিকার পরিচালন এবং উন্নতি বিধানের জন্য সম্পাদককে সাহায্য করার লক্ষ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'শিক্ষা-পরিচর সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করা হয়। এর অধিবেশন স্থান ছিল বোয়ালিয়া।[৩৫] এ সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সু-শিক্ষার উন্নতি কামনায় 'শিক্ষা পরিচর' সমিতির জন্ম হয়। এ সমিতির লক্ষ্য ছিল, নিরপেক্ষভাবে বঙ্গ সাহিত্য সমালোচনা, আবর্জনা রাশি দূর করে প্রকৃত মণিমাণিক্যগুলি সাধারণের সামনে তুলে ধরা। সমিতির এসব সমালোচনা শিক্ষা পরিচর এবং আবশ্যক হলে অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।[৩৬]

এ জেলার মধ্যবিত্ত সমাজ চিকিৎসার প্রতি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডাঃ বিনোদ বিহারী রায় এর সম্পাদনায় ১৮৯০ সালে তালন্দ থেকে 'চিকিৎসা' বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৩৭] শিক্ষা পরিচর (অগ্রাহয়ণ, ১২৯৭) সংখ্যায় বলা হয় যে "এই সুলভ মাসিক পত্রখানির প্রথম ভাগের ৭ম ও ৮ম সংখ্যা আমরা সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হয়েছি। এর ভাষা সরল ও শুদ্ধ, উদ্দেশ্য ততোধিক উচ্চ এবং হিতৈষীময়। এটি বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত"।[৩৮]

ঊনিশ শতকের আরো একটি উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা ছিল 'উৎসাহ'। রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থেকে ১৮৯৭ সালে সুরেশচন্দ্র সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায়, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, শশধর রায়, জলধর সেন প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের রচনা এর পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে। ১৩০৭ বাংলা (১৯০০) সালে বসন্ত রোগে সুরেশচন্দ্র সাহার মৃত্যু হলে ব্রজসুন্দর সান্যাল 'উৎসাহ' এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।[৩৯] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী 'উৎসাহের' প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রজনীকান্ত সেন-এর নাম তখন সাহিত্য সমাজের অজ্ঞাত থাকলেও তিনি অনুরুদ্ধ 'উৎসাহ' পত্রিকায় দু-একটি কবিতা লিখতেন। মফস্বলের ছোট মাসিক হিসেবে 'উৎসাহ' পত্রিকাটির প্রচার ভালই ছিল।[৪০] 'উৎসাহ' শ্রাবণ, ১৩০৫ (১৮৯৮) এর সংখ্যায় কালি প্রসন্ন চট্টোপধ্যায় রচিত প্রবন্ধে 'রাজসাহী' বানান সম্পর্কে বলা হয় যে, রাজশাহী হওয়াই সঙ্গত। প্রচলিত বলে আমরা 'স' রাখিতে বাধ্য হয়েছি।[৪১]

১৮৯৯ সালে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় সাহিত্য ও ইতিহাস সহায়ক পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্র' রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পত্রিকার প্রস্তাবক ছিলেন।[৪২] এ পত্রিকা সম্পর্কে 'ভারতী' ১৩০৫ বাংলা (১৮৯৮) সংখ্যায় 'প্রসঙ্গ কথা' প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে-

> বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের চর্চা বিশেষরূপে প্রবল হয়ে উঠেছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বিক্ষিপ্ত উদ্যমগুলিকে একত্রিত করে একখানি ঐতিহাসিক পত্র বাহির করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত সময়ে এ কার্যে অগ্রসর হয়েছেন এটা আমাদের আনন্দের বিষয়।

'ঐতিহাসিক চিত্র' আবিষ্কার ব্যাপারে নৌযাত্রায় একটি অন্যতম তরণী। ঐতিহাসিক চিত্র ভারত ইতিহাসের বন্ধন মোচনের ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃদ্ধ।[৪৩]

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমা রামপুর বোয়ালিয়াতে মুসলমানদের জন্য স্থাপিত নূর-অল-ইমান সমাজের (১৮৮৫) স্বত্ত্বাধিকারী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী কর্তৃক সম্পাদিত সমাজের মুখপত্র স্বরূপ 'নূর-অল-ইমান' নামক পত্রিকটি মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন কর্তৃক রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস (কলিকাতা) থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকায় প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশকাল ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০০ বলে উল্লেখ রয়েছে।[৪৪] নিতান্ত অনিয়মিতভাবে মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। নূর-অল-ইমান পত্রিকায় লেখকদের মধ্যে মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ।[৪৫]একে ইসলামী পত্রিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ পত্রিকার উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে বলা হয়-

> কি কি দোষ মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিল? কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করে সমাজজীবন নষ্ট করছে সে সব বিষয়ে পত্রিকাটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।[৪৬]

সমাজের সকল সদস্য বিনা পয়সায় পত্রিকা পেতেন।[৪৭]এ পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু মুসলমান ঐক্য সাধনের প্রয়াস। এ পত্রিকার ১৩০৮ (১৯০১) সালের আষাঢ় সংখ্যায় এ প্রসংগে দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ রচিত 'আবেদন' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।[৪৮]

আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম (১৮৯১) সংগঠন স্থাপিত হলে এ পত্রিকাতেই এর প্রচারকার্য শুরু হয়। নূর-অল-ইমান ও আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম সংগঠন দ্বয়ের মুখপত্র হিসেবে নূর-অল-ইমান পত্রিকা সে কাজ যথাযথভাবেই পালন করতো। এক্ষেত্রে নূর-অল-ইমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গোঁড়ামি মুক্ত মন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি।[৪৯]এ পত্রিকার হেমায়েতে এসলাম অংশে এ দেশীয়দের বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে অত্যন্ত সুন্দর ও জোরালো মন্তব্য ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়, শ্রাবণ,১৩০৭ (১৯০০) প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

> 'বাঙ্গালা' পাঠশালার ছাত্রদেরকে বাঙ্গালা ভাষা শিখতে ও তার সঙ্গে সাংসারিক কারবারের দেনা-পাওনা, হিসাব-নিকাশ, চেক-দাখিলা, ওজন/পরিমাপ ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষা করতে হয়। তৎসঙ্গে সামান্য ধরনের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল নিয়ম, কৃষি বিজ্ঞানের সরল-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঙ্গালা পাঠশালায় মুসলমানদিগকে রীতি-নীতি, আদব-তমিজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিশেষ পুস্তক পড়ান হয় না। ভাষা শিক্ষার পুস্তকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সৎনীতি ও সৎগুণ শিক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু সে শিক্ষা এসলামী নীতি শিক্ষার পক্ষে প্রচুর নহে।[৫০]

এতদসংগে এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, ...আমাদের সমাজে সেবকগণ ও গভর্ণমেন্টের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তারা আমাদের স্কুল-কলেজ শিক্ষা প্রণালী সেইরূপে নির্দোষ উন্নত ধরনের করে দেন যেন আমাদের যুবকগণ খাঁটি এসলামী সৎগুণে বিভূষিত হতে পারে, যাহাদের মুখপানে চেয়ে আমরা উন্নতির আশা করছি। তারা যেন প্রকৃত মোমেন মোসলমান হতে পারেন।[৫১]

ব্রিটিশ শিক্ষা তথা স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ সরকারি চাকুরি গ্রহণ, জীবন-যাপনের প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশা যেমন উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করে। এদের দ্বারাই মুসলমান সমাজে নতুন একটি সামাজিক শ্রেণি সৃষ্টি হয় যা মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল। এ নব্য সমাজ সম্পর্কে এ পত্রিকার হেমায়েত এসলাম অংশের একই সংখ্যায় বলা হয়:

> "...ভিন্ন দেশবাসী কিন্তু ভিন্ন ভাষাভাষি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজপুরুষগণ যদি কখনও না বুঝে হঠাৎ কোন ক্ষতি করতে উদ্যত হন তবে এ দলের লোক রাজপুরুষগণকে বুঝিয়ে সে গোলযোগ নিবারণ করে রাজা প্রজা উভয়ের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে থাকেন। দেশে হিতকর সভা-সমিতি এই দলের লোক কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। ইহারাই এখন দেশের ইষ্ট-নিষ্ট সম্বন্ধে চিন্তা করেন।" ..."শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিলে বর্তমান মোসলমান সমাজের আর সমস্ত পীড়া আপনা আপনি দূরে যাইবে" ইহা এই দলের লোক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট আমাদের অনেক আশা আছে। ... ইহাদের মধ্যে কোন মারাত্মক দোষ প্রবেশ না করে এই প্রার্থনা" ।[৫২]

এ পত্রিকা সমাজের ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছে। 'আমাদের নাম' শিরোনামে মৌলবী মীর মনসুর আলী কর্তৃক সংকলিত প্রবন্ধটি নূর-অল-ইমানে, আষাঢ়, ১৩০৮ (১৯০১) প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অর্থহীন এবং হিন্দু

নামের যেমন হ্যাসালকোন্দা, সঞ্চাকুড়া, লক্ষ্মী, কালী, সাধু ইত্যাদি উল্লেখ করে নামের এ দুর্দশার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, মূর্খতা, এলেমহীন হওয়াতেই যেমন রুজী, জীবিকা, মান-সম্ভ্রম সকল বিষয়ের ক্ষতি হয়েছে, তেমনি নামেরও দুর্দ্দশা ঘটেছে।[৫৩] উনিশ শতকে মুসলমান সমাজে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনীহা দেখে এ পত্রিকায়, ১৩০৭ (১৯০০) 'বঙ্গীয় মুসলমান ভাই বহিনের খেদমতে নূর-অল-ইমানের আপীল' শিরোনামের প্রবন্ধে বলা হয় যে, "...বঙ্গের মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণ বাঙ্গলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা না করে আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করে নিন"।[৫৪]

উপনিবেশিক যুগে রাজশাহী জেলার জমিদারদের আর্থিক সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হলেও এগুলোর সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা। এগুলির মধ্যে করচমাড়িয়া (নাটোর) জমিদার রাজকুমার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাজসাহী বাসী', তাহিরপুরের জমিদার কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়ের পরিচালনায় ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ক্রীড়া ও কৌতুক' এবং ১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'সদর ও মফঃস্বল' নামক পাক্ষিক পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। 'ক্রীড়া ও কৌতুকের' সম্পাদক ছিলেন রাধেশ চন্দ্র শেঠ।[৫৫] 'শিল্প-কৃষি পত্রিকা' নামে মাসিক পত্রিকাটি ১৮৮৫ সালে তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হয়।[৫৬]

পত্র-পত্রিকার বিকাশ ঘটলে মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে ব্রিটিশ শাসকদের শিক্ষা, রুচি ও ভাবাদশ তুলে ধরে। ফলে সমাজের কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে শাসকদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। আবার অনেকেই সরকারের সমালোচক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুধু তাই নয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার সাথে জড়িত থেকে সমাজের সার্বিক উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করে।

তথ্যসূচি:

---

১. *The World Book Encyclopaedia, Vol.-13,* (Chicago World Book Inc. 1988), p. 534.

২. Misra, B.B. *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Time.* (Delhi : Oxford University Press, 1983), p. 2.

৩. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০২, পৃ. ৫৭

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৭৯ বাং), পৃ. ১

৫. আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮), পৃ. ৭১

৬. মুনতাসীর মামুন, "বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িক পত্র: আদিপর্ব", বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০১

৭. মুনতাসীর মামুন, ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ- সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৫), পৃ. ৫৮

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

৯. *Bengal Administration Report, 1892-1893*; (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1893), p. cc.

১০. আলী আহমদ (সংকলিত), বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), ১৯৮৫, পৃ. ৫৬৭

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

১২. উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

১৪. দীনেন্দ্র কুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫ বাং), পৃ. ১১২

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১৬. মুনতাসীর মামুন, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২২০

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র দ্বিতীয় খন্ড, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮৪ বাং), পৃ. ৯০

২০. মুনতাসীর মামুন, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২২. Siddique, Ashraf (ed.) *Bangladesh District Gazetters, Rajshahi,* (Dacca : Bagngladesh Government Press 1976). p. 245.

২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৪. দীনেন্দ্র কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২৬. Siddique, Ashraf, *Op., Cit.,* p. 245.
২৭. জ্ঞানাঙ্কুর, মাসিক পত্র, (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২), পৃ. ৩৩৬
২৮. মুনাতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০০
২৯. মুনাতাসীর মামুন, বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িক পত্র, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৭
৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩১. শিক্ষা পরিচর, (শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা) ৩য় ভাগ, ৫ম ষংখ্যা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ. ১৪০
৩২. শিক্ষা পরিচর, ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ১৩০১, পৃ. ৩৫২
৩৩. শিক্ষা পরিচর, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯৮, পৃ. ৯৫-৯৬
শিক্ষা পরিচর, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৭, পৃ. ১৪৪
৩৪. শিক্ষা পরিচর, ৫ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, ১৩০২, পৃ. ২৪১
৩৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩৬. শিক্ষা পরিচর, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯৮, পৃ. ৯৪
৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৩৮. শিক্ষা পরিচর, ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১২৯৭, পৃ. ১৮৪
৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৪০. শিক্ষা পরিচর, ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১২৯৭, পৃ. ১৮৪
৪১. উৎসাহ, শ্রাবণ, ১৩০৫, পৃ. ১৩৬
৪২. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৪৩. ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫, পৃ. ৪৬৭-৪৭৭
৪৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ৬৪
৪৫. ওয়াকিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
৪৬. মুস্তফা-নূর-উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৭), পৃ. ৬-৭
৪৭. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নূর-অল-ইমান ‘সমাজ’ ও ‘আঞ্জুমানে হেমায়েত এসলাম’ আই.বি.এস. জার্নাল ১৪০৩:৪, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৪০৪ বাং), পৃ. ১৪২
৪৮. ফজলুল হক, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০), জীবনী গ্রন্থমালা (২২), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২৯
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫০. হেমায়েত এসলাম, নূর অল- ইমান, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা শ্রাকন, ১৩০৭, উদ্ধৃতি, মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৫৩. শ্রীযুক্ত, মৌলবী মীর মনসুর আলী সাহেবের সংকলিত, “আমাদের নাম”, নূর-অল-ইমান ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৮, উদ্ধৃতি, মুস্তফা নূর-উল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬
৫৪. নূর-অল-ইমান, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩০৭, উদ্ধৃতি, মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
৫৫. ব্রজেন্দ্র রায়, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৫৬. মুনতাসীর মামুন, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

দিবর দীঘির বিজয়-স্তম্ভ ও বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ: একটি নতুন পর্যবেক্ষণ

মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান চৌধুরী*

সারসংক্ষেপ: বাংলা হচ্ছে শস্য-শ্যামলা, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর, সরোবর-দীঘির দেশ। বাংলা ছাড়া আর কোন অঞ্চলে এত দীঘি নজরে পড়ে না। বাংলার প্রাচীন নৃপতিগণ তাঁদের প্রাসাদ-কাছারি, মন্দির-মঠ, দেউল-দেবালয়ের সম্মুখে বিশালাকারের দীঘি ও জলাধার খনন করতেন। তাঁরা যে সব অঞ্চল জয় করতেন সে সব বিজিত অঞ্চলে বৃহদাকারের জলাশয় ও পরিখা খনন করে তাঁদের বিজয় স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রাখতেন। কেননা দীঘি হচ্ছে সর্বকালের নীরব সাক্ষী। অট্টালিকা, দেবালয়, বিহার, মন্দির একদিন না একদিন ধ্বংস হবে, মৃত্তিকার অতল গহ্বরে মিশে যাবে। কিন্তু দীঘি? রাজার নামের সাথে বিজড়িত হয়ে চিরকাল টিকে থাকবে। আর তাইতো বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৌর্য, শশাংক, পাল, কৈবর্ত, সেন, বর্মণ এমন কি মুসলিম শাসনামলের বহু দীঘি আজো তাদের নামের সাথে যুক্ত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এমনই এক দীঘি- দিবরদীঘি। এর বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করার লক্ষ্যেই প্রতিপাদ্য নিবন্ধের অবতারণা।

বৃহত্তর রাজশাহীর নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানাস্থ আত্রাই নদীর নজিপুর বন্দর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে এবং সাপাহার থানা সদর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত একটি অতি সাধারণ গ্রাম 'দিবর'। এই গ্রামেই রয়েছে প্রায় সহস্র বছরের পুরোনো কৈবর্ত শাসনামলে (১০৭৫-১১০০খ্রি.) খননকৃত একটি সুবিশাল ঐতিহ্যবাহী দীঘি 'দিবরদীঘি'।

এই দীঘির বৈশিষ্ট হলো- এর বিশালতা, কাজল কালো জল এবং দীঘির মধ্যস্থল থেকে উত্থিত হয়ে একটি সুউচ্চ স্তম্ভ কালের সাক্ষী হয়ে ধ্যানগম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার ইতিহাসে এটি কৈবর্ত (ধীবর) রাজা দিব্য বা দিব্যকের বিজয় স্তম্ভ (Victory Piller) নামে খ্যাত। স্থানীয় গ্রামবাসী একে 'দিবরের জাঠ' বলে অভিহিত করে থাকে।

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার ফ্রান্সিস বুকাননের জার্নালে সর্বপ্রথম এ দীঘির উল্লেখ পাওয়া যায়। মিস্টার বুকানন (১৮০৭-১৮১২) খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বৃটিশ ভারত সরকারের আদেশক্রমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান সরেজমিনে জরিপ ও অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার জন্য পূর্বভারতীয় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং তৎকালীন দিনাজপুর (অধুনা নওগাঁ) জেলার পত্নীতলা থানার এ দিবর গ্রামে উপস্থিত হয়ে এ দীঘি পরিদর্শন করেন। তিনি এ সুবিশাল শৈবালপূর্ণ দীঘি এবং তার কেন্দ্রস্থলে উঁচু স্তম্ভ দেখে মুগ্ধ হয়ে এ দীঘি সম্পর্কে মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন। [১]

অতপর স্কটল্যান্ডীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের (১৮৬১-৬৫,১৮৭০-৮৫ খ্রি.) সময় থেকে দিবর দীঘির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ধরা পড়ে। স্যার কানিংহাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জরিপ কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন- যা একটি জার্নালাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ জার্নালের পঞ্চদশ খণ্ডে দিবর দীঘি ও এর স্তম্ভ সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা স্থান পায়।[২]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রথম অধ্যক্ষ বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ এবং ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এ দীঘি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

বটবৃক্ষ, তাল, খেজুর, নিম, শিশু, ইউক্যালিপটাস আর বাঁশ ঝাড়ের স্বচ্ছ শীতল ছায়া ঘেরা পরিবেশে বর্তমানে দিবর দীঘির অবস্থান অতি মনোরম। চতুর্দিকে দিগন্তবিসারী দীঘির পর্বতসম পাড়সমূহ যেন স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন। ক্রমশ পাড় থেকে নেমে আসা ঢালু ভূমি ধানী জমিতে পরিণত হয়েছে। দীঘির মূল অবস্থানের পশ্চিম পাড়ে মুসলিম অধ্যুষিত দিবর গ্রাম। পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসতি- যারা অদ্যাবধি দীঘির চিরকালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। উত্তর পাড়ে রয়েছে ভারত থেকে আগত কয়েক ঘর উদ্বাস্তু মুসলমান। দীঘির চতুর্পার্শ্বের গ্রামগুলোতে ছোট বড় শতাধিক জলাশয় পরিদৃষ্ট হয়।

দীঘিটি শত শত বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকার ফলে কালের প্রবাহে এর জলে শৈবালের আস্তরণ পড়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও অধিক খরার কারণে দীঘিটি একবার শুকিয়ে গিয়েছিলো। এ সময় স্থানীয় জমিদার বিনয় চন্দ্র চৌধুরী এ পরিত্যক্ত জলাশয়ের ঢালু অংশগুলো কৃষি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

জমিতে পরিণত করেন এবং একটি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমিগুলো স্থানীয় মুসলিম-হিন্দু প্রজাদের মাঝে বন্দোবস্ত করে দেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরে জমিদার ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে দীঘির জমি প্রজারা নিজেদের দখলে রেখে দেয় এবং পরে তারা নিজেদের নামে রেকর্ডভুক্ত করে নেয়।

দীঘির আয়তন

মূল দীঘিটি বর্গাকার (উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ)। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার বা ৩২৭৩ ফুট (প্রায়)।[৩] তাহলে প্রাচীন পাড়সহ জলার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৭ একর। জেনারেল কানিংহাম বর্গাকারে দীঘির প্রতিটি পাড়ের দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুট বলে উল্লেখ করেন। কানিংহাম শুকিয়ে যাওয়া দীঘির (ঢালুভূমি) জলার পাড়সমূহ পরিমাপ করে এ তথ্য প্রদান করেন। কানিংহামের মতে যদি দীঘির প্রতিটি পাড়ের দৈর্ঘ্য বর্গাকারে ১২০০ ফুটের অধিক হয় তবে জলার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ বিঘার অধিক।[৪] বর্তমানে দীঘির মধ্যস্থলে এর গভীরতা প্রায় ৮ ফুট এবং জলার পরিমাণ ১২ একর।

স্তম্ভের স্থাপত্যিক বিবরণ

স্তম্ভটি অষ্টকোণা বিশিষ্ট এবং অখণ্ড গ্রানাইড প্রস্তরে নির্মিত। ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে যাওয়া এ দীর্ঘ স্তম্ভের ঊর্ধ্বাংশে পর পর তিনটি বলয়াকারের স্ফীত রেখা (ব্যান্ড) আছে। তন্মধ্যে একটি কারুকার্যপূর্ণ ও প্রশস্ত। শীর্ষদেশে আছে অতি মনোরম কারুকার্য এবং সে অংশটি অনেকটা মুকুটাকারে নির্মিত। স্তম্ভের চূড়ার পূর্বপার্শ্বে একটি ভগ্নপ্রায় অংশ পরিলক্ষিত হয়। জনশ্রুতি মতে সেখানে একটি মনুষ্য মুখমণ্ডলের প্রতিমূর্তি বসানো ছিল। খান সাহেব আফজলের মতে, পূর্বে স্তম্ভের অগ্রভাগে লৌহের ধাতবযুক্ত কিছু কিছু অলংকরণের চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হতো।[৫] বর্তমানে স্তম্ভটিতে লৌহের কোন কারুকার্যই নজরে পড়েনা। স্তম্ভটিকে দীঘির পাড় থেকে সরু দেখালেও এর বেড় ধরতে দীর্ঘাকার তিনজন লোকের প্রয়োজন। স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। ঝড়ো হাওয়ার কঠিন চাপে স্তম্ভটি যেন হেলে পড়ে না যায় সেজন্যই ছিদ্র গুলো রাখা হয়েছে। বুকানন স্তম্ভের উচ্চতা ৩৩.৭৫ ফুট এবং ব্যাস ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি উল্লেখ করেন।[৬] স্যার কানিংহাম বলেন যে, বুকাননের ৩৩.৭৫ ফুট উচ্চতা ও ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি ব্যাস নির্ভুল ছিল না। বুকানন বাঙালি বাহু দ্বারা এর পরিমাপ করেন। বাঙালি বাহুর মাপ ১৮ইঞ্চি। মিস্টার বুকানন যেটাকে স্তম্ভের ব্যাস বলে মনে করেন সেটা মূলত স্তম্ভের পরিধি। বুকাননের পরিধি অনুযায়ী স্তম্ভের ব্যাস হবে ৩ ফুট ১.২৫ ইঞ্চি। কানিংহামের মতে স্তম্ভের ৯টি কোণ আছে এবং এক কোণ থেকে অপর কোণের দূরত্ব ১২ইঞ্চি। তিনি স্তম্ভের উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে হিসেব কষে বলেন যে, "দীঘিটির মাঝে একটি পাথরের স্তম্ভ আছে, যার পানির উপরের উচ্চতা ১০ ফুট এবং যেহেতু সেখানে পানির গভীরতা ১২ ফুট, তাই নিচ থেকে স্তম্ভের উচ্চতা ২২ ফুট। অতএব এর পুরোটার দৈর্ঘ্য ৩০ ফুটের কম নয়।" তিনি স্তম্ভের ব্যাস ২.৫০ ফুট বলে উল্লেখ করেন।[৭] দিবর দীঘিতে তিনবার খনন কার্য চালানো হয়। সর্বশেষ খননকার্য চালানো হয় ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে। স্তম্ভটির তলদেশ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্মিত ও প্রোথিত। তাঁর মতে, বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার ভিত্তিদেশের মতো স্তম্ভটির মাটির নিচের নিম্নদেশ সাতটি স্তবকে (Step) নির্মিত আছে। নিচের স্তবকটি নিচের দিকে ক্রমশ স্ফীতকার করে নির্মিত। [৮] অপর এক প্রত্যক্ষদশীর মতে, স্তম্ভের উপরের স্তবকের চতর্দিকে স্তম্ভকে ঘিরে বেশ কিছু লম্বা চৌকোণা প্রস্তর বৃত্তাকারে খাড়াভাবে বসানো রয়েছে। স্তম্ভটিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে জলের প্রবল স্রোতে ও বাতাসের টানে স্তম্ভটি হেলে পড়ে না যায়।

কাহিনী, কিংবদন্তী ও জলশ্রুতি

দিবর দীঘি ও এর স্তম্ভকে ঘিরে সমগ্র পুণ্ড্র-বরেন্দ্র ভূমিতে বহু কাহিনী ও জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভাবেই এসব কল্পকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। জলশ্রুতি বলে এটিকে 'ভীমের পান্টি' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নাকি ছিল হাল চাষ করে শস্য উৎপাদন করার নেশা এবং তিনি নাকি নৈশকালে এ কাজ করতেন । একদিন চাষ করতে করতে ঘটনাক্রমে প্রভাত হয়ে গেলে লাঙল-জোয়াল নিকটস্থ কুণ্ডে ডুবিয়ে রেখে গরু দুটি নিয়ে আকাশ পথে উড়ে যাবার কালে অতর্কিতে তাঁর হাতের পান্টিটি পড়ে যায়।[৯] স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, কোন দূর অতীতে এ দীঘির স্তম্ভের মুকুট সদৃশ চূড়ায় প্রস্তর নির্মিত একটি মনুষ্য মুখমণ্ডলের প্রতিমূর্তি বসানো ছিল। ঐ মূর্তির দুটি কর্ণে দুটি স্বর্ণ খচিত লোহার বালা পরানো ছিল। শোনা যায়, বহুকাল আগে দু'জন রাখাল বালক স্বর্ণের বালা দুটি চুরির উদ্দেশ্যে দীঘির জলে ঝাঁপ দেয়। স্তম্ভের নিকটবর্তী হতেই তাদের দেহ দীঘির অথৈ জলে তলিয়ে যায়। কথিত আছে যে, স্তম্ভের চূড়া থেকে মাঝে মধ্যে শনি ও মঙ্গলবার অমাবস্যার রাতে উজ্জ্বল আলো দীঘির স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়ে ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো।

দিবর দীঘির খননকারী ও স্তম্ভের নির্মাতার পরিচয়

দিবর গ্রামের দিবর দীঘি কে কবে খনন করে এর কেন্দ্রস্থলে সুউচ্চ স্তম্ভ বসিয়ে দিয়েছিলেন- তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। এ দীঘি কোন সাধারণ মানুষ বা সম্প্রদায় কর্তৃক খননকৃত নয়। হয়তবা কোন জমিদার বা সামন্তপ্রভু কিংবা কোন রাজপুরুষ এটি খনন করে থাকবেন, কেননা এ দীঘির বিশালতা এবং এর মধ্যস্থলে প্রোথিত কারুকার্যময় প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভখানাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ দীঘির পেছনে কোন মহান নৃপতির বিজয়কীর্তি লুকায়িত আছে। ১৮৭৯

খ্রিস্টাব্দে কানিংহাম দিবর দীঘি ও এর স্তম্ভের নির্মাতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটা পাল বংশীয় তৃতীয় রাজা দেবপালের অমর কীর্তি। দেবপালের নামের সঙ্গে গ্রাম ও দীঘির নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই তিনি এ অনুমান করেছিলেন (দেবেরদীঘি<দিবরদীঘি)। এ স্তম্ভ সম্রাট অশোকের কীর্তি হতে পারে এ অনুমানও স্যার কানিংহাম করেছেন।[১০] তবে বুকানন দু'শ বছর পূর্বে যেটা অনুমান করেছিলেন সেটা মোটামুটি সত্য ও সর্বজনস্বীকৃত বলে প্রমাণিত হয়। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এক সহস্র বছর পূর্বে ধীবর (কৈবর্ত) রাজা কর্তৃক এটি খনিত হয়। [১১] তবে তিনি কোন খননকারী ও স্তম্ভের নির্মাতার নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি।

স্থান পর্যবেক্ষণে জানা যায়, সমগ্র পুণ্ড্র-বরেন্দ্র অঞ্চলে হালিক ও জালিক কৈবর্ত (ধীবর) সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। দেশান্তরে গমন করলেও আজো এরা এ অঞ্চলে বহাল তবিয়তে টিকে আছে। একাদশ শতকে কৈবর্ত নায়ক দিব্য, তদীয় ভ্রাতা রুদোক, অতঃপর দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম সমগ্র বরেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তার করেন। এ.কে.এম জাকারিয়া বলেন যে, তাঁদের মধ্যে (দিব্য, রুদোক ও ভীম) একজন খুব সম্ভব এখানে জলাশয়টি খনন করে স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। [১২] মোস্তফা আলীর মতে, নওগাঁর পত্নীতলায় জলাশয় ও উহার কেন্দ্রস্থলে তৈরি সুউচ্চ স্তম্ভটি দিব্য কর্তৃক নির্মিত।[১৩] দিবর দীঘির ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে সাপাহার থানাস্থ রাজা দিব্যের স্মৃতি বিজড়িত কৈবর্ত নামক গ্রামখানি আজও বিদ্যমান। কথিত আছে, ঐ স্থানে কিংবা তৎপার্শ্ববর্তী কোন স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে দিব্য পালদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে, রাজা দিব্যের নামানুসারে দীঘির নাম 'দিবর দীঘি' এবং কালের ব্যবধানে দীঘির পশ্চিম পাড়ে গড়ে উঠা জনবসতির নাম 'দিবর' হয়ে থাকতে পারে। দিব্য থেকে 'দিবর' শব্দের জন্ম সহজ, সরল ও গ্রহণযোগ্য।

বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ

খ্রিস্টীয় যুগের সূচনার পরে উত্তর বাংলায় কৈবর্তদের ধন-সম্পদ অর্জন ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারও অনেক পরে একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে কৈবর্তদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভ্যুদয় ঘটে।[১৪] পাল যুগের বিখ্যাত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' কাব্য গ্রন্থে (রচনাকাল ১১৪৩-১১৬১ খ্রি.) দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত নায়ক দিব্য কর্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার এবং রামপাল কর্তৃক দিব্যের উত্তরাধিকার ভীমকে বধ করে বরেন্দ্রী উদ্ধারের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন কৈবর্ত রাজা ভীমের প্রতিপক্ষ রামপালের পুত্র মদনপালের সভাকবি এবং তার পিতৃদেব প্রজাপতি নন্দী ছিলেন রামপালের যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী। তাই স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যাকরের বিবরণীতে পালদের প্রতি পক্ষপাতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে কৈবর্তরাজ দিব্য সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। যে দিব্য দ্বিতীয় মহিপালের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং সফলভাবে মিলিত সামন্তচক্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন-তার সম্পর্কে সন্ধ্যাকর বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি দিব্যকে দস্যু, উপধিব্রতী (কর্তব্য পালনে ভানকারী), কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ, তাঁর বিদ্রোহকে অনীকম (অপবিত্র) ধর্ম বিপ্লব অখ্যায়িত করেছেন [১৫] এবং কৈবর্ত শাসকদেরকে 'ক্রুরকরপীড়ক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্রোহ পরবর্তী পালদের বিরুদ্ধে কৈবর্ত জাতির উত্থান সহজে মেনে নিতে পারেননি। পক্ষপাত দোষে দূষণীয় হলেও কাব্যগ্রন্থটি ঘটনার প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত একটি ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। কারণ প্রাচীন বাংলার এটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উপাদান ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের অন্যতম পুত্র বাকপালের পরবর্তী সপ্তম পুরুষ ছিলেন প্রথম মহীপাল। প্রথম মহীপাল ছিলেন বাংলার কিংবদন্তীতুল্য জনপ্রিয় রাজা। প্রথম মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের তিন পুত্র ছিল-দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মহীপাল পিতৃ- সিংহাসনে সমাসীন হন। সন্ধ্যাকর নন্দী বলেন যে, তিনি যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি এতদূর অত্যাচরী ও দুর্দান্ত হয়ে ওঠেছিলেন যে, লোকে তাকে মহীপালের পরিবর্তে অহিপাল বলে অভিশাপ দিতো। তাঁর প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারে কোন লোকের মান-সম্মান, স্ত্রী-কন্যা কিছুই নিরাপদ ছিল না। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় এবং অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে রাজ্যমধ্যে, সৈন্যদলে, এমনকি রাজপরিবারে অন্তঃবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সভাসদবর্গের উস্কানীতে দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর অপর সহোদর দুই ভ্রাতাকে কারাবন্দী করেন এবং প্রধান সেনাপতি দিব্যকে তার পদ হতে বহিস্কার করেন। দ্বিতীয় মহীপালের এ স্বেচ্ছাচারিতা ও বিদ্বেষমূলক অচারণের কারণে বিদ্রোহী অনন্ত সামন্তচক্র লাঞ্ছিত দিব্যকে তাদের নেতা রূপে বরণ করে নিলেন। সামন্তবীর দিব্য নেতৃত্বভার গ্রহণ করলে মহীপালের সৈনদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। বহু রাজসৈন্য বিদ্রোহী হয়ে সামন্তপতিদের পক্ষাবলম্বন করলেন। মিলিত সামন্তচক্রের সাথে মহীপালের যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে দুশ্চরিত্র মহীপাল পরাজিত ও নিহত হলেন। বিদ্রোহের অবসান হলো। বিদ্রোহী সামন্তগণ ও প্রজাবৃন্দের সমর্থনে দিব্য 'নৃপ' উপাধি নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[১৬] দিব্যের মাধ্যমে বরেন্দ্রে একটি কৈবর্ত রাজবংশের সূচনা হয়। এ রাজবংশ প্রায় পঁচিশ বছরব্যাপী গৌরবের সঙ্গে টিকে ছিলো।

বাংলার ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিদ্রোহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন, অত্যাচারী মহীপালের রাজত্বে বিরাজমান অসন্তোষের মধ্যে কৈবর্ত প্রজাগণ বিদ্রোহ করেন। এ প্রজা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত জাতিসম্ভূত নেতা দিব্য। আবার কেউ কেউ বলেন, মৎস্যজীবী কৈবর্তদিগকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা সামাজিক নির্যাতনের বশবর্তী করেছিলেন, কারণ কৈবর্তদের জীবিকা বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী ছিলো।[১৭] কৈবর্ত বিদ্রোহে শুধু কৈবর্তরাই অংশগ্রহণ করেনি, স্থানীয় অন্যান্য গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলিও বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলো। তবে কৈবর্তদের একটি মুখ্য ভূমিকা ছিলো। কৈবর্তদের মুখ্যভূমিকা না থাকলে এ বিদ্রোহের নাম কৈবর্ত বিদ্রোহ হওয়ার কথা নয়।

এ বিশাল সামন্ত বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী কৈবর্ত নায়ক দিব্যের রাজনৈতিক উত্থান আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। দিব্য ছিলেন মহীপালের প্রধান সেনাপতি এবং ইতপূর্বে মহীপালের পিতার আমলেও তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছিলেন।[১৮] তিনি ছিলেন হালিক কৈবর্ত পরিবারের ধনাঢ্য ব্যক্তির বীর সন্তান। সেই আদিম যুগ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ কৈবর্তগণ পুন্ড্র-বরেন্দ্রের বায়ু, পানি, মৃত্তিকাকে ভালোবেসে এদেশের মাটিতেই আপন নীড় রচনা করেছে। বরেন্দ্রের জনপদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে, কৃষি-সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে তারা এদেশের নদী-জলাশয়, খাল-বিল, পথ-ঘাট, বন-বাদাড় বিচরণ করে মৎস্যাদি ও জলচর নানা প্রাণী শিকার করে জীবনধারণ করে এসেছে। অথচ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ করে, মনুসংহিতায় এদের দাস, অন্য নামে কৈবর্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে- এদের উপজীবিকা মৎস্য শিকার ও নৌকার মাঝিগিরি। হিন্দুশাস্ত্রে তাদের পেশাকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি কৈবর্তদের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং স্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কৈবর্তরা কোন হীন জাতীয় মানবের সন্তান নয়। এদেশে তাদের আগমন, উত্থান ও তাদের শ্রেণীবৃত্তি মোটেই ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় নয়। পৃথিবীতে কোন জনহিতকর বৃত্তি বা কর্ম নিন্দনীয় হতে পারে না।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পুণ্ড্র-গৌড়-বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিম যুগ থেকে যে সব মানব গোষ্ঠী বসবাস করছে তাদের মধ্যে কৈবর্ত একটি সুবৃহৎ জাতি গোষ্ঠী। কৈবর্ত এমন একটি জাতি গোষ্ঠী যারা বহু শতাব্দী পরেও তাদের নিজস্ব রক্তধারা ও জাতিসত্তা টিকিয়ে রেখেছে এবং তারা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে লীন হয়ে যায় নি। অদ্যাবধি তারা টিকে আছে তাদের আদিম উপজীবিকা ও জীবনধারায়, তাদের স্বতন্ত্র্য পরিচয়ে। আর্যদের আগমনের বহু পূর্বে মধ্যমাকৃতির খুলির গড়নবিশিষ্ট পশ্চিম এশিয়ার আদিম অধিবাসী সেমেটিক ভাষাভাষি জাতিসম্ভূত মানুষের একটি শাখা পশ্চিম দিক হতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এরা মূলত কৃষিজীবী। এরাই একসময় মহেঞ্জোদারো ও হরফ্ফা অঞ্চলে কৃষি, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নগর সভ্যতার সূত্রপাত করে। সিন্ধু সভ্যতাসহ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন ও সভ্য জনপদ নির্মাণে এদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদেরই একটি শাখা দ্রাবিড় ভাষাভাষিতে পরিণত হয় এবং ভারতে আর্যভাষাভাষিদের আগমনের পূর্বেই কোন একসময় গাঙ্গেয় উপত্যকা রাঢ় অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। তারা এ অঞ্চলে রাঢ় জনপদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল এবং রাঢ় সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিলো। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে কৃষিজীবী কৈবর্তদের পূর্ব পুরুষরা যে কোন কারণেই হোক গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল পরিত্যাগ করে পুণ্ড্র ও তার আশে পাশের অঞ্চলে আগমন করে। এরাই এ অঞ্চলে কৈবর্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। দ্রাবিড়-ভিত্তি মূলের ওপরেই কৈবর্তরা বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়। যদিও বাংলা ভাষা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়, ইন্দো-আর্য পরিবারের একটি ভাষা।[১৯] প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পুণ্ড্র অঞ্চলে প্রটো-অস্ট্রোলয়েড জাতিসম্ভুত পোদ (পুণ্ড্র) সম্প্রদায়ের মানুষ মৎস্য নির্ভর যাযাবর জলাচারী জীবনযাপন করতো। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের দিকে তাদের একটি অংশ জলাচারী জীবনধারা ত্যাগ করে ক্রমশঃ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী হিসাবে অবির্ভূত হয়।[২০] এ কারণে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রে মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী দু ধরনের পোদ সম্প্রদায় নজরে পড়ে। কৈবর্তদের পূর্ব পুরুষরা এখানকার ভূ-প্রকৃতির কারণে প্রটো-অস্ট্রোলয়েড জাতিসম্ভুত পোদদের মূলধারাটির সংস্পর্শে এসে নৌকার মাঝিগিরি, ধীবর, জেলে প্রভৃতি জলাশ্রয়ী পেশায় লিপ্ত হয়। পুণ্ড্র অঞ্চলে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মৎস্যজীবী কৈবর্ত জাতি-গোষ্ঠীর একটি বৃহদাংশ কৃষিজীবী পোদদের অনুসরণে মৎস্যজীবী পেশা ত্যাগ করে তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা কৃষিকে মূল জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। তারা পোদসহ অন্যান্য জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যায় নি। তাই এ কৃষিজীবী কৈবর্তদের পরিচয় হয় হেলে বা হালিক কৈবর্ত। অন্যদিকে কৈবর্তদের মূল ধারাটি চিরায়ত মৎস্যকেন্দ্রিক জীবনযাপন প্রণালীকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাদের পরিচয় হয় জেলে বা জালিক কৈবর্ত। এ দুই উপজীবী সম্প্রদায় অভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শুধু শ্রেণি বৃত্তির ভিন্নতার কারণে তাদের (কৈবর্ত) মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে জেলে কৈবর্তরা হিন্দু বর্ণবিন্যাসের বাইরে রয়ে যায়। আর তাদেরই জ্ঞাতি ভাই হেলে কৈবর্তরা হিন্দু সমাজের একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতি বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের সময় কৈবর্তদের একটি অংশকে (হেলে কৈবর্ত) বর্ণ বহিস্থঃ বা প্রান্তিক অবস্থান থেকে তুলে এনে সমাজে উন্নীত করে উচ্চতর আসন প্রদান করা হয়।[২১]

যুগ যুগ ধরে এ উভয় শ্রেণির কৈবর্ত পুণ্ড্র-গৌড়-বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বরেন্দ্র অধ্যুষিত রাজশাহীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ কৈবর্ত বাস করতো। এদের বেশির ভাগই হালিক কৈবর্ত। এরা সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও শিক্ষিত।[২২] পাঁচবিবির নিকটবর্তী পাথর ঘাটা, বিরামপুর, দাউদপুরে বিপুলসংখ্যক হালিক কৈবর্ত বাস করে। এছাড়া নওগাঁ জেলার রানীনগর, আত্রাই, বাঁশবাড়িয়া, নগরকান্দি, ধামইরহাটের মঙ্গলবাড়িতে চাষি কৈবর্তগণ বাস করে।[২৩] অবশ্য হালিক কৈবর্তরা ইদানিং নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাহিষ্যদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তীকালে মাহিষ্য নামের এ উপবর্ণের সৃষ্টি হয়।

আজো বহু সংখ্যক জালিক কৈবর্ত পুণ্ড্রের নিম্নভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। মহাস্থানের অদূরে ফুলবাড়িতে, করতোয়া নদী তীরে মাঝিপাড়া গ্রামে, মহাস্থানের পূর্বে নূরইলের বিলাঞ্চলে, কুসুম্বা মসজিদের নিকটবর্তী শোভাগঞ্জের বিল সংলগ্ন পল্লীসমূহে, জয়পুরহাটের ধারকী ও সোটা হাড়েতে জেলে কৈবর্তদের বসতি আছে।[২৪]

বরেন্দ্রের কৈবর্ত বিদ্রোহ, তার অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাবলী এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলে অদ্যাবধি কৈবর্তদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, কৃষিজীবী কৈবর্তগণ একটি স্থিতিশীল উন্নত জীবন ধারা ও সামাজিক অবস্থান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলো এবং সামাজিক প্রভাব- প্রতিপত্তিতে, ধন-সম্পদে, লোকবলে, শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকখানি প্রাগ্রসর অবস্থানে ছিলো। নওগাঁয় পত্নীতলায় দিব্য কর্তৃক নির্মিত 'ধীবর স্তম্ভ' ও ভীম কর্তৃক খননকৃত 'ভীম সাগর' ও 'ভীমের জাঙ্গাল' তার অন্যতম প্রমাণ। জনশ্রুতি মতে, দিবর দীঘির অনতিদূরে মহীপাল ও দিব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং এজন্যই বিজয়ী দিব্য ও তাঁর বিজয়স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে দীঘি খনন করে মধ্যস্থলে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর বাংলায় কৈবর্ত শাসন স্বল্পস্থায়ী হলেও এ অঞ্চলের লোক সমাজে দিব্যের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রবাদ ও জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। কোন কোন স্থানে দিব্যকে মহাপুরুষ কল্পনা করে প্রতিবছর দিব্য স্মৃতি উৎসবের আয়োজন করা হতো। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্ভবত ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তবঙ্গের মাহিষ্যগণ (কৈবর্ত) কর্তৃক আয়োজিত দিব্য স্মৃতি উৎসবের প্রথম অধিবেশন দিবর দীঘির পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অতপর ১৯৪০ সনে বঙ্গের কৈবর্ত সম্প্রদায় নওগাঁর মহাদেবপুর থানার বকাপুর গ্রামে ভীম সাগর তীরে দিব্য স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপন করেন। মহাদেবপুরের জমিদার রায় বাহাদুর নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার ছিলেন এ উৎসবের প্রধান অতিথি। দিব্য স্মৃতির তৃতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ধামইরহাট থানার বিখ্যাত মঙ্গলবাড়ি গ্রামে। উৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন।[২৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে উত্তর বাংলায় সামন্তবর্গের এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এটা ছিল অত্যাচারী পালরাজার বিরুদ্ধে কৈবর্ত বীর ও সামন্তনেতা দিব্যের সফল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা থেকে ধরে নেয়া যায় যে, এ ঘটনার মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলে কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী হিসাবে কৈবর্তদের নবউত্থান ঘটেছিল। স্বজাতি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থনে তৎকালীন বরেন্দ্রে দিব্য নতুন একটি রাজ বংশের সূচনা করেন। দিব্য ও তার পরিবারের উত্থান থেকে এ ধারণাই দৃঢ়তর হয় যে কৃষিজীবী কৈবর্তরা বরেন্দ্র অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ স্বচ্ছল কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজ তথা সমৃদ্ধ কৃষি জীবনধারা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

তথ্যসূচি:

১. Buchanan-francis (Calcatta-1833) *Geographical, Statistical and Historical description of the District of Dinajpur in the province of Bengal.*

২. Cunningham, *Archaeological Survey Of India report*-vol- xv/p. 122-123

৩. এ,কে,এম যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (দিব্য প্রকাশ- ২০০৭)* পৃ. ২৮৭

৪. Cunningham, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

৫. খান সাহেব মোহাম্মদ আফজল, *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস*, পৃ. ৪৮-৪৯

৬. Buchanan-francis, প্রাগুক্ত

৭. Cunningham, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

৮. এ,কে,এম যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৯১

৯. এ,কে,এম যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি-১৯৮৪)*, পৃ. ২৬৯

১০. Cunningham, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

[১১] Buchanan-francis, প্রাগুক্ত

[১২] এ,কে,এম যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০

[১৩] মোস্তফা আলী, *পুণ্ড্র-একটি প্রচীন জনপদের ইতিবৃত্ত (ঋত্বিক বগুড়া প্রকাশনা)*, পৃ. ১০৭-১০৮

* 'দিবর' শব্দটি সংস্কৃত 'ধীবর' (কৈবর্ত) শব্দের বিকৃত রূপ বলে অনেক গবেষক মনে করেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে, রাজশাহী-দিনাজপুর জেলায় - মহাপ্রাণ 'ধ' বর্ণ অল্প প্রাণ 'দ' বর্ণের রূপান্তরিত হতে দেখা যায় না। (এ,কে,এম যাকারিয়া)

[১৪] ঐ মোস্তফা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[১৫] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস-অদিপর্ব*, পৃ. ২২৯

[১৬] কে,এম, মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, পৃ. ২৮৩-২৮৪

[১৭] ফোর ডক্টরস্, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১০২

[১৮] কে,এম, মিছের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৪

[১৯] মোস্তফা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৯

[২০] আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, *বরেন্দ্র ভূমির চিরায়ত বাসিন্দা, নৃতাত্তিক অনুসন্ধান (বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস)*, পৃ. ১০১-১০২

[২১] মোস্তফা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৯

[২২] শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৪০

[২৩] মোস্তফা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[২৫] কে,এম, মিছের, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮৬ এবং খান সাহেব আফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

মধুসূদনের কাব্য: জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী*

সারসংক্ষেপ: মধুসূদনের কাব্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনা উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের ফসল। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রায় সব লক্ষণই (মানবতাবোধ, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্য সচেতনতা প্রভৃতি) তিনি তাঁর মন ও মননে সচেতনতার সাথে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম তাঁর কাব্যে সর্বত্রই যে সচেতনতার ফসল একথা বলা যায় না। কারণ প্রথম যৌবনে পাশ্চাত্যানুরাগী কবি জাতীয় জীবন ও চেতনাতে সচেতনভাবে উন্নাসিকতা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অবচেতনায় জাতীয়তাবোধ এবং দেশের প্রতি গভীর মমতা সযত্নে লালিত ও চর্চিত হতে থাকে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কাব্য ও কবিতাতেই এই দেশাত্মবোধের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু কলেজের (১৮১৭) অসম্ভব প্রতিভাবান ছাত্র মধুসূদন। এই কলেজের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। মুক্ত মন ও মননের অধিকারী এই মহান শিক্ষকের প্রভাব তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বয়ে আনে রেনেসাঁসের প্রবল ভাববন্যা। হিন্দু কলেজে মধুসূদনের আগমন ১৮৩৭ সালে। ডিরোজিও সে সময় পরলোকগত। তবু তখনও তাঁর প্রভাব হিন্দু কলেজেই শুধু নয়, সমগ্র নগর কলকাতায় সংক্রমিত, যা প্রাচীন হিন্দু সংস্কার ও সমাজ কেন্দ্রে বিপুল আঘাত হানে। রেনেসাঁসের মানসপুত্র ডিরোজিও'র প্রভাব মধুসূদনের উপর পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল।

নব্যশিক্ষিত বাঙালিরা ইংরেজি ভাষাতে প্রথমে সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন। কালীপ্রসাদ ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, মধুসূদন দত্ত -এঁরা ইংরেজি ভাষাতে সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন হলেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *RAJMOHONS WIFE* (১৮৬৪) ইংরেজি ভাষায় রচিত। কিন্তু এঁদের অনেকেই সেই প্রমত্ত বেগ সংহরণ করে মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনায় সচেষ্ট হলেন। মধুসূদন দেখলেন 'মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।' কিংবা সেই চিঠিতে লিখলেন:

> Our Bengali is a very beautiful Language, it only wants men of genius to polish up.[১]

মধুসূদন দীর্ঘদিন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের সব কিছুই সুন্দর, অনুপম আর বরণীয় এটিই ছিল মধুসূদনের অন্বিষ্ট। কিন্তু স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশ তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর আবেদনে বাসা বেঁধেছিল। আর এই সব কিছুর একত্র সম্মিলন হতে পেরেছিল বলেই মধুসূদন আধুনিক মানুষ, তাঁর কাব্যকর্মও তাই আধুনিক।

ঊনবিংশ শতাব্দী সমগ্র ভারতবর্ষের একটি অখণ্ডরূপ বাঙালির চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। দেশানুরাগ তথা স্বদেশপ্রেম এ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান মানস ফসল, এর আগে দেশ এত বৃহত্তর রূপে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয় নি। আর এই দেশানুরাগের প্রথম ও সার্থক প্রকাশ ঘটে মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবি ডিরোজিও'র কাব্যে। মধুসূদনের ইংরেজি কাব্যের দেশাত্মবোধ সন্ধানে ডিরোজিও'র নিম্নোক্ত কবিতাটির আলোচনা প্রাসাঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে:

My Country I in thy days of glory past
A beautiful halo circled round thy brow,
And worshipped as deity than waste
Where is that glory, where that reverence now?
....
Well let me dive into the depth of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small forgments of those wrecks subtime
Which human eye may never behold;
Andlet the guerdon of my labour be
My fallen country I one kind wish for thee.[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

ভারত বন্দনামূলক এই কবিতাটি ডিরোজিও'র *Fakir of Jangeera* কাব্যের মুখবন্ধ। ডিরোজিও ছিলেন মন ও মননে পরিপূর্ণভাবেই বাঙালি। জন্ম তাঁর বাংলাদেশে। পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি জাতিভুক্ত হলেও, কোন ছুৎমার্গ জাত-চেতনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাই তাঁর কবিতাতে স্বদেশ এত বর্ণিল।

মধুসূদন কলকাতা থাকাকালে অনেকগুলো খণ্ডকবিতা ছাড়াও দু'টি আখ্যান কাব্য *The Upsori & King Porus* লেখেন। *King Porus* যেন ডিরোজিও'র কবিতার পূর্ণতা পেয়েছে। মধুসূদন পুরুরাজ নিয়ে কাব্য (১৮৪৩) লিখতে গিয়ে বেদনার্ত হয়ে ওঠেন। যখন দেখেন এই জাতি পরাধীন, এই দেশ পদানত- তখন কবি কণ্ঠে আর্তনাদ শুনি:

And where art thou-fair freedom? thou
Once goddess of Ind's Sunny clime !
When flory's halo round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
Like her own towering Himalaya,
To kiss the blue clouds thron'd on high![৩]

এই যে বর্ণনা তা দেশানুরাগের ঐক্যন্তিকতারই পরিচায়ক। দেশচেতনার এই বীজ তাঁর পরবর্তী বাংলা চতুর্দশপদী কবিতাগুলোতে বহুবর্ণিল বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। চতুর্দশপদীর 'আমরা'(৯২) কবিতা পাঠে উপলব্ধি করা যায়, ভারতবর্ষের পরাধীনতায় কবির কী সুগভীর আক্ষেপ:

আকাশ-পরশী-গিরি দমি গুন বলে,/ নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?/ আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিখ্যাত; আবদ্ধ শৃঙ্খলে?[৪]

আর এ থেকেই বোঝা যায়, চতুর্দশপদীর কবি-চেতনা সেই পুরুকাব্য কাল থেকেই এক অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। অর্থাৎ মধুসূদনের ইউরোপপ্রীতি ও দেশপ্রীতি এক সাথে দুই ধারার মতো পাশাপাশি বয়ে চলেছিল।

The Upsori কাব্যে স্বর্গের অপ্সরার মর্ত্য-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রেমকামনায় কাহিনি চিত্রায়িত হয়েছে। তবুও ভারতীয় প্রকৃতি, পরিবেশ আর ঐতিহ্য ব্যবহারের মধ্যে কবির দেশানুরাগের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর কাব্যের ভাষা ইংরেজি হলেও এর ভাব চেতনায় ছিল বাংলাদেশ। মধুসূদন ভারতবর্ষের যেরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তাঁর কাব্যে মহিমান্বিত রূপে ধরা পড়েছে। সমালোচকের বর্ণনায়:

> নদনদী গাঁথা, দ্বাদশ শিবের দেউলে ভরা গ্রাম বাংলার পথঘাট, চণ্ডীমঙ্গল কি রামায়ণ কাব্য মুখরিত বটবৃক্ষতলে। ...বাংলার বউকথা কও, শ্যামাপক্ষী, কেউটিয়া সাপের মধ্যে দিয়ে শুধু একটি বস্তুগত স্মৃতির অনুধ্যান তিনি করেন নি; একটি ধ্যান রূপের সন্ধান করেছেন তাঁর *কপোতাক্ষ নদ, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি* প্রভৃতি কবিতায়।[৫]

বাংলার এরূপ শুধু বাংলা কাব্য-কবিতাতেই নয় ইংরেজিতে রচিত চতুর্দশপদী কবিতাগুলোতেও দেশের এ বর্ণিল রূপ স্বর্ণশোভিত।

মধুসূদনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের পর (১৮৪৩) হিন্দু কলেজে আর ঠাঁই হলো না। এ সময় বিশপস কলেজে ভর্তি হন তিনি। এখানেই তাঁর বন্ধন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। রেনেসাঁসের ফেনিল উন্মত্ততায় নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেন। বিজাতীয় এখানে স্বজাতীয় হলো, কোন কিছুতেই আর বাধা রইল না। চিন্তা চেতনার জগতও হলো উন্মুক্ত, স্বাধীন। এই চেতনার পথেই তাঁর স্বদেশ ভাবনা আরো স্পষ্ট হতে থাকলো, যার পরিচয় পাওয়া যায় মাদ্রাজে অবস্থানকালীন (১৮৪৮-৫৬) রচিত বিভিন্ন কাব্য ও কবিতাতে।

মাদ্রাজ পর্বের কবিতাতে তাঁর ভাব-সাধনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নবমাত্রা সংযোজনে তাঁর কাব্যকলা হয়ে ওঠে উচ্চকিত শিল্পগুণে গুণান্বিত। *Captive ladie* (১৮৪৯) মধুসূদনের ইংরেজি কাব্যকলার মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ও প্রশংসিত আখ্যান কাব্য। এ কাব্যের উপকরণ উৎস ভারতীয়। এখানকার রাজ্য, রাজা ও রাজকুমারীর কাহিনি বর্ণনার মধ্যে কবির দেশপ্রেম প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠে নি, বরং তা স্পষ্ট মাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে কবির কল্পিত প্রিয় লঙ্কার যে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য, সমুদ্রের যে রূপ বর্ণনা এবং চতুর্থ সর্গে সীতার যে বর্ণনা আছে- তারও সূত্রপাপাত এ কাব্যে:

Or- how to beauty's lonly bow'r

the false one came at noon-tide;

And pluck its brighest- fairest flow'r;

....

that they would cross theocean wave
And make fair lunka all a grave;[৬]

তছাড়া কাব্যের দ্বিতীয় স্বর্গে মুসলমান আক্রমণে হস্তিনাপুরের পতন, পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও আত্মহনন বর্ণনার মধ্যে কবির দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত।

visions of the past কাব্যটিতে নবতর আঙ্গিকের কুশলতায় বিশেষ ভাব-সাধনা প্রকাশ পেয়েছে। এ কাব্যে আদি মানব-মানবীর স্বর্গচ্যুতির কাহিনী আখ্যানাকারে প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও কাব্যটিতে বাংলাদেশ এবং তার প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শের যেন ঘটেছে চিরন্ময়ী উদ্ভাসন–

Bangla ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan Slumberous haunt and cool.....
Echo in mimic accents among the flocks.
Couch'd there in none tide rest and soft repose
Repeats the deafering and deap thunder'd roar
Of him- the royal wanderer of thy wood's![৭]

তাছাড়া *Rizia* কাব্যনাট্যেও কবির বিষয় ভাবনাতে দেশচেতনা ঠাঁই পেয়েছে। হিংসা-দ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের কারাগারে বন্দিনী রিজিয়ার কাহিনিতে শিরিন ও লীনা উজ্জ্বল এবং ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র। এখানে লীনার সংলাপের মধ্যে গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে:

My Melody voiced Nightingale/ From green Bangla's grove !
My land of palmiest grave- and bluest stream.[৭]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে আবার কলকাতায় বসবাস শুরু করেন, এ সময় তাঁর নিকট স্বদেশ, স্বজাতি এবং মাতৃভাষা চরম মহিমান্বিত রূপে ধরা দেয়। সচেতনভাবেই তিনি দেখলেন 'বৈরীদল বেড়ে স্বর্ণ লঙ্কা'। এই লঙ্কা কবির কল্পিত ভারতভূমি। এভাবেই তাঁর দেশপ্রেম বন্ধন মুক্তির মানসে আপনার পথ খুঁজে পেল। রাবণের কনক লঙ্কা আসলে এক দেশপ্রেমিক কবির স্বপ্নের স্বদেশ।

তবে একথা ঠিক তাঁর কাব্যে স্বদেশ এবং দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে ক্লাসিকরীতির কঠিন বন্ধনে। সহজ সরল এবং তরল প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তাঁর দেশপ্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি বললেই চলে। সুতরাং মধুসূদনের কাব্যে স্বদেশপ্রেম আমাদের নিকট অবশ্যই ব্যঞ্জনাবাহী। মধুসূদনের বাংলা কাব্যসমূহে স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ সন্ধান এবং তার বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এর আগে তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্টিকর্মে স্বদেশপ্রেম বা দেশচেতনার উৎস সন্ধান এবং বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়।

যে কোন দেশের যে কোন সাহিত্যেই দেশ-কাল-পাত্র কবিদের সূক্ষ্ম শিল্পবয়নে প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের কবিদের কাব্যেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নি। *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বাংলাদেশের স্বরূপ এবং প্রকৃতি অনিন্দ্য রূপে ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন ধর্মীয় স্তবস্তুতির মধ্যেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণ নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সামন্তপ্রভু ও ভূস্বামীরা তখন রাজ্য শাসন করতো। অনেক কাব্যেই ভূস্বামীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্র দেখা যায়। কিন্তু তাদের এই অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসে কবিদের সশব্দ উচ্চারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন কাব্যে নেই বললেই চলে। কারণ তখন জনগণ ছিল নৃপতিদের 'প্রতি অনুগত'। রেনেসাঁসের মানদণ্ডে দেশচেতনার যে স্বরূপ– ঐ দুই যুগের বাংলাকাব্যে তা নিতান্তই অনুপস্থিত। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল রঙ্গলালের (১৮২৭-৮৭) কাব্য পর্যন্ত। রঙ্গলালই বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতার কথা বললেন। তাঁর *পদ্মিনী উপখ্যান* (১৮৫৮) কাব্যে এর দীপ্ত প্রকাশ লক্ষণীয়:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পারিবে পায় হে কে পারিবে পায় ॥

অবশ্য এর আগে যুগসচেতন কবি ঈশরচন্দ্র গুপ্তের নিকট স্বদেশের সবকিছুই ছিল তাঁর প্রিয়। গুপ্ত কবির নিকট-

মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নেই আর।
কতরূপ স্নেহকরি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥[৯]

মধুসূদনের কাব্যে এই স্বদেশ বিচিত্র আঙ্গিক কুশলতায় মুক্তির পথে প্রধাবিত হয়। ইংরেজি ভাষার অহংকারী কবির মাদ্রাজ থেকে কলকাতা আগমন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার মধ্যেই যেন স্বদেশপ্রেমের বীজ প্রস্ফুটিত হল। প্রবাসে যে কবির অন্তর স্বদেশের জন্য উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল হয়ে উঠত– সেই কবি দেশের মাটিতে পা দিয়েই বুঝলেন দেশ তাঁর নিকট কত প্রিয়, কত ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে যাঁর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন– সেই তিনি কালে নিজ প্রতিভা ও অন্বেষার ফলে অনেক বড় মাপের কবি হয়ে উঠলেন। বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতার সমস্ত নিগূঢ় বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেলেন। আর বাঙালিকে পৌঁছে দিলেন আধুনিক যুগের স্বর্ণদ্বারে। এখানেই খুঁজে পেল বাঙালি তার মুক্তির পথ। মধুসূদন বাঙালির আজন্ম লালিত সংস্কারে করলেন আঘাত। কিন্তু নির্দেশনা দিলেন নতুন মূল্যবোধের। এই মূল্যবোধের মধ্যে স্বদেশপ্রেমও তাঁর কাব্যে অভাবনীয় মহিমায় প্রকাশ পেল।

তাঁর প্রথম কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব* (১৮৬০)। এখানে পৌরাণিক কাহিনী আখ্যানের রূপ পেয়েছে। বাংলাভাষায় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে কাব্য রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন তিনি বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সংযোজন ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে স্বাজাত্য বা দেশাত্মবোধের নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন কবি। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই অনুরণিত। নিজ ভাষার সমৃদ্ধি স্থাপনে কবির এ কৌশলে ভাষাপ্রীতি ও স্বজাত্যবোধ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবার *বীরাঙ্গনা* পত্র কাব্যের মধ্যেও একই চেতনাবোধের সন্ধান মিলবে। *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতির মধ্যে যেন ভারত সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তমিত হওয়ার এবং ইংরেজ শাসন ও শোষণের কবল থেকে মুক্তি লাভের অনুভূতি কবি প্রতীকী কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের বিষাক্ত ধূম্ররাশি ভারতবাসীর নাসিক্যরন্ধ্রে তখনও লেগে ছিল। মধুসূদনের সাহিত্যিক মানস এই ধূম্রের তেজস্ক্রিয়তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি গভীরভাবে পাশ্চাত্যানুরাগী হলেও ইংরেজ শাসন যে স্বর্গপ্রতিম ভারতভূমি এবং তার জনগণকে কি অপরিসীম নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণে বিদ্ধ করছে তা মানবতাবাদী মধুসূদনের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই যখন–

সুন্দ উপসুন্দাসুর সুরে পরাভাবি,/ লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল।
ঔর্ব্ব ঋষি ক্রোধানল পর্শি যে জলে,/ জ্বালাইলা জ্বলেশ্বরে নাশি জলচরে।[১০]

তখন এর কারণ উদঘাটনে কবি বিধির বিধানকে দায়ী করেন:

তোমার এ বিধি, বিধি কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে কি অমরে? বোধাগম্য তুমি![১১]

বিধাতার কাছে প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ সিপাহী বিপ্লবে ভারতবাসীদের প্রায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

তার পরেও কবি আশা ছাড়েন নি। যে কোন উপায়েই হোক এর মুক্তি চান। কারণ এ যুগের রাজনীতির মূল কথাই হল 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। তাই তিনি দেবতাকুলের ষড়যন্ত্রের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন নি, যা পরবর্তীতে *মেঘনাদবধ* কাব্যে রামের প্রতি ঘটেছিল। দেবতা তাঁর কাছে পূজ্য নয় তাঁর অন্বিষ্ট স্বাধীনতা, শত্রুর কবল থেকে দেশের মুক্তি লাভ। কে দেব আর কে দানব- তার অনুসন্ধান কবির উদ্দেশ্য নয়, যে আগ্রাসী আর স্বাধীনতা হরণকারী, সেই তাঁর নিকট ঘৃণিত। কাজেই দেবতার বিধানেই 'ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জয়'।

তবে একথা ঠিক যে *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* বিদেহী সৌন্দর্যের আকর। তিলোত্তমার সৌন্দর্য বর্ণনাতেই কবি প্রাণ অধিক নিবদ্ধ। কাজেই শুধু দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* বিচার করতে গেলে এর শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটবে। এর সৌন্দর্যই আমাদের মোহাবিষ্ট করে, দেশপ্রেম নয়।

মধুসূদনের জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের সবচেয়ে অধিকতর স্ফুরণ ঘটেছে *মেঘনাদবধ কাব্যে* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে*। *মেঘনাদবধ কাব্যে* দেশ চেতনার একটা স্পষ্টরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেশপ্রেমের এই স্পষ্ট ধারণা পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় চতুর্দশপদী কবিতাসমূহে। এখানে তাঁর জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেম প্রকাশে তিনি সম্পূর্ণভাবেই অকৃপণ। *মেঘনাদবধ কাব্য* ও চতুর্দশপদী কবিতাসমূহের দেশ চেতনার স্বরূপ বিস্তারিত আলোচনা করে পরে দেখানো যাবে। তার আগে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে।

১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে *মেঘনাদবধ* কাব্যের প্রথমাংশ প্রকাশ হওয়ার পর ঐ বৎসরই জুলাই মাসে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* প্রকাশ ঘটে। *ব্রজাঙ্গনা* প্রকৃত পক্ষে প্রেম ও প্রকৃতির কাব্য। কবি রাধার জবানিতে ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতি- প্রকৃতি ও তার উপকরণ উৎসের দ্বারা নিবেদন করে 'ওড'-এর আঙ্গিক রূপায়ণে শৈল্পিক সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের দেশ চেতনার মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শের সন্ধান মেলা ভার। বাংলা কাব্যের আজন্ম বিরহী নায়িকাকে নিয়ে কাব্য রচনার মধ্যে এর স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে। দেশকে ভালো না বাসলে, তার মানুষের কথা না ভাবলে দেশের সংস্কৃতির কথা ভাবা যায় না। আর এ সংস্কৃতির সমৃদ্ধি স্থাপন, আর তা নিয়ে কাব্য রচনা- এতো অসম্ভব ব্যাপার। মধুসূদনের দেশ তাঁর মননে বাসা বেঁধেছিল- সেই সাথে তাঁকে করেছিল আলোড়িত, উজ্জীবিত। তাই দেশের রূপ, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি তাঁর কাব্যে এত বর্ণিল ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত।

কৃষ্ণ চলে গেছেন মথুরায়, কৃষ্ণভাবে ভাবিত রাধার বিরহের সীমা নেই, যন্ত্রণার অন্ত নেই। সে ভারতীয় প্রকৃতির সব উপাদানের নিকট তার হৃদয়ার্তি প্রকাশে অকুণ্ঠ। রাধার হৃদয়াকুতি বর্ণনার সময় ভারত-ই শুধু নয়, পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং স্বরূপও ফুটে উঠেছে। আর বাংলার প্রকৃতি লাভ করেছে মৃন্ময়ী রূপ। এখানে 'যমুনা তট', 'নিকুঞ্জ বন', 'কুসুম', 'জলধর', প্রভৃতি বর্ণনায় সব কিছুতেই যেন বাংলাদেশ। আর 'বসন্তের' বর্ণনা এমন মধুর ব্যঞ্জনায় বর্ণিত হয়েছে বলেই– বাংলাদেশ তাঁর কাব্যে এত বর্ণিল, এত বাস্তব। কবি রাধার জবানিতে বলেছেন:

ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহতা স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ ধরিলা কি ফুল সাজ,
বিলাসে ধরণী?[১২]

মেঘনাদবধ কাব্যে কবির দেশচেতনা বহু বর্ণিল ব্যাপকতায় ব্যাপ্ত। এ কাব্যের মধ্যেই মধুসূদনের দেশাত্মবোধের সরব উচ্চারণ প্রথম দেখা যায়। অবশ্য এ উচ্চারণ ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-হেম-নবীনের কাব্যের ন্যায় উচ্চকণ্ঠ নয়। এজন্য যে তাঁর সাহিত্যিক মানসে রাজনৈতিক মঞ্চ-বক্তৃতা কাম্য ছিল না। বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণার মধ্যেই তাঁর স্বদেশিকতা পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি বলেছিলেন, 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে'?

মেঘনাদবধ কাব্যের স্বর্ণলঙ্কা কবির কল্পিত ভারতবর্ষ। সুবর্ণখচিত লঙ্কার পরতে পরতে লেগে আছে যেন প্রাচীন ভারতের সম্পদ, সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য। সেই ভারতবর্ষ আজ ইংরেজ শাসন এবং শোষণের কেন্দ্রবিন্দু। দেশপ্রেমিক কবিকে স্বদেশ এবং স্বজাতির এই দৈন্য দশা ব্যথিত করে, উন্মত্ত করে। এই ব্যথিত আত্মার বিস্ফোরণ ঘটে *মেঘনাদবধ কাব্যে* । তাই কবি তাঁর 'Favorite' ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বিদ্রোহ করেন:

"ধিক মোরে" কহিলা গম্ভীরে/ কুমার "হা ধিক মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণ লঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?/ এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;/ ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।[১৩]

এ ধিক্কার কবি আত্মার নিজেই নিজের প্রতি ধিক্কার। এ যেন স্বাধীনতাকামী কবি মানসেরই আত্ম জাগরণ। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের স্পৃহা উনিশ শতকের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। সমকালীন শিক্ষিত সমাজে দেশপ্রেমের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, মধুসূদনের মানস তা গভীরভাবে ধারণ করেছিল।

বাল্মীকি রামায়ণের উপকরণ উৎস নিয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের শরীর গঠিত হয়েছে। রামায়ণে রাবণ ছিল লম্পট, চরিত্রহীন অত্যাচারী- সর্বোপরি এক রাক্ষস রাজা। কামমদে মত্ত হয়ে সীতাকে হরণ করে সে তাঁর নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। মধুসূদনের রাবণ রেনেসাঁসের আঙ্গিকে নবরূপ লাভ করে। সমালোচকের বর্ণনায়:

> তাঁর রাবণের যে বীর্যবত্তা, পৌরুষ, সাহস, শৌর্য ও রণ-প্রিয়তা তার মূলে ছিল দেশপ্রেম। রাবণ যেন উনবিংশ শতাব্দির জাতীয় নেতা। সাগর পার থেকে আর্য রামচন্দ্র এসে লংকা আক্রমণ করে অত্যাচার করবেন তা রাবণের কাছে অসহনীয়। মাতৃভূমির শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য সে তার সমস্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। দ্বিতীয় এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পশ্চাতে কাজ করেছে রাবণের আত্মমর্যাদাবোধ। ভগ্নী শূর্পনখা লক্ষ্মণ কর্তৃক লাঞ্ছিত

হয়েছিল সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই রাবণ 'পাবক শিখা রূপিণী জানকী'কে অপহরণ করে। তারই ফলে এই যুদ্ধ। অকারণে লংকা যুদ্ধ বাধেনি। শত্রুর আক্রমণ থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা, আত্মসম্মান রক্ষা স্বজাতির নিরাপত্তা বিধান রাবণের দায়িত্ব। তাই তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।[১৪]

ভয়ানক যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু হয়েছে। রাবণ প্রিয় পুত্রের লাশ ও যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার জন্য পাত্র-মিত্রসহ প্রাসাদ শিখরে উঠেছে। এ সময় মৃতপুত্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ গর্বভরে বলেছে:

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার/ প্রিয়তম বীরকুল সাদ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে;/ জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে![১৫]

পুত্রশোকাতুর পিতার কণ্ঠে তখনই এ বাণী ঘোষিত হতে পারে, যখন সে গভীর দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়। রাবণের এ বাণী তার স্রষ্টারই আত্মানুভূতি।

বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান মাতা চিত্রাঙ্গদা রাবণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। রাবণ শোকার্ত চিত্রাঙ্গদাকে স্বীয় মনের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছে:

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,/ শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি![১৬]

বীরবাহুর মৃত্যুতে শত শত লঙ্কা নাগরিকের বিচ্ছেদ বেদনাতেও রাবণের বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে। স্বজাতি ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের জন্য রাবণ আমাদের নিকট এত মহিমান্বিত।

তাছাড়া চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দেবার সময় রাবণ বিপুল দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয়:

দেশ বৈরী নাশি রণে পুত্রবরতব/ গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীর মাতা তুমি।
বীরকর্ম্মে হতপুত্র- হেতু কি উচিত/ ক্রন্দন।[১৭]

মেঘনাদ কবির মানস সন্তান। এ চরিত্র রূপায়ণে কবি অভাবনীয় দেশপ্রেমের অনুঘটন ঘটিয়েছেন। কাব্যের শুরুতে প্রমোদকাননে পরাধীন লঙ্কার অপবাদ ঘুচানোর অঙ্গীকারের মধ্যেই মেঘনাদ চরিত্রে ঘটেছে উজ্জ্বল দেশপ্রেমেরে সমাবেশ। তারপর সৈনাপত্য গ্রহণের পর যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে মাতা মন্দোদরীর নিকট বিদায় বেলায় তার কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত, তা বীর যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক সৈনিকের বাণী:

নগর তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,/ যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে।
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?[১৮]

এছাড়া ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পিতৃব্য বিভীষণের সাথে কথোপকথনের সময় তার কণ্ঠে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

১. তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে/ বনবাসী ! হে বিধাতঃ নন্দন কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে/ কীটবাস?[১৯]
২. কোন ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,/ জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি- এ সকল দিলা
জলাঞ্জলি?[২০]

উপরিউক্ত 'জন্মপুরে' 'জাতি' প্রভৃতি শব্দ লক্ষণীয়। মাত্র দুটি শব্দের মধ্যে কী অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে কবির অভীপ্সা।

চতুর্থ সর্গে অশোক বনে সীতা ও সরমার সংলাপের মধ্যদিয়ে সীতা হরণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ সর্গ সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এখানেও কবি কৌশলে দেশমুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন:

মারিবে বীরেন্দ্র/ ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ/ বৈরীদলে সিন্ধুপারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদরে/ রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু ধনে;[২১]

একই সর্গে প্রাচীন ভারতীয় প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে যেন বাংলাদেশেরই মৃন্ময়ী রূপটি তুলে ধরেছেন কবি:

শিখি সহ, শিখিনী সুখিনী/ নাচিত দুয়ারে মোর; নর্ত্তক, নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?/ অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,/ কেহ শুভ্র কেহ কাল কে বা চিত্রিত
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;/ অহিংসক জীব যত।[২২]

বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ আর প্রাণিকুল কি অপরূপ ব্যঞ্জনায় চিত্রিত। মেঘনাদবধ কাব্যে কবির উচ্চারিত দেশানুরাগের দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রাচীন ভারতীয় সৌন্দর্যের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এর ফলে *মেঘনাদ বধকাব্যে* কবির স্বদেশ প্রেমের চেতনা মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বদেশ প্রেম বীরাঙ্গনা কাব্যকে উচ্চকিত করে নি। বরং এর দার্শনিকতা অন্যত্র। নারী জাগরণ ও নারীর স্বতন্ত্র মূল্যনির্ধারণ এ কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই সাথে স্বাধীনপ্রেম চিন্তা এবং প্রেম নিবেদনে নায়িকাদের স্বাতন্ত্র্য *বীরাঙ্গনা* কাব্যকে শিল্প গুণান্বিত করেছে। তবে একথা ঠিক, যে কোন মহৎ সাহিত্যেই দেশ-কালের ছবি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মহৎশিল্পী কোন কিছুর সরব উচ্চারণ করে না, বরং তা বিশেষ সাহিত্যিক কৌশলে উপস্থাপন করে। *বীরাঙ্গনা কাব্যে* কবির স্বদেশ চেতনার স্বরূপও একই সত্যে উদ্ভাসিত।

বীরাঙ্গনা কাব্য রচনার উদ্দেশ্য এবং কলা কৌশলের মধ্যেই কবির দেশানুভূতির সন্ধান করা যেতে পারে। এ কাব্যে মধুসূদনের দেশপ্রেমের উৎস ও স্বরূপ সূত্রাকারে প্রকাশ করা গেল:

এক. বিদেশী সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করে যে সব কলা বিধি কবি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছিলেন *বীরাঙ্গনা* পত্রকাব্য তার উল্লেখযোগ্য অমর অবদান। দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে তার সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করার বাসনা ও প্রচেষ্টা এত প্রবল হতে পারে না।

দুই. উনিশ শতকের সমাজ- বিশেষ করে নারী সমাজ ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আচ্ছন্ন। নারী মুক্তি তো দূরের কথা তা মুখে প্রকাশ করাও গুরু পাপেরই নামান্তর। রেনেসাঁসের আদর্শপুষ্ট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার *বীরাঙ্গনা* কাব্যে এই প্রথম নারীকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিলেন। যুগ যুগ ধরে সামাজিক বেষ্টনে আবদ্ধ নারী এই কাব্যেই প্রথম বন্ধন মুক্তির পথ পেল। ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি না ঘটলে দেশের মুক্তি আসে না । অন্যদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে তার মানুষকে এত গভীর ব্যঞ্জনায় উপলব্ধি করা যায় না।

তিন. এ কাব্যেও প্রাচীন ভারত তথা বাংলাদেশ তার রূপ এবং স্বরূপে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ আর সৌন্দর্য তখনই কবির কাব্যে মোহনীয় রূপ লাভ করে যখন দেশ তার সত্তার গভীরে বাসা বাঁধে। বাংলাদেশ মধুসূদনের অন্তরকে আলোকিত করেছিল।

চার. *বীরাঙ্গনা* কাব্যেও দেশপ্রেমিক নারীসত্তার সন্ধান মিলবে। এ কাব্যের একাদশ সর্গে জনা পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়ে নি। বরং স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বীরপুত্রের জন্য গর্ববোধ করে গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন:

ক্ষত্রকুল-রত্নপুত্র প্রবীর সুমতি,/ সম্মুখ সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,-
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,/ ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।[২৩]

গীতিকবিতার প্রতি ঝোঁক মধুসূদনের খুব বেশি ছিল না। তবে তার রচনাতে ক্লাসিকরীতির সাথে কোথাও কোথাও গীতি প্রবণতারও পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য বিচারের মানদণ্ডে তাঁর দুটি কবিতাকে (আত্মবিলাপ ও বঙ্গভূমির প্রতি) বিশুদ্ধ গীতি কবিতার মর্যাদা দেয়া যায়। কবিতা দুটি বিলাত গমনের পূর্বে কলকাতা থাকাকালীন রচিত। *আত্মবিলাপ* কবিতাটিতে স্বদেশ প্রেম গুহ্যার্থে অনুরণিত। কারণ পাশ্চাত্যনুরাগী ও বিলাসী কবির নিকট পশ্চিম ছিল মহাকর্ষণীয় স্থান। পাশ্চাত্যের রীতিনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবন ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু কবি যে স্বপ্ন সাধে বিভোর এবং মোহাবিষ্ট হয়ে মরীচিকার পিছনে ছুটে ছিলেন- তার সবকিছুই প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কবির ঈপ্সিত কামনা, বাসনা, খ্যাতি-যশ, সুখ-ঐশ্বর্য– কোন কিছুই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাই কবির একান্ত আত্মানুভূতি-

আশার ছলনে ভুলি   কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি   কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে? [২৪]

শুধু তাই নয়, যার পিছনে ছুটে বলহীন, আয়ুহীন হয়ে পড়েছেন, তার সন্ধান মিলানো- এই সমাজ, এই জাতি, এই দেশেরই সম্ভব ছিল। তাই তাঁর আত্মবিলাপ।

আর একই কারণে *বঙ্গভূমির প্রতি* কবিতাতে কবির মনোভাব এত স্পষ্ট। ইংল্যান্ড আর কবিকে পূর্বের মতো আকর্ষণ করে না। বরং সেখানে গমন তাঁর নিতান্তই শিক্ষার প্রয়োজনে আদর্শের টানে নয়। তাই ইংল্যান্ড যাবার পূর্বে প্রিয় মাতৃভূমিক নিকট কবির করুণ নিবেদন:

রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো নাগো তব মনঃ কোকনদে।[২৫]

মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা না থাকলে দেশকে 'মা' ডেকে এমন সুস্পষ্ট আবেদন করা যায় না। তবে মধুসূদন দত্তের কাব্যে স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখের দাবি রাখেঃ

> কবি যুরোপীয় জীবন যাত্রার প্রতি যতই আকৃষ্ট হন না কেন- দেশীয় বিধি নিষেধ, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে যত রোষই প্রকাশ করুণ না কেন, মাদ্রাজ প্রবাসকালে স্বল্পত তাঁর মনে স্বদেশবোধের প্রকাশ হতে থাকে। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তা অনেকাংশে বিকশিত হয়।... অবশ্য তাঁর স্বদেশ চেতনা রাজনৈতিক নেতার ধ্যান-ধারণার ন্যায় স্পষ্ট, তীব্র ও কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল না। একটা চাপা বেদনাবোধ, একটা গভীর প্রীতিরূপেই কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেড়ে উঠেছিল।[২৬]

আগেই বলা হয়েছে যে, রাজনীতির বক্তৃতা মঞ্চ মধুসূদনের কাম্য ছিল না। তবে ক্লাসিক সাহিত্যের (মেঘনাদ বধ) মধ্যে এই চেতনাবোধের সন্ধান মিলবে। কিন্তু *চতুর্দশপদী* কবিতাবলীতে স্বদেশ মধুসূদনের নিকট স্পষ্টত প্রতিভাত। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে কবির দেশ-প্রেম আরো গভীর ব্যঞ্জনায় অনুরণিত। *চতুর্দশপদী* কবিতাতে বাংলাদেশ, তার প্রকৃতি ও পরিবেশ, নদী, মাতৃভাষা- সবকিছুই যেন কবির চৈতন্যে সত্যানুভূতিতে ধরা দিয়েছে। যা কবির জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের পরিচয়বাহী।

মধুসূদনের *চতুর্দশপদী* কবিতাবলী বিচিত্র ভাব-সম্পদে বৈচিত্র্যপূর্ণ।। যখন দেশকে ভালোবেসে মাতৃভাষাতে কাব্য রচনা শুরু করলেন, তখনই কবি চলে গেলেন ইংল্যান্ড ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ফ্রান্সেও বাস করতে হল কিছুকাল। এ সময় মাতৃভূমি, তার ভাষা- রূপে এবং স্বরূপে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখা দিল কবির নিকট। দেশের জন্য কবির অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর কণ্ঠে শতধা উচ্চারিত হলো:

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।/ সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে/ শোনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।/ বহুদেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?/ দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।[২৭]

যশোহরের সাগরদাঁড়ির কপোতাক্ষই শুধু তার স্মৃতিতে দোল দেয় না, সমগ্র ভারতভূমি কবির অন্তর সত্যে আলোকিত হয়ে তার চতুর্দশপদীতে ঠাঁই নেয়। ভারতের প্রাচীন কবি (বাল্মীকি) থেকে শুরু করে- এর প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি- সব কিছুই যেন বিপুল বৈচিত্র্যে ধরা দেয় কবির নিকট। কবি গর্ববোধ করেন তাঁর মাতৃভূমির জন্য। আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে গর্বভরে বলে উঠেন:

যে দেশ উদয়ি রবি উদয়-অচলে,/ ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,/ ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে/ (তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলে বরে,
রজতের উপবীত স্রোত রূপে গলে,)/ শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ;) হেরি ভীষণ মুরতি;/ যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে;
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;-/ চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে;
সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;/ তেঁই প্রেম দাস আমি, ওলো বরাঙ্গঁনে।[২৮]

প্রকৃতির এই কলগুঞ্জনের মধ্যেই ভারতবর্ষের সত্যিকারের মৃন্ময়ী রূপ ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির এই কলগুঞ্জনই যে শুধু তাঁকে মুগ্ধ করে তা নয়, কবি ভারতবর্ষ তথা স্বদেশকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন জন্যই, প্রকৃতি তাঁর কাব্যে এত বর্ণবৈভবে বর্ণিল।

সংস্কারমুক্ত মন ও মননের অধিকারী হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসব কবিকে বিমুগ্ধ করে। কবি প্রাণও যেন সেই উৎসবে একাত্ম:

দেখ, মিলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে/ অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল অম্বরে,-
আসিছেন সবে হেথা- এই দোলাসনে/ পুজিতে রাখাল রাজ রাধা মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,/ কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীণা- তান অপ্সরার রবে।/ আনন্দে কুসুম সাজ-ধরেন ধরণী,-
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে/ বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি![২৯]

বাঙালির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য- এই উৎসব। দোল উৎসবে কবি যেন নিজের মনে দোলা দেন, এ দোলা দেশেপ্রেমের স্মৃতির মধ্যে রোমন্থিত। তাছাড়াও *শ্রীপঞ্চমী*, *আশ্বিন মাস*, *বিজয়াদশমী* প্রভৃতি কবিতাতে ভারতীয় উৎসব নানা রং ও রসে ধরা দিয়েছে।

প্রকৃতি ও উৎসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ ছাড়াও ভারতের যাবতীয় বিষয় তাঁর চতুর্দশপদী কবিতার দেহ নির্মাণ করেছে। বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিকে নিয়ে চতুর্দশপদী রচনা করে কবি একদিকে যেমন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অন্যদিকে ভারতের ঐতিহ্য সন্ধানে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসায় কবি প্রাণ উজ্জীবিত হয়েছে।

বিপুল ঐশ্বর্য, সম্পদ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ আজ পদানত। এই পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য কবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস: 'কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,/ ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে/ নিগন্ধে'?[৩০]

কবির ধারণা ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদের জন্যই- এদেশ বারবার পদানত হয়েছে। হারিয়েছে স্বাধীনতা, লুণ্ঠিত হয়েছে সম্পদ:

কেনা লোভে, ফনিনীর কুন্তলে যে মণি/ ভূপতিত তারারূপে, নিশাকাল ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,/ কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?
হায়লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণজলে / ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,/ সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি![৩১]

এই লুণ্ঠনকারীদের কবি ধিক্কার দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্রোহ করেন নি। এ জন্য কবিতাটি হয়ে উঠেছে পরাধীন ভারতবর্ষের ধারাভাষ্য, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উপায় নির্ধারক হয়ে উঠে নি। তবুও সমস্ত কবিতাটিতে লেগে আছে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল প্রলেপ।

তথ্যসূচি:

---

১. শিশিরকুমার দাশ, *মধুসূদনের কবি মানস*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৮৯, পৃ. ২১

২. তদেব, পৃ. ২৮

৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী*, পাকিস্তান বুক কর্পোঃ ঢা, রা, য, র; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি- ১৯৭০, পৃ. ৭২৭

৪. তদেব, পৃ. ৫৫৩

৫. শিশির কুমার দাশ, তদেব, পৃ. ৩০

৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ৬৩৪-৬৩৫

৭. তদেব, পৃ. ৬৮১

৮. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য, পুথিপত্র, কলকাতা, ফ্রেব্রুয়রি- ১৯৮৬,পৃ. ৯৫

৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *স্বদেশ*, *ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য সম্ভার*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, জুন- ২০০১, পৃ. ৩৯৮

[১০] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১০

[১১] তদেব, পৃ. ১০

[১২] তদেব, পৃ. ৪০১

[১৩] তদেব, পৃ. ১৪৪

[১৪] খালেদা বেগম, *মধুকাব্যের নির্মাণশৈলী*, ইমপিরিয়্যাল বুকস, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ, ফ্রেব্রুয়রী- ১৯৯৩, পৃ. ১৫-১৬

[১৫] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১২৭-১২৮

[১৬] তদেব, পৃ. ১৩১

[১৭] তদেব, পৃ. ১৩২

[১৮] তদেব, পৃ. ২৪৮

[১৯] তদেব, পৃ. ২৭৫

[২০] তদেব, পৃ. ২৭৬

[২১] তদেব, পৃ. ২০১

[২২] তদেব, পৃ. ২০৫

[২৩] তদেব, পৃ. ৪৭৭

[২৪] তদেব, পৃ. ৫৭০

[২৫] তদেব, পৃ. ৫৭৩

[২৬] ক্ষেত্রগুপ্ত, *মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প*, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০১

[২৭] তদেব, পৃ. ৫১১-১২

[২৮] তদেব, পৃ. ৪৯৭-৯৮

[২৯] তদেব, পৃ. ৫০০

[৩০] তদেব, পৃ. ৫৫৩

[৩১] তদেব, পৃ. ৫৫১-৫২১

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

তিস্তাপাড়ের গান: ভাওয়াইয়া

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী*

সারসংক্ষেপ: রংপুরের মাটির সাথে আমার জন্মসূত্রেই আত্মিক সম্পর্ক। এ অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যরসধারায় আমার চিত্ত সঞ্জীবিত। আমার হৃদয়-পদ্ম বিকশিত এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাব-ভাষায় এবং লোকজশিল্পের জলবায়ুতে। কর্মসূত্রে রংপুর থেকে দূরে থাকলেও মননের গভীরে সযত্নে রেখেছি আমার জন্মভূমির মাটি ও মানুষের পরম আত্মীয়তার বন্ধন। অনেক অনেক স্মৃতি আজ মনকে বিচলিত করে তোলে । সে সব মিলিয়ে হবে এক মহাকাব্য। কিন্তু আমি আবেগকে সংহত করতে বাধ্য হচ্ছি। বলবো শুধুই তিস্তা পাড়ের গানের সুরবৈচিত্র্য, বাণী ব্যঞ্জনার কৌশল, দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র, সহজ-সরল মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়া কত সামান্য অথচ অকৃত্রিম। সাদা-সিধে মন ও মানুষ, ভাব ও ভাষাতেও প্রাণের ছোঁয়া।

তিস্তা পাড়ের গান অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে 'হৃদয় কলরবের' স্পন্দন আছে। বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরাই ভাওয়াইয়া গানের স্রষ্টা। যদিও রাজবংশী সম্প্রদায়কে এসব গানের স্রষ্টা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এ গানগুলোর মধ্যে কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং পুরো রংপুর ও দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার এবং আসামের কিছু অংশ ভাওয়াইয়া গানের জন্মভূমি। পণ্ডিতবর্গের ধারণা রাজবংশীরা পূর্ব কামরূপ অঞ্চলের মানুষ। ষোল শতকের গোড়ার দিকে কোচদের একটি অংশ 'হিন্দু ধর্ম'[১] গ্রহণ করেন এবং অন্য একটি অংশ 'ইসলাম'[২] গ্রহণ করে। মুসলিম রাজবংশীরা 'কেউট রাজবংশী'[৩] নামে পরিচিত। মাতৃতান্ত্রিক রাজবংশীরা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করে। কিন্তু তারা তাদের পূর্বের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা জীবনে লালন করতে থাকে।

ভাওয়াইয়া গানগুলোকে বিষয়ানুগ বিন্যাস করলে বেশ ক'টি ধারায় বিভাজিত হতে পারে। যেমন কুমারীর হৃদয়ে প্রেমের প্রকাশ, বিবাহিতা নারীর স্বামী কর্মের জন্য থাকে 'বৈদেশে'। নারীর মন বাধা পড়ে যায় মৈষাল বন্ধু কিম্বা গাড়িয়াল বন্ধুর কাছে, বিয়ের পরে মেয়েরা ছেড়ে যায় বাবা-মা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন। সম্পূর্ণ নতুন পরিবারে মেয়েটিকে মানিয়ে নিতে যে কত কষ্ট করতে হয় তা তার গানে গানে প্রকাশ পায়, আবার শত কষ্টেও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য গানের কথায় ব্যক্ত হয়। একদিকে আছে- শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের সমাদরের আয়োজন, আবার এও আছে শ্বশুর বাড়িতে নববধূটির চলনে বলনে পান থেকে চুন খসলে কেমন গঞ্জনা জোটে তার ভাগ্যে। ভাওয়াইয়া গানে আরো আছে ফুল, পাখি, বাঁশি, নৌকো, গরুর গাড়ি, মৈষাল বন্ধু, হাতির মাহুত, বিরহী নারীর কান্না, বৈদেশি বন্ধু, ঘর-কন্যার নানান চিত্র, দেবর-ভাবির রসালাপ, মশা ও বিড়ালের উৎপাত, ফান্দে পড়ে বগার বিলাপ, কুমারীর বিয়ের জন্য প্রতীক্ষা এবং উৎসাহ এমন বিচিত্র জীবনের সংলাপ।

লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি অধ্যায় লোকগান। লোকগানের মধ্যে আবার উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। উত্তরাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কার, চিন্তা-চেতনা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নিহিত রয়েছে ভাওয়াইয়া গানে। লোকগানের 'প্রবাদ-প্রতিম' কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ বলেছেন: 'আমার গ্রামে ছিল বহু ভাওয়াইয়া গায়ক,... আমাদের আধিয়ারী প্রজারা হাল বাইতে বাইতে, পাট নিড়াতে নিড়াতে গাইত ভাওয়াইয়া গান। সেইসব গানের সুরেই আমার মনের নীড়ে বাসা বেঁধেছিল ভাওয়াইয়া গানের পাখি।'[৪] আব্বাসউদ্দীনের মতো আরো অনেকেই ভাওয়াইয়া গানকে সুধীজনের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য করেছেন, তেমনি এসব গানকে করেছেন মোহনীয়। সুরেলা কণ্ঠের যাদু গানের কথাগুলোকে সর্বজনের প্রাণে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছে। কণ্ঠশিল্পী মহেশ চন্দ্র রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, কসিমুদ্দিন, শরীফা রানী, রাধা রানী, ফেরদৌসি রহমান প্রমুখ ভাওয়াইয়া গানের জন্য স্মরণযোগ্য।

গানের নামকরণ নিয়ে অনেকেই অনেক মত পোষণ করেছেন। 'ভাব' শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে কেউ কেউ মনে করেন, 'ভাব' থেকে 'ভাও' শব্দটি এসেছে। কারণ 'ভাও' শব্দটি রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অঞ্চলের লোকসমাজ 'নিয়ম', 'আপস', 'দিক' প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করে থাকে। তাই মনে করা হয়, 'ভাও' শব্দের সাথে 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে 'ভাওয়াইয়া' শব্দ। অর্থাৎ 'যে ভাবায়' যেমন যে খাওয়ায় সে খাওয়াইয়া, যে কামায় (উপার্জন করে) সে কামাইয়া এসব শব্দের ব্যবহার এখনও উত্তরবঙ্গে আছে। কেউ কেউ 'ভাওয়া' শব্দটিকে স্থানবাচক শব্দ মনে করেছেন। নদীর চর কিম্বা গরু-মহিষের চারণক্ষেত্র। ভাওয়াইয়া গানে গরু-গাড়িয়াল, মৈষাল, মাহুত এদের কথাই বেশি আছে। "...'ভাওয়া'

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বদলগাছী, সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

থেকে এ গান ভেসে আসত পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে। তাই এই গানের নাম হয়েছে 'ভাওয়াইয়া'।"[৫] আব্বাসউদ্দীন বলেছেন, 'উদার হাওয়ার মতো এর সুরের গতি, তাই এর নাম ভাওয়াইয়া।' ভাববাচক শব্দ থেকেই 'ভাওয়াইয়া' শব্দের উদ্ভবের সম্ভাবনাই বেশি বলে বিশ্লেষকগণের অনেকেরই ধারণা।

ভাওয়াইয়া গানের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে গবেষকগণ এসব গানে খুঁজেছেন 'আশেক-মাশুক' তত্ত্ব, সুফী-মারফতী, মাতৃতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতি। সে সব তত্ত্ব যে কোনো গানেই খুঁজলে পাওয়া যাবে। সেটি বড় বিষয় নয়। ভাওয়াইয়া গানে নারী-হৃদয়ের অভিব্যাক্তি প্রকাশের আধিক্য প্রমাণ করে না, এতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চেতনা বাহিত হয়েছে। যে কোনো সমাজেই নারী যে ঘরে বাইরে সমানভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অবাঞ্ছিত, তারই সরল প্রকাশ আছে ভাওয়াইয়া গানে। পুরুষ পরিবারের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রক। তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেই সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নারী বিশেষত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত নারীকে জন্ম থেকেই জীবন দিয়ে শিখতে হয়েছে, সে সকলের কাছেই অনুগ্রহের পাত্র। মেয়েরাও যে মানুষ– এ কথা আজকের সংসারেও অনেকখানি উপেক্ষিত। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে স্মরণ করানোর চেষ্টা করা হয়, নারীরাও মানুষ। কিন্তু কোনো দিবসই পারবে না নারীকে যথার্থ আসনখানি এগিয়ে দিতে। এযে পুরুষের জন্য লজ্জার। আজ থেকে বহু বছর আগে উত্তরাঞ্চলের নারীদের জীবন ও মন, তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সুখ-বিরহ-মিলনাকাঙ্ক্ষা ভাওয়াইয়া গানের হলকা বাতাসকে করেছে মুখরিত। কখনো তাতে আছে আনন্দের উচ্ছ্বাস, কখনো বিরহের আর্তি, কখনো সংসারে নানাভাবে বঞ্চিত হৃদয়ের গভীর সত্যের প্রকাশ। যেমন, স্বামীর মৃত্যুতে বালবিধবার অন্তরে জেগেছে প্রেমাকাঙ্ক্ষা। সে তাই নানাভাবে স্বর্ণকার বন্ধুকে কাছে আনতে চেয়েছে। গানের কথা- 'ও মোর বানিয়া বন্ধু রে/ সোনারূপায় মিশ্যাল করি একটা তাবিজ বানাইয়া দে/ ওরে মরিয়া গেইছে বিয়ার সোয়ামি স্বপনে আইসে।'

বৈদেশি বন্ধুর প্রেমে মগ্ন হয়েও পুরো বিশ্বাস করে না কিশোরীর মন। কারণ তার আচরণে সে বেশ কষ্ট পেয়েছে। তাই সে বলেছে:

> ও মুই না শোন না শোন তোর বৈদেশিয়ার কথারে/ ও মোক ছাড়িয়া গেলু ক্যানে
>
> ... ...
>
> আইলোত ফোটে আইল কাশিয়া গাওত পড়ে ঢলিয়া/ ও তুই আসিবু বলিয়া গেলুযে চলিয়া একেলায় ফ্যালেয়া রে/ ও মোক ছাড়িয়া গেলু ক্যানে...।

একটি গানে রয়েছে গ্রামের সরল বালিকার প্রণয় প্রকাশের আকুতি। বাড়িতে যখন কেউ থাকে না কিম্বা সকলের অগোচরে মেয়েটি চ্যাংড়া বন্ধুকে ডেকে সুরে সুরে জানায়–

> ও বাপুই চ্যাংড়ারে ..../ শুট করিয়া কওরে বাপুই শোন কথা মোরে
>
> সরিষার ফুলরে বাপুই মাঠের শোভা/ এইযে নারীর শোভা ঢালুয়া খোঁপা/ চ্যাংড়া বন্ধু গলার কাঠি / ও রসের ভোমোরা

গানে গানে সে তার পরিচয়টুকুও জানিয়ে দেয় –

> বাড়ি মোর হইল্রে বাপুই অমপুর জেলা....
>
> এই যে বাপের নাম হইলো আলাভোলা
>
> মায়ের নাম কুসুমকলি মোর নাম ফুলোবালা
>
> বাপুই চ্যাংগড়ারে...

গ্রামের অল্প বয়সী বধূটি পাশের বাড়ির যুবকটির প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করে। অন্তরের না বলা কথাগুলো সে মুখ ফুঠে বলতে পারে না। একদিন যুবকটিকে কয়েকটা জলপাই পেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। অনুরোধের সাথে থাকে অনুযোগ। গানের কথায়–

> তুইযে বাপুই চ্যাংড়া মানুষ কিছুই বুঝিস না
>
> মুইও যে অবলা নারী
>
> ও মোর মনটা মানে না।

একসময় টাকাওয়ালা জমিদারের বাড়িতে হাতি না থাকাটা আভিজাত্যের ঘাটতি মনে করা হতো। হাতির দেখাশোনার জন্য থাকতো মাহুত। বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে রোজ হাতিকে নিয়ে যাওয়া-আসা করে মাহুত। মাহুতের গলার সুর মুগ্ধ করে একজনের হৃদয়কে। চোখের ভাষা মুখের কথা হয়ে ওঠে। মাহুতের দেশে ফিরে যাবার কথা জেনে মেয়েটির মন চঞ্চল হয়। সে লাজ-শরম ভুলে মাহুতকে বলে–

> আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে
>
> তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে
>
> হস্তীক নড়ান, হস্তীক চড়ান, হস্তীর গলায় দড়ি

ওরে ...সত্য করিয়া কনরে মাহুত, ঘরে কয় জন নারী।

এবার মাহুতের আকুতি–

হস্তীরে নড়াও, হস্তীরে চড়াও, চম্পা নদীর পাড়ে
ওরে সত্য করিয়া কইলাম কন্যা, বিয়াও নাই করি।

শ্বশুরবাড়িতে একটানা অনেকদিন থাকতে থাকতে বধূটির আর ভাল্লাগে না। মনের ভেতর আনচান করে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে। অভাবের সংসার। স্বামী তেমন করে স্ত্রীর দিকে নজর দিতে পারে না। ভালো একটা পরনের শাড়িও দিতে পারে নি, তাই স্ত্রীর ভাই তার বোনকে নিয়ে যাবার জন্য এলেও স্বামী যেতে দিতে অনীহা প্রকাশ করে। গানের কথা এমন–

ভাইয়া আসছে গাড়ি ধরি/ মুই যাম বাপের বাড়ি / বানিয়া মড়া না দে যাবার মোক
আরে মোক আরো কয় মাসের শ্যাষ/ না যাস তোর ভাইয়ার দ্যাশ
নায়োর গেইলে দোষে ধরিবে তোক

অর্থাৎ স্বামী যে ভালো কিছু দিতে পারে না, এ সব নিয়ে বাপের বাড়ির লোকজন নানান কথা বলবে, তাই সে যেতে দিতে চাচ্ছে না। আরেক স্বামী তার স্ত্রীকে আর ক'টা দিন পরে বাপের বাড়ি যাবার অনুরোধ করছে। জমির পাট কাটা শেষ। পাট শুকিয়ে বাজারে বেচে সে তার বউয়ের জন্য রঙিন শাড়ি কিনবে, আর সেই শাড়ি পরে যখন বউ বাপের বাড়ি যাবে, তখন স্বামীর বুকটা আহ্লাদে ভরে উঠবে। গানে গানে সে বলছে–

ও মোর সখের নায়োরি / ও মোর ঢকের নায়োরি
এইবার পাটা ব্যাচেয়া আনিয়ারে দেইম তোক ফুলতোলা শাড়ি।
... ...
কিনিয়া দেইম তোক ঢাকাই শাড়ি
পিন্দিয়া যাবু তুই বাপের বাড়ি
মাইন্‌সে কইবে যাওছে ওকনা ফলনার নায়োরি..
তাকে শুনিয়া বেড়ামরে মুই আল্লাদি করি।

রংপুর অঞ্চলের বিশেষ যানবাহন ছিলো গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি। বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ভাওয়াইয়ার সুর তুলে গাড়িয়াল যখন যায়, তখন বাড়ির মেয়ে-বৌরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে গাড়িয়ালকে আর তার সুরের সাথে ভাব হয়ে যায়। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই' বলে ডেকে দু'দণ্ড কথা বলতে চায়, আবার গাড়িয়াল বন্ধুটিকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার অনুরোধ করে বিবাহিত বৌ-ঝি'রা। প্রথমে বলি কুমারীর হৃদয়ে গাড়িয়ালের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং অনুযোগের কথা–

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কতই রবো আমি পন্থের দিকে চায়া..আ..রে।
তোমার মুখের ভাওয়াইয়া গান/ পাগল করে আমার প্রাণ রে..
ওরে গাড়িয়াল বন্ধুরে।

এই আবেগঘন গানের কথা ও সুরে এক অনাবিল আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মেয়েদের বিয়ে হলে যেতে হয় স্বামীর বাড়িতে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন আচার-আচরণ। একরাশ ভীতির সাথে বিচ্ছেদ-বেদনা হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তোলে। যখন এই গানগুলোর জন্ম, তখন সমাজে বাল্যবিবাহ হতো বেশি। কৈশোরিক চাপল্য এখনও দেহ-মনে জড়িয়ে আছে, অথচ স্বামীর বাড়িতে সে একেবারেই ঘরের বৌ। শত সংস্কার, শত বিধি-নিষেধ মেয়েটিকে পরাধীন করে । চিরচেনা স্বজন ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে যেতে তার বুক ভেঙ্গে যায়। গলা ছেড়ে কাঁদে মেয়েটি ও তার স্বজনরা। গানের কথার কিছু অংশ এমন–

ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল .../ ওকি আস্তে বোলাও গাড়ি
আরেক নজর দেখিয়া ন্যাও মোর/ দয়াল বাপের বাড়ি রে গাড়িয়াল
আস্তে বোলাও গাড়ি।

গানের এক অংশের কথা আরো বেদনাদায়ক।

ছোট কালে বাপ মরিছে রে.../ মা'ও গেছে ছাড়ি

দয়াল ভাইও করছে মানুষরে .../ ওরে তাকো যাওছো ছাড়ি রে গাড়িয়াল

আস্তে বোলাও গাড়ি।

শ্বশুরবাড়িতে বৌমাদের ভাগ্য সবসময় সুপ্রসন্ন হয় না। তার পরে যদি সংসারে থাকে অভাব-অনটন। সামান্য বিষয়েই স্বামী-শ্বশুরের মুখ ঝামটাই শুধু নয়, কখনো কখনো গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করে না। মেয়েটি অসহায়। শুধুই কান্না সম্বল। এমনি একজন নারীর সংসারের চিত্র এবং তার হৃদয়স্পর্শী বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে একটি গানে। নিজের হাতে শাক তুলে এনে রান্না করেছে। কিন্তু তার রান্না ভালো হয় নি বলে তাকে সইতে হয় কটুবাক্য আর অত্যাচার। বধূটির ভাষায়–

সেই শাগে আন্দিনু মা মুই তাতে নাই দ্যাও নুন

হামার বাড়ির বুড়াটার গোদর গোদর শুন।

... ...

সেই শাগে আন্দিনু মা মুই তাতে নাই দ্যাও জিরা

দৌড়ি আসি মড়ার ব্যাটা ভাঙলে হাতের গিরা

এমন আরেক সংসারের চিত্র। একরাশ অভিমান–

শাইল-ষোল আনি মড়াটা ভাজা খাবার চায়

ভাজা না হইলে মড়া মোক ধরি ডাঙ্গায়

ওরে মড়ার সংসারোত আসি উপাসে থাকিয়া

শরীল করনু মাটি।

সুখের সংসারেও নানান সমস্যা। স্বামীর চাল-চলনে স্ত্রীর সন্দেহ জাগে। সে তার স্বামীকে সতর্ক করে দেয়, এভাবে যদি স্বামী তার প্রতি উদাসীন হয় তবে সে আত্মহত্যা করবে।

কিসের মোর রান্ধোন/ কিসের মোর বারোন/ ওরে কিসের মোর হলোদি বাটা।

মোরো প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায় মোরো আঙিনা দিয়া ঘাটা

ও প্রাণসজনী কার আগে কবো দুস্কের কথা

অভিমান এবার আরো বেশি গভীর হয়। সে গাল ফুলিয়ে বলে –

আর যদি দ্যাখো/ আর যদি শোনো/ অন্যজনার সঙ্গে কথা

এ হেন যৈবোনো সাগরে সঁপিবো পাষাণে ভাঙিবো মাথা।

এবার এমন একটি গানের কথা বলবো, যে গানে একজন বিরহী নারী প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা নিয়ে প্রহর গোনে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের–

'প্রেম জানে না রসিক কালা চান্দ হায় মোর ঝুরিয়া থাকে মন

কত দিনে বন্ধুর সনে হবো দরিশন বন্ধুরে।'–

আরেক বিরহী নারীর আকুতি- গানের কথায় প্রাণ উদাস করে তোলে:

প্রাণ বন্ধুর বিহনে মন মোর ছটফট ছটফট করে

উড়া পংখীর পাখনা যেমন ঝটপট ঝটপট করে রে ।

আরেকটি গানে বন্ধুবিচ্ছেদের যাতনার কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে–

নিন্দের আলিশে হাত পড়ে বালিশে

মনে করো বন্ধু বুঝি আছে

চ্যাতোন হয়্যা দ্যাখো বন্ধু নাই বগলে

বুকখান মোর ছ্যাং ছ্যাংআ হইছে।

ও প্রাণসজনী কার আগে কব দুস্কের কথা।

শ্রীমতি রাধিকা যেমন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য পথ চেয়ে থাকে, প্রতীক্ষার দিন শেষ হতে চায় না, তেমনি প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষার কথা আছে কিছু গানে। যেমন–

'লোকে যেমন ময়নারে পোষে পিঞ্জিরায় ভরিয়া
ওরে ওই মত নারীর যৈবন রাখিচোঙ বান্ধিয়া রে।
ওকি একবার আসিয়া
সোনার চান মোর যাও দেখিয়া রে।'

কিশোরীর মনকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে গ্রামের যুবক যখন তাকে ধোকা দেয়, তখন সেই কিশোরী বধূর সোয়ামী ও সংসারের প্রতি জাগে প্রবল বিতৃষ্ণা। ধিক্কার জনিয়ে বলে–

ওরে নাক ড্যাঙেরার ব্যাটাটা
চোখ ড্যাঙেরার নাতিটা
মোক ভুলালু শখের খাড়ু দিয়া।

বিয়ের আগের সব কথা মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তাই অভিমানে রাগে দুঃখে মেয়েটি বলে–

তখনে না কছিলু তুই
মোটা চাল খাই না
চিকন চাইলের লেখায় জোখায় নাই
ওরে বাড়িত আসিয়া দেখনু মুই
চাতুরালি করলু তুই
ঘরোত এ্যানা তোর খুদ-কুড়াব নাই।

বাংলার বারোটি মাসের মধ্যে নিজের বেদনাকে তুলে ধরে গায় বারোমাসি গান। মধ্যযুগের কাব্যে 'বারোমাসী'র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বারোটি মাসে নারীর বিরহের দশাকে উপস্থাপন করা হয়। যেমন ভাওয়াইয়া গান 'কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে।'– এ গানটিতে নারী বাংলার বারোটি মাসের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের বেদনাকে মিলিয়ে প্রকাশ করেছে। যেমন– 'জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল/ আষাঢ় মাসে নয়া জল রে/ শাওন মাস গেল কন্যার শয়নে স্বপনে রে।'

গ্রামের বৌ-ঝিরা কাজের অবসরে নকশী কাঁথা সেলাই করে। শুধু তাই নয়, মেয়েরা পাটের তৈরি বিচিত্র শিকা তৈরি করে। যে শিকায় তুলে রাখে পিঠা-পায়েস, দুধের পাত্র, মাছ-মাংস ইত্যাদি। যাতে মড়ার বেড়াল সে সব নাগালে না পায়। কিন্তু সেয়ানা বেড়াল অনেক সময় শিকায় রাখা জিনিসও খাবার চেষ্টা করে। এতে বাড়ির বৌটি ভীষণ রেগে যায় নষ্টের শিরোমণি ঐ বেড়ালের ওপর। এবার 'বিলাই'কে শাস্তি দিতেই হবে। গানে গানে সে তার দেবরকে বলে–

এই যে কারবা বাড়ির চেটিয়া বিলাই দুয়ারোত করলো ম্যাও
ধরতো দ্যাওরা ছাওয়াটাক মুই বিলাইক সাজা দ্যাও।

গানের অন্তরায় আছে বিড়ালের কুকর্মের কথা–

এই যে শুটকা শুকি খলইত থুইছোম/ তাকো বিলাই খাইছে
মড়ার বিলাইটা পাক পাড়ে হায় ঐ না নোবোতে
শুটকা খায়া ফ্যালাইছে

শেষে বিড়ালের সাজার কথা –

এইবার বিলাইটা ধরি ছালাত ডুবি চুবগাও দ্যাওরা পানিতে
দেখিসতো বিলাই ক্যামোন করি আইসে
বিলাইর য্যান গড়গড়ি ওঠে
বিলাইটা চুবগাও পানিতে।

সংসারের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনার পাশাপশি আছে অনাবিল আনন্দের ছবি। অতি আদরের বৌটি নায়োর যাবে কিন্তু সে না পারে গরু কিম্বা মহিষের গাড়িতে যেতে, না পারে পালকিতে চড়তে, পারে না যন্ত্রচালিত যানে যেতে। তার রিকশা হলে ভালো হয়। স্ত্রীর আবদার বলে কথা। স্বামী কাউকে কিছু না বলে নিয়ে এলো রিকশা। স্ত্রীতো গর্বে গদগদ। এবার গানে গানে –

ওমুই পালকিতে না চড়ো ভুলা লাগিবে

সওয়ারিতেও না বসিম গাও এলাইবে

ও মুই ছইয়া গাড়িত না চড়ো/ মোর মাথা বিষাইবে

এই যে নায়োর যাবার কালে/ মইষা গাড়ি থামেথুমে

নায়োর যাওয়ার ঘাটাকোনাত আইত নাগাইবে

গাঁয়ের রাস্তা পাকা হয়েছে। চলছে আধুনিক যান। কিন্তু তাতেও তার যেতে আপত্তি। তাই সে বলেছে–

এই যে বাড়ির বগলে ঘাটা সানে বান্ধাইছে/ কত খটখটিয়া গাড়িআলা ব্যাবোসা ফান্দাইছে

ও মুই ভিড় ঠেলিয়া না চড়ো তাত/ না থাকে মোর কাপড় মাথাত

ঠেলাঠেলির ফাপরে দম তাতে আটকাইবে।

রিকশা এ্যানা পাইলে ভালো বাতাস নাগিবে।

তারপর স্বামী যখন রিকশা নিয়ে এলো তখন তার স্বামীর জন্য গর্বে বুক ভরে গেলো। মনের আবেগ চেপে সে বলছে–

সাধু মোর বড়ই কামলা বটে/ কথা কইলেই খালি চটে

চটে চটুক তায় রিকশাত চড়ি এ্যালা যাইমো বাপের বাড়িতে

সাধু মোর যাইবে আগোতে বসিয়া বড়ই মানাইবে।

রংপুরের একটি বিশেষ ব্যঞ্জন হলো প্যালকা। বিভিন্ন শাক-পাতা সেদ্ধ করে তাতে সামান্য খাবার সোডা দিয়ে বিশেষ স্যুপের মতো। বাঞ্ছিত ব্যক্তির জন্য গ্রামের মেয়ে বা বৌ কীভাবে প্যালকা রেঁধে পরিবেশন করবে তা জানা যায় একটি গানে–

কানিচাত গাড়িনু আকাশি আকালি/ আকালি ঝুমঝুম করে।

....

আকালি তুলি মুই কাঁচা-পাকা/ বতুয়া তুলিয়া আন্দিম প্যালকা

উয়াতে দেইম আরো শলুকো না পাত/ খাইমেন শোষে শোষে।

আমরা গাড়িয়ালের প্রতি নারীর যে প্রীতি তা দেখেছি। এবার দেখবো গাড়িয়াল কী উৎসাহে তার গাড়ি নিয়ে ছোটে। গাড়িয়াল বলছে–

আরে বাউকুণ্ঠা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে

ওরে ঐ মতোন মোর গাড়ির চাকা পন্থে/ পন্থে ঘোরে রে

ওকি গাড়িয়াল মুই চলং রাজোপন্থে।

বিবাহযোগ্য দেবর তার ভাবিকে তার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছে। চারিদিকে বিয়ের ধুম দেবরের ঘুম কেড়ে নেয়। তাই সে বলে –

ও ভাবি চাইরো পাকে বিয়ার ধুম/ মোর চোখোত না ধরে ঘুম

ভাইয়াটা মোর কথায় বোঝে না

শুধু তাই নয়, বিয়ের পালকি কীভাবে তাকে কষ্ট দেয়, সে কথাও বলে বোঝাতে চায় তার মনের দুঃখ:

বিয়া হায়রে কতই না হয় বিয়া

আশেপাশে পালকি চলে মোর বাড়ির বগল দিয়া

মন মোর কান্দে রে

কান্দে মন মোর পালকি দেখিয়া

অনুরূপ বড় বোনের বিয়ের আনন্দে মন ভরে না ছোট বোনের। ছোট বোনটিতো আর ছোট নেই। তাই ‘আবো’ অর্থাৎ দাদীর কাছে মনের কথা খুলে বলে। বিয়ের নানা রকম বাজনা তার ভেতরের কষ্টটাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই সে বলেছে–

করকা বাজে কোরোত কোরোত/ মনটা তখন না রয় ঘরোত
কাশিটা কয় ট্যাং ট্যাং/ বুবুর সাথে মুইও যাং
শানাইর কান্দোনে আওলাইল মন
ঐ আবো কও তোরে আগে
বুবুর বিয়ার বন্দুক ফোটে/ মোর বিয়ার কি ফুলে না ফোটে।

বহু বিচিত্র জীবনের গল্প আছে এ সব গানে। ভাবে ও ভাষায় যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি এর সুরের শৈলিও মৌলিক। সহজ-সরল মানুষের জীবনের আবেগের প্রকাশও অকৃত্রিম। লঘু রসিকতা থেকে শুরু করে একেবারে ছোটখাটো বিষয় নিয়েও গান বেঁধেছেন। যেমন একটি গানে মশার উপদ্রবে অতীষ্ট হয়ে নানা উপায়ে মশার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে গান ধরেছেন একজন–

মশার কামড়ে মা মুই গেনু বাপের বাড়ি/ সেও ঠেনা বাগেয়া মশা বেড়ায় টারি টারি রে/
মশা প্যাটকোনা তোর টিমটিমাটিম করে।

মশার কামড়ে মা মুই টাঙানু মশারি/ মশা ফাক দিয়া ভিতর সোন্দাইছে।

মশার কামড়ে মা মুই ঘরোত দিনু ধুমা / নিন্দোতে পড়িয়া মশা গালোত খাইলে চুমা।

গ্রাম্য সালিশ বসতো গ্রামের দেওয়ানি অর্থাৎ মোড়লের উঠোনে। বিচার হতো বাদি-বিবাদির কথার ভিত্তিতে। একটি গানে গ্রাম্যবিচারের কথা পাওয়া যায়।

শোনো দ্যাওয়ানির ব্যাটা/ কথাটা হইছে বড়/ কথাটার বিচার করো
মুই বলে কোনো কামে জানো না

ভাওয়াইয়া গানের বিশেষত্ব প্রথমত এ গানের শব্দের মধ্যে কিম্বা শেষে 'হ' ধ্বনির ব্যঞ্জনা। এসব গানে বেশ ক'টি নদীর নাম পাওয়া যায়- ধল্লা (ধরলা), তিস্তা, হীরা নদী, ক্ষিরোল নদী, তোরষা নদী, যবুনা (যমুনা)। চিলমারীর বন্দরের কথা আছে। গরু ও রাখাল, মহিষ ও মইষাল, হাতি ও মাহুত, বানিয়া (স্বর্ণকার), কালা (নাগর), সাধু (ভালোবাসার মানুষ), আবো (দাদী), গাবরু (নতুন বর), কইন্যা (নতুন বউ), মাও (মা), বাপো (বাবা), সোয়ামী (স্বামী) প্রভৃতি শব্দ ঘুরে ঘুরে এসেছে ভাওয়াইয়া গানে। ফুল যেমন– চম্পা, বেলি, কাশফুল, কদম ফুল, পাখি- ঘুঘু, কইতর (কবুতর), বগা ও বগী, কুরুয়া, দৈয়ল (দোয়েল), বাওই (বাবুই), কোকিল, কোড়া ও কুড়ি, বালিহাঁস, ময়না,কাকাতুয়া এবং ফল– ডালিম, মালভোগ কলা, সবরি কলা, নারিকেল। এছাড়া পান, গুয়া (সুপারী), গম, সরিষা, ধান ,শাক, শিম প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত ছিল দোতরা, সানাই, করকা, কাশি, করতাল, সারিন্দা। চিকিৎসার জন্য মানুষ নির্ভর করতো ওঝা, কবিরাজ প্রভৃতির ওপর। অলংকার হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে নাকের নোলক, কানের ঝুমকা ও মাকরি, পায়ের ঘুঙ্গুর ও খাড়ু। বিবাহকে মেয়েপক্ষ বলতো 'ব্যাচেয়া খাওয়া' অর্থাৎ কন্যাকে পাত্রস্থ করার অন্য নাম মেয়েকে ব্যাচে (বিক্রি) খাওয়া হয়েছে। 'মোক বলে ব্যাচেয়া খায় তেমালা ঘরে।' ঐ মেয়ের উপর আর যেন কন্যাপক্ষের কোন দাবি নেই।

'যে জন প্রেমের ভাব জানে না/ তার সাথে নাই লেনা দেনা/ খাঁটি সোনা ছাড়িয়া যে নেয় নকল সোনা, সে জন সোনা চেনে না' কিম্বা 'ও মোর বানিয়া বন্ধুরে সোনা রূপায় মিশ্যাল করি একটা তাবিজ বানেয়া দে' প্রভৃতি গান আঞ্চলিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাংলার সকলের হয়ে আছে। এক একটি অঞ্চলের নিজস্বতাকে বহন করে চলে কিছু লোকগান- লোকসংস্কৃতি। কিন্তু সে সবের মধ্যে যখন মানুষ তার অন্তরাকুতি অনুভব করে, তখন তা আর একটি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভাষা ও সুরের ব্যঞ্জনা ভিন্ন হলেও ভাব অভিন্ন বলে এসব গান চিরজীবী। সবচেয়ে বড় কথা এসব গানের মানুষগুলোর জীবন ও জগৎ, চিন্তা-চেতনা, আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতি অত্যন্ত সাদামাটা এবং নিখাদ। উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে পুরুষের জীবন ও জীবিকা দেখানো হয়েছে। মাহুত, মৈষাল, গাড়িয়াল, চেংড়া বন্ধু, বানিয়া বন্ধু, সাধু প্রভৃতি সম্বোধনে নারীরা তাদের হৃদয়াকুতি প্রকাশ করেছে। যদিও গানগুলোর রচয়িতা পুরুষ কিন্তু প্রায় বেশির ভাগ গানে নারীর আনন্দ-বেদনা-উচ্ছ্বাস-বিরহ গীত হয়েছে। 'ভাওয়াইয়া গানে ভাবের গভীরতা ও সুরের মাদকতা আছে।'[৬] ভাওয়াইয়ার সুর 'করুণতম'[৭] তাই তা মধুরতমও। 'প্রাণ দিয়ে যাঁরা প্রাণকে বুঝতে চান ভাওয়াইয়া কবির সহজ হৃদয় অতি সহজেই তাঁদের কাছে ধরা পড়ে।... মন যখন একান্ত মনের বশে– তখনই ভাওয়াইয়া গানের অলকানন্দা মনের কূল ভাসিয়ে নেমে আসে।'[৮] একজন

বিশেষজ্ঞ ভাওয়াইয়া গানের সুরে 'অদ্ভূত বন্য বিষণ্ন মাদকতা'[৯] আছে বলে উল্লেখ করেন। ভাওয়াইয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, শব্দের মধ্যে কিম্বা শব্দের শেষে 'হ' ধ্বনির আগম। 'আজি ভাল করিয়া বাজানরে দোতরা' গানটির উচ্চারণ হবে 'আজি ভা-হা-ল করিয়া হা বাজান রে দোতরা হা'। "পরথম যৈবনের কালে না হৈল মোর বিয়া" এবং "প্রাণ সাধুরে/ যদি যান সাধু পরবাস, না করেন সাধু পরের আশ/ আপন হাতে সাধু আঁধিয়া খান ভাতো রে।" এই গান দুটির সংগ্রাহক প্রাচ্য ভাষাবিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। সম্ভবত এ 'দুটি গানই প্রথম মুদ্রিত ভাওয়াইয়া গান।'[১০]

তথ্যসূচি:

---

১. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২

২. তদেব, পৃ. ১২

৩. তদেব, পৃ. ১১

৪. আব্বাসউদ্দীন আহমদ, *আমার শিল্পী জীবনের কথা*, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৯

৫. সুখবিলাস বর্মা, *ভাওয়াইয়া-সংজ্ঞা-উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ*, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১১

৬. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৭. তদেব, পৃ. ২৮

৮. আব্বাসউদ্দীন আহমদ, *বাঙলার লোকসঙ্গীত*, ***বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য,*** ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৩৫

৯. রণজিৎ সিংহ, *মাটির সুরের খোঁজে*, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৭৫

১০. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

নজরুলের কবিসত্তায় আমিত্বের প্রভাব: একটি নিবিড় পর্যালোচনা

ড. মোঃ আবদুল মজিদ*

সারসংক্ষেপ: 'আমিত্ব' হচ্ছে এক ধরনের আত্মিকজাগরণ, যার দ্বারা মানুষ নিজেই নিজের মধ্যে ঈশ্বর বা খোদাকে অনুসন্ধান করার কাজে ব্যাপৃত থাকে। ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন ও আত্মোপলব্ধির সুচারুরূপ ক্রমেই তাঁকে মহামহিম এক সত্যের দিকে ধাবিত করে। যেখানে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, জাতিতে-জাতিতে নেই কোনো বৈষম্য। মহৎজীবন ও কর্মের মধ্যেই এর প্রকাশ ও প্রভেদ সংঘটিত হয়। ফলে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তি হতে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এ সত্যের পথ ধরেই, নজরুল সত্য-সুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন এবং জ্ঞাননয়নে ঈশ্বর বা খোদাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। ফলে তার মধ্যে এসেছিল আমিত্বের এক অমিয়তেজ। আর এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবেই নজরুল ইসলাম আত্মচেতনার পথে নিয়ত চঞ্চল, নিয়ত চলিষ্ণু। ফলে, লক্ষ করা যায় জীবনের ও জগতের কর্মাভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর কোনো অচঞ্চল প্রতিকৃতি নেই। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম, দৃঢ়তা, মানবতা, আবেগ-আহ্লাদ সব কিছুর মধ্যেই ছিল নজরুলের অন্তর্নিহিত একটি লক্ষ্যভেদ। জন্মসূত্রে মুসলমান, বাঙালি ও ভারতবর্ষীয় এই কবি নিজেকে জ্ঞানমানবরূপে, অভেদসুন্দররূপে কল্পনা করেছেন। অতঃপর তিনি সর্বমানবের মুক্তির প্রতীকরূপে নিজেকে স্রষ্টার মাঝে নির্বিকার স্রষ্টার আদলেই প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। মানুষের শক্তিমত্তার ও স্বয়ম্ভূ অর্জনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিজের মধ্যে আমিত্বের দুনিয়া সৃষ্টি করা এবং তার মধ্যে নিজেকে নিজে দেখা। আর নজরুল এ চেতনাকে সাঙ্গীকৃত করে চূড়ান্ত বিজয়কামী মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তারই সতর্ক সন্ধান করেছেন।

বাংলা কাব্যে প্রেম ও বিরহ সমীকরণের যিনি স্থিতধী, তিনি হলেন আমদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনি একটি নিজস্ব ধারার সক্রিয় বলয়ের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণের তাত্ত্বিক প্রণেতা ও সংগ্রামীচেতনার যুগপুরুষ। ফকির আহমদ ও জাহেদা খাতুনের এক দুখীসন্তান তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। একবিংশ শতাব্দীর যাত্রাকালেও বলতে হয় নজরুল মূলত ও মর্মত কবি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ব্যতীত সমগ্র বাঙালি সমাজ ও সংস্কতিকে আর কেউ এমন প্রবলভাবে প্রভাবিত ও উজ্জীবিত করতে পারেন নি। নিঃসন্দেহে কবি নজরুল বহুপ্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার, গীতালেখ্য-গীতিনাট্য রচয়িতা, সুরকার, স্বরলিপিকার, গায়ক, বাদক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, অভিনেতা, পত্রিকাপরিচালক, চলচ্চিত্র কাহিনীকার ও পরিচালক। যদি সব কিছুকে পেছনে ঠেলে দেয়া হয়, তবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় কবি হিসেবে। 'তাঁর প্রতিভার তাবৎ বিচ্ছুরণ কবিতার কেন্দ্র থেকেই কবিতার রশ্মি ও জল তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে সঞ্চালিত ও প্রবাহিত। আবার এও সত্যি যে, এতো বিচিত্র ক্ষেত্রে এতো সাবলীল স্বচ্ছলতা, আর তাও মাত্র সৃষ্টিশীল তেইশ বছরে (১৯১৯-৪২), একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই মনে হয়।'[১]

দুই.

মাত্র তেইশ বছরের সাহিত্যজীবনে নজরুল যে অজস্র কবিতা ও গান লিখেছিলেন তা থেকে তাঁর সৃজনী উন্মাদনার মধ্যে যে মানসসত্তার প্রবাহমানতা, সেটি মূলত আমিত্বের স্বকীয় মহিমায় প্রতিভাসিত হয়েছে। 'আমিত্ব' শব্দটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাত্ত্বিকভাবে জটিল ও দুরূহ। কিন্তু নজরুল কাব্যে প্রায়োগিকভাবে এর রীতি ও ব্যবহার সাধারণ অর্থেই বিকাশ লাভ করেছে। 'আমিত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ সর্ব নিজে, আত্ম, অহমিকা, সর্বোত্তম পুরুষ, বাক্যের প্রকৃত বক্তা'[২] ইত্যাদিকে বুঝায়। কিন্তু এর মমার্থতা ও সারাৎসার অথৈ জ্ঞানের বিশাল দরিয়া। যার মধ্যে মানব অস্তিত্বের সীমাহীন এক জগৎ প্রতিনিয়ত আমাদের ভাষাতেও চিন্তাসূত্রের উদ্রেক করে। প্রেম ও বিদ্রোহী ভাবানুষঙ্গের মন্ত্রদাতা কাজী নজরুলের মানসপ্রবণতার স্বাভাবিক ও সাধারণ চিন্তাসমূহকে আমরা তাঁর আমিত্বের ধারনায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

বাংলা কবিতা যখন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সম্পূর্ণ ছায়াচ্ছন্ন, তখন কবিতায় এক অরাবীন্দ্রিক মনোজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন কবি নজরুল। এ কথা সত্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) প্রমুখের মধ্যেও অরাবীন্দ্রিকতা ছিলো, কিন্তু সর্বোপরি তাঁরা রবীন্দ্রবলয়ের কবি ও লেখক হিসেবেই পরিচিত। তবে এ ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম ও তাঁর সঙ্গে বিশেষ করে আরো দু'জন কবি যেমন- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এঁরা যে অর্থে অরাবীন্দ্রিক, যুগকণ্ঠ, সাহিত্যে ও জনমনে প্রভাবসম্পাতী, সে অর্থে তাঁরা কেউ নন। কেননা, কবিমাত্রেই জন্মগতভাবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ ধারন করেন এবং সেটি সমাজ সন্নিধ্যানে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেন। কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

'আমিত্ব' হচ্ছে এক ধরনের আত্মিকজাগরণ। যার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, সংরাগ-সংহতি ও সংযম, আপোস, আনন্দ ও আন্দোলন, চিন্তা ও চিন্ময়তা, সুসংগঠিত আবেগী পরিচর্যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সুমেরুকরণ যেখানে মানবচিন্তার সূক্ষ্ম ও সমবায়ীস্বর প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়। সময় ও যুগের দাবির তাগিদে হাজার বছরের নিরলস ও সংগ্রামীচেতনার নিরঙ্কুশ নির্যাস ধ্বনি-প্রতিধ্বনি স্বতঃসিদ্ধরূপে কাজ করে থাকে। মহৎজীবন ও কর্মের মাধ্যমেই এর প্রকাশ ও প্রভেদ সংঘটিত হয়। ফলে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এ সত্তাকে কবিসত্তায় বিভিন্নভাবে রূপায়িত করা যেতে পারে। যেমন-রবীন্দ্রদর্শন ও নজরুলের কবিমানসসত্তায় এর বিভাসিতরূপের ভেদ-ভেদান্তর ও যৌগিক পার্থক্যও সূচিত হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তির আদর্শ ও চিন্তাসূত্রের নিবিড়পাঠ আমিত্বসত্তাকে বহুধাসত্তায় পরিগণিত ও পরিলক্ষিত করে প্রকাশ করাও সম্ভব। এর দৃষ্টান্ত যেমন:

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসমর্পণের স্থলে নজরুল নিয়ে এলেন বিদ্রোহের বাণী। যেমন:

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন![৪]

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যক্তিহৃদয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষণীয়। অন্যদিকে, নজরুল সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়কে কবিতা করে তুলে আবহমান বাংলা কবিতারই বিষয়ের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের চিরন্তন ও শাশ্বত কাব্যবিষয়ের স্থানে এমনই তরতাজা একটি বিষয়কে কবিতার অঙ্গনে দেখে বাঙালি পাঠকমাত্রেই অভিভূত হয়েছিলেন। নজরুলের সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আমিত্বের বিদ্রোহ হিসেবে প্রকাশযোগ্য। কবি নজরুল ইসলামের কাব্যে আমিত্বের ঘ্রাণ একটি বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে যুগের সৃষ্টি হিসেবে নজরুলকে নির্বিশেষ করে তুলেছেন। তাঁর কবিকর্মের আবেদন যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নি। তাঁর কাব্যের উত্তাপ ও ঝড়-ঝঞ্ঝা বাদ দিয়ে তার ভেতরের আন্তরিকতা এবং সত্যনিষ্ঠা আজ মানুষের মনে স্থিতি লাভ করেছে। কাব্যে তিনি আমিত্বের জয়গানে মুখরিত হয়ে অন্তরশক্তির প্রেরণা বলে উত্তাপেরও অধিকারী হয়েছিলেন। এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল সেকালের রাজনৈতিক পরিবেশ। কেননা, ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল এ সময়টি পাক-ভারত উপমহাদেশের এবং বিশেষভাবে সেকালের বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অস্থিরতা, উত্তেজনা, ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেশের তরুণ সমাজকে এ কালে যথারীতি পেয়ে বসেছিল। সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে দেখা যায়, পরিবেশ যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করে, শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রতিভা তেমনি পরিবেশেরও জন্ম দেয়। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নজরুল বাঙালিসত্তার মানসগঠনে এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের সৃষ্টিকারক। তিনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও লোকোত্তর চেতনার সাহায্যে এ পরিবেশকে অপরিমেয় গতি দান করেছেন। এমনকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথকেও তিনি ছাড়িয়ে গেছেন।

নজরুল বিদ্রোহী কবি। তিনি একাধারে এদেশে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছেন, আবার তাঁর দেশ, প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবেসেছেন। নজরুল মনে করতেন, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির নাগপাশ থেকে এদেশকে মুক্ত করতে হলে অসহযোগ আন্দোলন করলে চলবে না; বরং শক্তি দিয়েই তার মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে 'আত্মশক্তি যদি না থাকে, তবে চাই আন্তরশক্তির প্রকাশ। আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষের মধ্যে সে শক্তি কিছুতেই জন্মলাভ করতে পারে না। অহঙ্কার নয়, অহং জ্ঞানই তার কাছে 'আত্মশক্তি'। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে আপনা থেকেই মানুষের 'আত্মবিশ্বাস' জন্মায়।'[৫] এ বিশ্বাস ও আমিত্বের দর্শনই নজরুলকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। আর এ বিশ্বাসই ছিল নজরুলের জীবনদর্শন। তবে কোন দার্শনিক কবির মতো কোন দর্শনের প্রচার মানসে তিনি এ লেখনি ধারন করেন নি। আবার পড়ে শুনেও এ দর্শন তিনি লাভ করেন নি। এ ছিল তাঁর সহজ জ্ঞান, তাঁর স্থির প্রত্যয়, তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত এক বলিষ্ঠ অনুভূতি। এ অনুভূতির প্রচারণায় তাঁর বিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতার জন্ম। এ কবিতাটি ছিল মানবজীবনের সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জীবন, জগৎ ও ঈশ্বরের অন্যায় কৃতকর্মের বিরুদ্ধে দ্রোহ। এ দ্রোহ কবির পবিত্র রক্তে ও প্রবৃত্তিতে চিরজাগরক। যুগ-যুগ ধরে এর শক্তি ও সংহতি প্রবহমান। তাই কবির কণ্ঠে শুনি:

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক–পানির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে![৬]

একদিকে সৃষ্টির সুখকে কবি অন্তরদিয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি তথাকথিত বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে বিধাতার বুকে হাতুড়ি ঠুকেছেন। একই সাথে তিনি স্রষ্টার ফাঁকি ও সৃষ্টির চাতুরি ধরে ফেলে ভুয়ো ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়ে বিপ্লব আনতে চেয়েছেন।

তিন.

নজরুল ইসলাম পারিবারিক জীবন হতেই ভেতরে-ভেতরে এক ধরনের সমাজবাদী মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কিশোর বয়স হতেই রাজনীতি ও সমাজবিপ্লব বিষয়ক চর্চার সংস্পর্শ। তাঁর প্রেম ও দ্রোহের মধ্যে একাকিত্বজীবনের ক্ষত-বিক্ষত রূপের পরিচয় সুস্পষ্ট। ফলে তাঁর জীবনকর্মের মধ্যেও নিজ তাগিদের ও আমিত্বের একটি প্রগাঢ়রূপ আমরা লক্ষ করি। বলাচলে, সিয়ারসোল স্কুলে পড়ার সময় 'যুগান্তর' দলের নিবারণ চন্দ্র ঘটক বিপ্লববাদে নজরুলকে প্রভাবিত করেন। সংগ্রামীচেতনার আত্মবিস্ফোরণ ও যৌবনে এসে নজরুলের যে বিপ্লববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছিলো তার বীজ বপিত হয়েছিলো এখান থেকেই। আবার এই সিয়ারসোল স্কুল থেকেই নজরুলের কবিতা লেখার সূত্রপাত হয়। স্কুল শিক্ষকদের বিদায়বাণী নজরুলকে দিয়েই লেখানো হতো। নজরুল বিদায় অভিনন্দন রচনার ভেতরে ভণিতা হিসেবে কৌশলে কখনো-কখনো নিজের নামও ব্যবহার করেছেন। এভাবে নজরুলের জীবনযাপন, যাদেরকে নিয়ে নজরুলের জীবনযাপন তারা এবং শুধু সেই মানুষগুলো নয় বরং আশে-পাশের পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূগোল সব কিছুই যেন বালক নজরুলকে 'আমিত্বে'র ভাবগরিমায় ভেতরে ভেতরে লেখক বানিয়ে তুলছিলো।[৭] তা না হলে বালক বয়সে লেখা "প্রেমের ছলনা"তে বালক নজরুল কেনই বা লিখবেন :

বিরহ জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়োনা বাঁকা শ্যাম,
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম
মের না ললনা হো।[৮]

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের মর্যাদা অসাধারণ। কেবলমাত্র কাব্য প্রতিভার দ্বারা তাঁর এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কাব্য রচনার সঙ্গে অকৃত্রিম জীবনবোধ ও সত্যনিষ্ঠা যুক্ত না হলে কোন কবির রচনা সার্থক, সার্বজনীন ও স্থায়ী হয় না। নজরুলের কবিসত্তার সঙ্গে মানবপ্রেম ও সত্যনিষ্ঠা অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। তাঁর কাব্যসাধনার মূল প্রেরণাই হচ্ছে মানবপ্রেম এবং সত্যের জন্য গভীরভাবে নিজের মধ্যে নিজের প্রকাশসত্য উন্মোচন করা। তাঁর কবিকল্পনার সঙ্গে শাশ্বত মানবতাবোধ এবং দেশের সমকালীন সমস্যার সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। এজন্য তিনি একাধারে কবি এবং মানবপ্রেমিকরূপে আমাদের কাছে সমাদৃত। এ প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার সুস্পষ্ট ভাষ্যঃ

আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ'লে গেল আন্‌-কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
করিব কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।[৯]

কবি নজরুল ইসলামের চেতনায় ছিল গণমানুষের মুক্তি ও অসাম্প্রদায়িক শ্রদ্ধাবোধ। এর জন্য তিনি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশের মেরুদণ্ডহীন, বোধ-বুদ্ধিহীন, এবং ধর্মান্ধ মানুষের চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। আমরা দেখেছি সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে, ও আইন-কানুনে যেখানে সত্যের অবমাননা, সেখানেই নজরুল রুদ্রের মতো সংহারমূর্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই বিবেকের প্রেরণায় কবি নির্যাতিত মানুষের

পক্ষ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর শৃঙ্খল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে 'মাভৈ'[১০] বাণী উচ্চারিত হয় তাঁর দৃপ্তকণ্ঠে। লাঞ্ছিত মানুষের বেদনা কবিকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

> তাঁহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালাই তাঁহার প্রধান, এমন কি সর্বগ্রাসী অনুভূতি; তাঁহার রক্তে, তাঁহার গভীরতম চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মতাবোধ বজ্রাগ্নির মত অসহনীয় উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল কারণ।[১১]

কবি নিজেকে ভগবানের হাতের বীণারূপে কল্পনা করেছেন। কবির ভগবান সত্য-সুন্দরের নামান্তর মাত্র। নজরুল সামগ্রিকসত্তায় অর্থাৎ সমষ্টির অভাব, বেদনা, ও যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে অনুভব করেন। তাঁর কাব্য 'নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সরব প্রকাশ।' 'নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চীৎকার' যেন কবির কণ্ঠ বিদীর্ণ করে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের এই অনুভূতি ছিল নিখাদ। শিল্প নয়, কাব্য নয়- মানুষের বেদনাই তাঁকে করেছে বিদ্রোহী ও চিরপথিক।[১২] আর এই বিদ্রোহীসত্তার মধ্যে লুকায়িত ছিল নজরুলের আমিত্বের অমিয়তেজ।

চার.

কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির কবি। প্রেম ও প্রকৃতিতে তিনি একাকার। তাঁর নিজস্ব ভাবধারায় প্রকৃতি ও মানব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত। কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর আত্মভাবের প্রতীক। 'সিন্ধু' তাঁর দৃষ্টিতে বিরহী ও বিদ্রোহী, 'নদী' পথচারী, 'কর্ণফুলী' তাঁর বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী, 'বাতায়ন পাশের গুবাকতরু' নিঃসঙ্গ রাত্রির সমব্যথী, 'চক্রবাক' চিরবিরহী প্রেমিক, 'ঝড়' ধ্বংসক মহানাগ। সিন্ধুর কথা বলতে গিয়ে নজরুল বিরহী মানবের বেদনা প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কল্পনায় 'সিন্ধু' কানায় কানায় উদ্বেলিত। এর বুকে জাগে কল কল ঢেউ, অশ্রান্ত গর্জন, অনন্ত ক্রন্দন। এ সিন্ধু যৌবনের প্রেমোন্মাদনার প্রতীক। এ যেন কবির নিজের জীবনের প্রতীকীরূপের উজ্জ্বল আভাস। শীতের সিন্ধু বেদনায় নিস্তব্ধ, নির্বাক। সিন্ধু নদীর প্রতীকী অর্থই নজরুলের কাছে মুখ্য ব্যাপার। এই সিন্ধুর প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে নজরুল তার আদি স্বরূপটি কুশলী শিল্পীর মতো করে প্রকাশ করেছেন। আদি সমুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর চিত্ররূপ। কবির বাণীতে এর স্বরূপ:

মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ,
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ।
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে
এ-নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নি ক'নাড়া।
বিপুল আরশি-সম ছিলে স্বচ্ছ স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।-
তপস্বী! ধেয়ানী![১৩]

নজরুলের বিরহী স্বভাব সমুদ্র ও নদীর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছে। তাঁর বিদ্রোহী প্রকৃতি আশ্রয় করেছে 'ঝড়'কে। ঝড়ের ভয়াবহতা, প্রচণ্ডতা, দুর্নিবার গতি, বিশ্বপ্রকৃতিতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাঁর কবিতায় তা অপূর্বরূপে ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষ্যে এর প্রকাশ:

প্রমত্ত সাগর-বারি-অশ্ব মম তুফানীর খর ক্ষুর-বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে'
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার!
আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার-
ঢেউ এর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু-মুখে–
জল নাগ-নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে![১৪]

নজরুল কখনোই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশের মত প্রকৃতি প্রেমিক নন। কিন্তু প্রকৃতিতে তাঁর একটি নিজস্বসত্তা ছিল, যেথায় তিনি তাঁর নিজস্ব অবয়ব খুঁজে পেয়েছিলেন। সমাজজীবন নজরুলকে যত আকৃষ্ট করেছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তত করে নি। জীবনের অসমতা, বিকৃতি, সামাজিক অসঙ্গতি তাঁকে শুধু আঘাত করেছে। এর ফলে অসাম্যের বেদনায় তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। জীবনের প্রয়োজনের বাইরে সৌন্দর্যালোক সৃষ্টি করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাই সমাজ সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নজরুলের হাতে পূর্ণ সফলতা লাভ করে নি। প্রকৃতিকে তিনি নিজের আমেজ ও অনুভূতির মেরুকরণে আলতোভাবে শুধু ছুঁয়ে দিয়েছেন; কিন্তু এর গভীরে কখনো প্রবেশ করেন নি। তবু আকাশ-প্রান্তর, সমুদ্র-নদী, ঝড়-

ঝঞ্ঝা তাঁর তুলিকায় কখনো কখনো সুন্দর ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। তবে এ ছবি কোন দিন মুছে যাবার নয়। আর এই প্রকৃতি ও মানবসত্তার নিরেট স্বপ্নমোদী ভাবব্যঞ্জনার মধ্যেই নজরুলের আমিত্বের রোমান্টিক ভাবরস লুকায়িত।

কবি নজরুল ইসলাম ১৯৩০ সালের পর পূর্ণভাবে সংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩২ সালে নজরুল যখন রুদ্ধদ্বারকক্ষে সাধনায় নিমগ্ন, তখন পৃথিবীর ফ্যাসিস্ট শক্তির পাশবিকতায় শান্তি বিঘ্নিত। ফ্যাসিবাদের যে অশুভ উত্থান, কবি তার বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আগাম এই উচ্চারণের সুর ও সূত্র ধরেই পরবর্তীতে যুদ্ধ যখন এলো, স্বাধীন জীবনের অতন্দ্র প্রহরী বিদ্রোহী কবি তখন প্রায় সমাজচেতনা হারিয়ে যোগ সমাধিতে মগ্ন। ১৯৪১ সালে বিশ্বের ঘনায়মান দুর্যোগ ও সভ্যতার সঙ্কট কবি অনুভব করতে পারেন নি। পার্থিব জগতের ক্ষয়ক্ষতি তখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অবশ্য নজরুলের এই সময়ের আলাপ আলোচনায় ও কথাবার্তায় অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। কবির এই অসংলগ্ন ও অসম্বন্ধীয় বাক্যালাপের মধ্যে এক ধরনের ভাবাবেগও ঈশ্বরানুরাগের দৃষ্টান্ত বহন করে। গদ্যে ও পদ্যে তিনি এক 'অবাঙমানসগোচর', 'অসম,' 'প্রেম-ঘন-সুন্দর', 'রস-ঘন-সুন্দর', এর কথা ঘুরে-ফিরে বলতে লাগলেন। নজরুল কাব্যে এক রহস্যময়ীর আবির্ভাব উপনীত হলো। এমতবস্থায়, কবি সহসা মুখ ফেরালেন ভক্তির দিকে। তাঁর এই পরিবর্তন পাঠক ও সমালোচকের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কিন্তু নজরুল চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বিদ্রোহী, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু যথার্থ বস্তুবাদী নন। কেননা, তিনি ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো কখনো স্রষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও, তিনি স্রষ্টাকে অস্বীকার করেন নি। জীবন-মৃত্যু তথা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা স্রষ্টা সম্বন্ধে যেমন মানুষকে উদ্বেলিত করে, ঠিক তেমনি কবির মনেও এ ধরনের একটি আমিত্ব বা অস্তিত্বগত শক্তির উৎস ও লীলার রহস্য কাজ করেছিলো। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালের রহস্য তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে, কিন্তু তাঁর রচনায় সেই ভাবনাচিন্তার ধারাবাহিক সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে নি। 'মনের মানুষ'-এর কল্পনা নজরুলের কোনা কেনো গানে ও কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন "আপন পিয়াসী" কবিতায় কবি বলেছেন :

আমার   আপনার চেয়ে আপন যেজন
খুঁজি তারে আমি আপনায়,
আমি   শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়॥[১৫]

'আপনার চেয়ে আপনজন', 'স্নেহ-মেঘ-শ্যাম' পরবর্তীতে কবি 'আমার সুন্দর' নামে অভিহিত করেছেন। কবি নিজে 'আমার সুন্দর' নামক একটি রচনায় তার মানসবিকাশ ও আধ্যাত্মিকচেতনার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বৈষ্ণবদর্শনে ধর্ম সাধনার তিনটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা: কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। 'জীবনে সৎকর্মের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি, জ্ঞানের দ্বারা জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে মোক্ষের উপায় দর্শন আর ভক্তির দ্বারা ভগবৎ অনুগ্রহে মোক্ষলাভ।'[১৬] এই বৈষ্ণব ভাববাদী দর্শনে প্রেম, জ্ঞান ও ভক্তির সূত্রসাপেক্ষেই ইসলামি সুফিতত্ত্বের বিকাশ ও বিশালত্ব গড়ে ওঠে। কেননা, এই বৈষ্ণব তত্ত্বে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন। আবার ইসলামি ভাবধারায় সুফিতত্ত্বের ঐশ্বর্যলীলায় অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের আবর্তনে গড়ে উঠেছে একেশ্বরবাদী প্রসূত মতবাদ। আর এই একেশ্বরবাদী চেতনার মুলতত্ত্বই আমিত্বের সন্ধান। এ আমিত্বের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দ সহচর। যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আনন্দের তথা প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে নিয়ম-রীতির ব্যবধান থাকতে পারে না। কাজেই এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মের ঠাঁই নেই। অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে। পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডাংশ। বিন্দুস্বরূপ জীবাত্মা তাই পরমাত্মার জন্যে ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতার জন্যই জীবাত্মা প্রেমিক। আবার পরমাত্মারও আকুলতা আছে জীবাত্মার প্রতি। কেননা, জীবাত্মাকে বাদ দিয়ে পরমাত্মার লীলাভোগ হয় না। অর্থাৎ জীবও পরম আমা এবং তোমাতে পরস্পর একাকার। তাই বিশ্বকবি এর সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন:

সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,   কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়-পুর–
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥[১৭]

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কাব্য ও সংগীতের পটভূমি ও পরিভাষা যুগিয়েছে হিন্দুদর্শন ও উপনিষদ। নজরুল কাব্যে শেষের দিকে লক্ষ করা যায় নজরুলকে মূলত প্রভাবিত করেছে 'সুফিদের মরমীবাদ।' তবে নজরুল নিজে সুফি ও বৈষ্ণবদের মত ও পথ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলভাবের দিকে, সূক্ষ্ম বিধি-বিধানের দিকে নয়। তাঁর বাক্যের পরিভাষা তাই রবীন্দ্রনাথের মতোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয়। তাই নজরুলের "অভেদম" নামক কবিতা ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের ছন্দময় প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। এ কবিতার মর্মবাণী এরূপ:

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয়ে রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।[১৮]

সেই পরম একক হতে জন্মলাভ করে বিশ্বভূবন। এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নেই কোন বিভেদ। পরবর্তীতে বাউল দর্শনের মধ্যেও এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বাউলেরাও আমিত্বসত্তার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি নির্ধারণ করেছেন। এই পরমাত্মার সন্ধান ও সান্নিধ্যেই আমিত্বের গুণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বাউল ফকির মনসুর সাঁই বলেন:

একই পরমাত্মা এই যে এই দেহে স্থিতি
আমি ভিন্ন নাই আর অন্য, আমি ভিন্ন নাই রে গতি।
ভেবে দেখ সোহং সত্য, মাঝেতে অহংও সত্য।
জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্ম প্রাপ্তি॥[১৯]

মরমী কবি হাসন রাজা আমিত্বের সন্ধানে ইহলোকের সমগ্র কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছিলেন। জাগরুক আত্মার লীলাবাদী ভাবরসে নিজেকে বিলীন করেছিলেন পরমসত্তাকে ধরার জন্য। এই সত্তার স্বরূপোন্মোচন করতে গিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন :

আমি মূল, আমিই কোল, আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই।
নাচ নাচ হাছন রাজা কারে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া যাতে হইছ লয়॥[২০]

অর্থাৎ হাসন আল্লাহ্ বা খোদার রূপ ও স্বরূপকে এমন উপলব্ধির সীমায় নিয়েছিলেন, যখন পরমাত্মার সাথে নিজ আত্মাকে আর আলাদা করে দেখতে পান নি। আর তখনই ঘটেছিলো আত্মতত্ত্বের চরম প্রকাশ। নিজেকে জানার ভেতর দিয়ে আল্লাহকে জানাই হলো শেষকথা। আবার এই আত্মতত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লালন ফকির স্বয়ং খোদাকেই কখনো 'অচিন মানুষ', কখনো 'আলেক সাঁই', কখনো 'মনের মানুষ' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছেন। এ সব অভিধার মধ্যে রয়েছে আত্মজ্ঞান বা আমিত্বকে সন্ধান করে নিজের মধ্যে নিজকে খুঁজে পাওয়া। এই 'আত্মজ্ঞানের অভাবেই মানুষ আপনাকে পর ভাবে, আত্মীয়কে অনাত্মীয় জ্ঞান করে; ভেদনীতি, বর্ণবৈষম্য, ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না বলেই সর্বভূতকে আত্মতুল্য মনে করতে পারে না এবং এ অজ্ঞানতা প্রেমের পথকে রূদ্ধ করে। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবতে পারলেই আত্ম ও পরের মধ্যে মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।'[২১] এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক লালনের একটি পদের স্মরণ করা যেতে পারে:

আমি সত্য নাহি হলে
গুরু সত্য কোনকালে
আমিকে যে রূপ দেখা
সেইরূপে দীন দয়াময়॥[২২]

পাঁচ.

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফসল মানুষ। স্রষ্টার এই মানব সৃষ্টির কুদ্‌রতি মানবাত্মার জন্য আত্মদর্শনের ও আত্মোন্মোচনের এক স্থিতধীপাঠ। বাংলা কবিতার ধারায় লক্ষ করা যায়:

জন্মমানব নজরুল ধর্মে মুসলমান, জাতিতে বাঙালি, ব্যাপক পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়, কিন্তু কর্মমানব নজরুল? না, তাঁর পরিচয় কেবল এই ধর্মধর্মে বা ভূগোলে বা স্বকালে বিধৃত নয়। সে পরিচয় খুব সহজ কথায় সভ্যতার এমন এক মাঙ্গলিক স্তরে, যেখানে সব ভেদাভেদ, অনাচার-অত্যাচার অবসিত, যেখানে তাঁর পরিচয় এক 'অভেদ সুন্দর'।[২৩]

সেই অভেদ সুন্দরের আরেক পরিচয় মানুষ, যে মানুষ পরিপূর্ণ সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাবান। সেখানে নর ও নারীতে কোনো প্রভেদ নেই, কুলিতে-বাবুতে কোনো বৈষম্য নেই, হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ নেই। সভ্যতার সেই স্তরে প্রবেশের বাধা এক দ্বিপাক্ষিক কলহ। যেমন- একপক্ষ অত্যাচারী, অন্যপক্ষ অত্যাচারিত, একপক্ষ শোষক, অন্যপক্ষ শোষিত। কল্পলোকে নজরুল নিজের মধ্যে এমন এক আত্মরূপের সন্ধানে ব্যাপৃত, যেখানে তিনি নিজেই সেই স্বচ্ছ মানবতা, যেখানে তিনি স্বয়ং সেই সর্বমঙ্গল সর্বেশ্বর। নিজের দর্পণে স্রষ্টার অবয়ব প্রত্যক্ষ করতে করতে তাই তাঁর স্বগত মীমাংসা:

সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে প'ড়েছে তাঁহার ছায়া।[২৪]

জ্ঞাননয়নে নিজেকে দেখা এবং নিজের মধ্যে আমিত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করা মহাতপস্যার ও সাধনার। কাজেই নিজের রূপ যে কতো অতলস্পর্শী, কতো জ্ঞানাতীত, তারই বাণীরূপ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সাম্যবাদী সিরিজের "মানুষ" কবিতায়। "ঈশ্বর" কবিতায় মানুষ আর ঈশ্বরকে, স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে অভেদ কল্পনা করার পর "মানুষ" কবিতায়ও আবার সেই অভেদ সুন্দরের স্তুতি:

হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি-কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।[২৫]

সাড়ে তিনহাত দেহধারী এই কুদরতি মানুষের সম্ভাবনার যেমন সীমা সরহদ নেই, তেমনি তার রহস্যময়তাও অন্তহীন। ক্ষুদ্র এই মানবদেহকে তিনি যে কোনো ধর্মগ্রন্থ বা ভজনালয় থেকে পবিত্রতর মনে করেন। কবি তাঁর সমগ্রকাব্যে বিদ্রোহীসত্তার মধ্যদিয়ে আগমন করে পরমসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সাধ্যানুগ মানবভাষায় বিচিত্র উপাচারে এসব বৈপরীতের বর্ণনা দেন। যার বিন্যাসের যৌক্তিক পারম্পর্য নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে প্রশ্ন তোলা সম্ভব। ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল চিত্রসারি বিন্যাসের ফলে পুরোকবিতার শরীরে সৃষ্টি হয়েছে এক দ্বান্দ্বিক সহগামিতা, যা শেষাবধি কবিকে একটি অনিবার্য সত্যে পৌঁছে দিয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, নজরুল আত্মজাগরণ ও আত্মচেতনার পথে নিয়ত চঞ্চল, নিয়ত চলিষ্ণু। জীবনের ও জগতের কর্মাভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর কোনো অচঞ্চল প্রতিকৃতি নেই। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম, দৃঢ়তা, মানবতা, আবেগ-আহ্লাদ সব কিছুর মধ্যেই ছিল নজরুলের অন্তর্নিহিত একটি লক্ষ্যভেদ। জন্মসূত্রে মুসলমান, বাঙালি, ও ভারতবর্ষীয় এই কবি নিজেকে জ্ঞানমানবরূপে, অভেদসুন্দররূপে কল্পনা করেছেন। অতঃপর তিনি সর্বমানবের মুক্তির প্রতীকরূপে নিজেকে স্রষ্টার মাঝে নির্বিকার স্রষ্টার আদলেই প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। মানুষের শক্তিমত্তার ও স্বয়ম্ভূ অর্জনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিজের মধ্যে আমিত্বের দুনিয়া সৃষ্টি করা এবং তার মধ্যে নিজকে নিজে দেখা। আর নজরুল এ চেতনাকে সাঙ্গীকৃত করে চূড়ান্ত বিজয়কামী মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তারই সতর্ক সন্ধান করেছেন।

তথ্যসূচি:

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ "ভূমিকা", 'কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১
২. বলন কাঁইজি (সংকলক ও সম্পাদক), 'লালন ভাবার্থের আধ্যাত্মিক অভিধান', সমাচার, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৬
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাঞ্জলি', রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ১৩৮০, পৃ. ২১৫
৪. কাজী নজরুল ইসলাম, "বিদ্রোহী", 'সঞ্চিতা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ১৫
৫. মুহম্মদ আবদুল হাই, "কবি নজরুল", 'নজরুল কবি ও কাব্য', প্রণব চৌধুরী (সম্পাদিত), বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২
৬. কাজী নজরুল ইসলাম, "আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে", 'সঞ্চিতা' পৃ. ১৬
৭. শিমুল মাহমুদ, "নজরুল সাহিত্যে পুরাণ ব্যবহারের প্রেক্ষাপট", 'নজরুল সাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৮

[৮]. কাজী নজরুল ইসলাম, "প্রেমের ছলনা", 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৮
[৯]. ঐ, "সত্য-কবি", 'সঞ্চিতা', পৃ. ৮৩
[১০]. ঐ, "হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ", 'সঞ্চিতা', পৃ. ৮৭
[১১]. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রোত্তর কাব্য" 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ.২০৮।
[১২]. আতাউর রহমান, "নজরুলের কাব্য-প্রেরণার উৎস", 'নজরুল কাব্য- সমীক্ষা', মুক্তধারা, চতুর্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭
[১৩]. কাজী নজরুল ইসলাম, "সিন্ধু" 'সঞ্চিতা', পৃ. ৯০
[১৪]. ঐ, "ঝড়", 'বিষের বাঁশী' আগামী প্রকাশনী, সপ্তদশ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৫ পৃ. ৫৮
[১৫]. ঐ, "আপন-পিয়াসী", 'সঞ্চিতা', পৃ. ৫০
[১৬]. মুহম্মদ আবদুল হাই, ডক্টর আহমদ শরীফ (সম্পাদিত),"ভূমিকা", 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা', মাওলা ব্রাদার্স, একাদশ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ক।
[১৭]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সীমায় প্রকাশ", 'সঞ্চয়িতা', সাহিত্যকোষ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২৬
[১৮]. কাজী নজরুল ইসলাম, "অভেদম", 'নতুন চাঁদ', নজরুল রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৯
[১৯]. মনসুর সাঁই, পদ নং: ৩৮, ড. আবদুল ওয়াহাব, "নিবাচিত লোককবি ও সংগীত", 'বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০৬
[২০]. হাসন রাজার গান, গান নং :৪৯, ড. আবদুল ওয়াহাব, "দুই কবির সমাজ চিন্তা : তুলনামূলক আলোচনা ও নির্বাচিত গান", 'লালন-হাসান : জীবন-কর্ম-সমাজ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৭৩
[২১]. সুজিৎকুমার বিশ্বাস, "জাতিভেদ প্রথাই প্রাচীনতম উপাদান", 'দেশ', ৬৫ বর্ষ, ৯সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ২১
[২২]. লালন ফকির, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), লালনসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৬৪
[২৩]. মুহম্মদ নূরুল হুদা, "স্বরূপ সন্ধান", 'কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
[২৪]. কাজী নজরুল ইসলাম, "ঈশ্বর", 'সঞ্চিতা', পৃ. ৫৮
[২৫]. ঐ, "মানুষ", 'সঞ্চিতা', পৃ. ৫৮

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাংলা উপন্যাসে জেলে জীবন: প্রসঙ্গ পদ্মানদীর মাঝি ও গঙ্গা

মঈন উদ্দীন আহমেদ*

সার-সংক্ষেপ: সাহিত্য মানুষের জীবন-দর্পণ। মানুষের যাপিত জীবনের প্রকৃত চিত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যায়। পৃথক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যেমন মানুষের সামাজিকতা, কৃষ্টি-সভ্যতা পৃথক হয়ে থাকে, তেমনি গোত্র-বর্ণ, ধর্মবিশ্বাস এমনকি পেশাগত পার্থক্যের কারণেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলসমৃদ্ধ ভৌগোলিক আবহে মাছ এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম আহার্য। পাশাপাশি তা হয়েছে একটি বৃহৎ অঙ্কের মানুষের জীবিকার অবলম্বন। স্বাভাবিকভাবে তাই বাংলা সাহিত্যে মাছ এবং তার সংগ্রাহক হিসেবে জেলেদের প্রসঙ্গ এসেছে। পৃথক শ্রেণি-পেশার মানুষ হিসেবে জেলেদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয় ভিন্নমাত্রিকে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিকগণ। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে– মাছ নিয়ে, মৎস্যজীবী মানুষ নিয়ে সাহিত্য রচনা এদেশে খুব বেশি হয় নি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুবোধ লাহিড়ী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবু ইসহাক, হরিশঙ্কর জলদাস প্রমুখ হাতেগোণা ক'জন সাহিত্যিকের রচনাতেই মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার চিত্র কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ নদীমাতৃক বাংলাদেশে এ বিষয় নিয়ে রচিত সাহিত্যের সমৃদ্ধিই কাম্য ছিল। উল্লেখ্য, জেলেদের জীবনকাহিনী নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালি, চিনসহ নানা দেশে বহু গল্প-উপন্যাস রয়েছে। নানা দেশের নানা পরিবেশে রচিত সেসব লেখায় জেলেদের জীবন-জীবিকার কঠোর সংগ্রাম, তাদের অসহায়ত্ব, অবহেলা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুঃখের ইতিবৃত্ত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। রয়েছে মহাজন-আড়তদারসহ অন্যান্য শোষকশ্রেণির জুলুম-শোষণ-বঞ্চনার কথা। অঞ্চলবিশেষের পটভূমিতে রচিত হলেও রচনাগুলো আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে হয়েছে বিশ্বজনীন আর সর্বদেশের সর্বযুগের অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র ধীবরশ্রেণির মুখপত্র। বস্তুত, নদীবহুল বাংলাদেশের কিছু উপন্যাসেও এমন বিষয়ের অবতারণা লক্ষণীয়। সেই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রেই জেলেজীবন নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য দুইটি উপন্যাস আলোচ্য নিবন্ধের উপজীব্য করা হয়েছে।

জেলেদের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা রাশিয়ান ঔপন্যাসিক ভিলিস লাৎসিস-এর 'জেলের ছেলে' (১৯৩৪) একটি বিখ্যাত উপন্যাস। জেলের ছেলে'র পটভূমি হল, পশ্চিম দার্বগাঙ্গা নদীর মোহনার নিকটবর্তী একটি ছোটগ্রাম রিনুঝি, যেখানে জেলেরা বসবাস করে। বসবাস করে জেলেদের শোষকশ্রেণি মহাজন আড়তদারও। যাদের নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনায় ধীবরপল্লির মানুষের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। 'সাগর পারের গ্রামখানি' (১৯৫৩) নামে লাৎসিস আরেকটি উপন্যাস লিখেছেন। আমেরিকান ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সি' মৎস্যজীবীদের নিয়ে রচিত একটি অনবদ্য উপন্যাস। উপন্যাসটি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত। জেলেদের নিয়ে রচিত বাংলা উপন্যাসগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৪৫-৪৭) উপন্যাসের। এর লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহরের নিকটবর্তী তিতাস পাড়ের গোকর্ণ গ্রামের এক দরিদ্র মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (১৯১৪)। ধীবর পরিবারের সন্তান হিসেবে উপন্যাসটিতে অদ্বৈত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিতাস নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও বৈরী পরিবেশে কঠোর সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এক উপেক্ষিত সমাজের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। মূলত এই উপন্যাস রচনা করেই অদ্বৈত বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যায় উপন্যাসটি যেভাবে তাঁর আন্তরিক মমতায় রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। রাইন, টেমস, সিন, দানিউবের মতো নদীগুলোর তীরে যেমন গড়ে উঠেছিল নদী-কেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতা, তেমনি তিতাসের তীরেও গড়ে উঠেছিল এক সৃষ্টিশীল জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, 'তিতাস সমগ্র বিশ্বের নদীমাতৃক জেলে জীবনোপাখ্যানের মহাকাব্য'। আরেকটি উপন্যাস 'ভস্তার বিল' (১৯৬৯)। লেখক সুবোধ লাহিড়ী (১৯১৭-২০০১) উপন্যাসটিতে ভস্তার বিলের মাছ, প্রতিকূল পরিবেশে মাছ ধরার কঠিন কর্ম, মাছের উপর নির্ভরশীল জেলেদের যাপিত জীবনের কারুণ্য, তাদের সংগ্রাম-সাংঘর্ষিক কথকতা প্রভৃতি তুলে ধরেছেন অতি নিখুঁত নিপুণতায়। ভস্তার বিলের অবস্থান শেরপুর পৌরশহর থেকে ছয় কি.মি পূর্ব দিকে ধুনট-শেরপুর সড়কের পাশে। বিলটির চতুর্দিকে রণবীরবালা, হুসনাবাদ, চণ্ডীদাস, ঝাঁঝর, বথুয়াবাড়ি, শালফা, গজারিয়া, হাড়িদিয়া প্রভৃতি গ্রাম ও জনপদ। এইসব গ্রামে বসবাসরত জেলেদের জীবন ও জীবিকার কথা সুবোধ অন্তর্বীক্ষণজাত শৈল্পিক সংশ্লেষণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিশেষত রণবীরবালা গ্রামের দরিদ্র জেলে-মাঝিদের জীবনের নিখুঁত কথকতায় ভাস্বর হয়েছে উপন্যাসটি। মার্কসীয় সাম্যনীতির আদর্শে উজ্জীবিত সুবোধ জেলেদের মতো সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনেতিহাস গভীর মমত্ব দিয়ে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁর এই রচনায়।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলেদের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বস্তুত এটি বাংলা সাহিত্যে নদী-কেন্দ্রিক জীবন ভিত্তিক রচনায় এক অনুপম সৃষ্টি। এখানে মানিক পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর এলাকার মানুষের সঙ্গে গভীর মমত্ব ও সহানুভূতি নিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাদের দৈনন্দিন জীবন, পেশাগত কার্যাবলী, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা-প্রাপ্তি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। অভাব-দারিদ্র্যপীড়িত ধীবরপল্লির অখ্যাত মানুষের নির্বাক হৃদয়আর্তিরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মানিকের লেখায়। রবীন্দ্রনাথও এদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, তবে তাঁর লেখায় এই মানুষগুলোর অন্তর্লোকের রহস্যই কেবল প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ মানিক গুরুত্ব দিয়েছেন সাধারণ মেহনতী মানুষের সর্বহারা জীবনের বহিরঙ্গের বাস্তব চিত্রায়ণে। যদিও ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষণে কুবের ও শ্যালিকা কপিলার হৃদয়ানুভূতির সামান্য জটিলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু পল্লিজীবনের স্নিগ্ধ মাধুর্যময় ও ভাবমণ্ডিত আতিশয্যে বিভোর না হয়ে বরং সাধারণ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের বৈচিত্র্যহীন কঠিন বাস্তবতার সঙ্গেই মানিক পরিচয় করিয়েছেন পাঠককে। মূলত মার্কসীয় সাম্যবাদের সমাজতান্ত্রিক চেতনালালিত মানিক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবিকতা, অশিক্ষিত ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র-সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে সঙ্গতি কামনায় ভিনদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ প্রভৃতির নিখুঁত রূপায়ণ করেছেন বলেই 'পদ্মানদীর মাঝি' কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা প্রমুখ চরিত্র তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সার্বজনীন সাঙ্কেতিকতায় যুক্ত হতে পেরেছে। লেখক প্রকৃত দ্রষ্টা হিসেবে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব মানুষের হৃদয়ের গভীর সত্তায় প্রবেশে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তারা কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র জেলে বা মাঝি নয়, বিশ্বের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত বঞ্চিত নর-নারীর প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' পদ্মাতীরের জেলে-মাঝিদের জীবন কাহিনী। অভাব-দারিদ্র্যই যাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। অন্ন-বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব যাদের নিত্যসঙ্গী। নিরন্তর সংগ্রাম করেও তারা এই অভাব নামের দানবের সঙ্গে পেরে উঠে না। যত দীনতা, হীনতা এই দারিদ্র্যের জন্যই। দারিদ্র্যের কশাঘাতে মনুষ্যত্ববোধও কখনো তারা বিসর্জন দিয়েছে। কেতুপুরের জেলেপাড়ার বাসিন্দাদের জীবনযাপনের পরিচয় লেখক এভাবে দিয়েছেন,

> পূর্ব দিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। ...স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলে পাড়াটি হইয়াছে জম-জমাট।
>
> দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ...জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও বাহ্মণতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ও-দিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। ...জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
>
> পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মত কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়।[১]

জেলেপাড়া ও অধিবাসীদের এমন পরিচয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে লেখকের আন্তরিকতা, যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত এই নিচুতলার মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং এই বঞ্চনা অবহেলার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। প্রকৃতি ও তথাকথিত ভদ্রলোকেরা এদের ধ্বংস করতে চায়। অবাঞ্ছিত এদের জন্ম, মূল্যহীন বেঁচে থাকা। জীবনের মাহাত্ম্য এখানে অনুপস্থিত। আছে কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, স্বার্থ-সংকীর্ণতা। এদের শরীরে শক্তি আছে, বুকে সাহস অছে, কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার নেই। জেলেদের অসহায়ত্ব, জীবনযন্ত্রণার আর্তি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম আর ব্যর্থতার কাহিনী মানিক তাদেরই ভাষায় জীবন্ত করে তুলেছেন। জীবনজালে আবদ্ধ হয়ে তারা কেবল ইলিশের মতোই ছটফট করেছে।

উপন্যাসে জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। তাকে নিয়েই কাহিনীর শুরু, আর তার স্পষ্ট পরিণতির মধ্য দিয়ে ঘটেছে সমাপ্তি। কুবের একজন গরিব জেলে। তার নিজের নৌকা নেই, জাল নেই, সেগুলো কেনার সঙ্গতিও নেই। আছে কেবল কায়িক শ্রম দেয়ার শক্তিটুকু।

প্রতিবেশী ধনঞ্জয়ের নৌকা-জাল দিয়ে ধনঞ্জয় আর গণেশের সঙ্গে সে পদ্মায় মাছ ধরে। বর্ষাকালে ইলিশের ভরামৌসুমে সমস্ত রাত জেগেই তাকে মাছ ধরতে হয়। উপার্জন যা হয়, এ সময়েই। শরীর থাক আর যাক, তখন এক রাতও ঘরে বসে থাকা চলে না। শরীরে জ্বর নিয়েই কুবেরকে মাছ ধরতে যেতে হয়। এই অসহায়ত্ব কেবল কুবেরেরই নয়, সব জেলেরই। সারাটি বছর তাদের পদ্মার উপরই নির্ভর করতে হয়। অবশ্য এমন নির্ভরতাও কিন্তু সুদৃঢ় নয়। মাছের অভাব যখন হয়, তখন দু'আনা চারআনা ভাগে কুবের মজুরিও খাটে অন্যত্র।

কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত যে মাছ ধরে তার অর্ধেক দিতে হয় নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়কে। বাকি অর্ধেক দু'জনের। নৌকা-জালের মালিক বলে ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। সকালবেলা মাছ বিক্রির সঠিক হিসেবও সে দেয় না। মাছ শ'চারেকের মতো হলেও 'দুইশ সাতপঞ্চাশখান' বলে বুঝিয়ে দেয়। চালানবাবু কেদারনাথও বেশ কিছু মাছ চাঁদা হিসেবে এমনি এমনি তুলে নেয়। সবাই কুবেরদের ঠকায়। কুবেরও মাছ চুরি করে শীতল ঘোষের নিকট কম দামেই বিক্রি করে। কিন্তু সেও 'পয়সা কাল দিমু কুবের' বলে কেটে পড়ে। রাগে দুঃখে তার চোখে জল আসে। কারণ–

> গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।[২]

আসলে কুবেরের মতো মানুষগুলোর যেন বাঁচারই অধিকার নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, আহারের সংস্থান নেই। দিন-রাত কেবল 'খাওনের চিন্তা'য় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাইতো আরও একটি পুত্রসন্তানের জন্মসংবাদ কুবেরের মধ্যে কোনো আনন্দ জাগাতে পারে না। অভাবের সংসারে আরেকটি খাওয়ার মুখ বেড়েছে। আনন্দিত গণেশের অতি উচ্ছ্বাসে কুবের বরং বিরক্তই প্রকাশ করে। বলে, 'চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা!' দু'টি মাত্র কুঁড়ে ঘর কুবেরের। 'রাইতের বাদলায়' ঘরে জল পড়ে। চালায় ছন নেই। ছন লাগানোর যোগাড় নেই। ঘরের সামনের ভেজা স্যাঁতসেতে সঙ্কীর্ণ বারান্দার একপাশে রান্নার স্থান, অন্য পাশে প্রসূতি মালার আঁতুড়ঘর। সেখানে বাসানুপযোগী ভেজা বিছানায় মালা নবজাতকসহ অবস্থান করবে। এছাড়া উপায় বা কী? গরিব ঘরে জন্মলাভের প্রক্রিয়া এমনই হয়। ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর বানায়, চৌকি পাতে। আরো বেশি ভদ্রলোকদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড়ঘর। কুবেরের মতো লোকদের সে সাধ্য কোথায়? 'আর যতখানি সাধ্য সে তা করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার ছনগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেলকোম্পানির কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে!' মূলত জেলেপাড়ার বাসিন্দাদের জীবনে দারিদ্র্যই হচ্ছে বড় কথা। ধর্ম, বর্ণ পৃথক হলেও দিন যাপনের ক্ষেত্রে সবাই এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ দারিদ্র্য নামের অধর্মই সবাই সমানভাবে লালন করে।

> ধর্ম যতই পৃথক হোক দিন যাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে– দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মিমাংসা হইয়া যায়।[৩]

জেলে পাড়ার মানুষের জীবনযাত্রা ভদ্রলোকদের চাইতে যেমন স্বতন্ত্র, ওদের রসিকতাও তেমনি স্থূল। কার মেয়ে কার ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে, অথবা শীতল ঘোষের স্ত্রী পীতম মাঝির মেয়ে যুগীর পেট মোটা হওয়া, কুবেরের মতো 'কালিকুঠি' লোকের স্ত্রী মালার ফর্সা সন্তানের জন্ম দেয়া এবং এ জন্য গ্রামের জমিদার মেজকর্তাকে ইঙ্গিত করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পীতম বা কুবেরের সামনেই চলে প্রকাশ্য রসিকতা। সুযোগ পেলে ওরা চুরিও করে। ঘুমন্ত হোসেন মিয়ার পকেট থেকে কুবের পয়সা চুরি করেছে। সিঁদ কেটে রাসু তার মামা পীতম মাঝির টাকাভরা পেতলের ঘটি চুরি করে নিয়েছে। আবার কুবেরকে সেই চুরির দায়ে জেলে পাঠানোর চক্রান্ত করেছে। কুবেরের ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার নিচে পীতমের চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গেছে। গোপীকে রাসুর বিয়ে করার প্রস্তাব কুবের প্রত্যাখ্যান করায় প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে এবং হোসেন মিয়ার পরামর্শে ষড়যন্ত্রমূলক রাসুই হয়তো কাজটা করেছে। নিজের ময়নাদ্বীপে বসবাসে অনাগ্রহী সহজ-সরল, নির্লোভ কুবেরকে সেখানে যেতে বাধ্য করার একটি সুযোগ পেয়ে গেছে হোসেন মিয়া। বাড়িতে গেলে পুলিশ ধরবে, জেল-হাজতে যেতে হবে, এই আশঙ্কায় কপিলা কুবেরকে সতর্ক করতে মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটে। কুবের কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোসেন মিয়ার বাড়ি যায়। হোসেন মিয়া সে রাতেই কুবেরকে নিজের উপনিবেশ ময়নাদ্বীপে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। যে নিষ্ফলা-জঙলা, নির্জন দ্বীপ হোসেন মিয়া নবীন মানবসন্তানে রাঙিয়ে দিতে চায়, ফুলে-ফলে-ফসলে ভরে ফেলতে চায়। নেশাদ্রব্যের চোরাকারবারি, রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া কেতুপুর এলাকার বাসিন্দাদের দারিদ্র্যের সুযোগ তাই কাজে লাগিয়েছে। স্বার্থসিদ্ধিতে সেখানে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রয়োজনে, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে ঘর হারানো জেলেপাড়ার লোকদের নিজে উপস্থিত থেকে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। ধনঞ্জয়ের নৌকা থেকে কর্মচ্যুত কুবের, গণেশকে নিজের নৌকায় মাঝিগিরির কাজ দিয়েছে। স্বার্থ সিদ্ধিতে কৌশলে

লোকদের বিপদে ফেলেছে, আবার বিপদ থেকে উদ্ধারও করেছে। কুবের বুঝতে পারে, তার জীবনের একটি পরিণতি দ্রুত ঘনিয়ে এসেছে। হয় তাকে জেলে, নয়তো হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যেতেই হবে। একবার জেল খেটে বের হয়ে আসলেও আবার তাকে জেলে ঢোকাবে হোসেন মিয়া। ভবিষ্যতে ময়নাদ্বীপে যাওয়া থেকে, হোসেন মিয়ার কবল থেকে তার পরিত্রাণ নেই। অর্থাৎ ময়নাদ্বীপে না যাওয়া পর্যন্ত হোসেন মিয়া তাকে রেহাই দেবে না। বাধ্য হয়ে কুবের হোসেনের প্রস্তাব মতো সেই রাতেই ময়নাদ্বীপে যেতে সম্মতি দেয়। কুবের জানে, নিজের অবর্তমানে হোসেন মিয়াই তার পরিবারের দেখভাল করবে, অথবা সময় বুঝে তাদের ময়নাদ্বীপে পাঠিয়ে দেবে। অসহায় কুবের এই অনিবার্য পরিণতিকে তাই বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে। চিরশান্ত, নিরীহ, পতিপ্রাণা পঙ্গু স্ত্রী মালা, কয়টি সন্তান, সংসার সবকিছু ফেলে ভিনদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পা বাড়িয়েছে। সঙ্গী হয়েছে কপিলা। স্বামী, সংসার থাকা সত্ত্বেও মেয়েটির সহজ-স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল ভগ্নিপতিকে ঘিরে। সেই আরাধ্য প্রিয় মানুষটির সমূহ বিপদে কপিলা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ থাকতে পারে নি। মধ্যরাতের আঁধার গলিয়ে একাকী ছুটে এসেছে নদীর ঘাটে। অবশেষে হোসেন মিয়ার পরামর্শে কুবেরের যখন ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে, তখন সেও নিজের সবকিছু ফেলে নিঃসঙ্গ কুবেরকে সঙ্গ দেয়াই বড় মনে করেছে। বুক ফেটে বেরিয়ে এসেছে আকুতি, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' এই একটি কথার মধ্য দিয়ে কপিলার অবরুদ্ধ হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা-কান্না যেন বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। একে নিছক প্রেমের গল্প বলা যায় না। মূলত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিত্যপীড়িত দুটি অসহায় মানব-মানবীর অব্যক্ত মনের কথাই যেন একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। একরকম ঔদাসীন্যের সঙ্গে কুবেরও 'হ' বলে সম্মতি দিয়েছে। 'কপিলা চলুক সঙ্গে! একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।'

মূলত 'পদ্মানদীর মাঝি' কেতুপুর এলাকার জেলে-মাঝিদের যাপিত জীবনের বাস্তব উপাখ্যান। তাদের জীবনের দুর্বিনীত সীমাহীন দারিদ্র্য কোনো দিন দূর হবার নয়। তাদের ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দনও চিরস্থায়ী। অন্তহীন সারল্যের সঙ্গে নীচুস্তরের চালাকি, পরস্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভরতা, অন্ধ অন্তর্বিশ্বাসের সঙ্গে স্ব-স্ব ধর্মের সমন্বিতি প্রভৃতি নিয়ে এখানে তারা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একাকার হয়ে বসবাস করে। জীবন-জীবিকায় সবাই এক ও অভিন্ন। কেবল গ্রামের তথাকথিত ভদ্র মানুষগুলো তাদের দূরে ঠেলে রাখে। বঞ্চনা করে সমাজের উচ্চবিত্তরা। শোষণ করে আড়ৎদার-মহাজন। অন্যদিকে উন্মত্ত প্রকৃতি তাদের ধ্বংস করতে চায়। কালবৈশাখীর করাল ছোবল তাদের জীবন এলোমেলো করে। বর্ষার জল, শীতের তীব্রতায় তারা দিশেহারা হয়। রোগে-শোকে হয় বিপর্যস্ত। উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ হোসেন মিয়ার আপাতমধুর, অতি আন্তরিকতার আড়ালে স্বার্থ সিদ্ধির উঁচিয়ে ধরা যে খড়্গ, তারই নিচে আত্মবলি দেয় কুবের, রাসুসহ কেতুপুর এলাকার অনেক মানুষ।

সমরেশ বসুর (১৯২৪-৮৮) 'গঙ্গা' উপন্যাসকে বাংলার জেলেজীবনের এক অনবদ্য স্মারক বলা যায়। এটি নদীমাতৃক বঙ্গভূমির তৃতীয় জেলেজীবন ও নদী-কেন্দ্রিক উপন্যাস। গঙ্গা'র ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত নব অভিজ্ঞতামণ্ডিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে এক স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমরেশকে। উপন্যাসে লেখক গঙ্গানদীর জেলেদের জীবন-জীবিকার টানাপোড়েন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আশাভঙ্গের বেদনা, মানবিক প্রেম প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে, চরিত্রগুলোর আঞ্চলিক ভূমিজ ভাষার ব্যবহারে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'গঙ্গা' শৈল্পিক নিপুণতায় ভাস্বর হয়ে আছে বাংলা সাহিত্য জগতে।

গঙ্গা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাস। ব্যক্তিরূপে সে উপন্যাসের খরস্রোতের পটভূমিকায় এক বীর্যবান নায়ক হিসেবে স্থাপিত। পঙ্গু-পাংশু মধ্যবিত্ত নাগরিক মন্থরতার প্রতিক্রিয়ায় সে ক্ষিপ্র, উচ্ছল, দীপ্তিমান। সমাজের অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। তথাকথিত সমাজপতিদের নিয়ম-নীতির প্রতি সে দেখায় বৃদ্ধাঙ্গুলি, মহাজনদের প্রতি করে ভ্রুকুটি। তার সারল্য সাধুতা আর নির্মোহ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আমাদের ভালবাসা আদায় করে। নিজ পেশা-শ্রেণির শ্রমজীবী জেলেদের অধিকার রক্ষায় বিলাসের ভূমিকা এবং তাদের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ বিলাসকে অনন্যতা দিয়েছে। বিলাসের পরোপকারিতা, পরার্থপরতা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার বদলে সর্বজনচিন্তা, উপন্যাসের শুরুর দিকে না হলেও শেষের দিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও হিমির ভালবাসা ছাপিয়ে পিতা মৃত নিবারণের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে সাইদার হয়ে শাবর নিয়ে সমুদ্রযাত্রা আমাদের বিস্মিত করে। জীবনের স্বাভাবিক গতিময়তা শ্রমে-স্বেদে-শ্রান্তিতে অপরূপ, কিন্তু মানুষের আত্মতিক্রমণের আকাঙ্ক্ষা দুর্মর, সমরেশের এই জীবনতত্ত্বেরই মূর্ত প্রতীক বিলাস। বিলাসের এই সমুদ্রযাত্রার পরিণতি-সফলতা সম্বন্ধে আমরা জানি না। তবে যেতে চাওয়াই জীবনের বৈশিষ্ট্য। সেই চলিষ্ণুতায় বিলাস জীবন্ত এবং স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত।

গঙ্গা'তে জেলেদের জীবন-জীবিকার নানা দিক নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, আর্থিক দৈন্য, পেশাগত নানা সমস্যা, তাদের বিনোদন, বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির যেন বাঙময় চিত্রই আমরা প্রত্যক্ষ করি। জেলেরা বছরের একটি সময় নোনা গাঙে অর্থাৎ সমুদ্রে মাছ ধরে,

আবার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে উঠে আসে মিঠেগাঙে গঙ্গানদীতে। যে গঙ্গা 'অগতির গতি। যাবৎ জীবনের জীবন-মরণ ধন-দৌলত নিয়ে মা ঠাকরুন বসে আছেন গাঙের তলায়।' ঝাঁকে ঝাঁকে মাছমারাদের নৌকা আসে এদিক সেদিক দিয়ে। ধলতিতার ষাট বছর বয়সী পঞ্চানন মালো ওরফে পাঁচুকেও বর্ষায় গঙ্গায় আসতে হয়। এক দঙ্গল বুভুক্ষু মুখের অন্ন যোগাড়ের ভার তার কাঁধে। নিজের দেড়গণ্ডা 'কুচো', বড়ভাইয়ের একগণ্ডা। বড়ভাই নিবারণ দাস আজ সাত বছর হলো মারা গেছে। নিবারণ দাস ছিল সাইদার। টানের মৌসুমে দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটি নৌকা নিয়ে সকলের হয়ে সর্দারি করে দক্ষিণে অর্থাৎ সমুদ্রে যেত মাছ ধরতে। সুন্দরবনের বাঘ, বনদস্যু, উত্তাল সমুদ্র প্রভৃতির কবলে পড়ে ফি-বছর দু'একজন মারা পড়ে জেলেদের। তবে বড় ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কোনো দিন কোনো বিপদে পড়ে নি পাঁচু, সব বিপদ-আপদ নিবারণ মাথায় করে আগলেছে। গুণিন মানুষ। সব অন্ধিসন্ধি জানা ছিল তার। কিন্তু এমন গুণিন ভাইটিকেও অপদেবতা ছাড়ে নি। সে বছর অগ্রহায়ণে যাত্রার শুভক্ষণ শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে নিজের ও অনুজের প্রসব বেদনায় কাতর দুই বউকে রেখেই পাঁচুকে নিয়ে নিবারণ সাইদার রাইমঙ্গল নদীতে তার জন্য অপেক্ষমান আঠারো গণ্ডা নৌকার শাবরে দশকুড়ি জেলে নিয়ে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে। তিন মাস মাছ ধরে কমপক্ষে মাস ছয়েকের খোরাক যোগাড় করতে হবে তাদের। কিন্তু দাদাকে দক্ষিণেই রেখে আসতে হলো। অগ্রহায়ণের এক দুর্যোগময় দিনে পাটাজাল নিয়ে খেপ দিতে চকভাঙ্গা বাটা মাছের ঝাঁকের পেছনে একাকী নৌকা নিয়ে ছুটতে ছুটতে কোথায়, কোন মোহনায় যেন হারিয়ে গেল নিবারণ।

পুরো শুকনো মৌসুম সমুদ্রের সময়। নোনা জলের সুদিন। এ সময় জেলেদের মন্বন্তর চলে। 'পোষ-পোড়া', 'চৈত-টোটা' আরো কত কী। বাধ্য হয়ে তাদের সাই হয়ে সমুদ্রে যেতে হয়। সেখানেও নানা বিপদ। জেলেরা টাকার খোঁজে মাছের আশায় নৌকায় বসে জাল ফেলে, আর জেলেদের খোঁজে দক্ষিণ রায় মহাশয় হোগলা-হেঁতাল-গোলপাতার গহনে বসে থাকেন ওঁত পেতে। পাশাপাশি ঘাপটি মেরে ফেরে আর এক দল। বড় শেয়ালের রাজ্যে বিনা খাজনায় মালিকানা করে এরা। এদের কবলেও একবার পড়েছিল পাঁচুরা। দাদা নিবারণ চুনুরি বশিরকে নিয়ে অন্যদের সহায়তায় কৌশলে শাবরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাত ডাকাতকে বেঁধে ফেলে। সুঁদুরী গাছে লুকিয়ে থাকা অন্য ডাকাতরা আর তাদের আক্রমণ করতে সাহস করে নি। এভাবে সাইদার হিসেবে নিজের কাছে রাখা আট হাজার টাকা আর গোটা সাইকে রক্ষা করেছিল নিবারণ। তবে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বছর পূর্বে। তা ছিল খুলনার ওদিককার পাটাজালের বড় আকারের সাই। ছত্রিশ গণ্ডা নৌকা আর নৌকা পিছু তিনজন করে মাঝি। তার মধ্যে কুড়ি গণ্ডা গিয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে। মাছের নেশায় বিভোর হয়ে পেল্লায় মাছের চকের পিছু নিয়েছিল তারা। কিন্তু একটাও আর ফিরে আসে নি। মাছের চক ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানুষের চক। মহাসমুদ্রের মহাক্ষুধা এমন রুদ্ররূপে মাছমারাদের ঘরে আর দেখা দেয় নি।

> এখনও যারা চকের পেছন নেয়, তাদের একবার মনে পড়ে বোধহয় সেই কথা। কান পাতলে শোনা যায় নাকি সেই অগুন্তি মাছমারাদের নিদেন কান্না।
>
> শোনা যায় বইকী। ঘোর নিশিতে সাইয়ের জেলেরা যখন ঘুমোয় ছইয়ের মুখছাটের কাছে, আধখানা মাদুরে শুয়ে আর আধখানায় গা ঢেকে, তখন সুঁদুরী গাছের বাতাসে, দূর সমুদ্রের বুকে শোনা যায় সে কান্না। অচেতন ঘুমের মধ্যে তখন লাগে নিশির ঘোর।
>
> তারা তোমার মতোই বউ-ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি রেখে এসেছিল ঘরে। বলে এসেছিল অনেক কথা। ঋণ শোধ করবে মহাজনের, ভাঙা ঘর সারবে, চাওয়া-পাওয়া মেটাবে ঘরের মানুষের, বিয়ে দেবে ছেলেমেয়েদের। কত জনার কত ভাবনা, কত আশা। ঠিক তোমার মতো।[৪]

সকলেই জানে যারা সমুদ্রে এসে মৃত্যুবরণ করে, তারা নানা রূপ ধারণ করে বাস করে এখানে। তাদের মায়া ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মায়বীরা নানা বেশে ডাকে মাছমারাদের। কখন কোন বেশে এসে ডাকবে বলা যায় না। কখনো পানসা চক হয়ে লোভ দেখাবে, কখনো ইলিশের চক হয়ে ডেকে নিয়ে যাবে। তবে দলের মধ্যে থাকে গুণিন, যে জেগে বসে পাহারা দেয়, বিপদে রক্ষা করে।

দাদার বড় ছেলে বিলাসকে সঙ্গে এনেছে পাঁচু। বাইশ বছর বয়সী তেঁতুলতলার বিলাস অর্থাৎ তেঁতলে বিলেস। ও যেন দ্বিতীয় নিবারণ মালো। হুবহু বাবার মতো দেখতে। কুচকুচে কালো রঙ, পেটানো শরীর। অসীম সাহসী। কেবল চেহারায় নয়, কাজ-কর্মেও বিলাস পিতার মতোই দড়ো। এরই মধ্যে সে আকাশ-বাতাস চিনেছে, মেঘের অবস্থা, জলের লীলা বুঝেছে, গোন-কোটাল ধরতে শিখেছে। সাইদার বাবার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই বিলাসের মধ্যে ফুটে উঠছে। বাবার মৃত্যুর পর সে মাছ ধরায় খুড়োকে সাহায্য করে। প্রতিবছর এ সময় খুড়োর সঙ্গে গঙ্গায় আসে। আসতেই হয়। সংসার চালাতে মহাজনের কাছে ঋণ করতে হয়। গত মাঘে তাদের নৌকা বাঁধা পড়েছিল। আষাঢ়ের অর্ধেক যাওয়ার পর এতদিন পর আবার নতুন মুচলেকা দিয়ে নৌকা ছাড়ানো হলো। বিগত পাঁচ বছর ধরে ফি-বছরই নৌকা বাঁধা পড়ছে। চক্রাকারে বাড়ছে দেনা। এ বছর হয়তো দেনা শোধ হবে। কিন্তু গঙ্গায় ধরা মাছে কেবল কয়েক মাসের খোরাকই জোটে, মহাজনের দেনা শোধ হয় না। তবুও আসতে হবে। যার নৌকা নেই, মহাজনের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়েও সে আসবে। কেননা, যদি দেয় তো গঙ্গাই দেবে হাত ভরে। বিশেষ করে মাছের রাজা ইলিশ এ সময় সমুদ্রের নোনা জল ছেড়ে গঙ্গার ঘোলা মিঠে জলে ডিম পাড়ার জন্য উঠে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। মাছ মারতে জানে বিলাস। অনেক কিছুই সে জানে। স্বজনদের নিষেধ সত্ত্বেও

এরই মধ্যে দু'বার সমুদ্র ঘুরে এসেছে। শহরের প্রতিও তার বড্ড টান। এলাকার চাষীদের সঙ্গে পালিয়ে এসে দু'বার কলকাতা দেখে গেছে। বিলাসকে সবাই কমবেশি চেনে, জানে। যেমন রগচটা, তেমন গোঁয়ার। গায়ে অসুরের শক্তি। পুরোখোঁড়গাছির কেদমে পাঁচুকে কাত করে গত বছর 'বাছাড়' হয়েছিল বিলাস।

বড় ভয় হয় পাঁচুর ভাইপোকে নিয়ে। বিলাস গুরু-সাধু মানে না, বাপ-খুড়ো মানে না, পাঁজি-পুঁথি শাস্ত্র বিশ্বাস করে না, মাছমারাদের চৌদ্দপুরুষের ধার ধারে না, মহাজনের কাছে গিয়ে বিনম্রভাবে টাকা চাইতে জানে না, স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কথা বলতে জানে না, প্রতিযোগিতায় হারিয়ে কেদমে পাঁচুর মতো পিতৃতুল্য মানুষের মুখ কালো করতে সংকোচ করে না, অমর্তের জাঁহাবাজ বউয়ের খপ্পরে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে না। এমন বেয়াড়া খাপছাড়া ছেলের উপর কীভাবে ভরসা করা যেতে পারে? এত বড় সংসার কে দেখবে? নিজের বড় ছেলের বিলাসের সঙ্গে নৌকায় আসতে আরও বছর দু'য়েক লাগবে। এক ফোঁটা আবাদী জমি তাদের নেই যে, চাষ-আবাদ করে দিন গোজরাবে। জেলেদের অনেকেই ইদানীং মাছধরা বাদ দিয়ে চাষ-আবাদ ধরেছে নিশ্চিত জীবিকার আশায়। জলের জীবিকায় বড়ই সংশয়। মা গঙ্গার দয়া হলে ভালো, নির্দয় হলে তার সব জল ছেঁকে তুললেও কিছু মেলে না। তবুও মীনের রাজ্যে চলাফেরার জন্যই তাদের জন্ম। মাছ ধরেই যে তাদের বাঁচতে হবে। বিলাসকে নিয়ে একটু জমির স্বপ্ন দেখেছিল পাঁচু। সেই বাঁধা সুখের ঠিকানার আশায় গত পাঁচ বছর ধরে এই গঙ্গায় আসে বিলাসকে নিয়ে। কিন্তু কয়েক মাসের খোরাকি নিয়েই ফিরে যেতে হয়েছে তাদের। মা গঙ্গা বেশি কিছু দেন নি যে, তা দিয়ে একটুখানি জমির বন্দোবস্ত করা যায়।

বিলাস এক বিচিত্র ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে পাঁচুর অন্তরে। ওর বন্ধু সয়ারামের ভাষ্য মতে, কেমন ভাববিভ্রম ঘটেছে বিলাসের। চলে, ফেরে, বলে, আবার চুপ মেরে যায়। এদিক সেদিক কী যেন লক্ষ্য করে। হাত-পা ঝাড়া দেয়। তার মন দিবানিশি কেমন যেন 'ফসফস' করে। বুক বড় খালি-খালি মনে হয়, উথাল-পাথাল করে। পাঁচুও লক্ষ্য করে ভাইপোর এমন অসংলগ্ন আচরণ। তার উপর যখন বিলাস গান গায়,

না দেখে তোমারে আমার নয়নে নাই সুখ-হে / বড় উথালি পাথালি আমার বুক।
টানাছাঁদি টেনে চলি পাথালি লৌকোর বুক-হে / ওই আওড়ের ঘূর্ণি-জলে দেখব তোমার মুখ
বড় উথালি পাথালি আমার বুক। / তোমারে না পেয়ে হিদে বড়ই অসুখ-হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।[৫]

তবে কি অমর্তের বউয়ের কথা ভেবে বিলাসের এমন অবস্থা? শক্তপোক্ত জোয়ান ছেলে, বলা তো যায় না। কিন্তু সয়ারামের কাছে পাঁচু যা শুনেছে, তাতে সে কথা সত্যি নয়। অমর্তের বউয়ের প্রতি বিলাসের কোনো আকর্ষণ নেই। ওর ভালবাসার কাঙ্গাল পাড়ার গামলি পাঁচির উপরও তার কোনো টান নেই। ফলকথা, কোনো মেয়েমানুষের উপরই ওর আসক্তি জন্মায় নি। তাহলে আসক্তি কিসের উপর? কেন বিলাসের মন দিবানিশি উথাল-পাথাল করে? সব কিছু কি তাহলে সমুদ্রের জন্য? সমুদ্রের প্রতি দাদা নিবারণের আসক্তি টের পেত পাঁচু। বিশেষ করে যেবার মা গঙ্গা নির্দয় হতেন, সেবার এই গঙ্গাতে নৌকার গলুইয়ে বসে পাঁচু দেখত, কাঁড়ারে বসে গালে হাত দিয়ে দাদা তার চেয়ে রয়েছে দক্ষিণে। বিলাসও কি দক্ষিণের ডাক শুনতে পায়? কেন সে গায়–

আমার ডাক পড়েছে সাগরে / ঠাকুর, আমার যেতে মন করে।
আমার পরান বড় উদাস হে / আমি যাব সাগরে।
ঘরে নাই ভাত-পানি / পরনে নাই ছেঁড়া কানি
পানসা সাই নে' আমি যাব সাগরে।[৬]

একবার সমুদ্র যাকে ধরে সে তো স্থির থাকতে পারে না। এরই মধ্যে দু'বার সমুদ্র ঘুরে এসেছে ও। কিন্তু বিলাস দক্ষিণে যাক, তা পাঁচুর কাম্য নয়। ওর বাবা হারিয়ে গেছে সেখানে গিয়ে। টাকির ঠাকুর মশায় রীতিমতো আঁকজোক কষে, গণনা করে বংশের আর কাউকে সমুদ্রে পাঠাতে নিষেধ করেছেন পাঁচুকে।

জেলেরা গঙ্গার বুকে রাত জেগে মাছ ধরে। আর তাদের ঘরে জাগে বউ, ছেলে-মেয়ে, মায়েরা। কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো ছেলে কোন অকূলে ভেসে বেড়ায়। যাবৎ সংসার যখন ঘুমায়, তখন তারা নির্ঘুম চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে জেগে থাকে। বউ তার ঘুমন্ত সন্তান বুকে নিয়ে জাগে। অন্ধকারে দু'চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে। এ জাগরণ বিধির বিধানে নয়; পোড়া প্রাণের বিধানে। নদীতে পুবের শাওটার ঝড় বয়। বউ একা ঘরে শুয়ে বুকে দীর্ঘশ্বাস চেপে কেবল প্রহর গোনে। বৃষ্টিতে ভেজে মাছমারা, বউ অন্ধকার ঘরে থেকে আঁচলের ঢাকা দেয়। যখন মীনচক্ষু উত্তাল তরঙ্গবেশে, ঘূর্ণির ছদ্মবেশে, ঝঞ্ঝার রুদ্র দাপটে ঘিরে ধরে মাছমারাকে, তখন ঘরে জাগে বউয়ের সতর্ক দৃষ্টি। আষাঢ় থেকে আশ্বিন কার্তিক পর্যন্তই

গঙ্গায় মাছ ধরা চলে, এর পর জলে ধরে টান। জেলেরা ফিরে এসে দক্ষিণে যাবার প্রস্তুতি নেয়। বউয়েরা রাতভর জেগে ছেঁড়া জাল সারে, নতুন জাল বোনে। একদিন সাইদারের ডাকে গাঙ-নদী, খাল-বিলের দিন কাটিয়ে জেলেরা আবারও রওনা দেয় সাগরের উদ্দেশ্যে।

> বউ জাগে আবার। সতর্ক চক্ষু তার জাগে সমুদ্রে। নীলাম্বুধি অন্ধকারের বুকে, শাবরে আনাচে কানাচে, মাছের চকের পিছনে পিছনে, বনের অদৃশ্য দানোর সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ রায়ের পায়ে পায়ে, মা বনবিবির আঁচলে জাগে তার চোখ। আর তার বিনিদ্র আত্মা মাথা কোটে মাছের দেবতা খোকাঠাকুরের পায়ে। বলে, হে দক্ষিণ রায়, তোমার খাড়া নজর দূরে রাখো। মা বনবিবি, মাছমারার শাবরে তোমার দৃষ্টি দিয়ো না। খোকাঠাকুর, জাল ভরে, খোল ভরে মাছ দাও। তুমিই মাছমারার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তুমি দিলে, আমি আমার সোয়ামির হাসিমুখ দেখব, ঘরে আমার সোহাগের বান ডাকবে। আমার ছায়েরা হেসে খেলে বেড়াবে, আমার হাঁড়ি ভরে থাকবে। নতুন সুতো আসবে, নতুন জাল বুনব আমি। আমি পুজো দেব তোমাদের সকলের পায়ে।[৭]

ফাল্গুন শুরু হতেই আসে দখিনে বাঁওড়। সমুদ্র ফুঁসে উঠে। তার ফোঁসানি-গর্জানি দেখে মৃত্যুভয়ে মাছমারারা ফিরে আসে। চৈত-টোটা আর মহাজনের বকেয়া সুদের জেরে সমুদ্রে পাওয়া অর্থ দ্রুত ফুরিয়ে যায়। মাছমারা দৌড়ায় শুকিয়ে যাওয়া বাঁওড়-বিলে, খালে। পুরনো পাঁক-জল ঘেঁটে যা পাওয়া যায়, তাতে এক বেলার অন্ন জোটে না। মহাজনের নিকট বাঁধা পড়ে জাল-নৌকা, বসতভিটা সবই। এবার বউ রাত জেগে বসে ভাবে, রাত পোহালে কী ফোটাবে, স্বামী-সন্তানের সামনে কী বেড়ে দেবে? নিরুপায় মাছমারা ভেক ধরে, সন্ন্যাস নেয় গাজনের। 'জয় বাবা বুড়ো শিবেরো লাগি...' বলে হাঁক ছাড়ে। যে হাঁকের আড়ালে মাছমারার ক্ষিদের কান্না কেউ শুনতে পায় না। কিংবা অকারণে ঘরের বউয়ের গায়ে হাত তোলে। বউ রাত কাটায় কেঁদে কেঁদে। এভাবে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অতিক্রান্ত হয়। নতুন জল আসে। আষাঢ়ে নামে ঢল। বউ রাত জেগে আবার জাল বোনে, জাল সারে। মাছমারার বৌয়ের রাত এভাবেই কেঁদে-জেগে কাটে বারোটি মাস।

কোলকাতার বাগবাজারে একত্রিত হওয়া সাতটি নৌকা নিয়ে পাঁচুরা উত্তরে যাত্রা করে। পথে পাঁচুর সঙ্গে কথা বলে পুরোখোঁড়গাছির অনন্ত। মহাজনের কাছে তার নৌকা বাঁধা পড়েছিল। আসল তো আসল, সুদের একটি টাকাও মহাজন ছাড়তে চায় নি। নৌকার সঙ্গে বাঁধাছাঁদি জালটাও দিতে হয়েছিল। পালমশাই বলে, 'বুড়ো হয়েছ অনন্ত, জালখানি রেখে দেও আমার কাছে। যদি বর্ষায় গঙ্গায় না যেতে পারো, মরে ধরে যাও, তবে লৌকোয় আর জালে আমার কিছু শোধ হয়ে যাবে।' তিনশো টাকার দায়ে প্রায় হাজার টাকার নৌকা-জাল নিয়ে বলেছে, কিছু শোধ হয়ে যাবে। পাঁচুরও হাড়ে হাড়ে পাকিয়ে আছে মহাজনের ঋণ। তাদেরও পাটাজালখান রয়েছে বাঁধা। দাদা নিবারণ সাইদারের সমুদ্রে মাছ ধরার পাটাজাল। বাঁধা দিয়ে ভেবেছিল, বিলাসের সমুদ্রে যাওয়ার পথ বন্ধ হল, আবার কিছু টাকার দায়ও মিটল। কিন্তু বিলাসকে আটকানো যায় নি। অন্যের নৌকায় কাজ নিয়ে সে চলে গেছে সমুদ্রে। আর বছরখানেক অপেক্ষা করে জালটা হয়তো বিক্রি করে দেবে মহাজন। অনেক সময় বৌ-ঝিদের বালা-চুড়ি বাঁধা রেখেও টাকা নিতে হয় মাছমারাদের।

মাছমারাদের সবচাইতে খারাপ সময় যায় চৈত-টোটায়। নদী-খাল, বিল-বাঁওড় জলশূন্য হয়ে পড়ে। ঐদিকে সমুদ্র ধাক্কা মারে চৈত হ্যাঁকায়। মাছমারারা বিবেক বিসর্জন দিয়ে ঘরে-বাইরে মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, ঋণ করে নেশা-ভাঙ করে। কেউবা গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে অনাহারে বিবাগি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেসব মাছমারাদের নৌকা নেই, জাল নেই, তাদের কারো কারো বউকে ধরে পেতনিতে। গুণিন-ওঝার প্রশ্নের উত্তরে নাকি সুরে স্বামীকে শুনিয়ে বলে, 'ভাতার লৌকো করুক, মহাজনের কাছে বাঁধা খালাস করুক, জাল করুক, ভগবতীর মিঠে জলে গে' মাছ ধরুক, আমার কী!' ওঝা পেতনি তাড়াতে তার পিঠে যতই আঘাত করে, ততই চেঁচায়, 'যাব না যাব না। মাছ নেই, জল নেই, জাল নেই, লৌকো নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, পান নেই। যাব না যাব না যাব না।' কেউ আবার অন্যের জমা নেয়া পুকুরে, বিল-বাঁওড়ে চুরি করে জাল ফেলে রাতের আঁধারে। ধরা পড়ে পঞ্চায়েতের সামনে অপরাধ স্বীকার করে। পিটুনি খায়, আবার জরিমানাও দেয়। অপমানে দুঃখে মাছমারা কেঁদে ফেলে। হাবরে মাছ চুরি করতে গিয়ে প্রাণে মরেছিল অভয় মালো। অন্ধকারে কোত্থেকে ছুটে এসে শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করেছিল মস্ত একখানি ধারালো ট্যাঁটা। দুঃসময়ে কলঙ্ক ছায়া ফেলে। নিবারণের মতো মানুষও শেষাবধি সারাপুলের হাবরে গেছে লুকিয়ে মাছ ধরতে। কোনোদিন ধরা পড়ে নি বলে যদিও দুঃখ হয় নি, কিন্তু একফোঁটা সুখ যে মেলে নি তা স্পষ্টত বলা যায়। চোলাই রস আর বাজারেমেয়েতে মাতামাতি করে ফিরে এসেছে নিবারণ। চৈত্রমাস সমুদ্র গঙ্গা কোনোটিরই নয়। সময় বুঝে মহাজনের মনও কঠিন হয়ে যায়। নিবারণের মতো সাইদারকেও মানতে চায় না। বড় অসম্মানজনক কথা শোনায় মাছমারাদের। বলে, 'তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুখের কথা বলব। বউয়ের শরীলে কাপড়-চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।' জলে মাছ নেই, কিন্তু ঘরে মেয়েমানুষ আছে। মহাজন উশুল চায়।

বিলাস প্রথম জাল ফেলে গঙ্গায়। একটি ভোলা, ছোট-বড় দু'টি ইলিশ, আর কিছু খয়রা উঠে টানাছাঁদি জালে। প্রথম মাছ নগদে বিক্রি করতে হবে। তবে অন্য কোনো ফড়ে-পাইকেরের নিকট বেঁচে না পাঁচু। বহু বছরের চেনা-জানা ফড়েনি দামিনীকে দেবে। বাজারে মাছ বিক্রি করে বিস্তর টাকার মালিক হয়েছে দামিনী। পাঁচুর বাবার লেন-দেন ছিল দামিনীর মায়ের সঙ্গে। দাদা নিবারণও পঁচিশ বছর পূর্ব থেকে তার সঙ্গে লেনদেন করে এসেছে, বিশ্বাস করেছে। টাকা ধারের কথা দামিনীকে কখনো বলতে হতো না। অবশ্য বুড়ো হয়ে গেছে বলে হালে সে ব্যবসায় থেকে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিয়েছে। এখন সবকিছু দেখাশোনা করে তার নাতিন হিমি। তার সঙ্গেই পাঁচুদের লেনদেন করতে হবে। হিমিকে দিতে হবে মাছ, হিমি দেবে টাকা। আর, মেয়েটা যে আর পাঁচটা পাইকেরের মতো নয়, তাও পাঁচুরা বুঝে গেছে ইতোমধ্যে। দিদিমার আড়াই টাকা দর দেবার প্রস্তাবে সে পৌনে তিন টাকা করে দিয়ে ওদের মাছ কিনে নিয়েছে। অবশ্য দাম বেশি দিয়েছে বলেই নয়, বেশি না দিলেও ওদেরই মাছ দেবে। পাঁচু ফিরিয়ে দেয় আরেক ফড়েনি আতরবালাকে, পশ্চিম পারের রসিক ও অন্যান্য ফড়ে-পাইকেরকে। টাকা ধারে বলেই নয়, কোন এক আন্তরিকতার বাঁধনে দামিনীদের সঙ্গে পাঁচুরা জড়িয়ে আছে বহুকাল থেকে।

গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে এখানকার ফড়ে-পাইকেরদের কাছেও মাছ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেনা করে জেলেরা। জলের তলের মাছের নিশ্চয়তা নেই। মাছ না পেলে আর এলাকার মহাজনের নিকট থেকে নিয়ে আসা রসদ ফুরিয়ে গেলে বাধ্য হয়ে তাদের এ কাজ করতে হয়। ফলে মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে সবাই পাওনাদার পাইকের-মহাজনের কাছে বাঁধা থাকে। প্রয়োজন হলেও তারা অন্যের কাছে নগদে মাছ বিক্রি করতে পারে না, মহাজনকে দিয়ে পাওনা টাকার শোধ দেয়। মহাজনকে ছাপিয়ে অন্য কারো কাছে নগদ টাকার জন্য কেউ যদি মাছ বিক্রি করে আর মহাজন কোনোভাবে তা জানতে পারে তাহলেই বিপদ। তিনদিন পরে খাবার শেষ হয়ে যাবে ভেবে গঞ্জের মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের গত সনের দেনা শোধ না করেই কেদমে পাঁচু আতরবালাকে নগদে মাছ দিয়েছিল। ঠাকুর মশাই এ জন্য শালা বলে, জাত তুলে গালাগাল করে তাকে। গালি শুনে কেদমের ছেলেরাসহ অন্যরা চুপ মেরে থাকলেও প্রতিবাদ করে বিলাস। উদ্ভূত ঘটনায় আর নিজের জোয়ান ছেলেদের নিরুত্তাপ নিষ্ক্রিয় থাকায় বড় ছেলে পরানের পিঠে এক কিল মেরে রাগে অপমানে কেদমে গিয়ে ছইয়ের ভেতর লুকায়। মাছমারাদের এমন অপমান-লাঞ্ছনা নতুন নয়। প্রতিবারই এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় অনেককে। ঠিক বিপরীত চিত্র সমুদ্রের। সেখানে জগদ্বেড় জাল দিয়ে মণ-কে-মণ মাছ উঠে, কিন্তু মূল্য পাওয়া যায় না। আড়তদার, চালানদাররা বেশি মাছ দেখে 'কাট' মেরে থাকে। দাম নামানোর কৌশল খোঁজে। ত্রিশ টাকা মণের মাছ কোনোদিন নামে পাঁচ টাকায়। অকূল পাথারে সঁপে দেয়া প্রাণের বিনিময়ে, ঘামঝরা অক্লান্ত পরিশ্রমে আহরিত মাছ পচনের ভয়ে মাছমারা ওতেই বিক্রি করতে রাজি হয়। ওদের মাছ পেলেও জ্বালা, না পেলেও জ্বালা। এই জ্বালাময় জীবনের ঘানি টেনে বেড়ানোই যে মাছমারাদের নিয়তি।

হিমি মাছ নিতে পাঁচুদের নৌকায় আসে। কালো কুচকুচে নাগচোখে বিলাস তাকায় হিমির দিকে। হিমিও বিদ্যুৎ চিকচিকে দৃষ্টি দিয়ে বিলাসকে দেখে। চোখ-মুখের ভাবে যেন সাপখেলানো মন্ত্রের উত্তেজনা। রাগে ভয়ে হাতের দাঁড়িপাল্লা কাঁপে পাঁচুর। হিমি বিলাসকে মাছের চুপড়ি উপরে দিয়ে আসতে অনুরোধ করলে বিলাস সেটি দিয়ে আসে। অপলক চোখে শহুরে পাইকেরনিকে দেখতে থাকে, কথা বলে। দামিনীর নাতিনের প্রতি হারামজাদাটার মন বুঝি ঝুঁকে গেছে। 'অপঘাতে মারে যে মাছমারাকে, সেই ডাকিনী চেপেছে শোরের ঘাড়ে!' কিন্তু বিলাস তো লক্ষপতি নয়, মাছমারার ছেলে। পাঁচু দামিনীর মুখে শুনেছে, গঞ্জের বাস-লরির বড় ব্যবসায়ী, লক্ষপতি পাত্রের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছে হিমি। বিলাস নৌকায় ফিরে আসতেই পাঁচু হুঙ্কার ছাড়ে, 'শহরের ফড়েনির সঙ্গে তুই পিরিত করতে এসেছিস, শোরের লাতি। শুনি, মনে তোমার সুখ নেই, বড় জ্বালা। আমি তোমার জ্বালা জুড়োবার কাল গুনছি, আর তুমি গাড়লের ভাইপো এখানে মন বসাচ্ছ, জুড়াবে বলে? মেয়ে মাগছিস রাঁড়ের?' বুক কেঁপে উঠে পাঁচুর। দাদা ফেরে নি সমুদ্র থেকে। বিলাসও বারবার সমুদ্রে যেতে চায়। বংশে যাদের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, সেই যাত্রায় বিলাসের টান। দাদার প্রাণে ছিল আগুন, বিলাসের ভেতরেও সেই আগুন দাউদাউ জ্বলে। মাছমারারা থাকে বউ নিয়ে ঘরের কোণে, বিলাস ছোটে ফড়েনির পেছনে। বাবার মতো সেও যদি পাপ করে ঘরে ফেরে! পাপের চাইতেও বড় যে ভয়, দামিনীর দাপুটে মেজাজি রায়বাঘিনী নাতিন বিলাসকে ভেড়া বানিয়ে রাখবে। দাদার মতো গুণিন হলে পাঁচু ওকে আজ গুণ দিয়ে বশ করে রাখত। মালোর ঘরে মালোর মেয়ে আসবে বউ হয়ে, শহুরে মাছবেচুনি ফড়েনিতে তাদের কাজ নেই। তবে বিলাসের জোয়ান কোটালের টান ফেরাতে পারে না পাঁচু। বুড়ি দামিনীও বিলাসের উপর নাতিনের আসক্তি লক্ষ্য করে শিউরে উঠে। সব আগুন নিভে যাওয়া বুকে সমুদ্রের ফড়েনি হবার বাসনা তারও হয়েছিল একদিন। বিলাসের বাবা নিবারণের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চেয়েছিল। বড় সর্বনাশা নেশা। সোনার পালঙ্কের চেয়ে, রাজভোগের চেয়ে ঐ নেশার টান যে অনেক বেশি। নাতিনকেও তার অমন নেশাতে ধরেছে। লক্ষ টাকার মানুষকে ফিরিয়ে, ঐশ্বর্য-সুখের প্রস্তাব পায়ে ঠেলে শেষে কি-না হিমি মন সঁপে বিলাসের মতো মাছমারার ব্যাটার হাতে।

বাঁধা সুখের ঠিকানা খোঁজা তো দূরের কথা, ঘর-গেরস্তিও বুঝি আর রক্ষা হয় না পাঁচুদের। আষাঢ় শেষে শ্রাবণ আসে, পানিতে তেমন মাছ নেই। মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে আসা টাকা বের করতে হয়। জোয়ান কোটালের মুখেই আগে নগদ টাকায় হাত পড়ে। কিছু ঋণ শোধ হয়েছিল দামিনীদের। ঘরে-বাইরে মাথাবোঝাই ঋণ এখনো বাকি। ওদিকে মহাজনের রক্তচক্ষু দপদপ করে জ্বলে পাঁচুর অন্তরে। সে যেন বলে, 'পাঁচু, সুদে-আসলে যা হয়েছে, তোমার ভিটের দামে সে ঋণ শোধ হবে না। ঐ ভিটেখানি ছাড়া আর তো তোমার কিছু নেই।' নামে বুঝি শাঙনে টোটা। শ্রাবণের মহা মন্বন্তর। গঙ্গায় মাছমারাদের এত বড় মন্বন্তর আর হয় না। গড়ানের পর গড়ান যায় বৃথা। বিলাস গড়ান মারে আর বলে, 'হতো যদি সমুদ্রে পাটা জালের ঘের, লৌকোর পুরো খোল বোঝাই হতো এতক্ষণে।' বড় অশান্ত হয়ে উঠে বিলাস। গড়ান মেরে শূন্য জাল তোলে আর দূর গঙ্গার জলে তাকিয়ে থাকে। অস্থির চিত্তে বুঝি দিন গোনে সমুদ্রে যাবার। খুড়োকে একদিন স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, গঙ্গায় তার মন মানছে না, সামনের টানের মৌসুমে সে সমুদ্রে যাবে। সমুদ্রে যেতে বারণ আছে, গেলে নিজের অকল্যাণ হবে, সংসার অকূলে ভাসবে– পাঁচুর এমন কথার জবাবে বিলাস বলে, 'আমার বাপ গেছে, তার বাপ গেছে, তুমি গেছ খুড়ো। মাছ মারি আমি, আমি সাগরে যাব।' পাঁচু চিৎকার করে, 'সকলের পাণ মুঠোয় নে সমুদ্রে যেতে চাস তুই? যাওয়াব তোকে আমি। তার আগে তোকে লড়তে হবে আমার সঙ্গে। দুজনের একটা নিকেশ হবে, তা পরে যা হবার হবে।'

গঙ্গায় এবার মাছের মহা আকাল পড়ে। তার টোটাহানা বুকে চাপে অদৃশ্য রাক্ষসী। জাগ্রত মরণদেবতা যেন হানা দেয় ঘরে ঘরে। রোদে পোড়া, জলে ভেজা শকুনের মতো মাছমারাদের শরীরে দেখা দেয় দগদগে ঘা, যার ব্যথায় জ্বর আসে। তার উপর ভয়ঙ্কর রক্তআমাশয় মহামারীরূপে ছোবল হেনে ওদের একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলে। উজান থেকে নেমে আসা দূষিত বানের জলে, রোদে, বৃষ্টিতে, আধাপেট খাওয়া শরীর পেরে উঠে না; মাথাচাড়া দিয়ে উঠে রোগ। মাছমারারা যে বার পেট ভরে খেতে পায়, সে বার রোগের আমদানি কম হয়। মাছ ধরা ছেড়ে পালানো শুরু করে অনেকেই। গঙ্গা যেন ওদের তাড়িয়ে দেয়। তবে পালাতে চেয়েও পালাতে পারে না ঠাণ্ডারাম। পালমশাইয়ের পাহাড় সমান পাওনা অনাদায় রেখেই ঘূর্ণি জলের টানে পড়ে নৌকাসহ জেটির সঙ্গে আটকে মৃত্যুবরণ করে দিনমান অভুক্ত দুর্বল ঠাণ্ডারাম। এ অঞ্চলের জেলেদের পাড়ার বাচ্চা-বুড়োরা শহরে গিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। পশ্চিম পারের জেলেরা সভা করে দল বেঁধে যায় সরকারের প্রতিনিধির কাছে। পুব পারের নিরুপায় জেলেরা চরায় মাটির বেদি পেতে আমরণ অনশন নেয়। ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে, 'মা, মাগো! কী অপরাধ আছে মাছমারাদের বল মা! আমাদের কী গতি হবে মা! কী আছে তোর গর্ভে এবার বল, নইলে উঠব না।' পশ্চিম পারের জেলেরা গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে বিশালাকার জগদ্দেড়ের বাঁধাছাঁদি জাল ফেলে, তাতে যদি মাছের নাগাল মেলে। এ জাল ফেললে সাংলো, টানাছাঁদি কোনো জালই ফেলার জায়গা থাকে না। এ জাল ডিঙিয়ে কোনো তল্লাটে মাছ যেতেও পারবে না, আসতেও পারবে না। অন্যরা প্রতিবাদ করে, তারা কোথায় জাল ফেলবে, যাবে কোথায়? মরতে মরতেও যেটুকু আশা নিয়ে বেঁচে আছে, সেটুকুও যে গলা টিপে মারতে চায়। বিলাস তার লোকজন নিয়ে ওপারের জেলেদের প্রতিরোধ ভেঙে বাঁধাছাঁদি খুলে ফেলতে যায়। জালের খুঁটোর কাছে থাকা রসিক প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলাসের উপর। রসিকের আঘাত সত্ত্বেও বিলাস প্রথমে জাল খুলে দেয়, তারপর তাকে জাপটে ধরে জলের মধ্যে ঠেসে ধরে। পাঁচুর চিৎকারে প্রাণে না মেরে অবশেষে ছেড়ে দেয় রসিককে। জেলেদের মারামারি নিয়ে বিকেলে বসে সভা। অনেক বাকবিতণ্ডা শেষে বিলাসদের পক্ষেই যায় রায়। বাঁধাছাঁদি কেবল টানের দিনে রাতের বেলা ফেলতে পারে। এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শাঙনে টোটার থাবা কিন্তু গুটায় না। রক্তের পিপাসা মেটে না তার। পাঁচু অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিলাস খুড়োকে উপরে গিয়ে ক'দিন বিশ্রাম নিতে বললেও শোনে না। নৌকা ছেড়ে, নৌকার হাল ছেড়ে পাঁচু কোথাও যেতে রাজি নয়। বেশির ভাগ সময় সাংলো নিয়ে বসে থাকে, যদিও বসে থাকতে কষ্ট হয়। এক সময় হাত থেকে সাংলো খসে পড়ে পাঁচুর, ঝুঁকে পড়ে জলের দিকে। তড়িতে ছুটে এসে খুড়োকে ধরে ফেলে বিলাস। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে আমাশয়ে। সুরহীন চাপা গলায় পাঁচু শোনায়, দক্ষিণ থেকে তার দাদা এসেছে, এসেছে সেসব মীন, যাদের সে হত্যা করেছে। আর, বাদার (সুন্দরবনের) মালোদের কালো কুচকুচে সেই প্রথম পুরুষের ছায়া যে বিলাসের মধ্যেই দেখছে পাঁচু। যে কি-না বহু যুগ পূর্বে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে এসে দক্ষিণ রায়ের রাজ্যে প্রবেশ করে তার চ্যালাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয় এবং মালোদের পত্তন করে। বিলাসের সমুদ্র যাত্রার কথায় সর্বক্ষণ আঁতকে উঠা পাঁচু এবার এক অবাক করা কথা শোনায়,

> মাছমারাকে কেউ যদি বিধেন দেয়, তুমি মাছ মেরো না, সে বিধেন মানা যায় না। বিলেস, তুই মাছমারা। তুই সমুদ্রে যাস টানের মরশুমে। ওটা মাছমারাদের জীবনের বিধেন। বাতাসের মুখে আমি এই কথাটা শুনি। .....তুই সাই নে যাবি বিলেস।[৮]

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে পাঁচুর চোখ। আরও অবাক করা কথা শোনায়, 'দামিনীর লাতিনের পাণখানি পোস্কার বলে বুইছি। ছুঁড়ি তোকে ভালবাসে। মানুষের জীবনে এমন হয়। দামিনী চেয়েছিল তোর বাবাকে, পায় নি। লাতিন পেয়েছে তোকে। মাছমারার ঘরে যদি মেয়েটা আসতে চায়, তবে নিস।

বিলেস–' বিলাসের গলা ধরে আসে। শক্তপ্রাণ বিলাস কেঁদে ফেলে। খুড়োকে নিয়ে উপরে উঠতে যায়। দামিনীর নিকট টাকা ধার করে চিকিৎসা করাতে চায়। কিন্তু পাঁচুর সময় নেই, সে যে ওপারের যাত্রায় তৈরি হয়েছে। বলে, 'বিলেস, এট্টা কথা বলি, মানুষ চিরকাল মাছ ধরবে। এ সোমসারে মানুষ মাছ-ভাত খাবে। তুই মাছ মারিস। জীবনে তাতে তোর কিছু বাদ পড়বে না।' পাঁচুর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে। যেন আওড়ে তলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। কিন্তু আবার যেন স্পষ্ট করে বলে,

> আমি এতদিন হালে বসেছি, এবার তুই বসবি বাপ। আমার আগে তোর বাবা বসতো। তার আগে আমার বাবা। .....আমার ছেলে, আগামী সনে তোর দাঁড় ধরবে। শাঙনে টোটার কথা বলিস তাকে। তুই টোটার শেষ দেখে যাস।' কথা বন্ধ হয়ে যায় পাঁচুর। কেবল ঠোঁট কাঁপতে থাকে।
>
> বোঠান, পেত্থম পোহরে শ্যাল ডাকছে এখন ধলতিতেয়, শুনতে পাচ্ছি গো। হুতোম প্যাঁচা ডেকে মরছে কেন, ঠাহর করতে পারছ না? কেন অমন দমকা দমকা বাতাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে বেড়ায়, অনুমান করতে পারছ না? কেন তোমার জায়ের হাত থেকে বাটিখানি পড়ে গেল, তাই ভেবে মরছ? ওই জানান দিচ্ছে। পাঁচু তোমাদের ছেড়ে যায়। বিলেস.. বা-বা বি-লে-স...[৯]

সদ্য মৃত খুড়োকে বুকের মধ্যে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে জোয়ারের উত্তাল ঢেউ থেকে নৌকা সামলাতে দু'হাতে হাল ধরল বিলাস। এই প্রথম তার হাল ধরা। সবাই মিলে দক্ষিণের শ্মশানে কয়দিন আগের ঠাণ্ডারামের মতোই সৎকার করল ধলতিতার পঞ্চানন মালোর।

অবশেষে মাছমারাদের উপর থেকে যেন শনির দশা কেটে যায়। ভাদ্রমাস আসার পর থেকে মাছের আনাগোনা শুরু হয় গঙ্গায়। বিলাস একদিনে সতের সের ইলিশ ধরল। পূর্ণিমার দিন ধরল সাঁইত্রিশ সের মাছ। দামিনীর মুখে হাসি আর ধরে না। কেঁদে আর বাঁচে না। কোথায় ছিল এত মাছ? কাকে খেয়ে এল? সমুদ্র উজাড় করে আসছে উজানি মাছ। মাছের পাইকারি দর একশ' থেকে পঞ্চাশে নেমে আসে যদিও, মাছমারারা তবু ক্ষান্ত হয় না। মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার দিন তো আর আসে নি। এলাকার মহাজনের পাওনা শোধ হয়। শোধ হয় গঞ্জের মহাজন আর ফড়ে-পাইকেরদের কাছ থেকে নেয়া টাকা। উপরন্তু তাদের কাছেই পাওনা জমে মাছমারাদের। এত মাছ, মাছমারাদের এত খুশি কেবল দেখে যেতে পারল না দু'জন। ভাদ্রের ভরা জলের দিকে তাকিয়ে সজল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেদমে পাঁচু।

হিমি অস্থির হয়ে উঠে, বারবার ছুটে আসে বিলাসের নৌকায়। আর কতদিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিলাস বলে, 'এই যে মহারানি, জোয়ান কোটাল যায়। ভরা কোটাল শেষ করি আগে।' হাসতে গিয়েও কেঁদে ফেলে হিমি। তারও যে ভরা কোটাল যায়। কিন্তু দেরি করা তো বিলাসের হাতে নয়। মা গঙ্গা এতদিন সাড়া দেয় নি, এখন দিচ্ছে পূর্ণ করে। তা না নিয়ে বিলাস যেতে পারে না। বাড়িতে মা-কাকির সঙ্গে দেখা করে সমুদ্রে যাবে সে টানের সময়। যেন ঘোর অন্ধকারে মিশে মহাসমুদ্র হয়ে যায় বিলাস। সেই বুকে ভেসে বেড়ায় হিমি। তারও যে সমুদ্রের টান লাগে, মহাপ্লাবন উঠে বুকে। সমুদ্রের মহাজন হতে মন চায়। নদী আর সমুদ্রের মর্জির উপর বাঁচে-মরে মাছমারারা। বড়ই অনিশ্চিত অকূলে ভাসা সেই জীবন। তা ছাড়া, নিজের অতীত ইতিহাস হিমিকে শোনায় বিলাস। যেখানে রয়েছে অমর্তের বউয়ের বিষের ছোবল, যার যাতনা আজও বয়ে বেড়ায় সে। হিমি বিলাসের মুখে হাত চাপা দেয়। বড় উৎকণ্ঠা আর ভয় নিয়ে বলে, 'কাকে কী বলছ তুমি? সোমসারে আমি তো পাপ-পুণ্যি বুঝি নে। তা হলে আমার পাপের যে ভরাডুবি হবে, ঢপ।' হিমিও নিজের জীবনের অনেক কথা বলে। তার জন্ম যেখানে, লোকে বলে সেটিই পাপের বড় স্থান। ছোট বয়স থেকেই দেখেছে, জীবনের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা। সেখানকার পাশ কাটিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারে নি হিমি, নিজেরও যে অনেক পাপ! বড় দাগা পেয়েছে জীবনে। সেখানকার জীবনের চতুর্দিকে কেবল যন্ত্রণা আর অপমান। বড় মিথ্যে আর ভণ্ডামি, মন নিয়ে জুয়াচুরি। প্রেম করতে চেয়েছে, চেয়ে ঘৃণা করেছে বেশি। একদিন সে মনের মানুষ ভেবে একজনের সঙ্গে গিয়েছিল, সেই লোকের ঠকা খেয়ে পালিয়ে এসেছে। আর তাই বিলাসের সঙ্গে অকূলে ভাসতে চায় হিমি, যদিও মনের ভয় কাটে না ঘরপোড়া গোরুর মতো। তবে এটুকু প্রত্যয় জন্মে, এখানে সংহারের মূর্তি যেমন ভয়ঙ্কর, ভালবাসাও তেমনি নিষ্কলঙ্ক, ছলনাহীন, উত্তাল। দু'জনেই ধোয়া-মোছা করে জীবনটাকে পরিচ্ছন্ন করতে একমত হয়।

হিমির অনুরোধে মাছমারাদের সাঁজার (গঙ্গাপূজা) কাটিয়ে, কার্তিকের 'চাকুন্দে-মাকুন্দে' দেখে অবশেষে বিলাস তৈরি হয় যাত্রার জন্য। দামিনী নাতিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে। হিমিও কাঁদে অনেকক্ষণ। তারপর নৌকায় উঠে বিলাসের পায়ের কাছে গিয়ে বসে। একসময় তার গোটা শরীর লেপ্টে যায় বিলাসের বলিষ্ঠ দু'টি জঙ্ঘায়। কবে সমুদ্রে যাবে জিজ্ঞেস করায় বিলাস জানায়, 'তোমাকে বাড়িতে রেখে, ধর্মসাক্ষী করে কণ্ঠিখানি বাঁধব তোমার গলায়। তা'পর অগানের মুখপাতেই যাব।' হিমির বুক আবার কেঁপে উঠে। নৌকা ততক্ষণে বাগবাজারের খালের মোড়ে এসে পৌঁছেছে। বাক্স খুলে নগদে আর গায়ের গহনা সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার মতো হবে, বিলাসকে রাখতে বলে তার পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠে হিমি, 'ওগো ঢপ, আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে।' সাহস নেই হিমির। এতটুকু প্রাণী সে, বিলাসের অকূল পাথারে বেড় পাবে না। বিলাসের মতো এত

বড়কে পাওয়ার ভাগ্য তার নয়। বিলাস অকূল সমুদ্রে যাবে, আঁধার রাতে তার মন পুড়বে। বিলাসের নাগাল তো পাবে না হিমি। না-পাওয়ার কষ্টের চাইতে পেয়ে হারানোর কষ্ট যে বহুগুণ বেশি। বড় অভাগী সে। প্রতিকূল নিয়তি আর রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। পোঁড় খাওয়া জীবনে সমুদ্রের ঝঞ্ঝা সামাল দিতে পারবে না হিমি। পারবে না বিলাসের মা-কাকিসহ অন্যান্য মাছমারার বৌদের মতো বুকে পাথর বেঁধে নির্ঘুম রাত কাটাতে। বিলাস হিমির রুদিত মুখখানি তুলে ধরে সান্ত্বনা দেয়। টাকা-গহনা ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বলে,

> আমি মাছমারা, এসব আমার থাকতে নেই। এই তেঁতলে বিলেসকে তুমি যা দিয়েছ, তা আর কেউ কাড়তে পারবে না। সে যে মহারানির দান গো, মহারানির দান। আমার পাণ জুড়িয়েছ তুমি, জুড়িয়েছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।[১০]

জীবন ও মনের বিচিত্র বিড়ম্বনার অপমানে ও বিরহে ভারাক্রান্ত হিমি নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নেমে আসে। বিলাসকে কঠিন পাশে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ঢপ, তুমি থাকতে পার না?' কিন্তু বিলাস যে তা পারে না। তার সম্মুখ দৃষ্টি আসমুদ্র প্রসারিত। তবে কথা দেয়, জোয়ারের আগনায় এসে হিমির সঙ্গে দেখা করে চলন্তায় অকূলে যাবে ফিরে। হিমি বিলাসের এই যাওয়া আসার পথ চেয়েই বসে থাকবে। কেননা বিলাসের সঙ্গে অকূলে সে যেতে পারল না সত্যি, কিন্তু কূলে বাঁচাও যে তার এখন বড় দায়। অবশেষে অগ্রহায়ণের উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করলে আঠার গণ্ডা নৌকার শাবরের সাইদার হয়ে তেঁতলে বিলেস সমুদ্র যাত্রা করে।

আলোচিত উপন্যাস ও বর্তমান বাস্তবতায় জেলে প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা

নদীমাতৃক বঙ্গভূমির 'মাছে ভাতে বাঙালি' উপাধিক অধিবাসীদের যুগ যুগান্তর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ডাঙ্গার সোনালি-সবুজ ফসল আর পানির রূপালি মাছ। এই ফসল ও মাছের যোগানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যে মানুষগুলো জড়িয়ে আছে, তারা সমাজের একেবারেই নিচু অবস্থানের মানুষ। হাজারো অভাব-অনটনের সঙ্গে নিত্যই লড়াই করে যাদের দিনাতিপাত হয়। যারা নিজেদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলো কখনো পূরণ করতে পারে না। পারে না রোগ-শোকের চিকিৎসা করাতে, সন্তানের পড়াশুনা নিশ্চিত করতে। পারে না সামাজিক উন্নয়নের স্বাভাবিক স্রোতধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে এগিয়ে যেতে। অথচ দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমকাতর এই শ্রেণির মানুষের শ্রমের উপর ভর করেই অন্যরা এগিয়ে যায়, কেউ কেউ অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। সহজ-সরল, নিরহঙ্কার ও কর্মনিষ্ঠ এই মানুষগুলোর শ্রমে-অবদানে দেশের অর্থভাণ্ডার হয় সমৃদ্ধ। অথচ এমন মানুষেরা নিয়তই হয় শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের শিকার। তাদের এই দুর্দশার ইতিহাসও অনেক প্রাচীন।

বৃটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক দুঃশাসন, তাদের সৃষ্ট সামন্তপ্রভু তথা জমিদারদের শোষণ-নিপীড়নে সাধারণ বাঙালি হয়েছে দিশেহারা। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, তে-ভাগা আন্দোলন, টঙ্ক বিদ্রোহ, চা-শ্রমিক বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সফলও হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ৪৭-এর দেশ বিভাজনে স্বাধীনতা লাভের পরও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি যে খুব করতে পেরেছে, তা কিন্তু নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। অথচ তাদের ঘাড়ে পা রেখে লাভবান হয়েছে সমাজের সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি। সংস্কৃতিবিমুখ, তথাকথিত ধর্মের ধ্বজাধারী প্রতিক্রিয়াশীল দানব পাক-শক্তির শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্তির অন্বেষায় আবারো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষ। খুব অল্প সময়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন বাঙালির বোধ ও অনুভবে বিস্ময় জাগায়। আনন্দিত হয় সবাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতাশ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে হয় তখন, যখন দেখা যায় এই মুক্ত স্বাধীন সোনার দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক দৈন্য। দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে অবস্থানরত চল্লিশ ভাগ মানুষ আজও অনাহারে, অর্ধাহারে, কায়ক্লেশে মানবেতর দিন কাটায়। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিক কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে। জাল-জল হারিয়ে কর্মহীন জেলে-মাঝিরা মাথা কুটে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে বাড়ে অস্থিরতা, বাড়ে অপরাধ প্রবণতা। মুক্তিযুদ্ধের বহু বছর পরও একটি ভারসাম্যহীন সমাজ থেকে মানুষ যে মুক্তি পায় নি, সেটি বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে ও পরে লেখা আলোচিত উপন্যাসদুটিতে জেলেদের যাপিত জীবনের ও পেশাগত ক্ষেত্রের যে আলেখ্য পাওয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের প্রান্তিক অবস্থানের ও স্বল্প আয়ের এই মানুষগুলোর প্রায় সবাই ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র। দারিদ্র্য এদের জীবনের যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাজারো অভাবের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেও তারা এই 'অভাব' নামের দানবের সঙ্গে কোনোদিনই পেরে উঠে না। শত দীনতা, হীনতা নিয়ে সমাজের অপাঙক্তেয় মানুষ হিসেবে এরা বসবাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এই মানুষগুলোকে কোনো কোনো সময় নিজের মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে তাদের সারল্য, সততা,

কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, আত্মপ্রত্যয়, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ তৎপরতাও আমাদের অবাক করে। কখনো এদের প্রতিপক্ষ হয়েছে বিরূপ প্রকৃতি, কখনোবা সমাজের শোষকশ্রেণি তথা মহাজন, জোতদার, আড়তদার, চালানদার, ইজারাদার, ফড়ে-পাইকের প্রভৃতি। যাদের শোষণ বঞ্চনা আর নিপীড়নে জেলেদের জীবন ও জীবিকা হয়েছে বিপর্যস্ত। কখনো এরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় হয়েছে সোচ্চার, অন্যায় আর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে করেছে প্রতিবাদ, গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। আবার প্রতিবাদহীন নির্বাক দৃষ্টিতে ক্ষমতাধরদের নিকট করেছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

জেলেদের মাছ ধরার প্রধান উপকরণ নৌকা আর জাল, যা অনেকেরই নেই। পদ্মানদীর মাঝি'র কুবেরের কোনোদিন নৌকা-জাল কেনার সামর্থ্য হয়ে উঠে নি। সে প্রতিবেশী ধনঞ্জয়ের নৌকা-জাল দিয়ে মাছ ধরে। গঙ্গা উপন্যাসেও মাছমারাদের অভিন্ন চিত্র দেখা যায়। যাদের নিজস্ব নৌকা-জাল নেই, তারা দ্বারস্থ হয় মহাজনের। কঠিন শর্তে নৌকা-জাল দাদন নেয়। জেলেদের জীবনের মহাদুর্ভোগের কারণ হয়েছে এই মহাজন শ্রেণি। টানের মৌসুমে যখন মাছের আকাল পড়ে, তখন মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয়। সময়মতো সেই ঋণ পরিশোধ না হলে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়তে থাকে। সুদের একটি টাকাও মহাজন ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। এভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে নিজের নৌকা জাল, বৌ-ঝিদের অলঙ্কার, এমন কি কখনো বসতভিটা পর্যন্ত বাঁধা পড়ে। বর্ষায় মাছের মৌসুমে সেসব ছাড়িয়ে নিতে সর্বস্বান্ত হতে হয় জেলেদের। গঙ্গা-তে দেখি, মাছ বেঁচে টাকা শোধ দিতে না পারায় মাছমারার বৌ-ঝির শরীরের বিনিময়ে পাওনা উশুল করতে চেয়েছে পালমশাই। গঞ্জের মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের গত সনের দেনা শোধ না করেই কেদমে পাঁচু নগদে অন্যের কাছে মাছ বিক্রি করেছিল বলে ঠাকুর মশাই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে কেদমেকে।

অক্লান্ত পরিশ্রমে ধরা মাছ জেলেরা সুষ্ঠুভাবে, ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে না। এখানে মধ্যস্বত্বভোগী আড়তদার, ফড়ে-পাইকেরের কবলে পড়ে এবং আরো নানাভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পদ্মানদীর মাঝি-তে বর্ষায় ইলিশের মৌসুমে শরীরে জ্বর নিয়েও সমস্ত রাত জেগে কুবের মাছ ধরেছে। কিন্তু নৌকা-জালের মালিক ধনঞ্জয় মাছ বিক্রির সঠিক হিসেব গোপন করে ভাগের টাকা কম দিয়ে ঠকিয়েছে। চালানবাবু কেদারনাথ বেশ কিছু মাছ বিনামূল্যে তুলে নিয়েছে। কুবের গোপনে শীতল ঘোষের নিকট ক'টি মাছ কম দামেই বিক্রি করে। কিন্তু সেও মূল্য পরিশোধ না করে কেটে পড়েছে। গঙ্গা উপন্যাসে দেখা যায়, পানিতে মাছ না পাওয়ায় জেলেদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আবার যখন বেশি বেশি মাছ ধরা পড়েছে, তখন একশো টাকা মণের মাছ নেমেছে পঞ্চাশ টাকায়। সমুদ্র এলাকায় আরও ভয়াবহ চিত্র। সেখানকার আড়তদার, চালানদার বেশি মাছ দেখে দাম ফেলে দেয়ার কৌশল খোঁজে। ত্রিশ টাকা মণের মাছ কোনোদিন নেমেছে পাঁচ টাকায়। জেলেদের মাছ না পাওয়ার যন্ত্রণা তো আছেই, পাওয়ার যন্ত্রণাও কম নয়।

সচরাচর আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আশ্বিন কার্তিক মাস পর্যন্তই নদীতে মাছ ধরা চলে। এর পর থেকে মাছের আকাল শুরু হয়। আর জেলেদের লড়াই শুরু হয় অভাব নামক দানবের সঙ্গে। চৈত্র-বৈশাখের টানে জেলেদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে। এসময় নদী-খাল, বিল-বাঁওড় জলশূন্য হয়ে পড়ে। জেলেদের ঘরে বাইরে কেবলই অশান্তি দেখা দেয়। গঙ্গা-তে দেখি, অনাহারী জেলে অকারণে বৌকে পেটায়। মাতাল হয়, সন্ন্যাসের ভেক ধরে না-খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। পরিবারের কারো পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। বিবেক বিসর্জন দিয়ে কেউবা অন্যের জমা নেয়া পুকুরে, বিল-বাঁওড়ে চুরি করে মাছ ধরে। ধরা পড়ে পঞ্চায়েতের সামনে লাঞ্ছিত হয়, জরিমানাও দেয়। শ্রাবণ মাসেও গঙ্গার জল মাছশূন্য হয়েছে শাঙনে টোটার ছোবলে, বিপর্যস্ত হয়েছে মাছমারাদের জীবন ও জীবিকা। বাঁধাছাঁদি জাল ফেলা নিয়ে মাছমারাদের দু'পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। মাছের আকাল পড়ায় অগ্রহায়নের শুরুতেই মাছমারারা দলবদ্ধভাবে সাইদার নিয়ে চলে যায় সমুদ্রে। সুন্দরবনের বাঘ আর বনদস্যুর মোকাবেলা করে, বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে জীবন বাজি রেখে মাছ ধরে। চৈত্র-বৈশাখে সামুদ্রিক দুর্যোগের মুখে আবার সবাই ফিরে আসে, তবে ওসবের কবলে পড়ে ফি-বছরই কিছু জেলেকে জীবন দিতে হয়। পদ্মানদীর মাঝি'র কুবেরকে ধনঞ্জয় ইলিশের মৌসুম শেষ হওয়ায় নৌকার কাজ থেকে বাদ দেয়। তার জীবনধারণের একমাত্র উপায় যে মাঝিগিরি, সেটি হারিয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখে কুবের। বাধ্য হয়ে কুবের তখন দু'আনা চারআনা ভাগে অন্যত্র মজুরি খাটে। শেষ পর্যন্ত মাছ ধরা বাদ দিয়ে হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেয়; যে নৌকা হোসেন মিয়া বৈধ কারবারের পাশাপাশি চোরাকারবারের মতো অপরাধমূলক কাজে এবং সরকারের নিকট থেকে লিজ নেয়া বাসানুপযোগী ময়নাদ্বীপে কেতুপুর এলাকার নিরুপায় অভাবগ্রস্ত মানুষ পারাপারে ব্যবহার করে। কুবের মাঝি অভাবের সংসারে আরেকটি খাবার মুখ বাড়ায় সন্তানের জন্মসংবাদে আনন্দিত না হয়ে বরং বিরক্তিই প্রকাশ করেছে। জেলেপাড়ার নবাগত শিশুর ব্যাপারে মানিকের মন্তব্য হলো, জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। ক্ষুধা, অপুষ্টিজনিত রোগ-শোক আর নানা সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে শিশুরা কোনো রকমে বেঁচে থাকে কেবল। তাইতো জেলেদের ঘরে ঘরে শিশুর কান্না কোনো দিন বন্ধ হয় না।

বড় অনিশ্চিত আর বিপদসঙ্কুল পরিবেশে জেলেদের জীবিকার তালাশে দৌড়াতে হয়। জলের তলের মাছের স্বল্পতা কিংবা অপ্রাপ্তি, মাছ আহরণ ও বিপণনে নানা দুর্ভোগ-বিড়ম্বনা, কখনো বিরুদ্ধ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, কখনোবা সুবিধাভোগী শোষক শ্রেণির বিরূপতা, কখনো দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে জেলেদের জীবিকা হয়েছে বিপর্যস্ত, জীবনকে করেছে পর্যুদস্ত। তরলতার নিরবলম্ব অবয়বের মতোই যে তাদের সামাজিক অবস্থান। ভাগ্যতাড়িত এই মানুষগুলো তাই জীবিকার খোঁজে জীবন বাজি রেখে নৌকা ভাসিয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে, কূল থেকে অকূলে। কিন্তু দারিদ্র্যের কবল থেকে কখনোই তারা মুক্ত হতে পারে নি। অভাব নামক দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে মাছের মতোই কেবল ছটফট করেছে। তাদের দাম্পত্য জীবন হয়েছে স্বাদহীন, পারিবারিক জীবন হয়েছে মমতাবর্জিত, সামাজিক জীবন হয়েছে আন্তরিকতাশূন্য, আর প্রেমিকহৃদয় হয়েছে দ্বিধান্বিত, সংশয়াকুল। গঙ্গা-তে বিলাসের উথাল-পাথাল বিষণ্ন হৃদয়ে স্থিরতার স্বপ্ন জাগিয়েছিল হিমি। বিলাসও গভীর হৃদয়ানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল মেয়েটিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছে হিমি। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মোকাবেলায় বিলাস ছুটতে চেয়েছে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে, যা হিমি মেনে নিতে পারে নি। বিলাসকে পেয়ে হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছে, আত্মসংবরণ করেছে। হিমিকে নিয়ে বিলাসের ঘর বাঁধার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। পদ্মানদীর মাঝি-তে কেতুপুর এলাকার বহু মানুষ দারিদ্র্য-দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে বাঁধা সুখের ঠিকানা পেতে কপট হোসেন মিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। হোসেনের দূর সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গিয়ে সুখের সন্ধান করেছে। কিন্তু কারো পক্ষেই সুখের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে নি; বরং সেখানকার বৈরী পরিবেশে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসেছে রাসু। সবকিছু জেনেও মিথ্যা চুরির দায় থেকে রেহাই পেতে কুবেরও একই পথে এগিয়েছে। পঙ্গু স্ত্রী মালা, চারটি সন্তান, সংসার সবকিছু ফেলে শ্যালিকা কপিলাকে সঙ্গে করে ময়না দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া কুবের তো জানে না, কী পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে। কুবেরের জীবনের এমন ছন্দপতনের মূলেও কিন্তু রয়েছে দারিদ্র্য। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা হতদরিদ্র কুবেরের নেই। মনোবল হারা, অসহায় কুবের ছুটে গেছে হোসেন মিয়ার কাছে। সুযোগসন্ধানী, কৌশলী হোসেন কুবেরকে দ্বীপে পাঠানোর ব্যবস্থা পোক্ত করে তাকে নিয়ে নিজের বহুদিনের লালিত বাসনা পূরণ করেছে।

উপন্যাসদুটিতে প্রতিফলিত সমসাময়িক এবং বর্তমান সময়ের এই পেশার মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে একুশ শতকের এই সময়ে এসে জেলেদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, বরং আরও অবনতি হয়েছে। তারা হারিয়েছে জলাশয়, জলাশয়ের মাছ। সেগুলোতে স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার। সাবেক জমিদারী আমলে সামান্য 'নজরানা'র বিনিময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে উন্মুক্ত জলাশয়গুলোতে মাছ ধরে জেলেরা ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারত, জমিদারী প্রথা পরবর্তী এমন জলমহাল ইজারায় 'খোলা ডাক' প্রথা চালু হলে এরা আর সম্মুখ প্রতিযোগিতায় বিত্তবান প্রভাবশালী মানুষদের সঙ্গে পেরে উঠে নি। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে পরিচিত অমৎস্যজীবী বিত্তবান মানুষেরা প্রথমে জলমহাল ইজারা নিয়ে নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। পরে তারা ইজারা নিতে ব্যয়কৃত অর্থের কয়েকগুণ বেশি আদায় করে সাধারণ জেলেদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়। ইজারাভোগীরা পেশাদার মৎস্যজীবী না হয়েও মৎস্যজীবী সমিতির নামে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে জেলেদের প্রতিনিধিত্বকারী দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে সমিতির নামে ইজারা নিয়ে কার্যত নিজেরাই জলমহালের মালিক হয়। এমনও দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা নেতাদের দিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বাধ্য করে জলাশয় নিজেদের অনুকূলে বন্দোবস্ত দিতে। কখনোবা হস্তগত বিল-জলাশয়ে নিজেরাই মাছ ছাড়ে। নৌকা-জালসহ অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে নিজেদের ক্ষেতমজুর দিয়ে মাছ ধরায়। জেলেদের দিয়ে মাছ ধরে নেয়া তো দূরের কথা, বিলের ধারে-কাছে ঘেঁষতেও জেলেদের বাধা দেয়। এভাবেই সরকারি বিল, পুকুর, জলাশয় থেকে জেলেরা উৎখাত হয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর-দীঘিতে জেলেরা কেবল 'জলমজুর' হিসেবেই মাছ ধরে দেয় কালে-ভদ্রে। মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারের পাশাপাশি আড়তদার, ফড়ে-পাইকেরদের খপ্পরে জেলেদের দুর্ভোগ বর্তমান সময়ে আরও বেড়ে গেছে। খুব অল্প পরিমাণে হলেও আহরিত মাছ হাটে-বাজারে নিয়ে স্থানীয় আড়তদার কিংবা পাইকেরদের কাছে কম দামেই বিক্রি করতে হয়। কষ্টলব্ধ মাছ সরাসরি ক্রেতার কাছে সঠিক মূল্যে বিক্রির সুযোগ জেলেরা তেমন পায় না।

বিশেষত গঙ্গা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, তিস্তা প্রভৃতি অভিন্ন নদীগুলোর উজানে বাঁধ দিয়ে ভারতের পানি প্রত্যাহার করায় এবং প্রাকৃতিক বৈরিতায় দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলেদের মহাবিপর্যয় ঘটেছে। নদী, বিল-জলাশয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় পানি থাকে না। আবার সেগুলোতে প্রকৃতিগত ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মাছের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক ভাবে কমে গেছে। শুকনো মৌসুমে জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাওয়ায় জেলেরা একেবারেই বেকার হয়ে পড়ে। এসময় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে। সেই অতীতের মতোই বাধ্য হয়ে যেতে হয় মহাজনের কাছে চড়াসুদে ঋণ নিতে। বিল-জলাশয়ে মাছ ধরার সুযোগ পেতে ইজারাদারদের বাড়তি অর্থের জোগাড়ে, আকালের সময় সাংসারিক প্রয়োজনে,

আর নৌকা-জালসহ মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ তৈরির জন্য মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে অবশেষে সর্বস্বান্ত হয় জেলেরা। এখনও জেলেদের নৌকা, জাল বাঁধা পড়ে মহাজনের কাছে। সময়মতো শোধ দিতে না পারায় কখনোবা মহাজন সেগুলো বিক্রি করে পাওনা আদায় করে।

সচরাচর অগ্রহায়ণ মাস থেকে নদী-বিলে মাছ কমতে শুরু হয়। তিতাস-এর কিশোর সুবলের মতো কিংবা গঙ্গা'র পাঁচু বিলাসদের মতো জেলেদের অনেকেই তখন ছোট নদী, বিল ছেড়ে দূর প্রবাসে গিয়ে বড় নদীতে কিংবা দক্ষিণাঞ্চলের নদী-সাগরে গিয়ে জলমজুর হিসেবে মাছ ধরে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এ তিন মাস জেলেরা একেবারেই কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন তাদের অনেকে ডোবা ছেড়ে উঠে আসে ডাঙ্গায়। কেউ রিক্সা-ভ্যান চালায়। কেউবা রাজমিস্ত্রির যোগালি হয়। অনেকেই অন্যের জমিতে কামলা খাটে। মাটি কাটে। আবার কেউ পাঁচ টাকা, দশ টাকা মূল্যের হরেকমাল আর প্লাস্টিক খেলনা গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করে। স্বর্ণকার, ফার্নিচারসহ অন্যান্য দোকানেও অনেকে কাজ নেয়। মাছের মৌসুমে এদের কিছু ফিরে এলেও একটি বড় অংশই থেকে যায় সেসব কাজে। বস্তুত জলের তলের মাছের অভাব আর মাছ সংগ্রহে নানা প্রতিকূলতায় হতাশ জেলেরা জলাশয়বিমুখ হয়ে অন্য পেশার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অন্যদিকে যারা অনভ্যাসের জন্য অন্য কিছু না করে পূর্বপুরুষের চিরাচরিত মাছ আহরণ পেশাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকে, তারা দুর্ভোগে পড়ে সব চাইতে বেশি। দিনভর কাদা-জল হাতড়ে যে মাছ পাওয়া যায় তা দিয়ে দু'বেলা আহারের জোগাড় হয় না। পরিধানের জরা-জীর্ণ পোশাক দেখে বুঝা যায় জেলেদের দীনতা। ঠাসাঠাসি করে গড়ে তোলা ভগ্নপ্রায় ছোট ছোট বেড়ার ঘরে কুবেরদের মতো আজও জেলেদের বসবাস করতে হয়। আলোচিত উপন্যাসগুলোতে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের যে চিত্র আমরা দেখেছি, বহুকাল পরও সে অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিশেষ পেশাজীবী শ্রেণি হিসেবে জেলেদের গুরুত্ববহ একটি অবস্থান রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। জাতীয় আয়ে মৎস্যসম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য অবদানের শুরুটিও তাদের হাতে। তারা অমানুষিক শ্রমে কাদা-জল ছেঁকে জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলে মৎস্যপ্রিয় মানুষের আহারের তৃপ্তি মেটায়। কিন্তু তাদের সামগ্রিক জীবনচিত্র পর্যালোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়, এই শ্রেণির মানুষেরা চিরদিনই দুর্ভোগ-দুর্দশা আর অবহেলা-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। দারিদ্র্যের অতলান্তে শত অভাব-অনটনের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করেছে। জেলেদের দুর্দশার অন্যতম কারণ তাদের পেশাগত বিপর্যয়। অতএব, মৎস্যক্ষেত্রের প্রান্তিক অবস্থানের এই মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয় ভাবা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তার সমাধানে করণীয় নির্ধারণ করে তার বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদের জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালা, পরামর্শ, সহযোগিতা।

বস্তুত, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাগর কিংবা উপকূলীয় এলাকা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের শুকিয়ে যাওয়া নদ-নদী, বিল-জলাশয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা এবং মাছের অপ্রাপ্তির চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। বর্তমানে নদী, বিল-জলাশয়ে পানি নেই, মাছ নেই। মাছ আহরণে সম্পৃক্ত জেলে-মাঝিদের অনেকেই জীবিকার বিপর্যয়ে বাধ্য হয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। ফলে আবহমান বাংলার চিরন্তন পেশা মাছ আহরণে নিয়োজিত জেলেদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দিন দিন। নদ-নদী, খাল-বিলের নাব্যতা কমে যাওয়ায় সেগুলোতে বছরের অধিকাংশ সময় পানি থাকে না। আবার ধ্বংসাত্মকভাবে মাছ শিকার, জলাশয় শুকিয়ে বা বিষ প্রয়োগে মাছ ধরা কিংবা ফসলের জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। এ জন্য দরকার, জলাধারের স্বাভাবিক নাব্যতা, প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত সেখানে মাছের অবাধ বিচরণ ও জন্ম-বৃদ্ধির সুযোগ এবং নদী-বিল-জলাশয়ের সঙ্গে জেলেদের স্বাভাবিক সংযোগ, উপস্থিতি। নির্মম সত্য হলো, বাংলাদেশের সব নদী-জলাশয়ই নাব্যতা হারিয়েছে বহুদিন। তার উপর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। কেবল নিজেরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে একের পর এক উজানে বাঁধ দিয়ে বহমান নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে চলেছে ভারত। ৫৪ টি অভিন্ন নদীর ৪২ টিতে ইতোমধ্যে ভারতের বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করায় উত্তরাঞ্চল ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। বছরের একটি উল্লেখযোগ্য সময় জলাশয়গুলো শুকিয়ে থাকে। অন্যদিকে মাছ আহরণে মানা হয় না কোনো নিয়ম-নীতি। আর, মাছ না পাওয়ার পাশাপাশি শক্তিমানদের দাপটে জেলেরা জাল-জলা হারিয়ে ডাঙ্গায় বসে কেবলই মাথা কোটে। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তারা যে জীবন যাপন করছে, তা জেলেপল্লিগুলোতে গেলেই বুঝা যায়। স্মর্তব্য, বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষায় তথা প্রকৃতির সৌন্দর্য-স্বাভাবিকতা এবং মানুষের সুষ্ঠু জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। এটি চিরন্তন সত্য, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ ও নদী-জলাশয়ের বিকল্প কিছু নেই। জলাশয়কেন্দ্রিক মানুষের দুর্ভোগের প্রধান কারণ, নদী-জলাশয় ভরাট হওয়ায় বেশি দিন পানি না থাকা, দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া। জীবিকার উৎসক্ষেত্র

হিসেবে নদী-জলাশয়ের পানিস্বল্পতা কিংবা পানিশূন্যতাসহ অন্যান্য কারণে মাছের অপ্রাপ্তির জন্যই মূলত জেলেরা জলাশয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মৎস্য এবং মৎস্যজীবী হিসেবে জেলের সম্পর্ক একই সূত্রে বাঁধা। উভয়ের জন্য প্রয়োজন দখলমুক্ত, দূষণমুক্ত সুন্দর-স্বাভাবিক নদী-বিল-জলাশয়। যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ উৎপন্ন হবে। জলাশয়বিমুখ জেলেরা ফিরে এসে চিরচেনা নদী-বিলের উন্মুক্ত পরিবেশে নির্বিবাদে, নিরুদ্বেগে মাছ আহরণ করবে। মৎস্যানুরাগী বাঙালি ফিরে পাবে তাদের হারানো সুদিন। আর স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করবে আবহমান বাংলার চিরন্তন মাছধরা পেশায় যুক্ত জেলে-মাঝিরা। একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করবে প্রান্তিক অবস্থানের এই জেলে শ্রেণি, একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে তাদের জীবিকার উৎসক্ষেত্রে– এমনটিই আজ সকলের প্রত্যাশা।

তথ্যসূচি:

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৩৮৯, পৃ. ১৬

২. তদেব, পৃ. ১৫

৩. তদেব, পৃ. ৩০

৪. সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, ঢাকা, ঘাস ফুল নদী, অমর একুশে বইমেলা ২০০৮, পৃ. ২৬

৫. তদেব, পৃ. ৮২

৬. তদেব, পৃ. ১১৫

৭. তদেব, পৃ. ৪৫

৮. তদেব, পৃ. ১৭৬

৯. তদেব, পৃ. ১৭৭

১০. তদেব, পৃ. ২০৭

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপট

চন্দন আনোয়ার*

সার-সংক্ষেপ: বিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত বাঙালির জাতীয়তা, জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস। একশো বছরেই বাঙালির আধুনিক জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। আর এই বিকাশের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসন, অখণ্ড ভারতবর্ষের আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস ওতোপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত। ভারতের জাতীয় জাগরণের তথা জাতীয়তাবাদের বিকাশের ইতিহাসে কংগ্রেস(১৮৮৫) ও মুসলিম লীগের(১৯০৬) প্রতিষ্ঠা ছিল প্রধান গুরুত্ববহ ঘটনা । কখনো যুগপৎভাবে ও কখনো স্বতন্ত্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এই দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তেমনি স্বার্থ-শর্তের বিতর্কে জড়িয়ে অখণ্ড ভারতকে খণ্ড করে নিজেদের নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, এবং জাতীয় জীবনে ডেকে এনেছে করুণ বিয়োগাত্মক ট্রাজেডি! কিন্তু এই ট্রাজেডি নিয়তি নির্ভর গ্রীক ট্রাজেডি নয়, ক্ষমতালোভী ম্যাকবেথ তুল্য প্যাটেল-জিন্নাদের লোভের ফলে সৃষ্ট শেক্সপীরিয়ন ট্রাজেডি। আর এই ট্রাজেডির দীর্ঘ যাতনা বয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালি। তার দেশ-দেহ-চিন্তা ভাগ হয়ে আছে। নিজ ভূখণ্ডেই বাঙালি নিরাপদ নয়! হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে অস্তিত্বের শেকড়।

ইংরেজ বাণিজ্য ও শাসন প্রসারের সময়কালে সমাজের অন্তর্বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিশেষত, শিক্ষায়-চিন্তায়-মননে আধুনিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেশীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং প্রচলিত উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা ভেঙে তৈরি হওয়া নবসৃষ্ট বণিক সমাজ–এই দুই সমাজের সম্মিলনে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার ভিত্ পেতে শুরু করে মূলত উনিশ শতকে। প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহ [১৮৫৭] প্রতিরোধ করতে গিয়ে সরকারও এই সত্য স্পষ্টত জেনে যায়, জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে এবং ভারত শাসন-শোষণের সহজ পথ ক্রমেই পিচ্ছিল হয়ে পড়ছে। ফলে শক্তিবৃদ্ধির জন্য বিশাল শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনীর আমদানি করে ভারতবর্ষে। তাদের বেতনাদির[১] দাবি পূরণ ও উত্তরোত্তর কলেবর বৃদ্ধি পাওয়া বিরাট জনপ্রশাসনের খরচাদি সবই মিটানো হত অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে। আর সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে ভারতে আসার মৌল উদ্দেশ্য, বাণিজ্যের কথা তারা কখনোই ভুলে নি। একতরফাভাবে ভারতীয় সম্পদ বিলেতে পাচার করেছে ভারত ছাড়া অবধি। ভারতে তাদের আয় বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে অযৌক্তিক ও অসহনীয় পর্যায়ের ভূমিকর, আমদানি শুল্ক আরোপ, নীলচাষ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে) যেমন রাস্তা, শিক্ষার মত বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর জন্য মাসোহারা গ্রহণ ইত্যাদির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণে কৃষক ও বণিক উভয়শ্রেণির ভিতরে অসন্তোষের বারুদ জমতে থাকে, যার বিস্ফোরণ হিসাবে দেখা যায় প্রথমে নীলবিদ্রোহ [১৮৫৯-৬০], এবং পরে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ [১৮৭৫] ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। ব্রিটিশ নীতির ফাঁদে পড়ে অরণ্যচারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাঁওতাল কৃষকরা স্বভূমিচ্যুত হয় এবং স্থানীয় জমিদার, সরকারি আমলা ও কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ও প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে [১৮৫৫] অগণিত প্রাণ হারায়। এরও আগে ওহাবী আন্দোলনের নেতা তিতুমীরের প্রতিরোধ [১৮৩১] এবং ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়ার নেতৃত্বে নীলকুঠি ও জমিদারদের বাড়ি লুটপাটের [১৮৪৬] ঘটনা ঘটে। উত্তর ভারতের অযোধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের [১৮৫৭] যে অগ্নিমশাল জ্বলেছিল, বাংলা অবধি সম্প্রসারিত হতে খুব বেশি সময় লাগে নি। বাস্তবতা হচ্ছে, সিপাহী অভ্যুত্থানই ভারতের জাতীয়তা বিকাশের এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রস্তুতির সশস্ত্র সূচনা। যদিও অনিবার্য বাস্তবতার কারণেই সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন [১৮৮৫] রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ আলোচিত ছিল। জমিদার, সরকার কোন পক্ষই প্রজাস্বার্থ বিবেচনা না করে স্বেচ্ছাচারভাবে জমির খাজনা বাড়িয়েছে। খাল-জলের উপরেও খাজনা ধার্য করা হত। এরমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে [১৭৯৩] জমি পরিণত হয় পুঁজিপতিদের লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র। 'কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের সুবিধা বণিক, মহাজন, সেনাবাহিনীর ঠিকাদার, লবণ আফিমের রাজস্ব বোর্ডের অনেকেই ছিল। এ কথা ঠিক যে পুরনো জমিদারকুল নির্মূল হয় নি।'[২] ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বন্টনের কারণে সামগ্রিক সামাজিক বিন্যাসের অদল-বদল ঘটে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় চলে আসে নগরকেন্দ্রিক নবোদিত মধ্যবিত্তশ্রেণি, যারা শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্ম ও সামাজিক চিন্তায় ছিল স্বাধীনচেতা। এই শ্রেণির নেতৃত্বেই সরকারের সাথে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে চলে দেনদরবার। বিশেষ করে, কর্মসংস্থান, কৃষি, ভূমি কর, স্বদেশি বাণিজ্য ও শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায়ে সক্রিয় ভূমিকায় নামে এই শ্রেণি। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই দাবি আদায়ের প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে সামনে উঠে আসে রাজনৈতিক লক্ষ্য। প্রথমে স্থানীয় শাসনের দাবিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করলেও ধীরে ধীরে তা ভারতের শাসন কর্তৃত্বের দিকে এগোয়। আর এই রাজনৈতিক সাংগঠনিক ভিত্তি রচনা করার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের সংগঠন রাধাকান্ত দেব-এর [১৭৮৩-১৮৬৭] ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

অ্যাসোসিয়েশন [১৮৫১], বোম্বে এসোসিয়েশন [১৮৫২], বিলেতে নৌরজি প্রতিষ্ঠিত ইস্টইন্ডিয়া এসোসিয়েশন [১৮৬৬], মারাঠা সর্দার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত পুণা সার্বজনিক সভা [১৮৬৭] ও জাতীয় চেতনার উদ্রেককারী ‘হিন্দুমেলা’র [১৮৬৭] অবদান অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তব ও সফল যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বের গোকুল দাস তেজপাল কলেজ হলে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ বা ‘ভারতের জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। মধ্যবিত্তের স্বাধীনসত্তা, সামন্ত জমিদারদের শ্রেণিস্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দমন-পীড়ন-শোষণের ইতিহাসই কংগ্রেস জন্মের সক্রিয় কারণ। এই প্রথম, জাতীয় ইচ্ছার প্রতিফলনের এবং নিজেদের দাবি পূরণে সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি হয়, যার ভিত্তিমূলে ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপিরণামদর্শিতা ও সীমাবদ্ধতা, দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ থাকলেও জাতীয় ঐক্য ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে কংগ্রেসের সকল পদক্ষেপই বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিল। জনপ্রশাসনের সংস্কার, জনপ্রশাসনে ভারতীয় লোক নিয়োগ, সিভিল সার্ভিসের বয়সসীমা ১৯ থেকে ২৩ বছরে উন্নীতকরণ, আইন কানুন উদারকরণ ও ভারতেই পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ, বিপুল সামরিক ব্যয় হ্রাস ও সৈন্য বিভাগে দেশীয় তরুণদের নিয়োগ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ত্রিশশালা বন্দোবস্ত, রাজস্বের উচ্চহার ও আদায়ের কঠোর পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক বচসা চালাত। ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

বিশশতকের প্রথম দশকেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন মেরুকরণ ঘটে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রিকরণ ও বাংলার পশ্চাপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে সরকার তথা কার্জনের নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বঙ্গভঙ্গ(১৯০৫) হয়। বাস্তবে, অবিভক্ত বাংলার শক্তি ও মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতায় তটস্থ সরকার সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থের স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছে। ‘বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের আন্দোলনের ফল ছিল না। এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পর্যায়েও এ সম্বন্ধে মুসলমানরা তা দাবি করেন নি এবং এ সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব গ্রহণের পরেও তারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল অত্যন্ত ধীরে। সরকারই প্রথম মুসলমানদের কাছে বঙ্গভঙ্গ নীতি সমর্থনের আহ্বান জানায়।’[৩]

বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে দু’টি প্রধান ঘটনা ঘটে– প্রথমটি, কলকাতা কংগ্রেসে [১৯০৬] স্বরাজ ইস্যুতে নরমপন্থি ও চরমপন্থির বিরোধ প্রকাশ্যরূপ লাভ করে। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে একদল তরুণ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতা– তাদের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ, পাঞ্জাবের লালা রাজপত রায় ও মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক। আবেদন-নিবেদনের সব নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করে স্বরাজ আদায়ে সর্বাঙ্গীন বয়কটসহ যে কোন ধরনের ত্যাগে প্রস্তুত ছিল চরমপন্থিরা, বঙ্গভঙ্গের উত্তাল রাজনৈতিক আবহকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগতে আগ্রহী তারা। কেননা, কলকাতা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিশাল গণআন্দোলনের[৪] বিস্তৃতি ঘটে, বিপরীতে ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম গণজাগরণ। প্রবল প্রতিরোধের মুখে সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গভঙ্গের কারণে সৃষ্ট স্বদেশি আন্দোলনই ছিল ভারতের গণজাগরণ তথা জাতীয়তাবাদের ‘মেরুদণ্ড’ অর্থাৎ ‘জাতীয় আত্মচেতনার বীজ বপন’। কার্জন বঙ্গভঙ্গ নামক অস্ত্রের দ্বারা মূলত, ব্রিটিশ আধিপাত্যবাদকেই আঘাত করে। ‘স্বদেশি আন্দোলনের মাধমে রোপিত জাতীয়তাবাদী বৃক্ষজাত ফল হল গান্ধীজীর অসহযোগ সত্যাগ্রহ, খান আব্দুল গাফফার খানের আন্দোলন, বিশের দশকের শ্রমিক আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালের ভারতছাড় আন্দোলন।’[৫]

বঙ্গভঙ্গের সময়কালে লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্য পেয়েছিল মুসলমানরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এই সুবাদে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি মুসলামনদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের প্লাটফর্ম ‘সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ’। মূলত, ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে একটি অখণ্ড সংহতি রচনা করার জন্যই লীগের জন্ম। আর এই ঐক্য ও সংহতির প্রধান সেতুবন্ধন ছিল কোরান, হাদীস, তীর্থস্থান মক্কা-মদীনা, হজ্জ, খলিফা এবং মুসলিম কবি-মনীষের গৌরব গাঁথা। বঙ্গভঙ্গের সময় সাম্প্রদায়িক বিভক্তির যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, সেই বিভক্তির রাজনৈতিক রূপ পেল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ভারতের রাজনীতিতে এরপরের ইতিহাস কিন্তু বিভক্তির ইতিহাস। তবে এই সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লীগ প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের স্বাধীনতার দাবি নতুন মাত্রা পায়। বিশেষ করে, প্রথম দিকে কংগ্রেস ও লীগের সমঝোতার ফলে সম্মিলিতভাবে যে দাবিগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল, সেই দাবিকে অবজ্ঞা করা সরকারের জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, এবং ভারতীয়করণ ইত্যাদি বিষয়ক দাবিকে জাতীয় সংহতির স্মারক

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইতোমধ্যে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে উদয় হয় ধ্রুবতারার মত জাজ্বল্যমান এক মহান পুরুষ মহাত্মা গান্ধী, যার সুবিশাল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ক্যারিশমার কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূটচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কংগ্রেসের বয়কটনীতি বা স্বদেশি আন্দোলনের কোনটির সাথেই মুসলিম লীগের সম্পর্ক না থাকলেও গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি মুসলমানদের আস্থার ঘাটতি ঘটে নি। বাস্তবে, লীগের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না এবং সর্বজন প্রবেশের পথ রুদ্ধ ছিল। বাংলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মুসলমানদের আস্থা অর্জনে সমর্থন ও আনুকূল্য পায় নি। প্রায় দুই দশক ড্রইংরুম পার্টি হিসেবেই টিকে ছিল। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক গান্ধীর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও হস্তক্ষেপে খেলাফাত আন্দোলন বেগবান হলে মুসলিম মানসে নতুন করে উদ্যম ফিরে আসে। খেলাফত আন্দোলনের পক্ষে গান্ধী হরতাল ও সত্যগ্রহের মত কঠোর কর্মসূচি[৬] ঘোষণা করেন। শেষে ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। অনমনীয় ও অহিংসবাদের জনক গান্ধীই প্রথম আইন অমান্য করেন। স্কুল-কলেজ ও কাউন্সিল বর্জন এবং বিদেশি কাপড় পোড়ানোর মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি পালনে জনগণের ভিতরে যে জাগরণ ঘটে, তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য সুস্পষ্ট অশনি সংকেত। গান্ধীর অসহযোগের ডাক বিদ্রোহের জনপদ বাংলায় আসে বুমেরাং হয়ে। কংগ্রেসের বিপ্লবী চরমপন্থিরা এখানে হরতাল, ধর্মঘট, দাঙ্গা ইত্যাদি শুরু করে। ফলে কংগ্রেস ও খেলাফতিরা গ্রেফতার হয় গণহারে। ভারতমাতার প্রিয় সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীর অহিংস নীতির অনুসারী ও অকুণ্ঠ সমর্থক হলেও স্বরাজ আদায়ে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিকে সমর্থন করতে পারেন নি। এর ভিতরের ফাঁক-ফাঁকি ও অসম্ভবতাকে তিনি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এই থেকে নিবৃতির খানিক চেষ্টার উদ্দেশ্যে কলমও ব্যবহার করেন। আর বাস্তবেই যে ফাঁক-ফাঁকি ছিল তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমানের নড়বড়ে ঐক্যে ফাটল ধরে; যে অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানরা দলে দলে সশরীরে যোগ দিল, সেই মুসলমানরাই অবিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবশ্য, এখানেও ব্রিটিশ দাবার চালে পা দিয়ে উত্তাল খেলাফত আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করে মুসলমান নেতৃবৃন্দ। উপরন্তু, অসহযোগ আন্দোলন যখন উত্তাল এবং জনমনে যখন বিপুল সমর্থন ও অংশগ্রহণে শ্রেণিসংগ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখনই গান্ধী লাগাম টেনে ধরেন। বিশেষত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা এই নেতা কখনই চান নি শ্রেণিসংগ্রাম। বিশেষ করে, ভারতের মত বহু ধর্ম ও মতের দেশে শ্রেণিসংগ্রাম প্রকট হলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন এই পরিণামদর্শী মনীষী। কিন্তু চরমপন্থি ও বামপন্থিদের বিচারে জনগণের সাথে গান্ধীর এই আচরণ 'বিশ্বাসঘাতকতা'র সামিল। অন্যদিকে, অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খেলাফত আন্দোলনের সংযোগ নিয়ে তৈরি হয় নতুন বিতর্ক। আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে গান্ধী যেমন বাহবা পেয়েছিলেন, তেমনি আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার জন্য দায় বর্তায় তাঁর উপরেই। এছাড়াও ভারতে খেলাফত আন্দোলন যৌক্তিক ছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। 'খেলাফতী কতটা ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে তুরস্কের মুসলমান, ভারতের হিন্দু নয়, এমনকি ভারতের মুসলমানও নয়।' কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমা নিয়ে নয়, মুসলমানের আত্মজাগরণের প্রধান সোপান হল আল্লাহ ও কোরান। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শোষণে পীড়িত দরিদ্র মুসলমানদের কাছে সেই অর্থে জাতীয় জাগরণের ডাক পৌঁছায় নি, ফলে ধর্ম না জাতীয়তা-কোনটি বড়ো সেই দ্বিধা ছিল। যে মিথ্যা জাতি ও বর্ণ গর্বে তথা আভিজাত্যের অভিমানের কারণে চরমপন্থি আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, খেলাফত আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেন মুসলিম মানসে তারই প্রতিবিম্ব। একদিকে তুরস্কের খলিফা পদ বাতিল হওয়ায় মুসলমান-হিন্দুর মিলনের নৈতিক মিলনের পথ যেমন রুদ্ধ হয়, অন্যদিকে মালব্যের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার [১৯২৩] উত্থান, পাশাপাশি কংগ্রেসে মুসলমানদের প্রবেশের পথ সংকুচিত থাকায় অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত মুসলমানরা ঐক্য ও সংহতির চিন্তা ছাড়ে এবং আরো বেশি সংরক্ষণবাদী হয়ে ওঠে। যে কারণে, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার [১৯২৬] মত ভয়াবহ দাঙ্গাসহ এক বছরে ২৫টির মত দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যার মফস্বল পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটে। এই নৃশংসতাকে সরকার উপভোগ করে দারুন খোশ মেজাজে এবং নিজেদের রাজতখত আরো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াচ্ছে ভেবে দাঙ্গা দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। তবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষের ভিতর দিয়েও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে ওঠে, যা কৌশলি ব্রিটিশরা আঁচ করতে পারলেও বাস্তব ধারণা করতে পারে নি যে, তার পরিমাণ কত এবং কত শক্ত আঘাত হানতে সক্ষম।

ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক কারণেই বাংলার রাজনীতিতে স্বতন্ত্র একটি মেরুকরণ প্রায়শ থেকেছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বাংলা ছিল একটি সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow'. তাই আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাকে প্রধান বিবেচনায় এনে যেমন রাজনৈতিক দলগুলো কর্মপন্থা ঠিক করেছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী সরকারকেও বাংলাকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে হয়েছে। ব্রিটিশ অবিভক্ত বাংলার শক্তি হ্রাস করার কূট ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গভঙ্গ করেছিল। আর কোথাও না হলেও বাংলায় কোন বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সরকার তা কঠোরহস্তে দমনে নামত। বাংলার স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব ও তাঁর স্বরাজ দল[৭] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেবল বাংলা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলিম কমিউনিটির জন্য সম্ভবত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত এমন দরদি বন্ধু আর

একজন এসেছে কিনা সন্দেহ। বাংলার মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর করা ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট'(এপ্রিল ১৯২৩) বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতের ইতিহাসেও বিরাট এক মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত। I was greatly impressed by him and regard him as one of the most powerful men in history of our national awakening.[৮]

প্যাক্টে বলা হয়েছিল– সংখ্যা অনুপাতে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশসহ যতদিন প্রাপ্য অনুপাতে [৫৪%] না পৌঁছাবে ততদিন ৮০% চাকুরি পাবে মুসলমানরা । শুধু তাই নয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমন কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক ও লোকাল বোর্ডসমূহে মুসলমানরা একই হারে চাকুরি পাবে। মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা হবে এবং ঈদের সময় কোরবানিতে বাধা দেওয়া হবে না। সেই সাথে প্যাক্টে দেশবন্ধু এই প্রতিশ্রুতিও লিপিবদ্ধ করেন যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে এবং পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। প্যাক্টের বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে দেশবন্ধু মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁর ডেপুটি মেয়র নিয়োগ করেন তরুণ মুসলিম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এবং আব্দুর রশীদকে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ। অনেক মুসলমান গ্রাজুয়েটকে মোটা বেতনের দায়িত্বপূর্ণ বড় পদে চাকুরি দেন, যা ছিল হিন্দু প্রাধান্যের কর্পোরেশনে কল্পনারও অতীত। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বাংলার অগ্রসর এই নেতা ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে পালন করেন পাইওনিওরের ভূমিকা। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এই ঐক্যের ভিত্তি রচনার এক বছরের মধ্যেই ১৯২৫-এর জুন মাসে অকালে প্রয়াণ ঘটে দেশবন্ধুর। তাঁর আদর্শকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিতে যে তরুণ নেতা প্রস্তুত ছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্র বসুকেও দেশবন্ধুর মৃত্যুর আগেই বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখে সরকার। 'বাংলার জাতীয় নেতৃত্ব চলে এসেছিল যাঁদের হাতে তাঁরা ছিলেন নিতান্তই দ্বিতীয় শ্রেণির দেশপ্রেমিক–দেশবন্ধুর মহৎ দূরদৃষ্টি বা সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তা কোনটাই তাদের ছিল না।'[৯]

ভারতের জাতীয়তাবাদের বামপন্থি ঘরানার রাজনীতির বিকাশ বিশেষ গুরুত্ববহ। সুদূর তাসখন্দে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। মূলত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের রাজনীতির আর এক নতুন মেরুকরণ হয়। গান্ধীবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও সংক্ষুব্ধ একদল যুবক প্রত্যক্ষ সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের পতন করতে চেয়েছিল, যারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও গান্ধীর অহসহযোগ আন্দোলনের সামনে ছিল, তারাই কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল বেশি। এছাড়াও শুরুতেই জুটে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সর্মথন ও সহযোগিতা। আর ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকায় কম্যুনিস্ট পার্টির দ্রুত প্রচার ও প্রসার ঘটে। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে বাংলায় পার্টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিপনবিহারী গাঙ্গুলি, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চ্যাটার্জির মত 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের কিছু বিপ্লবীদের যোগদানে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'গোয়েন্দা দফতরের কর্তা মন্তব্য করেন, কম্যুনিস্টরা সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রজাতীয়তাবাদীর মধ্যে একটা বিপজ্জনক tactical position পাবার চেষ্টা করছে।'[১০] এরিমধ্যে কানপুর সম্মেলনে [১৯২৫] সিপিআই-এর জন্ম হলে সরকারের গাত্রদাহ ঘটে এবং দমনের জন্য 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায়' জড়িয়ে নানাভাবে হয়রানির ব্যবস্থা করে। ঝানু রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র রায় নিজে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন বিধায় গোপনে কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সাম্যবাদের বীজ বপনের চেষ্টা চালান এবং প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বামপক্ষ গঠন করে [৩১ মে ১৯২৭] সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে মুজফ্ফর আহমদের 'নবযুগ [১৯২০], কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' [১৯২২] ও লাঙল [১৯২৬] পত্রিকা । এছাড়া ভ্যানগার্ড পত্রিকা বাংলায় আসত অবাধেই। কম্যুনিস্ট রাজনীতির ধারা ভারতের স্বরাজ আন্দোলনকে নতুনমাত্রা যোগ করে। বিশেষ করে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটে কম্যুনিস্টদের সাথে কম্যুনিস্ট ঘেঁষা কংগ্রেসদেরকেও সামনে দেখা যেত। বাংলার চটকল, রেল কারখানা ইত্যাদিতে শ্রমিক ধর্মঘটের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জীর মত কংগ্রেস নেতবৃন্দকে।

ভারতের রাজনীতির মঞ্চ থেকে প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব ওঠে মাদ্রাজ কংগ্রেসে [১৯২৭]। কিন্তু কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে সংযুক্ত না করায় তা আর বাস্তব আন্দোলনে রূপ নেয়নি। খেলাফত আন্দোলনের পরে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল সাইমন কমিশন। কিন্তু দুই পক্ষের স্বার্থের রশি টানাটানিতে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টনের ঘোর বিরোধিতা করে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী। মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ গান্ধী মানলেও, জওহরলাল নেহেরু না মানায় তা এক বিবাদ সৃষ্টি হয়। গান্ধী-নেহেরুর দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে ওঠে। এমন কি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে শাসনতন্ত্রের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলনের পরে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তৈরি খসড়া শাসনতন্ত্রেও বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টনের বিষয়টি

বিবেচনায় আনা হয় নি। লক্ষ্ণৌ সর্ব দলীয় সম্মেলনে [২৮-৩১ আগস্ট ১৯২৮] নেহেরুর শাসনতন্ত্রে জিন্না মুসলমানদের স্বার্থ সংশিষ্ট কিছু দাবি পেশ করে সংশোধনী আনেন এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম আসন সংরক্ষণের দাবি তুলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, তীব্র শ্লেষ ও অপমানের সাথে জিন্নার প্রস্তাব সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দলীয় সম্মেলন [৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮ - ১ জানয়ারি ১৯২৯] ডেকে নেহেরুর শাসনতন্ত্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে লীগ এবং চৌদ্দ দফা দাবি সম্বলিত 'দিল্লী প্রস্তাব' পেশ করে। ফলে লীগ-কংগ্রেসের দুর্বার বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। '১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল নির্বিশেষে সব হিন্দু-মেম্বাররা জমিদার পক্ষে এবং দল নির্বিশেষে সব মুসলিম মেম্বাররা প্রজার পক্ষে ভোট দেন। আইন সভা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়। পর বৎসর সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করা হয়। কি মুসলমানের স্বার্থের দিক দিয়া, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া, কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া চলা সম্ভব থাকিল না।'[১১] বস্তুত, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, লীগ ও কংগ্রেসের মতবিরোধের ইস্যু ততই বাড়ছিল। বিশেষ করে ভারতের মুসলমানরা কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন একটি প্লাটফর্ম হিসেবে মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকছিল, এমন কি মডারেট মুসলমানদের অনেকেই কংগ্রেসের অস্পষ্ট অবস্থানের জন্যও দোদুল্যমান হয়ে মুসলিম লীগে, না হয় বামপন্থি দলের দিকে ঝুঁকেছে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভাবনা মূলত তিরিশের দশকের প্রথম দিকেই প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে ইকবাল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটি সীমানা কাঠামোর মধ্যে দাবি করেন। বাস্তবে, পাকিস্তান রাজ্যের বীজ বপন হয় এই দাবির মধ্য দিয়ে।

বিভিন্ন দাবিতে বিশশতকের প্রথম তিন দশক গোটা ভারতের রাজনীতি উত্তাল ছিল। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কম্যুনিস্ট পার্টির উত্থান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' শাসতন্ত্র খসড়া প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন আন্দোলন-সংস্কার চললেও স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত মরণ কামড় দিতে পারে নি। অবশ্য গান্ধীর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অহিংসবাদী হবার কারণে বিচ্ছিন্নভাবে চরমপন্থিরা জেগে উঠতে চাইলেও পারে নি। ইতোমধ্যে বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে [৩১ ডিসম্বর ১৯২৮] পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। মূলত, বাঙালি নেতৃবৃন্দের মনের কথাটিই সেদিন সুভাষচন্দ্রের মুখ দিয়ে বের হয়। অবশ্য নেহেরুর খসড়া শাসতন্ত্র মেনে নেবার জন্যে এরিমধ্যে সরকারকে ১৯৩০ এর ৩১ ডিসেম্বর ডেটলাইন বেঁধে দেন গান্ধী এবং ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্র না মানলে 'অহিংস অসহযোগে'র মত কঠোর কর্মসূচিতে যাবে। এরিই ধারাবাহিকতায় '১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ইরাবতীর তীর প্রকম্পিত করে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিল।...মতিলাল স্বরাজীদের আইনসভা থেকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। ১৯৩০ এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হল এবং স্বাধীনতার শপথ নিল কোটি কোটি ভারতবাসী।'[১২] অহিংসবাদী গান্ধী আপোষরফার শেষ চেষ্টা করলেও ব্রিটিশ সাম্যাজ্যবাদীর প্রতিনিধি অরুইন তা অগ্রাহ্য করেন। প্রয়োজনে এই মানব দরদি সন্ন্যাসী ধাঁচের নেতা কি পরিমাণে বজ্রকঠিন হতে পারেন তারই প্রমাণ মিলল লবন আইন অমান্য করার ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

আইন অমান্য আন্দোলন পূর্বের অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও দুর্বার হয়ে ওঠে। এরিমধ্যে সরকার কঠোরহস্তে দমনের উদ্দেশ্যে জওহরলাল নেহেরু, যতীন্দ্রমোহন, আব্দুল গফুর খাঁর মত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে কেবল গ্রেফতার করে নি, অধ্যাদেশ জারি করে আন্দোলনকারীদের দমনে নামে, কংগ্রেসের সম্পত্তি দখল করে এবং খবরের কাগজে কংগ্রেসের সংবাদ প্রচারের বিধিনিষেধ আরোপ করে। অবশেষে গ্রেফতার করে গান্ধীকেও। সরকারের গ্রেফতার-হামলা-মামলার কারণে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। বিশেষ করে বাংলার পরিবেশ তখন ভয়ানক বিস্ফোরণমূলক[১৩]। বিদেশি কাপড় বর্জন, মদের দোকানে পিকেটিং তো চলেছেই, কম্যুনিস্টরাও নিজেদের আন্দোলনে মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন প্রভৃতি বিপ্লবীর সাথে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলির মত নারী বিপ্লবীরাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। যাদের নেতৃত্বে ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঘটে–যা ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কলকাতা শহর পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল। বাংলার এই অগ্নিরূপে শংকিত গান্ধী আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। সেই সাথে বণিকশ্রেণির প্রচণ্ড চাপে এবং সর্বোপরি নিজের অহিংসবাদী আদর্শিক চিন্তাকে জিইয়ে রাখতে আন্দোলন থেকে সরে আসেন। এবং কংগ্রেসের প্রবল বাধাকে পাশ কাটিয়ে করেন গান্ধী-অরুইন চুক্তি [৫ মার্চ ১৯৩১]। দুর্ভাগ্য এসে ভর করায় এই আন্দোলনের গতি হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন আন্দোলনকে স্বাধীনতা পর্যন্ত নিতে না পারা যেন কংগ্রেসের নিয়তিই হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে, আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল এবং সরকার চরম ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিনীকে নামিয়েছিল, আর

কিছুদিন চালাতে পারলে সরকার ভূমধ্যসাগরের জাহাজে চড়তে বাধ্য হত তখন ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখতে গিয়ে ও নিজের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে সেই চিরশত্রুর সাথে চুক্তি করতে হল, যা যুবশক্তির জন্য ছিল নিদারুণ হতাশার।

প্রথম দফায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও বাংলার বিপ্লবী ধারা অব্যাহত ছিল। গান্ধীর হুকুম শুনে সন্ত্রাসবাদীরা চুপ করে বসে থাকে নি। বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যার ঘটনা ঘটে, যা ক্ষেত্রবিশেষে অসহযোগ চলাকালীন ধ্বংসযজ্ঞের চেয়েও আরো ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক। প্রশাসনের ভিত্তি প্রায় নড়বড়ে হয়ে পড়ে আমলাদের হত্যার ঘটনায়। ফলে সরকারি অসুরিক চেহারার বিস্ফোরণ ঘটে। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে [৭সেপ্টম্বর ১৯৩১] সেই হিন্দু-মুসলমানের পুরনো বিভেদেরই চর্বিত চর্বণ হয় এবং কি ফেডারেল কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে ঐক্যমত না হলে এবং কংগ্রেসকে ভারতের একমাত্র মুখপাত্র ধরে সরকার আলোচনা এগোতে রাজি না হওয়ায় গান্ধীকে বিলেত থেকে ফিরতে হয় শূন্য হাতে। ফলে ভারতের উত্তপ্ত রাজনীতি আরো দ্বিগুণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল পার্টির জয় এবং সরকার গঠনের পরে সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তায়ও পরিবর্তন আসে। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের দেওয়াল আরো পুক্ত করার চেষ্টা হিসেবে সরকার 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা'র দিকে ক্রমাগত ঝুঁকতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন গান্ধী। এবার সরকার আরো কঠোর হয়ে আন্দোলন দমনে নামে এবং বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু অর্থাভাব ও বাংলার মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের বিমুখতার কারণে বাংলায় এই অসহযোগ আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে নি। তদুপরি এই সময়টাতে [১৯৩২-৩৩] পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধের সূত্রে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দল শক্তিশালী হয়। এদিকে গান্ধী-নেহেরু ও গান্ধী-কংগ্রেসের আদর্শিক দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকলে গান্ধী কংগ্রেসের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান এবং খাদি, চরকা, অহিংস নিয়ে একলা চলো রে পথ অবলম্বন করেন। বিপরীতে নেহেরুর রাজনৈতিক মতাদর্শ ক্রমেই ঝুঁকতে থাকে সমাজতন্ত্রের দিকে। ফলে স্বরাজ লাভের উপায় হিসেবে আইন অমান্যকে শ্রেষ্ঠ ও কার্যকরী উপায় হিসেবে কংগ্রেসের নীতিনির্ধারকদের মাথায় ঠাঁই করে নেয়। নেহেরু মনে করতেন জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি সহজ সমাধান আসবে। ফলে গান্ধীর এই রণেভঙ্গ দেওয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য হয় নি নেহেরুর কাছে এবং কংগ্রেসের জন্য ছিল অমর্যাদার। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার যুবশক্তি তখন বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ত। এছাড়া দক্ষিণপন্থি নেতাদের আপত্তির মুখে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের ধারা প্রবর্তন হয়। আর স্বভাবতই বামপন্থি কংগ্রেসদের আনুকূল্য পাবে কম্যুনিস্টরা। ফলে গোটা ভারতের রাজনীতিই গান্ধীর অহিংসবাদী ধারণা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করে।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পথকে সুগম করেছিল গান্ধির করা পুনা চুক্তি [সেপ্টম্বর ১৯৩২]। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক আইন সভায় সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে সমগ্র ভারতের হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং কংগ্রেসে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার কারণে কেন্দ্রে কংগ্রেস কখনই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। হিন্দুরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাইলেও এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিবেচিত হলেও মুসলমানদের দাবি ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস করে প্রাদেশিক শাসন। কেননা তারা জানে যে, কেন্দ্রে সবসময়ই তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকবে। অবশেষে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামেজ ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Act)[১৪] ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু সমস্যার একটি সমাধান তৈরির চেষ্টা করেন এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে এবং এর আলোকে ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রধান পাঁচটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং চারটিতে হয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এরমধ্যে বাংলায়[১৫] একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েও কংগ্রেস সরকার গঠন করে নি এবং কৃষক প্রজা পার্টিকেও প্রার্থিত সমর্থন দেয় নি । ফলে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সহায়তা নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। এটি ছিল অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বিভক্তির পিছনে কংগ্রেসের আরো একটি রাজনৈতিক ভুল। বাঙালি হিন্দু নেতারা সেদিন নিজেদের সর্বনাশ করেছে, তেমনি ফজলুল হকও খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছিলেন। বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংহতি সবই একদিনে ডুবল।'[১৬] বাস্তবে কংগ্রেসের অদূরদর্শী ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব-ই ফজলুল হককে লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঠেলেছে। '১৯৩৭-১৯৪০ সময়কালে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সফর করেন এবং লীগের জনসভা-কনফারেন্সে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি কংগ্রেস শাসিত ৭টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমানদের উপর কথিত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় তাঁর সরকার কর্তৃক 'প্রতিশোধ' গ্রহণের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।'[১৭] ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বাংলার মুসলমানদের কাছে জিন্নার গ্রহণযোগ্যতা আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। তখনকার বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ-একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দিন, মাওলানা আকরম খান ও আবুল হাশিম প্রমুখরা আন্তঃকোন্দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেলে অবাঙালি নেতা

জিন্নাহ চলে আসেন বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। সেইসাথে নির্বাচনে হেরেও কেন্দ্রের রাজনীতিতে জিন্নার দাপট বাড়ে বৈ কমে না। প্রথম প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি রাজনৈতিক নানা দাবার চাল শুরু করেন। ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাহ গান্ধীর মতই মুসলমানদের প্রায় একক নেতৃত্ব পেয়ে যান। ফলে একসময়ের কংগ্রেস [১৯২০ পর্যন্ত] ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন মৌলবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মডারেট চিন্তার জাদরেল আইনজ্ঞ জিন্নাহ আপাদমস্তক চিন্তা নিয়োজিত করেন মুসলিম কমিউনিটির জন্য। এখন আর কেবল মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোর জন্য নয়, ভারতের সামগ্রিক মুসলমানদের অধিকার ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য লড়াইয়ে নামেন। মুসলিম লীগকে ভারতের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কংগ্রেসের উপর কৌশলে নানামুখী চাপ প্রয়োগ করেন এবং বলেন যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন মুসলমান সদস্য নেওয়া চলবে না। বলা চলে বিপন্ন ইসলাম রক্ষার নামে এক প্রকার জেহাদ ঘোষণা করেন জিন্নাহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের [৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯] সময়কালে ভারতের রাজনীতিতে বহুমুখী মেরুকরণের সূচনা ঘটে। বিশেষত মিত্রপক্ষের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আহবান করে। বড়ো লাট ভারতের মতামতের কোনো তোয়াক্কাই না করে স্বপ্রণোদিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে এক প্রকার জোর করে ভারতকে যুদ্ধে জড়ায় সরকার। সেই সাথে চলে সৈন্য ও যুদ্ধের রসদাদি সংগ্রহের জন্য অন্যায় চাপ প্রয়োগ। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ত্রিপুরা কংগ্রেসে [মার্চ ১৯৩৯] সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান ঘোষণা করে বলা হয় :

> The Congress dissociates itself entirely from British foreign policy which has consistently aided the Fascist Powers and helped in the destruction of democratic countries. The Congress is opposed to Imperialism and Fascism alike and is convinced that world peace and progress required the ending of both of these. In the opinion of the c , it is urgently necessary for India to direct her own foreign pollicy as an independent nation, thereby keeping aloof from both Imperialism and Fascism, and pursuing her path of peace and freedom. [১৮]

কংগ্রেসের ত্রিপুরা সম্মেলনে [মার্চ ১৯৩৯] সরকারকে চরমপত্র দেবার দাবি করেন সুভাষচন্দ্র বসু। দাবি নাকচ হলে এবং গান্ধীর সাথে বিরোধে জড়িয়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ [২৯ এপ্রিল ১৯৩৯] ছেড়ে ভিন্ন এক রণকৌশল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির প্রতিরোধে নামেন সুভাষ বসু কে। বামপন্থি চিন্তার নেতৃবৃন্দের সম্মিলনে গড়ে তুলেন ফরওয়ার্ড ব্লক [৩ মে ১৯৩৯], যা ছিল বামশক্তিকে সুসংহত করে কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা এবং জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করার প্রথম পদক্ষেপ। এছাড়াও সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধেও ফরওয়ার্ড ব্লক লড়বে। সুভাষচন্দ্র বলতেন, দেশকে যে শক্তি দুভাগ করেছে সে শক্তি হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, সে শক্তি হচ্ছে ব্রিটিশ শক্তি এইজন্য তিনি দেশের মধ্যে বিপ্লব চেয়েছিলেন।[১৯] রামগড় কংগ্রেসের [২০মার্চ ১৯৪০] প্রস্তাবনায় কংগ্রেস স্পষ্ট আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নেতৃবৃন্দের ভীরুতাকে সুভাষচন্দ্র তীব্র ভাষায় বিষোদগার করেন। আর এখানেই গান্ধীর আদর্শিক অহিংস দর্শন ও ‘কংগ্রেসের সংগ্রামবিরোধী কর্মনীতির’ বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট আবস্থান গ্রহণ করেন জাতীয়তাবাদী এই আপসহীন নেতা। যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে আটকাতে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নামলে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং অনশন শুরু করলে মুক্তি দেয়। এরিমধ্যে চরম শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয়তার জন্ম দিয়ে সুভাষ বসু ২৬শে জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দেশান্তরি হন। প্রায় বছরের অধিক সময় লাপাত্তা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তবে তিনি বার্লিন যান ব্রিটিশবিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলবার জন্যে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি যে ভাবমূর্তি গড়ে ছিলেন তা কেবল নেপোলিয়নের সাথেই তুল্য।

গান্ধী-নেহেরু, গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বে যখন অস্থির কংগ্রেস এবং যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গোলযোগ চরমে–এই সুযোগকে জিন্নাহ পাকিস্তান দাবি আদায়ের মোক্ষম সময় হিসেবে নতুন এক কৌশলের আশ্রয় নেন– ‘যে সংঘাত এতদিন ছিল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, দুই সম্প্রদায়ের গার্হস্থ্য সংঘাত, জিন্নাহ তাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিলেন। ঘনীভূত আন্তর্জাতিক গোলযোগের প্রেক্ষাপট জিন্নার মাথায় ছিল। তাই গার্হস্থ্য সমস্যার আন্তর্জাতিককরণ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গান্ধীজীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সংকীর্ণ স্বদেশের সংকীর্ণ সীমায়, ফলে গার্হস্থ্য সমস্যার আন্তর্জাতিকতাকরণ তিনি কখনও চান নি। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন।’[২০] মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে [২২-২৪ মার্চ, ১৯৪০] জিন্নার দুই ঘণ্টার উদ্বোধনী ভাষণে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে ‘দ্বিজাতিতত্ত্বে’র ব্যাখ্যা করেন এবং এরই প্রেক্ষিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কর্তৃক ঘোষিত লাহোর প্রস্তাবই[২১] ছিল ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভাবনার চূড়ান্ত প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনাকে ‘পাকিস্তান’ প্রস্তাব বলে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিয়মিত পাকিস্তান প্রস্তাব বলে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতে থাকলে লাহোর প্রস্তাবই হয়ে যায় ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’। আর এই কারণে জিন্নাহ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ‘পাকিস্তান’ শব্দটি আমরা চালু করিনি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার দিয়েছেন।’ বস্তুত জিন্নাহ তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থান থেকে ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ ঘোষণা করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না– এই সত্যটি সর্বজনবিদিত। তথাপি দ্বিজাতি তত্ত্বের

ভিত্তিতে একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার পিছনে ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল। পাকিস্তান বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা খোলাসা করে বলেন নি জিন্নাহ। কারণ সেটা তিনি নিজে জানতেন না এবং অনুগামীদের নিজের পছন্দমাফিক ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা দিলেন।[২২]

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ক্রিপসকে ভারতে পাঠান সরকারের প্রস্তাবনা নিয়ে [২২শে মার্চ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে], যা ইতিহাসে 'ক্রিপস মিশন' নামে খ্যাত। যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীন, একক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠন এবং সদস্যদের মন্ত্রীর মর্যাদা, বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক থাকবেন ইত্যাদি আরো কয়েকটি প্রস্তাবনা আনলেন ক্রিপস এবং বন্ধু হিসেবে অনুরোধ রাখেন এই প্রস্তাব যেন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ক্রিপসের কথায় আস্থা আনলেও যুদ্ধের পূর্বে স্বাধীনতা দাবি করলেন এবং ভারতকে যুদ্ধের মাঠে নেবার একমাত্র এই শর্তেই পথ খোলা আছে। অন্যদিকে সরকারের মিত্র লীগও প্রস্তাবকে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপন্থি দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ক্রিপসের মিশন ব্যর্থ হয়।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা মূলত ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। ফলে, ভারতবাসীর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, চার্চিলের প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়টি আন্তর্জাতিক টেন্ডারবাজি ও স্রেফ আইওয়াশ। তারা ভারতের আধিপত্য এতটা সহজে ছাড়বে না। অধিকন্তু এই মিশন ব্যর্থতা হবার কারণে ভারত-ব্রিটিশের আলাপ আলোচনার দরজাও প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন পতনের পরে মিত্রশক্তির মনোবল ভেঙে পড়ে। ইতোমধ্যে জাপান বাহিনী প্রায় ভারত উপকণ্ঠ বার্মায় এসে পৌঁছালে জনগণের মধ্যে প্রচারণা চলে যে, ভারতেও জাপান আক্রমণ চালাবে। সরকারও ধরে নিয়েছিল যে, জাপানিরা অন্তত বাংলায় আক্রমণ করবেই। তাই যাবতীয় প্রতিরোধমূলক রণকৌশল তৈরি করে রাখে। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্যেই সুভাষ বসু দেশান্তরি হন। এই সুযোগে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছক কষেন এইভাবে,

> The scheme I had in view was that as soon as the Japanese army reached Bengal and the British army withdrew towards Bihar, the congress should step in and take over the control of the country. With the aid of our volunteers, we should capture power in the interregnum before the Japanese could establish themselves.[২৩]

আপরদিকে এই সুযোগকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের মাহেন্দ্রক্ষণ ধরে গান্ধী 'ভারত ছাড় (Quit India) নামে চরম আন্দোলনের ডাক দেন, যা বোম্বাই কংগ্রেসে [৮ আগস্ট ১৯৪২] প্রস্তাব আকারে পাস হয় এবং যাতে সুস্পষ্ট করে বলা হয়, এবার আর ব্যর্থ হবার সুযোগ নেই। Every Indian who desires freedom and strives for it must be his own guide urging him on along the hard road where there is no resting place and which leads ultimately to the independence and deliverance of India.[২৪] কংগ্রেসের এই কর্মসূচি পত্রিকায় প্রকাশ হলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং সরকারও এই আন্দোলনকে গ্রহণ করে ভারত ছাড় আন্দোলন হিসেবেই। তাই কালক্ষেপণ না করে ৯ আগস্ট ভোরে গান্ধীসহ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির[২৫] প্রায় সকলকেই গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। গ্রেফতারের আগে গান্ধী বললেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', আর এটাই মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে জ্বালাময়ী শ্লোগান হিসেবে। খেলাফত আন্দোলনের পরে এই প্রথম কোনো আন্দোলন তৃণমূলের জনগণের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেল। গান্ধী চেয়েছিলেন, আন্দোলন হবে অহিংসার ভিত্তিতে, বাস্তবে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ছিল কংগ্রেসের বামপন্থি ধারার নেতৃবৃন্দের হাতে। তাঁরা ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেন। হরতাল, অবরোধ, বাস-ট্রাম জ্বালাও পোড়াও, আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ইত্যাদি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা, বোম্বাই, পুণা, আহমেদাবাদ, পাটনা ও কলকাতার মত বড়ো বড়ো শহরে এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

কিন্তু এই আন্দোলনও লক্ষ্য পৌঁছুতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হল- গান্ধী আশা করেছিলেন সিপাহী আন্দোলনের মত মুসলমানরাও এবার শরিক হবে কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। বরং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৬-২০ আগস্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে লীগ তার দলীয় ফোরামে। এই মর্মে মূল্যায়ন করে যে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির অন্তরায়। দ্বিতীয় কারণটি ছিল- কম্যুনিস্টরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, যা ছিল যুগপৎভাবে মারাত্মক ও দুঃখজনক। ভারতের স্বাধীনতার চাইতে ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইরত ব্রিটিশ-মার্কিনের সহযোগিতাকেই বড় করে দেখে তারা এবং তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তির বিজয় হলে ভারতের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই আসবে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা এবং পঞ্চম বাহিনীর[২৬] বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে জনগণকে যেমন বিভ্রান্ত করেছে, শ্রমিক সংগঠনকে আন্দোলন থেকে বিরত রেখেছে, তেমনি সরকারের হাতকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়া 'রাশিয়া মডেলে বহুজাতিত্বে'র জন্য জাতীয় সরকারের দাবিতে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রচেষ্টার কথা বলেছে । এইজন্যে কংগ্রেসকে লীগের 'পাকিস্তান দাবি' মেনে নেবার জন্য চাপ প্রয়োগসহ লীগের সাথে প্রকাশ্যে যুক্ত সভা

করে কম্যুনিস্টরা মূলত জিন্নার ‘পাকিস্তান দাবি’কেই শক্তিশালী করে না সরকারের হাতকেও শক্তশালী করে। ফলে দেশভাগ এক ধাপ এগিয়ে যায়। প্রচণ্ড ব্রিটিশ দমন, ঘরের শক্র বিভীষণের মত কম্যুনিস্ট পার্টির তুমুল বিরোধিতা ও সরকারের সাথে আঁতাত এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর জড়িত না হওয়াসহ কৌশলগত কিছু দুর্বল দিক ছিল ভারত ছাড় আন্দোলনের। বাস্তবে মিত্রশক্তির পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে কংগ্রেস ও সুভাষ বসু যে ‘জুয়ো’ খেলেছিলেন সে খেলায় দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।[২৭] প্রহসনের বিষয় হল, এই আন্দোলনের ফলভোগী হলেন জিন্নাহ ও তাঁর দল। এই সময় বাংলায় জিন্নাহ এমনি দাবার চাল চালেন যে, দুইদিনের ব্যবধানে হক মন্ত্রিসভা মেজোরিটি হারায় এবং তাঁর দল নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। হক মন্ত্রিসভার পতনে ‘বাংলার রাজনীতি শাপমুক্ত’ হওয়ায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের দিল্লি সম্মেলনে [২৪ এপ্রিল ১৯৪৩] সভাপতির ভাষণে উল্লাস প্রকাশ করেন জিন্না।[২৮]

অসুস্থতার কারণে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নতুন রাজনৈতিক চাল হিসেবে লীগের সাথে একটি সমঝোতার চেষ্টা করেন গান্ধী। বোম্বে গান্ধী ও জিন্নার আলোচনায় [৬ থেকে ২৭ সেপ্টম্বর ১৯৪৪] সুযোগ বুঝে জিন্না গান্ধীর নিকট লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম, সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও আসাম– এই ছয়টি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের দাবি মেনে নিতে আহ্বান জানান। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দেন গান্ধী এবং জনমত যাচাইয়ের শর্ত জুড়ে দেন যে, তারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চায় কিনা? অবস্থাবৈগুণ্যে এই প্রথম অখণ্ড ভারত আন্দোলনকে ছাড় দিয়ে গান্ধী যেমন জিন্নার সাথে একটা আপোষরফায় আসতে চাইলেন, তেমনি যুদ্ধবিরোধী অবস্থান থেকে সরে এসে সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে চান এই শর্তে যে, ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলে ভারত নিজে থেকেই মিত্রপক্ষ নিবে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। বাস্তবে গান্ধীর দুটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে জিন্নাহ হিসাব কষে দেখেছেন যে, জনমত যাচাই অর্থাৎ গণভোট দিলে ফল উল্টোও হতে পারে। শেষে পাকিস্তান প্রস্তাবটিই নাকচ হয়ে যেতে পারে। তাই গান্ধীর প্রস্তাবে সতর্ক অবস্থান ছিল জিন্নার। গান্ধীর এই আপোষরফার প্রচেষ্টাকে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে একটি মারাত্মক ভুল বলে মনে করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

> It gave a new and added importance to Mr Jinnah which he later exploited fully Gandhiji had in fact adopted a peculiar attitude to Jinnah from the very beginning. Jinnah a had lost much of his political importance after he left the Congress in the twenties. It was largely due to Gandhiji’s acts of commission and omission that Jinnah regained his importance in Indian political life.In fact, it is doubtful if Jinnah could have ever achieved supremacy but for Gandhiji’s attitude.[২৯]

জিন্না ও লীগের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম প্রমাণ দেখা গেল সিমলা সম্মেলনে [২৫ জুন ১৯৪৫]। অনেকটা অন্যায়ভাবেই ‘ওয়াভেল প্লানে’[৩০] অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করে সম্মেলনকে পণ্ড করেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আন্তরিক উদ্যোগ ভেস্তে যায়। বিশেষত যেখানে শুধু ভারতীয়রাই প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন এই প্রথম ভারতীয়দের হাতে আসার সুবর্ণ সুযোগ ছিল– তা অকালেই বাতিল হয়ে গেল জিন্নার গোয়ার্তুমির জন্যে। নইলে সব ইস্যুতে এই প্রথম একমত হলেও জিন্নাহ কিভাবে দাবি করলেন যে, কংগ্রেস তার দল থেকে কোন মুসলমানকে মনোনীত করতে পারবে না। জিন্নার এই দাবি ছিল অবাস্তব ও অযৌক্তিক। কেননা কংগ্রেসের চলমান সভাপতি ছিলেন একজন মুসলমান এবং অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের সরকার তখনও বিদ্যমান। ‘ওয়াভেল প্লান’ মেনে নিলে মুসলমানের জন্যেই লাভজনক হত।

> If therefore the Conference had not broken down because of Jinnah’s opposition, the result would have been that Muslims who constituted only about 25percent of the total population of India, would have had seven representatives in Council of four teen.[৩১]

ফলে সিমলাতেই জিন্নাহ চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলেন, নিজের দাবির পক্ষে তিনি কতটা লৌহমানব, প্রয়োজনে ব্রিটিশরাজকেও তোয়াক্কা করেন না। এরিসাথে সিমলাতেই কবর রচিত হয় অখণ্ড ভারতের শেষ সম্ভাবনা। সিমলা সম্মেলন ভেঙে গেলে ব্রিটেনের নব নির্বাচিত [১৯৪৬] শ্রমিক দলের সরকার এই সত্য স্পষ্টতই জেনে যায় যে, এরপরে অখণ্ড ভারত ভাবনা বালখিল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রধান এটলি তাঁর মন্ত্রী পরিষদের তিনজন কেবিনেট মন্ত্রী যথাক্রমে লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও এ. ভি আলেকজান্ডারকে নিয়ে একটি ‘কেবিনেট মিশন’ গঠন করেন। এই মিশন দিল্লিতে এসে পৌঁছায় ২৪মার্চ ১৯৪৬-এ। রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এসে একটি বাস্তব দিক আবিষ্কার করে মিশন, তা হল, বিষয়টি মোটেই সহজ কোন বিষয় নয়। বিশেষ করে আলোচনা চলাকালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক গাদা দাবিনামা উপস্থাপন করে কমিশনের সামনে। কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা, অন্তর্বর্তী সরকার ইত্যাদি কয়েকটি সর্বভারতীয় জনগণের পক্ষে দাবি উত্থাপন করলে জিন্নাহ বিরোধিতা করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবিকে প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ এবং ছয়টি প্রদেশের জন্য আলাদা সংবিধান পরিষদ দাবি করেন, যারা বিশেষ গ্রুপের সংবিধান রচনা করবেন। তৃতীয়ত, গান্ধী নিজের পক্ষ থেকে বন্দি মুক্তি ও লবণ কর প্রত্যাহারসহ তিন দফা দাবি পেশ করে তা বাস্তবায়ন করে সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ উপস্থাপন করতে বলেন। ফলে মিশন ত্রিমুখী টানাপোড়নে পড়ে– দুই রাজনৈতিক দলের দুই মেরুতে অবস্থান এবং সেই সাথে আছেন ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের নায়ক গান্ধী, যে কিনা যে কোন মুহূর্তে মিশনকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন । ইতঃপূর্বে ক্রিপশ মিশনের ব্যর্থতাসহ ব্রিটিশ সরকারের বেশ কয়েকটি মিশনকে বানচাল করার নেপথ্যে নায়ক হিসেবে গান্ধীকে মনে করে সরকার। ফলে সুনির্দিষ্ট কোন ছক এঁকে না আসলেও ১৬ মে কেবিনেট মিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করে। যেখানে গোটা দেশকে এ, বি, সি এই তিনটি সেকশনে[৩২] ভাগ করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপরিষদ ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করবে বলে সেই মোতাবেক গণপরিষদের আসন বন্টনও করে মিশন। মিশনের প্রস্তাব ও আসন বন্টন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে লীগ ও কংগ্রেস সম্মতি জানিয়েছে। তবে দু দলের লক্ষ্য দুই বিপরীত দিকে-কংগ্রেস গণপরিষদে যোগ দিতে চেয়েছে একটি অখণ্ড ভারতের সংবিধান পাবার লোভে, অন্যদিকে দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক জিন্নাও বিশ্বাস পান যে, মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে পাকিস্তানের দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব। কিন্তু প্রদেশগুলোর সাধারণ নির্বাচনে লীগের ভরাডুবিতে জিন্নার সেই আশা গুড়েবালি হয় । এরপরে জুলাইতে গণপরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেখা যায় যে মোট ২৯৬টি আসনের বিপরীতে মুসলিম লীগ পেয়েছে ৭৩টি এবং ২১২টি আসন পেয়ে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন জিন্নাহ নতুন ফাঁদ পাতেন। দাবি করেন, অন্তর্বতী সরকারে মুসলমান সদস্যদের মনোনয়ন দিবে মুসলিম লীগ। ভাইসরয় তাঁর এই দাবি মেনে নিলে তৈরি হয় নতুন সংকট। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আর খালি মাঠে গোল দেবার এই অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগাতে জিন্নাহ প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করেন, যেন কংগ্রেসকে ছাড়াই সরকার গঠন করা হয়। ভাইসরয় রাজি না হলে [হবে না যে তা জিন্নাও জানতেন] ক্রুদ্ধ জিন্না ২৯ জুলাই কেবিনেট মিশনের উপর আস্থা প্রত্যাহার করেন এবং গণপরিষদে যোগদানে বিরত থাকেন। শুধু সমর্থন প্রত্যাহার আর গণপরিষদে যোগদান থেকে বিরত থেকেই নীরব থাকেন নি, এবার পাকিস্তান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা দিলেন। আর কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা গেল গোটা দেশে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মুসলমানরা। বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে ঐদিন ছুটি ঘোষণা করে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, কংগ্রেস সরকার গঠন করলে সারা বাংলা বিদ্রোহ করবে। এর তীব্র প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা গেল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল। প্রায় ৫হাজার নিহত হল এবং পনেরো হাজার আহত ও আশ্রয়চ্যুত হল।[৩৩] মৌলানা আজাদের ভাষায়,

> 16 August was a black day in the history of India. Mob violence unprecedented in the history of India plunged the great city of Calcutta into an orgy of bloodshed, murder and terror.Hundreds of lives were lost. Thousands were injured and property worth crores of rupees was destroyed. Procession were taken out by league which began to loot and commit acts of arson. Soon the whole city was in the grip of goondas of both the communities.[৩৪]

এর পরে বোম্বাই, বিহার, ঢাকা, আহমেদাবাদ, কলকাতা নিয়মিতই দাঙ্গা হতে থাকলো। আর এরই চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে নোয়াখালিতে [অক্টোবর ১৯৪৬]। লুটপাট, হত্যা, অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে নোয়াখালি সদর ও ফেনি মহকুমার ২০০ কিলোমিটারের গ্রামগুলোতে চলে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা।

অনেক নাটকীয়তার শেষে সরকারে যোগদানে সম্মত হন জিন্নাহ। লীগের পক্ষ থেকে সদস্য মনোনয়ন দেওয়া হয় পাঁচজনকে[৩৫]। কিন্তু কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ অব্যাহত রাখেন। ফলে কংগ্রেসকে সরকার ভেঙে নতুনভাবে গড়ার দরকার পড়ে। তখনই ঘটে আর এক নতুন বিপত্তি। মুসলিম লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দাবি করে, কিন্তু প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছাড়তে রাজি না হওয়ায় শেষে লিয়াকত আলীকে অর্থমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। এই সুযোগে, অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী কংগ্রেসের মেম্বারদের যে কোন পরিকল্পনাকে হয় বাতিল করে দিতেন, আর না পারলে নিজে কেটে বদলে ফেলতেন। পরিস্থিতি এমনি ছিল যে, একজন চাপরাশি নিয়োগ করতে হলেও লিয়াকত আলীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত কংগ্রেস সদস্যদের। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সর্দার প্যাটেল মারাত্মক প্যাঁচে পড়েন। ফলে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রথম থেকেই দানা বাঁধে। ষাট বছরেরও অধিক সময় ধরে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন লালনকারী কংগ্রেসও শেষে ভারত বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা আর অস্বীকার করতে পারল না। ১৯৪৭ এর ৮ মার্চের কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে ভারত বিভক্তির পক্ষে অবস্থান নেয় নেতৃবৃন্দ। ইতোমধ্যে বিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে ভারতে

স্বাধীনতার জন্য টাইম ফ্রেম বেঁধে দিলেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসকে এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে প্রত্যাহার করে মাউন্টব্যাটেনকে স্থলাভিসিক্ত করলে ভারত ভাগের প্রায় সকল আয়োজনই শেষ হয়ে আসে। মাউন্টব্যাটেন ২২ মার্চ ভারতে আসেন। এসেই দেখলেন সমগ্র ভারত বারুদ হয়ে উঠেছে এবং ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে। তাই খুব দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে না পারলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সেই মোতাবেক প্রদেশগুলোর স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে একটি খসড়াও প্রস্তুত [২ মে ১৯৪৭)করেন। প্রদেশগুলো স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস তীব্র বিরোধিতা করে এই মর্মে যে, ভারত গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়বে এবং গৃহযুদ্ধ এড়ানো যাবে না। পরে খসড়া পরিবর্তন করে ডোমিনিয়ন মর্যাদার [dominion status] ভিত্তিতে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেন এবং মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের স্বাধীনতা দিলেন। এরপরে বিট্রিশ সরকারের পরামর্শক্রমে মাউন্টব্যাটেন ২ জুন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মিলিত হন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় পক্ষ থেকেই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে সম্মতি পান। পরের দিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই দিনে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক বাকবিতণ্ডার পরে মাউন্ডব্যাটন পরিকল্পনা অনুমোদন পায়। এরপর ১৪ইজুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভারত বিভাগের প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।[৩৬]

কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সেবক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই দেশভাগকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এই দেশভাগের জন্য কেবল জিন্না নয়, এবার প্যাটেলকে দায়ী করেছেন এবং 'দেশভাগের প্রবর্তক' বলেছেন। কেননা মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার প্রথম টোপ গিলেছিলেন তিনিই। আর যে গান্ধী বলেছিলেন 'যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি কিছুতেই ভারত বিভাগে রাজী হব না।' সেই তিনিই ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে এক প্রকার মেনে নিলেন। আর নিলেন প্যাটেলের পরামর্শেই। ক্ষুব্ধ আজাদ বলেন : I was surprised that Patel was now an even greater supporter of the two nation theory than Jinnah. Jinnah may have raised the flag of partition (partion) but now the real flag bearer was Patel.[৩৭]

অবশেষে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ভিত্তিতে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হল– ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। সেই সাথে পূর্ণ হল জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের অভিলাষ, পূর্ণ হল প্যাটেল-নেহেরুর অভিলাষ, গদিতে বসলেন ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খুশি মনেই বিদায় নিল, কিন্তু যাদের জন্য এই দেশভাগ, সেই জনগণ এই দেশভাগ মেনে নিল কিনা কেউ দেখতে গেল না কিংবা দেখতে চাইল না। বাংলা ও পাঞ্জাবকে কেটে দুই টুকরো করে কসাইয়ের মাংস বণ্টনের দুইভাগে ভাগ করে নিলেন জিন্না-প্যাটেল-নেহেরুরা কিন্তু একবার কি ভেবেছেন কিংবা দেখেছেন যে, কি পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছিল সেদিন। কি পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া কোটি কোটি হিন্দুজনগোষ্ঠীর এবং ভারতের থেকে যাওয়া চার কোটি মুসলমানের অন্তর চুঁইয়ে। গান্ধীর অনশনই [১২ জানুয়ারি ১৯৪৮] কি যথেষ্ট নয়– এই ইতিহাসের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য। ভারত ছেড়ে পাকিস্তান চলে যাবার সময় জিন্না বিবৃতি দিলেন-'সংখ্যালঘুরা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তার প্রতি অনুগত থাকবে।' এত বড় প্রতারণার ইতিহাস আর কোথায় আছে? কোথায় গেল তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বের থিওরি! যে অবিশ্বাসের রক্ত দুই ঘরানার রাজনৈতিক নেতাদের ভিতরে বইছিল, সরবে কি তা প্রকাশ পায় নি কিংবা পাচ্ছে না। 'দেশভাগ আমাদের কী দিল? কোটি কোটি মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন কষ্ট আর যন্ত্রণা, একটা স্থায়ী অভিশাপ।' স্বাধীন ভারত একটি কঠিন রোগ নিয়ে জন্মায়– বিকলাঙ্গ।[৩৮] মধ্যরাত্রির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত পোশাকি স্বাধীনতার সাধ ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানেই এতই বিষাক্ত হয়ে উঠল যে, অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে পরিণত হল পাঞ্জাবসহ সারা ভারতবর্ষ! ১৪ আগস্ট লাহোর স্টেশনে শিখদের উপর আক্রমণ, ১৫ আগস্ট অমৃতসরের বাজারে গণহত্যা ও মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ, পাঞ্জাবের গণহত্যা, দিল্লির মুসলমানদের কচুকাটাসহ সর্বশান্ত ও সর্বহারার মিছিল দিয়ে পালিত হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উৎসব, আর উৎসবের খরচা হল ৬ লক্ষ ভারতীয়ের প্রাণ, ১ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম ও ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও অগণিত মন্দির-মসজিদ-মাজার ধ্বংসতাণ্ডব। 'মানুষ যদি পশু হয়ে যায় তবে এই স্বাধীনতা কার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের কথিত 'অতিনৃশংস আত্মবিচ্ছেদে'র যন্ত্রণায় পাণ্ডব হয়ে কাতরিয়েছে দুই ভূখণ্ডের বাসিন্দারাই: নিজের আবাসভূমি ছেড়ে যারা পালাতে পারল কিংবা মাটি কামড়ে থেকে গেল যারা, সকলেই নিজ দেশে উদ্বাস্তুর মর্যাদা পেল। আততায়ীর গুলিতে আটচল্লিশে গান্ধীর, জিন্নার অপমানজনক প্রয়াণ, লিয়াকত আলীর হত্যা, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের রহমানের নৃশংস হত্যা, এইসব কিসের আলামত? এই ট্র্যাজেডির শেষ কি হয়েছে? না শেষ আছে? এই ট্র্যাজডির মঞ্চায়নে নায়কের যাতনা ভোগ করছে খণ্ডিত বাংলা ও তার বাইশ কোটি বাঙালি সন্তান– 'যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, বাংলায় স্বপ্ন দেখেন, বাংলা একে- অন্যকে আলিঙ্গন করেন, তাদের সুখ ও আকাঙ্ক্ষার অখণ্ড জমি নেই কোথাও। তাদের চিন্তা খণ্ডিত। চিন্তার চাষবাসও

খণ্ডিত।'[৩৯] দুই জাতির অখণ্ড ভালবাসার সুতা কেটে দিয়েছে ক্ষমতা লোলুপ দেশীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ ভেদনীতি। আজও তার আত্মপরিচয় হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। সন্দেহে ঘোরপাক খাচ্ছে– সে কতটা বাঙালি, আর কতটা বাংলাদেশি বা ভারতী, কতটা মুসলমান বা হিন্দু, কতটা বাঙালি মুসলমান বা বাঙালি হিন্দু! কোন সত্তাটি তার বড়–ধর্মীয় সত্তা না বাঙালি সত্তা!

তথ্যসূচি:

---

১. ১৮৫৬ সালে সৈন্যবাহিনীর খরচ ছিল ১কোটি ১৫লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৫৯ সালে তা বেড়ে হল ২ কোটি ৯৯ পাউণ্ড। এ বিপুল ব্যয়ভার মেটাতে সরকারকে বিলেত থেকে প্রভূত ঋণ নিতে হল যার বার্ষিক সুদের পরিমাণই ২০ লক্ষ পাউণ্ড। (অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস(১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিসার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৭, কলকাতা.পৃ. ২৪

২. অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ. ২৮

৩. জন. আর. ম্যাকলেন, *বঙ্গবিভাগ(১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস(১৭০৪-১৯৭১)*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৩৩০

৪. ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী মৈমনসিংহের বা নিকটবর্তী শহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। সাধারণ মানুষ এতে আলোড়িত হয় নি, হলে বঙ্গভঙ্গ সম্ভব হতো না। মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্র ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৩১-৩২

৫. রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায়, '*জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে স্বদেশি আন্দোলন*' . মো. মাহবুবর রহমান (প্রধান সম্পাদক) ও স্বরোচিষ সরকার(সম্পাদক), *বিশশতকের বাংলা(সেমিনার খণ্ড)*, আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১০, পৃ. ৩২

৬. ৭ই মার্চ ঘোষণা করলেন ১৯শে মার্চ(১৯২০) খিলাফৎ দিবস রূপে পালিত হবে, হরতাল দিয়ে শুরু এবং দাবি গৃহীত না হলে সত্যাগ্রহ। সত্যগ্রহের কয়েকটি পর্ব নির্দিষ্ট করলেন তিনি–(১) ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সম্মান ও উপাধি প্রত্যাহার (২) কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ (৩) আসন্ন নির্বাচন বর্জন (৪) সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং (৫০) সর্বশেষে খাজনা ও করদান বন্ধ। উইকলি রিপোর্ট ডি সি আই, ৫ এপ্রিল ১৯২০, হোম পল ডিপোজিট(দ্রষ্টব্য: অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৭. ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'কাউন্সিল এন্‌ট্রি' প্রোগ্রাম করেন। কংগ্রেস তাঁর মত গ্রহণ না করায় ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতেই তিনি স্বরাজ দল গঠন করেন। ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক নেতা দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। (আবুল মনুসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ৫ম সং ডিসেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ৩৬

৮. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Orient Longman, NewDelhi, p. 18

৯. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর : ইতিহাসের কাছে অঙ্গীকার', আশিস নিয়োগী(সম্পাদক), *স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ: আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা সম্ভাবনা*, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা, পৃ. ১০৮

১০. অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

১১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১২. অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

১৩. ১৯১৯-২৯ এর মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, আর শুধু ১৯৩০–এ ঘটেছিল ৫৬টি। (অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

১৪. এই ঘোষণায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসনগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায় ওস্বার্থের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। বাংলা প্রদেশের জন্য ২৫০টি আসন নিম্নরূপে বিভক্ত করা হয়। মুসলমান ১১৭, মুসলমান মহিলা ২, সাধারণ (হিন্দু) ৭০, অনুন্নোত হিন্দু শ্রেণি ১০, হিন্দু মহিলা ২, ইউরোপীয় ১১, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ১৪, ভারতীয় ব্যবসায়ী ৫, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয় ২, ক্রমিক ৮, এাংলো ইন্ডিয়ান ৩, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা ১। আসন বণ্টন ছাড়াও মুসলিম, শিখ ও ইউরোপীয়দের জন্য ভারতীয় আইন সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা এবং মুসলিম সংরক্ষিত আসনে কেবল মুসলমান ভোটার ভোট দিবে এমন সিদ্ধান্ত হয়। এই ঘোষণার পর ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যার অলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করা হয়। [ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-৪৭)*,তাম্রলিপি, প্র প্র ফেব্রয়ারি ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৮৭]

১৫. ১৯৩৭ বাংলায় আসন প্রাপ্তি ছিল–কংগ্রেস ৫২, বর্ণ হিন্দু ৩,হিন্দুসভা(তপসিলী) ৩ স্বতন্ত্র হিন্দু ১৫, স্বতন্ত্র তপসিলী ২৪ মুসিমলীগ ৩৯, প্রজাপার্টি ৩৬, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪৩, ইউরোপীয়ান ২৫, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪, ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চয়ান ২, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫ মোট ২৫০টি, (ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১)

১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

১৭. হারুন-অর-রশিদ, '*বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা, ১৯৩৭-১৯৪৭*', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

১৮. Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 27

১৯. রঞ্জিত সেন, জিন্না-গান্ধী-সুভাষ, আশিস নিয়োগী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫

২০. রঞ্জিত সেন, জিন্না-গান্ধী-সুভাষ, আশিস নিয়োগী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৮

২১. লাহোর প্রস্তাবের প্রধান বিষয় ছিল-১. ভারতের সকল অঞ্চলের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট, যথা উত্তর পশ্চিম ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারত, সে সকল এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ' গঠন করতে হবে। ২. এই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। (ড. মো.মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২)

২২. যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*, প্রথম বি আর পি সংস্করণ, ঢাকা. ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৩৮

২৩. Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 74

২৪. Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 270

২৫. গ্রেফতারকৃতরা হলেন; মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (কংগ্রেসের সভাপতি), জওহরলাল নেহেরু, আসফ আলী, ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ, শঙ্কর রাও দেও, সর্দর বল্লভ ভাই প্যাটেল, গোবিন্দ বলভ পন্থ, ডাক্তার পট্টভি সীতারামাই, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল ঘোষ প্রমুখ। তাঁদেরকে আহমেদনগর ফোর্ট জেলে রাখা হয়েছিল। আর গান্ধীকে পুণায় রাখা হয়েছিল।

২৬. কম্যুনিস্টরাই পঞ্চম বাহিনীর স্রষ্ঠা। বোম্বাইতে ১৯৪৩ এর ২৩ মে সি পি আই-এর প্রথম কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয়– 'পঞ্চম বাহিনীতে যারা রয়েছে তারা হল–ফরওয়ার্ড ব্লক, বিশ্বাঘাতক বোসের দল; সি এস পি যা যুদ্ধের প্রথমেই সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সুবিধাবাদ ও বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করে, শেষে ট্রটস্কিপন্থি (!) বিশ্বাসহন্তাদের শিবিরে যোগ দেয়; এবং পরিশেষে ট্রটস্কিপন্থী গোষ্ঠী যারা ফাসিবাদীরা টাকা খাওয়া অপরাধীর দল। কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা করছে যে এই তিনগোষ্ঠীকে প্রত্যেক সত্যকার ভারতীয় যেন জাতির হীনতম শত্রুরূপে গণ্য করে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে বিতাড়িত করে এবং নিশ্চিহ্ন করে..। (অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০)

২৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৬

২৮. যশোবন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

২৯. Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 96-97

[৩০.] ভারতের নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। ২. বড় লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সম সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়া হবে। ৩. একমাত্র বড় লাট ও প্রধান সেনাপতি ভিন্ন কাউন্সিলের অপর সকল সদস্য ভারতীয় হবেন ৪. যতদিন ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যাস্ত থাকবে ততদিন সামরিক দপ্তরের ভার ব্রিটিশের হাতেই বহাল থাববে। (প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, চতুর্থ সংস্করণ; নভেম্বর ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ২৭১)

[৩১.] Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 121

[৩২.] এ সেকশন-চেন্নাই, মুম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, ওড়িশা, বি-সেকশন; পাঞ্জাব, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত ও সি-সেকশন; বাংলা ও আসাম

[৩৩.] প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

[৩৪.] Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 169

[৩৫.] মনোনীত পাঁচজন হলেন; লিয়াকত আলী, আই. আই. চুন্দ্রিগড়, আব্দুর রব নিশতার, গজনফর আলী আর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (তপসিলী নেতা)

[৩৬.] প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫

[৩৭.] Maulana Abul Kalam Azad, *Ibid* , p. 201

[৩৮.] মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্বাধীনতার সালতামামি*, আশিস নিয়োগী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

[৩৯.] বাহারউদ্দিন, *অলিখিত মানচিত্রের খোঁজে*, আশিস নিয়োগী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৮

দুই বঙ্গে, বাংলার বাইরে, গত পাঁচ দশকের বাঙালীর লড়াই এর অন্য নাম কেবলই আত্মত্যাগ, রক্তক্ষরণ এবং ভাঙন। তার পরিবার ভেঙেছে। দেশ ভেঙেছে। হৃদয় ভেঙেছে। আমরা মোটামুটি জরিপ করে দেখেছি, গত পঞ্চাশ বছরে, দাঙ্গা, ভাষাদাঙ্গা, রাজনৈতিক দাঙ্গা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাঙাল খেদাও, আসাম-ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে সুপরিকল্পিত গণহত্যা, ৫০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ খুইয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই শুধু নিহতের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। পৃথিবীর আর কোন জাতিকে, এইভাবে তার জমি, জল, জঙ্গল ও জনবল হারাতে হয়েছে? যেখানে সে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেই তার সামনে ঝলসে উঠেছে তরবারি। স্বভূখণ্ডেই নিরাপদ নয় সে। আত্মঘাতী রাজনীতি বিপন্ন করেছে তার অর্থনীতিকে। অন্যের জবরদখল বিপন্ন করেছে, ক্রমাগত করে যাচ্ছে তার সত্তাকে। (বাহারউদ্দিন, পৃ. ৪৮৪)

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাংলায় সুলতানি আমলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ড. আবু নোমান*

[Abstract : Bangla is an ancient habitation. 'Bango' was one of the ancient names among many ancient names of Bangla. From time immemorial, this region was considered as the central point of harmony alliance of different religions, classes, casts and crudes. Before the advent of Muslim, this region was mainly the residence of Hindu and Buddha. During this period the internal conflict, disputes and whimsical nature of that religious causad insult of humanity very often. As a result, the society had been filthy and contaminated. People of lower class tried to live with honour, but the humanity of lower class society was sacked and harrased by the people of the so called upper class society against their hope and expectations. The communication between Arab, the birthplace of Islam, and Bangla is primitive. At first the cause of this communication was business. Subsequently, Muslim preachers with the Arab businessman came in Bangla and started religious preaching. In 1204, Ikhtyar Uddin Muhammad Bakhtyar Khaljee first introduced Muslim rule conquering Bangla. Islam gives lesson in showing respect toward others and human rights. As a result, people of the lower class society of Bangla paid full attention converting themsalves into Islam. Under the rule of Muslim society in Bangla, a beautiful facilitating and a friendly relationship entered into an alliance among different religions, colours and customs. So, the society became heal and hearty. During the reign of Sultani dynasty (1204-1576), religious freedom and communial satisfaction was present there except some detatched incidents. Infact, no religion doesn't give lesson of destroying the religious patience and communal satisfaction. And it is irreligion which is upholder. During Sultani dynasty in Bangla the pictures of the religious patience and communal satisfaction depicted during the Sultani age will be mentioned in this topic as follows.]

বাংলা প্রাচীন জনপদ। এর অনেকগুলো আদি নামের একটি নাম ছিল বঙ্গ।[১] বাংলার সীমান্ত অঞ্চলগুলোর কোন কোন এলাকা কখনো বাংলার সঙ্গে কখনো বাইরের অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়েছে। সুতরাং ভূগোল, ভাষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালি এবং যে ভু-খন্ডকে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে নির্ণয় করে থাকি, তা আধুনিক কালের।[২] সপ্তম শতকের প্রথম দিকে রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ের রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনপদগুলো এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর পরে পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদই বাংলাদেশ নামের সমার্থক হয়ে ওঠে।[৩] মধ্যযুগেও বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। কারণ পরিবর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বাংলার আকার, আয়তন ও অবস্থানের প্রায়শই পরিবর্তন ঘটেছে।[৪] ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বিজয়ের সময় বাংলার অবস্থান ছিল- উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে তেলিয়াগতি গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল জনপদ।[৫] ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] এ সময় স্থানটি গৌড় ও লক্ষণাবতী এবং মুসলিম বিজয়ের পরে লখনৌতি হিসেবে পরিচিত হয়।[৭] বঙ্গ বা বাংলা নামে বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয় সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশ বিজীত হওয়ার পর 'বাঙ্গালা' শব্দ দ্বারা সারা বাংলাদেশ নির্দেশ করতো। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়কাল থেকে বাংলায় সুলতানদের পতনকাল (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ৩৭২ বৎসরাধিককাল বাংলায় সুলতানি শাসন স্থায়িত্ব লাভ করে। এই মুসলিম শাসনের এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল অনুকরণীয়।

সমাজে সুন্দরভাবে বসবাসের জন্যই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্ম হচ্ছে মানুষের একটি বিশ্বাস যা তাকে সঠিক ও সুন্দর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধান। এ ছাড়াও ধর্ম বলতে সৎকর্ম, পুণ্যকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] আবহমান কাল ধরে যুগে যুগে সমাজে ধর্ম প্রচলিত ছিল। ধর্ম মানুষকে অন্যায়, অপকর্ম, লোভ-লালসা, অনাচার-ব্যভিচার, কুসংস্কার পরিহার করে সত্য, যুক্তিপূর্ণ, সুন্দর ও কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করে। ফলে সমাজ সকল অনাচারমুক্ত হয়ে ভালো মানুষের সহাবস্থানে পরিণত হয়। সকল ধর্মের মূল কথা হচ্ছে সমাজের মানুষের কল্যাণ।[৯] পালনীয় কার্যে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলেও সকল ধর্মের উদ্দেশ্য সমাজে সুন্দরভাবে বসবাস করা। সকল ধর্ম মানুষকে ভালো কাজের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকলেও ধর্মের অনুসারীরা অনেক সময়ে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ হয়। ফলে ধর্মের মূল ধারা থেকে তারা হয় বিচ্যুত। এ সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায়, ধার্মিকরা হন সমাজের সুন্দর ও পরিশীলিত মানুষ। ধর্ম সমাজকে অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের পথে, অন্যায়ের পথ থেকে ন্যায় ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করে। ফলে সমাজ হয়ে উঠে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য।

সুলতানি আমলে বাংলার সমাজ ছিল নানা ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত। প্রধানত হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ এই তিন ধর্মের মানুষ এ সময়ে বাংলায় ছিল। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিমই ছিল সমাজে গুরুত্বপূর্ণ।[১০] সংখ্যাল্পতা ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব সমাজে তেমন ছিল না বললেই চলে। নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুরাচার[১১], হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দাপট, পক্ষান্তরে ইসলামের উদারনৈতিক আহ্বানে দিন দিন তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে সমাজে তাদের অবস্থা ছিল অনেকটাই নিশ্চিহ্নপ্রায়।[১২]

বর্ণের দিক হতে বাংলায় হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণি ও উপশ্রেণিতে ছিল বিভক্ত। হিন্দু সমাজের বর্ণবাদের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। কারণ বর্ণবিন্যাসের ভিত্তিতেই ভারতে সমাজ বিন্যাসিত হয়েছে।[১৩] এ সময়ে বাংলায় প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের হিন্দু দেখা যেত। এর বাইরের আরো অসংখ্য বর্ণ ও কোম বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক বর্ণ ও কোমের ভেতর আবার স্তর এবং উপস্তর ছিল।[১৪] হিন্দু ধর্ম মূলত আর্য ধর্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৫] আর্যরা ছিল বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। একত্ববাদী অনার্য তথা দ্রাবিড়দের পরেই আর্যরা বাংলায় আগমনের ধারা রচনা করতে শুরু করে। বাংলায় দ্রাবিড়রা প্রথম ধর্ম পালন করতো বলে ধারণা পাওয়া যায়। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাতে অনুমান করা সমীচীন যে, তারা ছিল সেমিটিক[১৬] ধর্মের অনুসারী। সেমিটিক ধর্মমত একত্ববাদের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে আর্যরা যারা বাংলায় এসেছিল তারা ছিল বহুত্ববাদের অনুসারী। এ কারণে সেমিটিক দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের বিরোধ চলতে থাকে। আর এ বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।[১৭] তার প্রমাণ হিন্দুদের পুরাণাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকেও জানা যায়।[১৮]

আর্যরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতির পূজা করতো। এ ভাবে তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনুমিত হয়। সাধারণত হোম, যাগ-যজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের ব্রাহ্মণরা পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করতো। ধর্মকার্য অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দানের ফলে সমাজে তারা বেশ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ, অবতার, অতিমানব ও মানবশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রচার করতে থাকে। এভাবেই আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পরিণত হয়। আর্যধর্মে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পর সমাজ জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। এভাবেই ব্রাহ্মণরা সমাজের উচ্চ শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। এমনকি অস্ত্র পরিচালনা ও শাসন কার্য পরিচালনারত ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণদের নিচের শ্রেণির নাগরিক হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হয়। তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বৈশ্যরা স্থান লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কারবার ছিল তাদের কাজ। সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের নাগরিক হিসেবে স্থান পায় শূদ্ররা। এভাবে আর্যরা নিজেদের অবস্থানকে ঊর্ধ্বে রেখে সমাজের বিস্তৃত অগণিত সাধারণ নাগরিকদের চতুর্থ শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও বঞ্চনার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে থাকে। ফলে সমাজ জীবনে এক অসহনীয় পরিবেশ বিস্তার লাভ করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে জৈন ধর্মের প্রচারক বর্ধমান মহাবীর[১৯] এক বঞ্চিত ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সমাজের অস্থিতিশীল, উচ্ছৃঙ্খলাপূর্ণ এবং মানবতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা অবলোকন করে শান্তির প্রত্যাশায় গৃহত্যাগ করে বনে জঙ্গলে কৃচ্ছ্রতা সাধনে ব্রতী হন।[২০] খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর বাংলার রাঢ় প্রদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[২১] প্রথম দিকে এ ধর্মের কোন লিখিত ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তাই তাদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে বিশৃংঙ্খলা দেখা দেয়। পরবর্তীতে এ ধর্মের বিধান সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় শতকে এই ধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতকের দিকে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর (৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণের আলোকে জানা যায় বাংলার জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।[২২] পরবর্তীতে হিন্দুরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জৈনদের এবং তাদের ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে থাকে। ধীরে ধীরে জৈন ধর্ম হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের সাথে বিলীন হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের মাঝে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ।[২৩] হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ অনার্য ও দ্রাবিড়রা বৌদ্ধমত গ্রহণ করে নিজেদের সম্মান ও মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। গুপ্ত যুগ ও গুপ্তোত্তর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাল-চন্দ্র বংশের শাসনাধীনে অত্র অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সপ্তম শতকের দিকে খড়গ বংশীয় রাজারা অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল রাজারা, দশম শতকে কান্তিদেব দশম-একাদশ শতকের দিকে চন্দ্র বংশীয় রাজারা, দশম শতকের কম্বোজাম্বর রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[২৪] বৌদ্ধ রাজাদের প্রচারণা ও

ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এই ধর্ম মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের প্রধানতম ধর্মে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের রোষানলে পতিত হয়। এবং ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শীদের প্রভাবেই বৌদ্ধ ধর্ম ভেঙ্গে মহাযান ও হীনযান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত অংশগুলোও হিন্দুদের প্রভাবে অনেক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

গুপ্তপূর্ব যুগেই শৈব ধর্ম পরিপূর্ণরূপ লাভ করে।[২৫] পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে শিবের পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকে শৈব ধর্ম পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। পাল চন্দ্র যুগে শৈব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।[২৬] সেন রাজাদের মধ্যে রাজা বিজয় সেন ও বল্লাল সেন শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সৌর ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল বাংলায়। রাজশাহী জেলার কুমারপুর, নিয়ামতপুরে, বগুড়া জেলার দেওড়ায় এবং চব্বিশ পরগণার কাশীপুরে সূর্যমূর্তির অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া গেছে। পাল চন্দ্র যুগে এই পূজার বিশেষ প্রসার ঘটে।[২৭] বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ছিলেন সূর্য পূজারী।

বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লালন ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। আর্য ধর্ম থেকে শুরু করে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, সৌর প্রভৃতি ধর্ম ও বর্ণের আশ্রয়ে বাংলার বিভিন্ন কালের মানুষ তাঁদের সংস্কৃতিতে পেয়েছে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা। সুলতানি যুগে এই সমস্ত ধর্ম-বর্ণের লীলাভূমি বাংলায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক কবি ও লেখকদের অনেকে এই সময়ের ধর্মীয় পরিবেশকে অত্যন্ত বিপর্যয়কর বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকে এই সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে একটি চমৎকার অধ্যায় বলে মন্তব্য করতেও কোনোরূপ দ্বিধা করেননি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একই জায়গায় পরস্পর দুটি বসবাসরত জাতি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক ও সমঝোতার একটি সূত্র তৈরি হয়েছিল।[২৮] সে সম্পর্ক শুধু রাজা ও প্রজা বা শাসক-শাসিতের মত নয়। নিজেদের অন্তর্গত বিভিন্ন গলদ ও দুষ্কর্মের কারণে হিন্দুদের একটি শ্রেণি বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মানুষ মুসলমানদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। সামাজিক অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের বিভিন্ন কাজকর্মের সহযোগী হয়েছিল। এমনকি নিজেদের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল যা উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের জন্য ছিল একটি মারাত্মক আঘাত। ফলে দেখা গেছে, কিছু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করে চললেও অনেক হিন্দু মুসলমানদেরকে তাদের চিরশত্রু কল্পনা করে অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেছিল।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় বসবাস করতো মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক জৈন। পাল বংশের পতনের পর থেকে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক প্রাধান্য কমতে থাকে। গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু সেন রাজবংশের আরোহণের ফলে বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।[২৯] হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও বর্ণপ্রথার কঠোর নিয়মের শৃংখলে গোটা বাংলার জনপদ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু রাজা, অমাত্যবর্গ ও রাজ সুবিধাভোগীরা ছাড়া সকলেই কামনা করছিল।

সেন বংশের শাসনামলে বাংলার অধিবাসীরা যে উৎপীড়ন-নীপিড়নের মধ্যে বিরাজ করছিল তার প্রমান পাওয়া যায় বিভিন্ন মাধ্যমে। এ সময় বাংলার জনগণের মধ্যে নীরব ক্ষোভ জন্মেছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষণ সেনের রাষ্ট্র ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণরা সমাজের উঁচুস্তরের লোক ছিল। তারা নিম্নশ্রেণির মানুষদের শোষণ নির্যাতনের মধ্যে রাখতো। লক্ষণ সেন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায় অন্যান্য ধর্মের মানুষদের উৎপীড়ন করেছেন।[৩০] তাঁর সময়েই ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে নির্যাতন।[৩১] রাজার অত্যাচারে সাধারণ প্রজাদের অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রেরণা তাই স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়। সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাংলায় অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে তাই তারা নিজ দেশ ছেড়ে নেপাল তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পন্ডিত তার *শূন্যপুরাণে* শ্রী নিরঞ্জন রুস্মায় ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ চিত্র একেছেন কবিতার মাধ্যমে।[৩২]

সামাজিকভাবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তারা শূদ্র[৩৩] সমাজের মধ্যে গণ্য হতো। শূদ্রদের চেয়ে নিম্নে ছিল অন্ত্যজ শ্রেণি। এই উভয় শ্রেণি সমাজে অবহেলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা এই নিম্নশ্রেণি থেকে সব সময় দূরে থাকত। এই শ্রেণির অনুষ্ঠানে যাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি তাদের ছায়া স্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণদের জন্য পাপ মনে করা হত। এভাবে সমাজে বিরাট এক বাধার প্রাচীর তুলে অধিবাসীদের দ্বিধাবিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। সমাজে পতিতাবৃত্তি হিন্দু সমাজের উচুঁশ্রেণির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং পতিতাবৃত্তি সমাজে কোন নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হত না।[৩৪] সমাজে অশ্লীলতার পাশাপাশি অশ্লীল কথাবার্তারও প্রচলন ছিল। চৈত্র মাসে হিন্দুদের কাম মহোৎসবে অশ্লীল গীত

গাওয়া হতো। কামদেব এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ধনপুত্র দান করবেন এ ছিল তাদের বিশ্বাস।[৩৫] হিন্দুদের শারদীয় পূজায় বিজয়া দশমীর দিন 'শারদোৎসব' নামের অনুষ্ঠানে লোকেরা অশ্লীল গান পরিবেশন করত এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করত।[৩৬] সেন যুগে (১০৯৭-১২২৫ খ্রিস্টাব্দ) নর-নারীরা বিলাসিতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করত। ধোয়ীপবন দুত ও গোবর্দ্ধন আচার্য্যের *আর্য্যা সপ্তশতী* পড়লে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অভিরুচি এবং ব্রাহ্মণগণের যৌনতার কুরুচিপূর্ণ চিত্র সহজই অনুমান করা যায়।[৩৭] সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ মদ পান করতো। বিভিন্ন ধরনের মদের প্রচলন ছিল। দোকানে প্রকাশ্যে মদ ক্রয়-বিক্রয় হতো। মদের সর্বগ্রাসী প্রভাব সমাজকে স্থবির করে রেখেছিল।[৩৮]

প্রাক মুসলিম বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি-বর্ণ-গোত্র ও ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সময় দ্বন্দ্ব-কলহ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব হলে তার যথাযথ বিচার পাওয়া যেত না। সমাজের নিচু শ্রেণিতো দূরের কথা, সমাজের সাধারণ মানুষ এমনকি বণিকগণও অত্যাচারিত হলে তা বিচার প্রার্থনা করে তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতো। *শেক শুভোদয়ার* এক কাহিনীতে দেখা যায়, রাজা লক্ষণ সেনের শ্যালক (রাজ মহিষী বল্লভার ভাই) কুমার দত্ত মাধবী নাম্নী এক বণিক বধূর উপর নির্যাতন করেছিলো। নির্যাতিতা মাধবী তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করেও এই অপমানের প্রতিবিধান কল্পে লক্ষণ সেনের রাজসভায় অভিযোগ করেন। রাজমহিষী বল্লভা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা লক্ষণ সেন মাধবীর অভিযোগে নিরুত্তর থাকলেন এবং রাজ মহিষী স্বয়ং মাধবীকে অভিযোগ করার অপরাধে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করলেন।[৩৯] হিন্দু ধর্মের বহুল আলোচিত সহমরণ[৪০] ছিল প্রাক-মুসলিম বাংলার সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির এক নির্যাতনের দলিল। ব্রাহ্মণ সমাজে স্বামীর সাথে সহমরণে যাবার জন্য বিধবাদের উৎসাহিত করা হতো। কখনো কখনো বাধ্য করা হতো। সহমরণে আপত্তি হলে সমাজে বিধবাদের বাঁচার অধিকার থাকতো না। এই সহমরণকে উৎসাহিত করতে তৎকালীন ধর্মপতি ও হিন্দু ব্রাহ্মণগণ যে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেন সে সম্পর্কে *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে। *বৃহদ্ধর্মপুরানে* বলা হয়েছে, যিনি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান তিনি স্বামীর গুরু পাপ হতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগত চিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করে যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হন।[৪১]

হিন্দু ব্রাহ্মণগণের ধর্মীয় বিকৃতি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চাকাকে বাধাগ্রস্থ করেছিল। আর্যেতর ধর্মের আচার আচরণ এবং তান্ত্রিক ধর্মের বিকৃতি এই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এর ফলে সমাজের সকল স্তরে বিশেষত উচ্চবর্ণ ও শ্রেণিগুলোতে অশ্লীলতা, যৌনতা সহ নানা প্রকার ভোগবিলাস সমাজকে এক কর্দমাক্ততায় নিক্ষেপ করেছিল। ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য রক্ষিতা বা দাসী প্রতিপালন ছিল উচ্চ বিত্তদের নেশা। বাৎস্যায়ন তাঁর রচিত *কামসূত্রে* গৌড়বঙ্গের রাজান্তপুরের কামলীলার এক অশ্লীল বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। এই সকল দুর্নীতি ও অশ্লীলতা পালযুগের প্রথমদিকে বঙ্গে তেমন বিস্তৃত না হলেও পালযুগের শেষভাগে হতে সেন বংশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্নীতি, অশ্লীলতা ও নৈতিক অধঃপতন সমাজ দেহকে কলুষিত করে তুলেছিল।

মুসলিম বিজয়কালীন বাংলার কবি ও লেখকগণ তাদের সমসাময়িক বাংলার যে সমাজচিত্র তাদের কাব্যে তুলে ধরেছেন তাতে সমকালীন সমাজের বর্ণ-বৈষম্য, দারিদ্যপীড়িত বুভুক্ষ শ্রেণির আর্ত-বিলাপ, নারী জাতির প্রতি চরম অবমাননা, যৌনতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মদ ও মাদকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বারবার এসেছে। যদিও ব্রাহ্মণ হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলে মনে করতো এবং এই ভাষা ছাড়া তারা কাব্য রচনা করা মহাপাপ ধারণা করতো, তথাপি এই সমস্ত কাব্যে তারা মদ, নারী, যৌনতা ইত্যাদি বিষয়ে যে কুরুচিকর উপমা উৎপ্রেক্ষার সন্নিবেশ ঘটাতো তাতে সে সময়ের সংস্কৃতির একটি পতনোন্মুখ কাঠামোর চিত্রই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

নিম্নশ্রেণিকে এড়িয়ে চলাই ছিল হিন্দু উচ্চশ্রেণির একটি সংস্কার। সামাজিক সম্পর্ক তো দূরের কথা, সকল নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতো না হিন্দু ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী। তথাপি এই উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা নিম্নশ্রেণির ডোম্বিনীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত রতিক্রিয়ায় মিলিত হতে দ্বিধাবোধ করতনা।[৪২] গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাদের কামনা ও পোশাকের কথা এবং বঙ্গের রাজ দরবারের অভ্যন্তরে মহিলাদের যে নির্লজ্জ যৌনতা, ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের কাম-ষড়যন্ত্রের বিবরণ বাৎস্যায়ন লিখেছেন।[৪৩] ধোয়ীর পবনদূত কাব্যেও কামচরিতার্থতার অবাধ লীলা অত্যন্ত সাড়ম্বরপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

কেশব সেনের *ইদিলপুর লিপি* এবং বিশ্বরূপ সেনের *সাহিত্য পরিষদ লিপিতেও* সে সময়ের সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চিত্রগুলি দেখা যায়। এগুলোতে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা হলো, প্রতি সন্ধ্যায় বারাঙ্গনা সভানন্দিনীদের নিক্বন ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলো যৌনতা ও অশ্লীলতায় মেতে উঠতো। সে সময়ে উচ্চ হিন্দুদের বাড়িতে দাসী রাখা হতো শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। এ দাসীরা উত্তরাধিকার হিসেবে হাত

পরিবর্তন হতে পারতো। এছাড়াও এ সময়ে বাংলায় দেবদাসীও ছিল। এরা ছিল বেশ প্রভাবশালী সুন্দরী বেশ্যা। অতি উচ্চশ্রেণির যৌন সঙ্গী হওয়ার জন্য এদের যৌনতার বিভিন্ন কলাকৌশল জানতে হতো। *রামচরিত কাব্যে* এদের দেব-বারবনিতা, এবং *পবনদূতে* এদের বাররামা বলা হয়েছে।[৪৪] এই সমস্ত বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ সে সময়ের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বলগাহীন কাম বাসনার বিরুদ্ধে নিজেরা বক্তব্য ও লেখনী চালাতেন, যদিও তারাই ছিল সমাজের এই অপকর্মের মূল হোতা।[৪৫] সে সময়ে মেয়েদের চরিত্রহীনতার অনেক নজির দেখা যায়।[৪৬]

হিন্দুদের মধ্যে যৌতুক প্রথা তখনও সমাজে প্রচলিত ছিল। এমনকি শ্রেণি কৌলিন্যের এত কঠিন যুগেও যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্ন জাতের কন্যা বিয়ে করতেও আপত্তি করতো না। এই সমস্ত বর্ণনা তৎকালীন কবিতার মূল বিষয় ছিল। একটি সমাজের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো কতটা নোংরামিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে এই সমস্ত কাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।[৪৭]

সে সময়ে নিম্নশ্রেণির স্ত্রীলোকদের মধ্যে নৃত্যগীত, মদ-চোলাই বিক্রয়, এমনকি বারাঙ্গনাবৃত্তির প্রচলনও ছিল। ধনী পরিবারে অনেক সম্পদ থাকতো। ঘরে সোনা রূপা, গয়নাগাঁটি থাকবার ফলে চোর-ডাকাতের উপদ্রবও হতো। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের দু'বেলা খাবার জুটতো না। উঁচু সমাজে নারীদের সতীত্বের গুরুত্ব কিছুটা থাকলেও পুরুষদের অনেকেরই চরিত্র ঠিক ছিলনা।[৪৮] সে সময়ের কবিদের লেখনীতেও চরিত্রহীনতার নজির দেখা যায়। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের মধ্যে কবি যা লিখেছেন তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়: ''ওগো প্রিয়ে, তোমার কুরুকুম্ভের উপরে যে মণিহার দুলছে তার দীপ্তিতে তোমার বুক আলোকিত হয়ে উঠুক। তোমার যখন-জখনের মেঘলা রতিরঙ্গে মুখরিত হয়ে মল্মথের জলবার্তা ঘোষণা করুক। স্থল কমল গঞ্জণ আমার হৃদয়রঞ্জণ ওগো প্রিয়ে, তুমি আদেশ কর রতিরঙ্গে সুশোভিত তোমার ঐ রক্ত চরণখানি আমি অলক্তরাগে রঞ্জিত করি। মদনের দহন জ্বালায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। অতএব হে প্রিয়ে- স্মর গরল খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনম"।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থার এই অধঃপতনের পেছনে তৎকালীন মানুষের সমাজ জাতবর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণি উভয় দিক হতে স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তি এবং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন জনজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্প-সাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ব বিশ্বাসঘাতকতা এবং রুচির অভাব।[৪৯] ধর্মের নামে অধর্ম, সামাজিকতার বদলে অসামাজিকতা, সংস্কৃতির স্থানে অপসংস্কৃতি এই সময়ের বাংলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''একটা বৃহৎ গভীর ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল, কিন্তু কেহ তার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কিভাবে কী উপায়ে কী হইত বলিবার উপায় নাই।[৫০]"

যে কোন সমাজের জন্য সে সমাজের মানুষের নৈতিক শক্তি সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড। আর যে সমাজ থেকে এই দিকটি দুর্বল হয়েছে সে সমাজও ধীরে ধীরে পতনের দিকেই এগিয়ে গেছে। তৎকালীন বাঙ্গালি সমাজে নৈতিক বল ও চরিত্রবলের অভাব সুস্পষ্ট। সেন বংশীয় রাজাগণ,এমনকি রাজা লক্ষণ সেনও এই দুর্বলতার গন্ডী থেকে বের হতে পারেন নি। ফলে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতো। তৎকালীন রাজকবি হলায়ুধ মিশ্রের কাব্যেও হিন্দুদের নিন্দা ও মুসলমানদের গুণকীর্তনের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।[৫১] বাংলার সামাজিক অবস্থা দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, ব্রাহ্মণদের নির্যাতন, উচ্ছৃংঙ্খল যৌনতা ইত্যাদি সমাজকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। একটু ক্ষীণ আশার আলো বুকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এ থেকে মুক্ত হবার পথ খুঁজছিল।

অষ্টম ও নবম শতক থেকে বাংলা ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। মুসলমান মিশনারি জাতি। মহানবী (স.) ইসলামের সুমহান বাণীকে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। রাসুল (স.) বলেছেন, 'আমার নিকট হতে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে।' উপস্থিত ব্যক্তি আমার নিকট থেকে যা শুনবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট অবশ্যই প্রচার করবে।[৫২] মহানবীর (স.) এই নির্দেশে সাহাবাগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী অনুসারীগণ যুগে যুগে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের সক্রিয় চেষ্টা করেছেন এবং তার বাস্তব উদাহরণ আমাদের জন্য রেখে গেছেন।[৫৩] ভারতের সিন্ধু মুসলমান নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার পর থেকে এতদঞ্চলে তাদের আগমন বৃদ্ধি পায়। এ সময়েই বাংলা ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা-মাশায়খ ও সুফি-সাধকগণ ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাদের অনেকেই ইসলাম প্রচারের স্বার্থে এ দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এদেশবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তাদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের মহান ও সাম্যের বাণীকে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। ইসলাম ধর্মের বিধানাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের মাধ্যমে উলামা-মাশায়েখ ও সুফি সাধকগণের নৈতিক চরিত্রে সৌন্দর্য ও মাহাত্মের যে সমাহিত চিত্র ফুটে উঠেছিল তা বাংলার সাধারণ মানুষকে একদিকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, তেমনিভাবে বাংলার আধ্যাত্মিক

ও নৈতিক বিজয়ে এবং বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহতকরণে এ বিষয়গুলো যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। উলামা-মাশায়েখ সে সময়ে সমাজের নিগৃহীত হতদরিদ্র বঞ্চিতদের আশ্রয়স্থল ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম নৃপতি, বিজেতা ও শাসনকর্তাবৃন্দ রাজ্য বিজয় অথবা ইসলাম ধর্মের গৌরব মহিমা প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য কামনা করতেন। তাঁরা কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন, আবার কখনো তাঁরা নিজেরাই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধবিজয়ী এই উলামা-মাশায়েখের কেউ কেউ বিজিত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সমাজে ইসলাম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসে এ সমস্ত উলামা-মাশায়েখকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক বহু সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত উলামা মাশায়েখকে ইসলাম প্রচারে হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের কোপানলে পড়তে হয়েছে। হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের অকথ্য নির্যাতনে জর্জরিত হতে হয়েছে তাদের। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কার্যধারাকে বন্ধ ও ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে উলামা-মাশায়েখকে অনেক সময়ে বাধ্য হয়েই তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। এ সংগ্রামে কখনো তাঁরা নৈতিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন, কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র, চিন্তা, চেতনা চতুষ্পার্শ্বস্থ অমুসলিম তথা হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এরই এক প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন। ফলে পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারের ধারা রাজকীয় নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হতে থাকে।[৫৪] এইভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলা ইসলামের আলোয় প্রজ্বলিত হয়ে যায়। বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা-মাশায়েখ কোন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ তো দূরের কথা প্রায় ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচারে পরবর্তীতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির আগমন ও মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিল বলা যায়। এ সময় থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারকবৃন্দ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করতে থাকেন।[৫৫] হিন্দুদের সামাজিক অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা ও যৌনতার বিরুদ্ধে ইসলামের মহান আদর্শ, উদারতা, নৈতিকতা দর্শনে স্থানীয় বাঙালি সমাজ ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করতে থাকে। দুই ধর্মের সম্প্রীতি ও সহবস্থান সহজ ছিল না। এক্ষেত্রে ইসলামের উদারতায় হিন্দু সমাজের দুর্নীতির চিত্রগুলো সমাজ থেকে কমতে শুরু করলেও হিন্দুরা সমাজে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে চায়নি।

মুসলমান বাংলায় বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এদেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালবেসে স্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চেয়েছিলেন। শাসক হিসেবে শাসিতের উপরে কোনো অন্যায় অবিচার তাঁরা করেননি। জনসাধারণও তাঁদের শাসন মেনে নিয়েছিল। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়ের পরপরই তিনি নিজে ও তাঁর আমিরদের সহযোগিতায় বাংলায় মানুষের জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও উপাসনালয় দ্রুত সুন্দরভাবে নির্মাণ করেন।[৫৬] একজন বিজেতা হিসেবে বাংলার অমুসলিমদের প্রতি তিনি উদার নীতি অবলম্বন করেন। যদুনাথ সরকার তাঁর *The History of Bengal* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> "....But he was not blood-thirsty, and took no delight in massacre or inflicting misery on his subjects. The problems of internal administration and the conciliation of his military chiefs were together solved by the establishment of a sort of feudal government in the country."[57]

এই কারণে বাংলার অধিবাসীরা বখতিয়ারকে শুধু গ্রহণই করেনি, তাদের অনেকেই তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। এমনকি সেনাদলের নেতৃত্বও দিয়েছে। আলী মেচ তেমনই একজন।[৫৮] বখতিয়ার খলজির পরবর্তী শাসকগণও দেশ পরিচালনায় তাঁর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। মুসলিম শাসকগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সুচারুভাবে পরিচালনা সম্ভব। এ জন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিবেচনা না করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলতঃ তাঁদের এ নীতির ফলেই সকল শ্রেণির নাগরিকের সহযোগিতায় বাংলাকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছেন।

মুসলমান শাসকগণ মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন মকতব, মাদরাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্যও শিক্ষার দরজা ছিল অবারিত। হিন্দু বালকগণ পাঠশালায় তাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। এসব পাঠশালা বিত্তবান ব্যক্তিদের গৃহ-সংলগ্ন থাকতো কিংবা গুরুগৃহের নিকটবর্তী কোন এক গাছের নিচে বসতো। গুরু একটি টুলের উপর বসতেন। শিক্ষার্থীরা বসতো তাদের নিজ নিজ মাদুরের উপর।

কখনো কখনো মুসলমানদের মক্তব এবং হিন্দুদের পাঠশালা একই ছাদের নিচে বসতো। মুসলিম শিক্ষক (মুনশী) সকালে পড়াতেন এবং হিন্দুদের শিক্ষক (গুরু) পড়াতেন বিকেলে। বিত্তবান হিন্দুরা পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় যে, চাঁদ সওদাগর বড় ধরনের একটি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সেখানে তার ছয় পুত্র সোমাই পণ্ডিত নামক এক গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করতো।[৫৯]

হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় পড়াশোনা করতে যেত। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" সূত্রে জানা যায় যে, জনৈকা রাজকন্যা ময়নামতি তার পিতার গৃহসংলগ্ন পাঠশালায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করতো। এ ধরনের অনেক তথ্য মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে জানা যায়। এথেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে হিন্দু বালিকারাও পড়াশোনা করতো এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। সে সময়ে সাধারণ বালিকারাও যে পড়াশোনা করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সারদা মঙ্গল কাব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ড. দীনেশ চন্দ্র লিখেন যে, একটি পাঠশালায় হিন্দু রাজার ছেলেমেয়েরা অন্যদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেছিল। এই পাঠশালায় পাঁচ রাজার কন্যা সন্তান অন্যান্য বালক ছাত্রের সঙ্গে অধ্যয়নরত ছিল। এই বর্ণনা থেকে হিন্দু সমাজের দু'টি বিষয়ের চিত্র ফুটে উঠে। প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত নারী শিক্ষা প্রচলন, দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষার প্রসার। হিন্দু সমাজের উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাদের সম্পর্কেও বহু তথ্য বিভিন্ন উপাদানে উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রামী, মাধবী, চন্দ্রাবতী, খনা, বিদ্যা, রানী ভবানী প্রমুখ মহিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বাংলার সুলতানি আমলে কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের খ্যাতি সম্পর্কে *চৈতন্যভাগবতে* উল্লেখ করেন যে, নবদ্বীপে বহু টোল ছিল এবং সেখানে ছিলেন হাজার হাজার খ্যাতনামা পন্ডিত, বিদ্বান ব্যক্তি ও অধ্যাপকবৃন্দ যারা সে সময়ের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। মুহম্মদ এনামুল হক লিখেন যে, হুসেনশাহী আমলে বাংলায় সংস্কৃত চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। এখানে বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতগণ জমায়েত হতেন। এখানে সাধারণত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই শিক্ষা দেওয়া হতো। এসব টোলে সংস্কৃতের সাথে সাথে বাংলা ও ফরাসিও শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে ইতিহাস, কালিদাসের গ্রন্থাবলি, চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ মধুকোষ, অমর কোষ, ব্যাকরণ বা ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত, ব্যবসার হিসাব নিকাশ, রাজস্বের হিসাব ইত্যাদি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপের এ গৌরবময় ঐতিহ্য সারা মুসলিম আমলেই টিকে ছিল। কবি বিজয়গুপ্তের জন্মস্থান ফুল্লশ্রী গ্রাম (বরিশাল জেলায়) ষোল শতক থেকে হিন্দু শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। বিজয়গুপ্তের লিখিত '*পদ্মপুরাণ*' কাব্যে দেখা যায় যে, ফুল্লশ্রী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বেদ সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী এবং বৈদ্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের পেশায় দক্ষ ছিলেন। সে স্থানের কায়স্থরা অভিজ্ঞ লেখক এবং অন্য লোকেরা তাদের নিজ নিজ পেশায় নিপুণ ছিলেন। বর্ধমান সংস্কৃত শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। নোয়াখালির যুগদিয়াও ছিল সে যুগের হিন্দু শিক্ষার আর একটি কেন্দ্র। এছাড়া, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং বিষ্ণুপুরেও (বাকুড়া জেলা) হিন্দু শিক্ষার আরো কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচিত হয়েছিল। সুলতানি শাসনপর্বে সুলতানগণ সংস্কৃত শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শিক্ষার্থীদের কোনো রকম বেতন প্রদান করতে হতো না। তবে টোলে তাদের শিক্ষা জীবন শেষ হলে তারা গুরুকে দান-দক্ষিণা উপহার দিত। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় যে, চাঁদ সওদাগর বড় ধরনের একটি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সেখানে তার ছয় পুত্র সোমাই পণ্ডিত নামক এক গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করতো[৬০]। জানা যায় যে, সে সময়ে কিছু সংখ্যক মুসলিম সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই না তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থও রচনা করেন। এভাবে সুলতানি আমলের বাংলায় ধর্মীয় উদার নীতির ফলে সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এভাবে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সুলতানদের সুশাসন এবং বিদেশাগত সুফি-সাধক কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে শুরু থেকে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। মুসলমান শাসকদের এমন উপলব্ধি ছিল যে, তাঁরা শাসক সম্প্রদায় হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং প্রজাসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। সুতরাং বাংলায় মুসলিম শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে প্রথমেই হিন্দুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অতি জরুরি। এরূপ উপলব্ধি সুলতানগণ মনে প্রাণে করেছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক রক্ষা এবং ইসলাম নির্দেশিত প্রজাসাধারণের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সুলতানগণ হিন্দুদের সাথে সহৃদয় আচরণ অবলম্বন করেন। এ ক্ষেত্রে সুলতানগণ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন, শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতাসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃতির সাথে সাথে সুলতানগণ উচ্চশিক্ষিত স্থানীয় হিন্দুদের শাসনকার্যে সম্পৃক্ত করেন। মুসলমান সুলতানদের আহবানে সাড়া দিয়ে বহু হিন্দু শাসক, সেনাপতি মুসলিম শাসনে নিযুক্ত হয়ে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। মুসলমান সুলতানগণ প্রতিভাবান ও শিক্ষিত হিন্দুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ, রাষ্ট্রীয় উপাধি, এবং সরকারি জমি দান করেন। তাঁরা

বিশ্বস্ততার সঙ্গে মুসলমান সুলতানদের সহযোগিতা করে। বাংলার ইলিয়াশ শাহ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে যখন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত তখন বাংলায় হিন্দু সামন্ত, সেনাপতি সহদেবসহ সাধারণ সৈনিকগণও অস্ত্রধারণ করেছিল। হিন্দু সেনাপতি সহদেব এই যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহ যুদ্ধ শেষে এ সব হিন্দু যোদ্ধাদের পুরস্কৃত করেছিলেন। সুলতান ইলিয়াশ শাহ দিল্লীর সালতানাতের বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু সামন্ত জমিদার, সেনাপতি ও সৈনিকদের সমর্থন ও সাহায্য করেন। তিনি দুর্যোধন নামক একজন কর্মচারীকে 'বঙ্গভূষণ' এবং চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়াও তিনি কয়েকজন হিন্দু জমিদারকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করেন।[৬১] তিনি বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' ও অন্যান্য উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাঁকে সৈন্যদলে উচ্চপদ প্রদান করেন।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে দুর্গাদাস সান্যাল লিখেন যে, ইলিয়াস শাহী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই রাজশাহী জেলায় বিখ্যাত সান্যাল এবং ভাদুড়ি পরিবারের উৎপত্তি হয়। ইলিয়াস শাহ জয়ানন্দ ভাদুড়িকে দিওয়ান, সুবুদ্ধি খান (খান উপাধি মুসলমান শাসক থেকে প্রাপ্ত), শিখাই সান্যালকে সেনাপতি পদে দায়িত্ব দেন। অভুতপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতার জন্য শিখাই সান্যালকে সুলতান চলনবিল এলাকার বিশাল স্থান জায়গির মঞ্জুর করেন। কালক্রমে এই জায়গার নাম হয় সান্যালগড়। সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্ব উত্তরকালে ভাতুড়িয়ার কংস নামক এক ব্রাহ্মণ উজির পদ লাভ করেন। তবে এই কংস রাজা পরবর্তীতে মুসলমান উচ্ছেদের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই তাঁর মন্ত্রী ছিল। রূপের উপাধি ছিল দবির খাস বা মুখ্য সচিব এবং সাকের মালিক ছিল সনাতনের উপাধি। সনাতনের বড় ভাই রঘু নন্দন এবং ছোট ভাই বল্লভও সুলতানি দরবারের একজন উচ্চপদে কর্মরত কর্মকর্তা ছিলেন। বল্লভের উপাধি ছিল অনুপম মল্লিক। কেশব বাবু রাজার দেহরক্ষীদের নায়ক ছিলেন। তিনি রাজার নিকট হতে খান ও ছত্রী উপাধি পান। এই কারণে তাকে কেশব খান বা কেশব ছত্রী বলা হতো।[৬২] সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের অধিকারী বা গৌড়ের শাসনকর্তা অথবা গৌড়ের কোতওয়াল। মুকুন্দ দাস সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎসক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পরিবারটি পুরুষানুক্রমে রাজবৈদ্য ছিলেন। এ ছাড়াও রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরণ্য দাস, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ আরো হিন্দু কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এরা সকলেই উচ্চ রাজপদে কর্মরত ছিলেন। ধারণা করা যায় যে, নিম্নপদেও অনেক হিন্দু কর্মরত ছিলেন যাঁদের নাম আমরা কোনো সূত্রে উল্লেখ পাইনি। রূপ সনাতনরা চার ভাই একসঙ্গে চাকুরি করতেন। রূপ সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রীকান্তও রাজসরকারে উচ্চপদে চাকুরি করতেন। তাঁর কার্যস্থান ছিল হাজীপুর। তিনি সেখানে ঘোড়া কেনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৩] তাঁদেরকে প্রদত্ত উপাধিতে অনুধাবন করা যায় যে, সুলতানি আমলে তাঁদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দুদের প্রতি সুলতানদের এমন উদারতাকে অনেক হিন্দু লেখক ভিন্নভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, হোসেন শাহ কর্তৃক হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের ভাষায়-

> "সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা বাংলাদেশে অনেক দিন আগে থেকেই চলে আসছিল; রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। ....এতে রাজা হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের প্রমাণ মেলে না।"[৬৪]

আবদুল করিম সুখময় মুখোপাধ্যায়ের উপরোক্ত মতামতের বিরোধিতা করেছেন।[৬৫] এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বাংলার সুলতানি পর্বে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা পেতে কোনো বাধা হয়নি। বাংলার সুলতানগণ শিক্ষিতজন ও দক্ষ মানুষের যেমন মূল্যায়ন করতেন, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়ারও পক্ষপাতি ছিলেন।

মুসলমানগণ শাসক জাতি হলেও, তাঁরা হিন্দুদের থেকে দূরে থাকেন নি, কিংবা হিন্দুদেরকেও দূরে সরিয়ে রাখেন নি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদেরকে সংযুক্ত রেখেছেন। যোগ্যতা ও প্রতিভাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁরা পণ্ডিত, কবি, বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং হিন্দুদের সরকারি পদ, উপাধি ও জমি দান করে মর্যাদাবান করেন।[৬৬]

মুসলিম শাসকগণ রাজ দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের আহবান করে তাদের সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দুদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ উপলব্ধি করে তাঁর তাদের মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ করান। সংস্কৃত ভাষার মরমীবাদ

গ্রন্থটিও আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুসলমানদের এ ধরনের আগ্রহের পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সামাজিক সমঝোতা সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৭] সুলতানি শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হিন্দু সংস্কারবাদী বিপ্লবী শ্রী চৈতন্যের বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে কোনো ধরনের বাধা প্রদান না করে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[৬৮] সামাজিকভাবেও মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিল। একবার হিন্দু সম্প্রদায়ের দু' গ্রুপের মধ্যে এক সমস্যা ও সংঘর্ষের বিচার করতে গিয়ে কাজী সাহেব এক গ্রুপের পক্ষে রায় প্রদান করলে অপর পক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। কাজী সাহেব চাইলে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু তিনি আপোষমূলক নিষ্পত্তির অভিপ্রায়ে দোষী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ভাগ্নে সম্বোধন করেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।[৬৯] এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভ্রাতা,ভগ্নী, ভাগ্নে ইত্যাদি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেন।[৭০] দীর্ঘ সুলতানি আমলের দু'একটি ঘটনা ছাড়া হিন্দুরা মুসলমানেদের বন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। বাংলার সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় তাঁদের জমিদার, শাসক ও অন্যান্যরা মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মুসলমান সুলতানগণ যেমন তাঁদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে ও কার্যে হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন, হিন্দু জমিদাররাও তাঁদের বিভিন্ন কার্যে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁরা মুসলমান রাজদরবারের শিষ্টাচার ও আনুষ্ঠানিকতায় মুগ্ধ হয়ে সেগুলো নিজেদের দরবারে অনুসরণ করতেন।[৭১]

সুলতানি শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। হিন্দুরা তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবাদিতে মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করতো, মুসলমানরাও তাঁদের এই সমস্ত আনন্দ উৎসবে যোগ দিত। কবি বিজয়গুপ্ত বলেন, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের বিয়েতে নয়শত মুসলমান গায়ক যোগদান করেছিলেন।[৭২] মুসলমানগণও তাঁদের সামাজিক উৎসবাদিতে হিন্দুদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এভাবে সামাজিক লেনদেন ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যের সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ স্বভাবতই মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদের ভক্তি জাগরিত করেছিল। একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ফলে বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হয়।

মুসলিম পীর দরবেশ ওলি আওলিয়ার প্রতি হিন্দুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর শুভক্ষণে ও পুত্র সন্তান কামনায় আল্লাহর নাম নেয়ার পরামর্শ দিতেন। মুসলমানদের পীর দরবেশদের দরগাহসমূহের শিরনি বা উপঢৌকন প্রদান হিন্দুদের মধ্যেও সমানভাবে প্রচলিত ছিল। পীর দরবেশকে তারা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতো। তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করতো। যুগ যুগ ধরে শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন *শেক শুভোদয়া* গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা কবিতার প্রারম্ভে মুসলমান পীর দরবেশদের প্রশস্তি লিখে শুরু করতো।[৭৩] বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বকালে সামাজিক মেলামেশা এবং সাধারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে সে সময়ের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, দুটো সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কখনো কখনো শত্রুতামূলক ঘটনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যবিধ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে নি। *মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে* জানা যায় যে, ষোড়শ শতকে সর্পদেবতা মনসার পূজার সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিছুটা গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু মুসলিম শাসকদের দূরদর্শিতার ফলে এ গোলযোগ অতি সত্বর নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে ভেদাভেদ থাকলেও বিরোধ ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলমানদের আল্লাহ রাসুল এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি হিন্দু সমাজ মানসের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসা মঙ্গল* কাব্যের নায়ক শৈব সাধক ভাগ্য বিড়ম্বিত চাঁদ সওদাগর পুত্র লক্ষীন্দরকে সর্পদেবী মনসার আক্রোশ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এ কারণেই লক্ষীন্দরকে লৌহ বাসরে অন্যান্য হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচের সঙ্গে একখানা কোরআন শরীফও রাখা হয়েছিল।[৭৪] অপুত্রক লক্ষপতি সওদাগর তার অপুত্রক হওয়ার কারণ জানতে ব্রাক্ষণদের ডাকলে তারা আল কুরআন দেখে অঙ্কপাত করেন। অনুরূপ লক্ষপতি সওদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাত্রাকালে হিন্দু দেবদেবীকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকেও স্মরণ করেছেন।[৭৫] সামাজিক জীবনের এই প্রভাব হয়তো সর্বব্যাপী ছিল না, তবে মুসলিম সমাজের ধর্মকর্মের প্রতি কিছু কিছু হিন্দুর যে উদার মনোভাব ছিল না এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন হিন্দু কবিদের কেউ কেউ হিন্দু-মুসলিম চরিত্র চিত্রায়নে অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর অতিক্রমে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মুসলমান শাসক ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিয়মনীতি, এমনকি নবী রাসুল এবং মুহম্মদের

(স.) দৌহিত্র হাসান হোসেনকে আক্রমণ করতেও তাঁরা ছাড়েন নি। জবাবে মুসলমান কবিরা অনেক সময় তাঁদের মনোভাবের জবাব তাঁদের রচনার মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত বিরোধ সমাজকে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি, বরং সমাজের মানুষকে ধর্ম সচেতন জাতিতে পরিণত করেছিল। চৈতন্য মঙ্গলের কবি জয়ানন্দ এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, "ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।"[৭৬]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* পুস্তকে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পরে এখানকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

> "মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব মন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এ দেশে বাস করার ফলে বাঙ্গালা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের পরম কৌতূহলহইল। ...গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। "[৭৭]

বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে গৌড় বা লখনৌতিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের বিকাশ শুরু হয়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন স্থাপিত হয়। সুতরাং বখতিয়ারের বিজয় থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের উত্থানকালকে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। মুসলমান সমাজের সঙ্গে উপাসনাগৃহ মসজিদের সম্পর্ক ছিল আঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িত। যেখানেই মুসলমান বসতি গড়ে উঠতো, সেখানেই ধর্মীয় প্রয়োজনে গড়ে তোলা হতো মসজিদ, মাদরাসা ও দরগাহ। সমাজের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কল্যাণে মুসলমান সুলতান এবং তাদের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কূপ, জলাধার, পুকুর খনন অথবা সেতু নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা হতো। মুসলিম দেশের জনগণ হিসেবে হিন্দুরাও এ জনহিতকর কাজের সুবিধা পেয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম সুলতানদের সঙ্গে হিন্দু জনসাধারণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা বিবেচনা করা যায়। এ কথাও উপলব্ধির বিষয় যে, বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা ছড়ি হাতে শাসনকার্য শুরু করে দিতে পারেনি এবং তা তারা চায়ও নি। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিসেবে সুলতানদের প্রথমত হিন্দুদের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়েছিল। নিজেদের শাসনকার্যে দক্ষতা প্রদর্শন, সকল কার্যে সমভাবে সকলের সন্তুষ্টি অর্জন সর্বোপরি অধিকার, সম্মানহারা অবহেলিত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্মান প্রদানের মাধ্যমে মুসলমান শাসকগণ নিজ ধর্মে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এ কথা বলা যায়, বাংলায় তলোয়ারের মাধ্যমে নয়, আদর্শের মাধ্যমেই মুসলমানরা সংখ্যায় ধীরে ধীরে গরিষ্ঠতা অর্জন করতে থাকে।

লখনৌতিতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'শ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলার উপর মুসলমান সুলতানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় মুসলমান সমাজ সম্প্রসারণের প্রধান কারণ ছিল বহুসংখ্যক হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ। এর ফলে মুসলমান সমাজ গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রভৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের হিন্দুদের সঙ্গে বাংলায় আগত মুসলমান জনগোষ্ঠীর পারস্পারিক লেনদেনের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতির গ্রহণ ও বর্জন সাধিত হয়েছে এ কথা বলা বাহুল্য। মুসলমান সুলতানগণ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে হিন্দুদের পূর্বের কিছু কিছু নিয়ম, রীতি-নীতি পরিবর্তন করতে চান নি। এই সমস্ত বিষয়ের উপর উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যেমন, বখতিয়ার খলজির প্রাপ্ত মুদ্রায় একজন অশ্বারোহীর চিত্র খোদিত আছে। বাংলার আরো ক'জন মুসলিম শাসনকর্তার মুদ্রায় অনুরূপ অশ্বারোহীর চিত্র সংযোজিত দেখা যায়।[৭৮] জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের একটি রৌপ্য মুদ্রায় সাতরশ্মি সংযুক্ত সূর্যের প্রতীক উৎকীর্ণ রয়েছে। এ কথা উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম প্রাণীচিত্র অঙ্কন বা মূর্তি খোদাই করা সমর্থন করে না। অন্যদিকে এ দেশের জীবন ধারায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজে মূর্তি পূজা ও মূর্তি তৈরি, অঙ্কন এবং সংরক্ষণ একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় কাজ। আবার সূর্যের প্রতীকের সঙ্গে সূর্য পূজার সম্পর্কও জড়িত রয়েছে। মুসলিম মুদ্রায় তাই লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি, নাগরী লিপি বিন্যাস, অশ্বারোহীর মূর্তি অঙ্কন এবং সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। বাংলার সুলতানদের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার চেয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল বেশি। ফলে ধর্মীয় বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে সহজেই তারা তাদের মুদ্রায় অশ্বারোহী অথবা সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই করতে পেরেছেন। এ থেকে মুসলিম সুলতানদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় রক্ষণশীলতার চেয়ে উভয় ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যকরণের দিকে যে ঝুঁকেছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৯]

হিন্দুরাও মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, আচরণ অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল। এ কথা সত্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের কাছ থেকে সাধারণ হিন্দুরা ততটা বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি পায় নি, নিজ ধর্মের নেতৃত্বের কাছ থেকে যতটা পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটি শিলালিপির সাক্ষ্য

উপস্থাপন করা যায়। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের সময় গৌড়ের সাদুল্লাপুরে নির্মিত মসজিদের গায়ে সংস্থাপিত ছিল শিলালিপিটি। মসজিদের নির্মাতার নাম উল্লেখ রয়েছে বিবি মালতি। শিলালিপি পাঠ থেকে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ মহিলা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[৮০] কিন্তু নামের 'বিবি' শব্দটি মুসলিম মহিলাদের নামের সঙ্গেই সাধারণত যুক্ত হয়। কিন্তু মালতি শব্দটি একবারেই বঙ্গজ, বিশেষ করে হিন্দু রমণীর নাম হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। কানিংহামের ধারণা বিবি মালতি সুলতান মাহমুদ শাহের পরিবারেরই একজন। কিন্তু এখানে বিবি শব্দটি সংযুক্ত হয়ে প্রকৃত আগের হিন্দু নামটি রেখে দেওয়া এবং মসজিদের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হওয়াটা তৎকালীন সমাজ ও নেতৃত্বের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা ও সহনশীলতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়।[৮১]

মুসলিম শাসকবৃন্দ বাংলা বিজয়ের পর হিন্দুদের নির্যাতন, হিন্দু উপাসনাগৃহ মন্দির ধ্বংস, কোথাও কোথাও মন্দিরের স্থানে মসজিদ নির্মাণ এবং কোথাও বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাথর দিয়ে মসজিদ স্থাপনা দেয়াল সাজিয়েছে- এমন অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, মাধাইপুরের গুণবন্ত মসজিদসহ আরো অনেক মসজিদের নাম উল্লেখ করে থাকেন। উল্লেখ্য, আদিনা মসজিদের দেয়ালে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করা হয়েছে এবং মসজিদের পূর্ব পাশের দেয়ালে বৃষ্টির পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে ছিদ্র রয়েছে তার মুখে প্রস্তর নির্মিত একটি কুমির শায়িত অবস্থায় আছে। গুণবন্ত মসজিদ সম্পর্কে অভিযোগ হচ্ছে গুণবন্ত নামে এক ব্রাহ্মণের গড়া মন্দিরের উপর এটি নির্মিত হয়েছিল। এ ধরনের অনেক মসজিদ রয়েছে যেগুলোতে হিন্দু স্থাপনার অনেক নিদর্শন- ইট, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছিল যা থেকে তাঁরা ধারণা করেন যে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই এ কাজে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁদের আরো অভিযোগ বখতিয়ার খলজি বাংলায় এসেই মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজী এক বা একাধিক কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভেঙে তার উপকরণ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮২] পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। তাঁরা বলেন, এ কারণেই বড় বড় হিন্দু মন্দির পরবর্তীতে বাংলায় গড়ে উঠতে পারেনি।[৮৩]

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মুসলিম শাসকই হিন্দুদের কোনো মন্দির ধ্বংস করেন নি; এর কোনো প্রমাণও আমরা পাই না। বরং ইসলাম ধর্ম এইরূপ ধ্বংসাত্মক কার্য সমর্থন করে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানগণ এদেশে এসে প্রথমত এদেশবাসীকে আপন করে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। এ সময় থেকেই অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। অতঃপর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি যখন বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন নিম্নবর্ণসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ইবাদতগৃহ মসজিদ নির্মিত হতে থাকলে প্রতিবেশী হিন্দু বা নব মুসলিমগণ মসজিদ নির্মাণে আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। এ কথা অবাস্তব নয় যে, তাদের পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে পাথরখণ্ড সমসাময়িক নির্মাণাধীন মসজিদে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরাই দান করেছিলেন। মুসলমানগণ তাঁদেরকে খুশি রাখা এবং তাঁদের এই দানের স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে তাঁদের দেয়া পাথর খণ্ডগুলো উদারভাবে মসজিদে সংস্থাপন করেছেন। উল্লেখ করা যায়, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবেই মুসলমানগণ হিন্দুদের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তাঁদের মসজিদে ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় আগ্রাসন বা জবর দখল করে মন্দির কেন মুসলমানগণ চাইলে সে সময়ে হিন্দুদের সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখতেন। সুতরাং মন্দিরের পাথরের ভাঙা টুকরা গ্রহণের জন্য মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের মন্দির আক্রমণের প্রয়োজন হবে এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া, এ ধরনের মন্দির আক্রমণের কোনো ঘটনা সমসাময়িক কোনো সাহিত্য বা কোনো সূত্রেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ ধরনের অভিযোগ একেবারেই অসত্য ও অযৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূচি:

---

১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১), পৃ. ১৭

২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *১ম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭৮), পৃ. ০১

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা ১৪০২), পৃ. ৬৮

৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ (সম্পাদিত) ÒEducation for Muslims under the Bengal Sultanate", *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ কে এম ইয়াকুব আলী সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ৭২৯

৫. A K M. Yaqub Ali, Education for Muslims under Bengal Sultanate, *Islamic Studies,* XXIV. 4, Islamic Research Institute, Islamabad, 1985, p. 420.

৬. Dr. P. L. Gupta, The Date of Bakhtiyar Khalji's Occupation of Gaur, *Journal of the Varendra Research Museum, Vol. IV,* 1975-76, pp.33-34; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৯৩; মো. আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস, মুসলিম আমল ১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.* (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৮), পৃ. ২০

৭. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত ও সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ২৮

৮. মুহম্মদ এনামুল হক, শিব প্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিস সরকার, (কর্তৃক সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫) পৃ. ৬৩৯

৯. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৮৯

১০. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৮

১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৫৪-৬০

১২. আ. করিম, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, সদর আলী (সম্পা.) *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী: ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯১), পৃ. ২৪৫

১৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা ১৪০২), পৃ. ১৩২

১৪. *প্রাগুক্ত*

১৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৩০

১৬. সেমিটিক ধর্ম আরবের প্রাচীন ধর্ম। এরা হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র হযরত শাম (আ.) এর বংশোদ্ভূত। এরা পরবর্তীতে মেসোপটেমিয়া ভূ-মধ্যে-সাগরের পূর্বে উপকূল অঞ্চল ও নীল নদের ব-দ্বীপ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। [দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০) পৃ: ৩৪]

১৭. আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১৮. রামাই পণ্ডিত, *শূন্য পুরাণ*, সম্পাদনা, এম. এন বসু (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪০-১৪২

১৯. মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ২৮ বৎসর পর্যন্ত তিনি গৃহে অবস্থান করে সংসার ধর্ম পালন করেন। ২৮ বৎসর পর তিনি গৃহত্যাগ করে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে ধর্ম প্রচার করেন। ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বাওয়াপুরী নামক স্থানে মারা যান। জৈনদের মধ্যে অনেকে ঋষভ নামক এক ব্যক্তিকে ধর্ম প্রবর্তক মনে করেন। তবে জৈনদের সকল ধর্মীয় গ্রন্থের উৎস হচ্ছেন মহাবীর। আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

২০. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০১

২১. নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

২২. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০১-৫০২

২৩. গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে হিমালয়ের কপিলাবস্তু নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি সংসার ধর্মে রত ছিলেন। হঠাৎ করে একদিন তিনি সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘ ছয় বছর সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ দেবের শিক্ষা ছিল: অহিংসা, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্য সাধন, স্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

২৪. নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৯

২৫. নিহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৪

২৬. নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭

২৭. নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭

২৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ১৫

২৯. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ৩০

৩০. অবশ্য, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার বখতিয়ার খলজীকে একজন লুটেরা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা এও উল্লেখ করেন, লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে বাংলায় সুখ ও শান্তির ফোয়ারা বইছিল। একজন লুটেরা সেখানে আক্রমণ করে শান্তি ও সুখ বিনষ্ট করেছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা জাতীয় পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করেছেন।

৩১. [ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে উদ্ধারকৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে এ সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। চর্যাপদের কবি ঢেন্ঢন পাদ উল্লেখ করেছেন:

''জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চৌর সোই সাধী"

(অর্থ- যে বুঝে সে নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু।)

আর একটি চর্যায় কবি ভুসুকু পাদ উল্লেখ করেছেন:

''কাহেরে খিনি মেলি আচ্ছুহু কীস
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস।।
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।।
তিন ন চুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিল অ ণ জানী।।
হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিণআ তো।
এ বন চাড়ী হোহু ভান্তো।।
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঈ।।"

[উল্লেখিত পদগুলোর অর্থ করলে দাঁড়ায়, কাকে নিয়ে ছেড়ে কেমন করে আছো, আমাকে ঘিরে চারদিকে হাক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুকু ছাড়ে না। হরিণ ঘাস ও ছোয় না, পানিও পান করে না। হরিণ-হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে হরিণ তুমি শোন, এ বন ছেড়ে দূরে চলে যাও [দ্র. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* (কলিকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৭৪, ১০২, ১০৩]

৩২. কবিতাটি নিম্নরূপ-

''জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন ।
দখিন্যা, মাগিতে জাঅ, জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন।।
মালদহে মাগে কর, না চিনে আপন পর
জালের নাঞ্চিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।।
বেদ করে উচ্চারণ বের্য্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সবায় কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এই রূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ,
ই বড় হোইল অবিচার
বৈকণ্ঠে খাকিআ ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার।।"

[আধুনিক বাংলায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায়, জাজপুরে ষোল শ' বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায়। যার ঘরে দক্ষিণা পায় না অভিশাপ দিয়ে তার সংসার পুড়িয়ে দেয়। মালদহে তারা আপন পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়। তাদের জাল জুয়াচুরির শেষ নেই। তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দল বেঁধে সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করছে। তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়, সকলে তা দেখে কম্পমান। সকলে মনে মনে অর্থ বুঝে বলে 'হে ধর্ম দেবতা, রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে আমাদের উদ্ধার করবে'?] দ্র. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ৫৫-৫৬; কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানদের কথা*, মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশ: বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স ১৯৯০), পৃ. ৮৬

[৩৩] বৃহদ্ধর্ম পুরাণে শূদ্র জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ১. উত্তম সংকর যথা: করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, শঙ্খকার, দাসচাষী, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী ২. মধ্যম সঙ্কর যথা: তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈল কারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক ৩. অধম সঙ্কর যথা: মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলবাহী ও মল্ল। প্রথমে তাদের সংখ্যা ছিল ৩৬ পরবর্তীতে ৫ জাতিতে সংযোজিত করা হয়েছে। (দ্র. ড. নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪০-৪২)

[৩৪] এ সম্পর্কে চর্যাপদে উল্লেখ পাওয়া যায়:

নগর বাহিরেঁ রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া।
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িয়া ।

অর্থাৎ ডোম্বীনীর সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় ব্রাহ্মণরা তাদের ঘরের আশেপাশে সময়ে অসময়ে কামতাড়িত হয়ে বেড়াত। চর্যাপদের অন্য একটি শ্লোকে এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়:

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামারু জাঅ ।।

অর্থাৎ দিনে বউটি কাকের ভয় পায় কিন্তু রাত্রে অভিসার যাত্রায় যত দূরেই হোক না কেন সে পিছপা হয় না। দ্র. অতীন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫, পৃ. ৪১

[৩৫] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীনযুগ*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ২৫১

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

[৩৭] বিরচিত কয়েকটি শ্লোক থেকে তখনকার ভদ্র নর-নারীদের ব্যভিচারের অবস্থা অনুমান করা যায়:

বৃদ্ধোষ্মাণস্তন পরিসরাঃ কুঙ্কুম স্যাঙ্গরাগা
দোলাঃ কেলি ব্যসনরসিকাঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ
ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনু - সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্যানজ্যোৎস্নামুদমবিরতং কুর্ব্বতে যত্র যূনাং।।
ভ্রাম্যন্তীনাং ভ্রমসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্খিনীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌরসীমন্তিনীনাম।
রক্তাশোকস্তবকলালি তৈর্বালভানোর্ম্ময়ুখৈ
নালক্ষ্যন্তে রজনিবিগমে পৌরমার্গে ষু যত্র।

[উপরিউক্ত শ্লোকের সাধারণ যে অর্থ দাড়ায়, "এই সময় দেশের মধ্যে ব্যভিচার স্রোত এত প্রবল ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমনীরাও জ্যোৎস্নালোকে প্রকাশ্য রাজপথে দোলায় আরোহিত নগর বাসিগণের সহিত প্রেমালাপে সম্পূর্ণ রজনী অতিবাহিত করত। রাজপথ বার বিলাসীগণের মঞ্জীরনিকুণে চমকিত ও মুখরিত থাকিত। বল্লভাকাঙ্খিনী স্বেচ্ছা বিহারিনী অভিসারিকারা গভীর রজনীর অন্ধকারে রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত।"] দ্র .সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ*, ১ম পর্ব (কলিকাতা: প্রকাশ মন্দির প্রা. লি.), পৃ. ৬৭-৬৮

[৩৮] সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে মদপানের স্বাভাবিক রীতি সম্পর্কে বিরুপা উল্লেখ করেছেন:

"এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চী অন বাকল অ বারুনী বন্ধতা।
* * *
দশমী দু আরত চিহ্ন দেখিয়া
আইল গরাহক অপনে বহিয়া
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাকি নিসারা।।
এক সে ঘড়ুলী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল।।

[শ্লোকগুলির সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়, ''এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে বা ঢোকে, সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দরজায় দেয়া থাকে সে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকল তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই (মদের নেশায় এমনই বিভোর); সরুনালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে বিরুপা সাবধান করতেন, সরু নল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুনী ঢালো।] (দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৮)

[৩৯] সুশীলা মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[৪০] স্বামীর সাথে সহমরণকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। পূর্বে হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুসৃত একটি প্রথা। এতে স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিত। ব্রিটিশ ভারতে ১৮২৯ খ্রি. লর্ড বেনটিংক আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা রহিত করেন। (দ্র. খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম সম্পা. *বাংলা বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড, ১৯৭৬, পৃ. ৫২৬)

[৪১] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪

[৪২] নগর বাহিরে রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া,
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।'
[অর্থাৎ ডোম্বীনীর সঙ্গে মিলিত হবার আশায় ব্রাহ্মণরা তাদের ঘরের আশেপাশে সময়ে অসময়ে কামতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াতো। (দ্রঃ অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, কলকাতাঃ নয়া প্রকাশ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫)]

[৪৩] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৫

[৪৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৬

[৪৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬৬-৪৬৭

[৪৬] কুক্কুরীপাদের একটি গীতে বর্ণিত রয়েছে,
'দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।
[অর্থাৎ বৌটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চিৎকার করে ওঠে, অথচ রাত হলেই কোথায় যে চলে যায়। (দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬৯)]

[৪৭] এ আমলের চর্যাপদের কয়েকটি লাইন এরকম,
'নর অ নারী মাঝে উভিল চীরা'।
অর্থাৎ - নর ও নারী মাঝে উর্ধ্ব করলাম লিঙ্গ।"
দ্র. উৎ. Muhammed Shahidullah, *Budhist Mystic Songs, Dacca*: 1966, P:12|

[৪৮] অতুল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

[৪৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২১-৭২২

[৫০] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২২

[৫১] সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[৫২] মিশকাত আল মাসাবীহ (করাচীঃ নূর সুজস্সত লাইব্রেরী) কিতাব আল ইলম, পৃ. ৩২, ৩৫

[৫৩] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮) পৃ. ৩৯

[৫৪] আবদুল করিম, *বংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৮

[৫৫] কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন যে, খ্যাতিনামা তুকী সেনাপতি বখতিয়ার খলজির লক্ষনাবতী অধিকারের পূর্বের কিছু সংখ্যক আরব বণিক বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ অভিমতের প্রামান্য দলীল না থাকলেও এখানে আগে থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। দ্র. ড. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩১-৩২

[৫৬] মীনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৭

[৫৭] Jadunath Sarkar, *The History of Bengal,* Vol-II Muslim Period 1200-1757, (Dhaka : The University of Dhaka, First Edition Fourth Impession, 2006), p. 9

[৫৮] মীনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[৫৯] বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, পৃ. ৯৫

[৬০] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৩

[৬২] *প্রাগুক্ত*

[৬৩] চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ। উদ্ধৃত-আবদুল করিম, *বংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৩৩৫

[৬৪] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* (১২০৪-১৫৭৬), (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০০), পৃ. ৫৪৪; উদ্ধৃত-আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫

[৬৫] আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫

[৬৬] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৯২

[৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

[৬৮] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৫; এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[৬৯] চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ আছে, কাজী সাহেব এইভাবে সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
দ্র. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, পৃ. ৩২৫

[৭০] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৪৪

[৭১] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ২৯৫

[৭২] বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৭৯; এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ২৯৬

[৭৩] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৯৭।

[৭৪] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ. ৩১৯

[৭৫] Azizur Rahman Mallick, British Pokicy and the Muslims in Bengal, (Dhaka, 1965), p. 9

[৭৬.] জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, (নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাগ সম্পাদিত) (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১২ সন), পৃ. ১১

[৭৭.] জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, (নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাগ সম্পাদিত) (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১২ সন), পৃ. ১১

[৭৮.] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৫৯

[৭৯.] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

[৮০.] এম আবিদ আলী খান মালদহী, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, (ঢাকা : ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ১১০; Shamsuddin Ahmd, *Inscriptiption of Bengal*, Vol. IV (Rajshahi : Varendra Research Museum, 1960), pp. 238-239; Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1992), pp.365-366; এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *সাম্প্রতিক প্রত্ন গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৪৫

[৮১.] এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৩২

[৮২.] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্য যুগ, পৃ. ৪৪৫

[৮৩.] *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৯৩

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাংলা বানান: সমকালকে ধারণ করে নিরন্তর সহজ ও স্পষ্টীকরণের পথে

মোহাম্মদ সফিকুল আলম*

সারসংক্ষেপ : বাংলা বানান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বোদ্ধামহলে বিভ্রান্তি, বিতর্ক চলে আসছে। এ বিতর্ক নতুন নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে হাল আমলের প্রথিতযশা ভাষাবিদদের মধ্যেও বানান-বিতর্কের রেশ চলে আসছে। তাঁদের প্রস্তাবে বৈচিত্র্য থাকলেও একটা মূল সুর সকলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে - সেটা হচ্ছে বানান ও উচ্চারণে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টীকরণের চেষ্টা। তাঁদের প্রস্তাব ও চেষ্টার ফলশ্রুতিতে আজ আধুনিক বাংলা বানান অনেকক্ষেত্রেই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়েছে। ভাষা যেহেতু সর্বদা গতিশীল, সেহেতু বলা যেতে পারে, এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে অনাগতকাল পর্যন্ত। আলোচ্য প্রবন্ধটি সেরকম চেষ্টারই একটি দুর্বল প্রয়াসমাত্র।

প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী সুধীর মিত্র 'বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ' প্রবন্ধে বলেছেন–

> বাংলাভাষা খুব বেশী দিনের ভাষা নহে। ইহার গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র একশত বৎসর পূর্বে–তৎপূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাকে নামে মাত্র ভাষা বলা যাইতে পারে। এখনকার ভাষার সহিত শতবর্ষ পূর্ব্বকার ভাষার তুলনা করিলে মনে হয়, – এ ভাষার সহিত সে ভাষার আকাশ পাতাল তফাৎ, এক ভাষা বলিয়া চিনিতেই কষ্ট হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা যে কোন জাতির পক্ষে গৌরব ও শ্লাঘার কথা হইতে পারিত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কোন ভাষাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, বাংলাও পারে নাই। পৃথিবীর অনেক বড় বড় ভাষা শত শত বৎসর পার হইয়া আসিয়াও পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই, সেদিক দিয়া হিসাব করিলে বাংলা ভাষার গৌরব করিবার অনেক কিছুই আছে। তবুও আজ ইহার যে সকল ত্রুটি ও অভাব আছে তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সে সকল ত্রুটি সংশোধন ও অভাব মোচনের ভার সমগ্র বাঙালী জাতির উপর।[১]

ভাষা হওয়া উচিত সহজ, সরল, গতিশীল স্রোতস্বিনীর ন্যায়। যে ভাষা সাধারণের প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে সহসা সে ভাষার অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তাই তো আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের কলমযোদ্ধাদেরকে কঠিন শব্দের পরিবর্তে সহজ ও স্পষ্ট শব্দ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে।[২] বানান অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। সে অভ্যাস বদলানো সহজ নয়। এমনকি বুদ্ধি দিয়ে যা গ্রহণ করা যায় লেখার সময়ে অভ্যাসের কাছে তা হার মানে।[৩] বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা আমাদের অতি পরিচিত বৃক্ষ 'বাঁশ' প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে/ যেহেতু তা লাগে বিশ্বকাজে।' দেখা যাচ্ছে, 'বংশ' শব্দটি পরবর্তীতে সহজ হয়ে 'বাঁশ' হয়ে গেছে। এতে 'বংশ' শব্দের একাধিক অর্থের বিভ্রান্তিও দূর হয়েছে। সম্প্রতি অনেক বছর পর বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষও সময়ের দাবিতে 'একাডেমী' শব্দটিকে 'একাডেমি'তে নবায়ন করেছে[৪]। অতৎসম শব্দের মতো বিদেশি শব্দের বেলায়ও ঈ-কার বর্জনের চেষ্টা চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। আর 'একাডেমি' তারই সার্থক রূপায়ণমাত্র। উপর্যুক্ত শিরোনামে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নোক্ত মতামতটি তুলে ধরা সঙ্গত বলে মনে করি:

> ভাষার ব্যবহার অভিধানসিদ্ধ শব্দের সীমানা ডিঙিয়ে নানা মাত্রায় বিকশিত হয়। শব্দের ও বাক্যের ব্যবহার নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করে এর বিকাশের ধারা। কারো কারো মধ্যে মাতৃভাষায় আঞ্চলিক বুলির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কেউ বা ভাষাকে নিজের উপযোগী সামাজিকীকরণ করতে চান। কেউ বা ভাষাকে আপন অধিকারে এনে পরনিন্দা বা খিস্তি খেউড়েও ভরে তুলতে পারেন। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, এ ভাষার একটা প্রমিত ও সুশৃঙ্খল সুন্দর রূপ আছে, নিয়মসিদ্ধ ব্যাকরণসম্মত গঠন আছে। সেভাবেই আমাদের চর্চা করতে হবে। আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ একটি ভাষা, ভাষা শব্দসম্পদ ও বাক্য-কলায় ধনী। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ২২ কোটি লোক এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা শতরূপিণী, চিরযৌবনবতী। কিন্তু বাঙালির সংগ্রাম ও সাহসে, রক্তস্রোত ও আন্দোলনে এটা যতটুকু এগিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সে প্রতিষ্ঠা পায় নি। তবুও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আমাদের সর্বপ্রকার আবেগ ও অনুভূতির ভাষা আমাদের মাতৃভাষা–বাংলা। এ ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন, এ ভাষার গৌরব স্বমহিমায় সুষমামণ্ডিত।[৫]

* সিনিয়র শিক্ষক (বাংলা), আইডিয়াল স্কুল এণ্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা। বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এ ভাষায় প্রতিটি ধ্বনি উচ্চারণের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র বর্ণ রয়েছে। যার কারণে বিশ্বের অনেক দেশেই বাংলা ভাষা গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়। আফ্রিকার কিছু দেশ ও ভারতের একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসেবে ঐসব দেশের মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছে। তার কারণ—

> বাংলা একটি বিজ্ঞানসম্মত ভাষা, যার সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। যারা জটের কথা বলেন, তারা বস্তুত জানে কম, বলে বেশি। এমন নয় যে এসব লোক আরও এক-দুইটা ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে। পৃথিবীর কোনো ভাষাই বানান জটিলতা থেকে মুক্ত নয়। হ্যাঁ, বাংলা বানানে বেশিরভাগ শব্দের সাথে উচ্চারণগত অমিল আছে, একই শব্দের দুই-তিনটি বিকল্প বানান আছে। আছে ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, অনুস্বার, উঁয়ো, চন্দ্রবিন্দু, বিসর্গ সমস্যা।[৬]

কিন্তু এতসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বলতেই হয়, বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রুতিমধুর ভাষা, যে ভাষার রয়েছে **১১** টি স্বরবর্ণ ও **৩৯** টি ব্যঞ্জনবর্ণ। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এ ভাষার প্রথিতযশা পণ্ডিতব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. আবদুল হাই, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এ ভাষারই বিদগ্ধজন। এ ভাষার নিরন্তর উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে 'বাংলা একাডেমি'র মত একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট'। 'বাংলা বানান' প্রসঙ্গে ড. মাহবুবুল হকের 'পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি:

> বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার জন্যে ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল তাতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকল্প বানানের সুযোগ থেকে গিয়েছিল। ফলে কুমির/কুমীর, জার্মানি/জার্মানী, বাড়ি/বাড়ী, বেশি/বেশী, ভিড়/ভীড়, মাসি/মাসী, রাণী/রানী ইত্যাদি বিকল্প বানান চলতে থাকে। বিকল্প বানান বা বানান-ভিন্নতা আরও কিছু কারণে গড়ে উঠেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বরেণ্য লেখক মেনে নিলেও কেউ কেউ মানতে রাজি হন নি। ফলে ঐ বানান বিধি বাংলা বানানের ব্যাপক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনলেও সর্বমান্য হয় নি বলে বানান-ভিন্নতা থেকেই যায়। ঐ সময়ে বিশ্বভারতী আলাদাভাবে একটা বানান-বিধি তৈরি করে এবং তাদের প্রকাশিত বইপত্রে নিজস্ব বানান-রীতি অনুসরণ করতে থাকে। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের বানানের নিয়মে পুরোপুরি সমতা না থাকাতেও বিকল্প বানানের সমস্যাটি থেকে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনায় ছাপা হতে থাকে ইংরেজী, বাঙালী আর বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় ছাপা হতে থাকে ইংরেজি, বাঙালি। এভাবে এ দুই প্রতিষ্ঠানের হাতে বহু শব্দের দুরকম বানান আমরা পেয়েছি।[৭]

অবশ্য আমরা জানি, বর্তমানে লেখালেখির জগতে ই-কারের জয়জয়কার লক্ষ করা যাচ্ছে। 'ই-কার' এর ব্যবহার প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব। এবারে বাংলা শব্দ প্রসঙ্গে আসা যাক। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ যখন অর্ধতৎসম বা প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে, তখন তাকে তদ্ভব বা বাংলা শব্দ বলে। আধুনিক বাংলা ভাষা এই তদ্ভব শব্দের ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। কতগুলো উদাহরণ লক্ষ করা যাক-

সংস্কৃত>	প্রাকৃত>	বাংলা	সংস্কৃত>	প্রাকৃত>	বাংলা
কার্য	কজ্জ	কাজ	মৎস্য	মচ্ছ	মাছ
হস্ত	হত্থ	হাত	উষ্ট্র	উট্ট	উট
তঙ্ক	টঙ্কা	টাকা	চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
পাষাণ	পাহাণ	পাহাড়	চর্মকার	চম্মআর	চামার
কাষ্ঠ	কট্ঠ	কাঠ	কর্মকার	কম্মআর	কামার

দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত কঠিন শব্দগুলো কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে সহজ রূপ নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন – কঙ্কন>কাঁকন, পঞ্চম>পাঁচ, কণ্টক>কাঁটা, অঞ্চল>আঁচল, স্বর্ণ>সোনা, দেবকুল>দেউল, ভ্রান্ত>ভুল, সন্তার>সাঁতার, ষোড়শ>ষোল, অদ্য>আজ, গৃহিণী>গিন্নি ইত্যাদি। বর্তমানে এই সহজ রূপের বাংলা শব্দ নিয়েই লেখালেখির জগতে আমাদের বসবাস। ভাষা কখনও থেমে থাকে না। নিরন্তর এগিয়ে চলাই ভাষার ধর্ম। এগিয়ে চলতে গিয়ে ক্রমেই সে জটিল রূপ থেকে সহজ ও সহজতর রূপে বিকাশ লাভ করে। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা[৭] করলে এর সত্যতা নিরূপণ করা যায়। কাজেই বাংলা বানানও সময়ের বিবর্তনে সহজতর রূপ লাভ করবে, এটাই স্বাভাবিক। ড.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা বানানে বিকল্প থাকা পছন্দ করতেন না।[৮] তাছাড়া স্পষ্ট ও সহজ বাংলা বানানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাংলা বানান সম্বন্ধে তাঁর আংশিক অভিমত তুলে ধরা হল:

> ১০ নম্বর নিয়মে বলা হইয়াছে, "মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে।" কিন্তু আমার বিবেচনায় তদ্ভব ও দেশী শব্দে কেবলমাত্র শ হইবে। ইহা ধ্বনিসম্মত এবং প্রাকৃত ব্যাকরণ-সম্মত। যখন মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে ণ বা ণ না করিয়া কেবল ন বিধান করা হইয়াছে, তখন তদ্ভব শব্দে তিনটি শ, ষ ও স রাখা অযৌক্তিক। তবে উচ্চারণ অনুযায়ী বিদেশী শব্দে ও যুক্ত বর্ণে স থাকিতে পারে, যেমন সার (Sir), সালাম, মুসলমান, মস্ত, কাস্তে।...আমি যদিও সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে বানান পরিবর্তন, আমি আশা করি, আপত্তিজনক হইবে না।

১. জ ও য স্থানে কেবল জ। সংস্কৃতে এই দুয়ের পৃথক আকার ও উচ্চারণ আছে; কিন্তু বাংলায় আকৃতি পৃথক হইলেও উচ্চারণ এক। শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবলমাত্র জ-য়ের ব্যবহার আছে। সংস্কৃত যমল, যশঃ, যামিনী, যুবা, যমুনা, যেন শব্দগুলি উক্ত দুই প্রাকৃতে বর্গীয় জ দিয়া লেখা হয়। বাংলার মূল গৌড়ী প্রাকৃতেও এইরূপ ছিল, অনুমান করা যায়।

২. ণ ও ন স্থানে কেবল ন। মাগধী, শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবল ণ এবং পৈশাচী প্রাকৃতে কেবল ন আছে। যখন বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত শব্দের ণ ও ন-এর মধ্যে কোনও ভেদ করা হয় না, তখন অক্ষরে ভেদ করিবার কোনও কারণ নাই। সংস্কৃত কণা, গণনা, ঘুণ, মণি শব্দগুলি পৈশাচী প্রাকৃতে ন দিয়া লেখা হয়। যথা– কনা, গননা, ঘুন, মনি। গৌড়ী প্রাকৃতেও এইরূপ ছিল, অনুমান করা যায়। সুতরাং, এই সংস্কার ধ্বনিও প্রাকৃত ব্যাকরণ–সম্মত।

৩. শ, ষ, স স্থানে সর্বত্র শ। অশোক লিপি, পালি ও প্রাকৃতে ষ নাই। অশোক লিপি, পালি এবং শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবল স ; মাগধী প্রাকৃতে কেবল শ আছে। গৌড় অপভ্রংশে এই শ ছিল, অনুমান করা যায়। সশেষ শব্দটি অশোক লিপি প্রভৃতিতে সসেষ এবং মাগধী প্রাকৃতে শশেশ রূপে লিখিত হইবে।

৪. ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঞ্চ স্থানে ন্চ, ন্ছ, ন্জ, ন্ঝ লিখিলে উচ্চারণসম্মত হয়। হিন্দীতে এরূপ স্থলে
বিকল্পে ং লেখা হয়। বাংলাতেও তাহা চালান যাইতে পারে।

৫. জ্ঞ, ক্ষ থাকিবে, তবে তাহা গ্যঁ, ক্খ–এর প্রতীকরূপে এবং তাহা গ্যঁ ও খিয় রূপে পড়িতে হইবে। পূর্বে ক্ষ–কে খিয় পড়া হইত।

৬. আমি অন্ত্য বিসর্গস্থানে হ্ এবং শব্দ মধ্যে বিসর্গস্থানে পরবর্ণের দ্বিত্ব প্রস্তাব করি। আঃ, দুঃখ স্থানে আহ্, দুক্খ হইবে। ইহা ধ্বনিসঙ্গত।[৯]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্যের সাথে সমকালের অনেকেরই মতামতের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'একই বাংলা শব্দের একাধিক বানান যে বাঞ্ছনীয় নয়, এ কথা – আরও অনেকের মতো – আমরাও বিশ্বাস করি।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য মোতাবেক বাংলা বানানের মৌলিক সমস্যাগুলো পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। যথা :

ক. জ ও য;

খ. ণ ও ন;

গ. শ, ষ ও স;

ঘ. বাংলা বানানে একাধিক যুক্তাক্ষর;

ঙ. বিসর্গ ধ্বনির অবস্থান ভেদে উচ্চারণ ভিন্নতা।

এছাড়াও ই, ঈ এবং উ, ঊ ব্যবহারের পার্থক্য নিয়েও জটিলতার অন্ত নেই। আনন্দের বিষয় হল এই, তিনি সমস্যাগুলো পাঠকের নিকট উপস্থাপনের পাশাপাশি সমাধানেরও পথ বাতলে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়। তাঁর সুপারিশগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলা ভাষা কাঠিন্য ও জটিলতার হাত থেকে অনেকাংশে বেঁচে যেত। ভাষাবিজ্ঞানী সুধীর মিত্রের প্রস্তাব অনুসারে, উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি জোড়া থেকে একটিকে রেখে অতিরিক্তগুলোকে বাদ দিতে পারলে বাংলা বানান সমস্যা অনেকাংশে সহজ হয়ে যেত।[১০] তার মতামতের সাথে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রস্তাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুধীর মিত্রের মতে, 'কাজেই বাংলায় নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বানান চলিয়া আসিয়াছে, আজ বর্ণমালা হইতে মূর্দ্ধন্য ণ ছাঁটিয়া দিলে অনেক গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে, ক্ষতিও হইবে না।...কোন শব্দের আদিতে ণ হয় না, কাজেই ণ বর্জ্জন করা সুবিধাজনক।'[১১]

শ, ষ ও স – এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় প্রায় একইরকম। এ প্রসঙ্গে সুধীর মিত্র তাঁর 'বাংলা ভাষার বানান ও মুদ্রণ' প্রবন্ধে বলেন –

শ ও ষ অপেক্ষা স-এর প্রয়োগ বাংলায় অধিক এজন্য আমরা স-কে রাখিবার পক্ষপাতী। বর্গ্য জ এবং অন্তঃস্থ-য এর উচ্চারণে বাংলায় কোন তারতম্য দেখা যায় না – অর্থাৎ আমরা 'য' কে 'জ' - এর মতোই উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। 'যাওয়া' স্থলে 'জাওয়া' লিখিলে কোনই ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। ব্যাকরণে দেখিতে পাই, স্বর দুই প্রকার-হ্রস্ব ও দীর্ঘ। হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে অল্প এবং দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রস্তাবিত বর্ণের মধ্যে ই, উ, হ্রস্ব ও ঈ, ঊ দীর্ঘ স্বর। আমাদের মনে হয়, দীর্ঘ স্বরদ্বয় বাদ দিলে কোনই ক্ষতি হইবে না। দীর্ঘ স্বর সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে বাংলায় আসিয়া দীর্ঘ আসন জুড়িয়া বসিলেও বাংলায় ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, আমরা হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে কোন তারতম্য করি না, করিলে তাহা এত সূক্ষ্ম যে উহা বাদ দিলে ভাষার কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই।[১২]

বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ 'কী' এর প্রচলন করে[১৩] আরেকটি বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। হ্রস্ব ও দীর্ঘ সর্বক্ষেত্রেই 'কি' ব্যবহার করা যেত। প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ি 'কি' এর দীর্ঘ উচ্চারণ কি করা যেত না ? তবুও সময়ের দাবিকে উপেক্ষা না করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 'কী' ও 'কি' এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করেছে।[১৪]

কি (অব্যয়)	কী (সর্বনাম)
১. কি ছেলে কি বুড়ো সবাই মেলায় এসেছে।(সাকুল্যবাচক অর্থে)	১. কী কাজ দেখালে রে বাবা ! (বিস্ময়সূচক বাক্যে)
২. ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা আর কি! (বিশেষ ভাব প্রকাশে)	২. কীসে তোমার রুচি, আমায় বলবে তো !
৩. জিনিসটা ভালো কি মন্দ, তুমি কীভাবে বলবে? (বিকল্পার্থে)	৩. আজ আর তোমার কী চাই ?
৪. তুমি কি তাকে একথা বলেছো ?	৪. ভাবছি , কীভাবে কাজটা করবো।

আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী, পদের শেষে বিসর্গ (ঃ) লিখতে হবে না। যেমনঃ ইতস্তত, অহরহ, ক্রমশ, দৃশ্যত, মুখ্যত,স্বভাবত ইত্যাদি। তবে শব্দের মধ্যে অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) বহাল থাকবে। যেমনঃ অতঃপর, মনঃক্ষুণ্ন, অন্তঃস্থ, পুনঃপ্রচার, স্বতঃপ্রণোদিত, নিঃসরণ ইত্যাদি।[১৫] নেই, নাই, নি, না, নই, নয়– এই ছয়টি নঞর্থক অব্যয় আগে শব্দের সাথে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিককালে এগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে বাক্যে স্বাধীনভাবে বসবে।[১৬] যেমনঃ বাবা গতকাল হাটে যান নি। অয়ন চালাক নয়। তোমাকে দেওয়ার মত আজ আর আমার কিছু নেই। তবে 'কেননা' শব্দের 'না' আলাদা হবে না। এটি যুক্ত থাকবে। কারণ 'কেননা' একশব্দ। নেপাল মজুমদার সম্পাদিত বানান বিতর্ক (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে ভাষাবিদ সুধীর মিত্র বলেন, 'আমরা বানান করিয়া কথা বলি না বা উচ্চারণ করি না। বানান উচ্চারণকে অনুসরণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অথচ উচ্চারণের উপর নির্ভর করিয়া বানান করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই – থাকিলে অনেক হাঙ্গামা চুকিয়া যাইত।'[১৭] বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রাবন্ধিক সুধীর মিত্রের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করে আমরা বানানে যে দিকনির্দেশনা পাচ্ছি তা হল :

ণ স্থলে ন	=	রাণি>রানি, কণা>কনা, গ্রামীণ>গ্রামীন, ধরণ>ধরন (বর্তমানে বানানগুলো প্রচলিত)
শ ষ স্থলে স	=	শিশি>সিসি, সুশান্ত>সুসান্ত, ষান্মাসিক>সান্মাসিক
য স্থলে জ	=	যৌবন>জৌবন, অভিযোগ>অভিজোগ, যাওয়া>জাওয়া
ঈ স্থলে ই	=	নিরীহ>নিরিহ, দীর্ঘ>দির্ঘ, কী>কি
ঊ স্থলে উ	=	বধূ>বধু, ঊষা>উসা

উদাহরণগুলোর অর্থে কোনরূপ বিভ্রান্তি নেই। এদের মধ্যে উচ্চারণগত কোন বৈশিষ্ট্য বা ঐক্যও নষ্ট হয় নি। বর্তমান সময়ে রাণি, গ্রামীন, অনুযায়ি, শ্রেণি, নির্বাচনি, সরকারি, বেসরকারি ইত্যাদি বানানের বহুল ব্যবহার আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, বই-পুস্তকে লক্ষ করি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' গ্রন্থে পুরাতন বানানের পরিবর্তে নতুন যে বানানগুলো লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হল:

লিখুন	লিখবেন না	লিখুন	লিখবেন না
ইসলামি	ইসলামী	উনিশ	ঊনিশ
ইস্পাহানি	ইস্পাহানী	দরুন	দরুণ
বাংলা	বাঙ্গলা/বাঙ্গালা	বেশি	বেশী
উর্বশী	ঊর্বশী	বেআইনি	বেআইনী
নকশা	নক্সা	খিদে	ক্ষিদে
উহ্য	ঊহ্য	বিদেশি	বিদেশী
বর্ণালি	বর্ণালী	বদলি	বদলী

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সমোচ্চারিত ধ্বনির পৃথক বানানে যেখানে ভিন্নার্থ প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে কী হবে? যেমন: নারি= না পারি, নারী= মহিলা; চির= নিত্য, চীর= ছেঁড়া কাপড়; করি= ক্রিয়ার রূপবিশেষ, করী= হাতি। এরূপ ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ অনুসারেই অর্থ নির্ধারিত হবে। যেমন: আমাকে আশি টাকা দাও। সাপের আশিতে বিষ থাকে। এখানে প্রথম বাক্যের 'আশি' ও দ্বিতীয় বাক্যের 'আশি'র অর্থ নিয়ে কারো বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। এখন সময় হয়েছে, বাংলা ভাষার একটি আদর্শ সঠিক বানান রীতি প্রবর্তন করা– যাতে কোনরূপ বিকল্প বা বিভ্রান্তি থাকবে না। তৎসম শব্দের আইন-কানুনের বেড়াজাল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় একটা সত্যের প্রতি দৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে, হয়েছে আমরা লিখি এক আর পড়ি আর এক। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায় আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।" প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জগন্নাথ চক্রবর্তী বলেন: "প্রাকৃত বাংলা ভাষাই প্রকৃত বাংলা ভাষা। এই ভাষাটি আজ পর্যন্ত অভিধানে, ব্যাকরণে, বানানে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় নি। এটি করা দরকার। বাংলা ভাষা এখন সাবালক, নিজেকে নিজের নামে পরিচয় না দেবার আর কোনো যুক্তি নেই।"[১৮] তিনি 'বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব' প্রবন্ধে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন[১৯]:

১. বাংলা বর্ণমালা থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দেওয়া হবে। দরকার হলে বর্ণমালার প্রয়োজনীয় বর্ণ যুক্ত হতে পারবে। বর্ণের মোট সংখ্যা যথাসম্ভব কমানো হবে।
২. যুক্তাক্ষর বর্জন করা হবে। যুক্ত স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত আকারে অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে, মিশ্র অক্ষর থাকবে না।
৩. যুক্তাক্ষর বর্জনের জন্য হস্ চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে হস্ চিহ্ন ব্যবহার খুব সীমায়িত রাখা হবে।
৪. বানান হবে বাংলা উচ্চারণের যথাসম্ভব কাছাকাছি। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণভাবে গ্রাহ্য এই নীতি বিসর্জন দেওয়া চলবে না। কিছু কিছু পার্থক্য অভ্যাসের দ্বারা নির্ণীত হবে।

ভাষাবিদ সুধীর মিত্র বানান সংস্কারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর মতামত উদ্ধৃত করা গেল-

> সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে।[২১] সুতরাং সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খলে বাংলাকে চিরদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনই হেতু নাই। বহু ভাষা হইতে পুষ্ট-কলেবর হইলেও বাংলা একটি স্বতন্ত্র এবং জীবন্ত ভাষা। অতএব বাংলা শিক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে হইলে তাহা অহেতুক উৎপীড়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াও বাংলা ষত্ব ণত্বের পুরাপুরি কিনারা হয় না। যদি হয়ও, অন্য ভাষা হইতে যে শব্দগুলি আসিয়াছে তাহাদের উপায় কি ? তাহারাও কি সংস্কৃত সূত্রাধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে ?...ভাষার আসল মাপকাঠি হইতেছে সাহিত্য, ব্যাকরণের কসরৎ নয়। সাহিত্য সৃষ্ট হইতে থাকিলে ব্যাকরণ নিজের পথ খুঁজিয়া লইবে, সেজন্য ব্যাকরণের দোহাই দিয়া সাহিত্যে প্রচলিত বানান জোর করিয়া চালাইবার প্রয়োজন হইবে না। ব্যাকরণের বাঁধাধরা গণ্ডীর বাহিরে না আসিতে দিলে ভাষার পঙ্গুত্ব কোনদিন ঘুচিবে না। যে সব বানান ব্যাকরণসঙ্গত না হইয়াও আজ পর্যন্ত

টিকিয়া আছে ব্যাকরণ তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। এবং আজ যদি সাহিত্যিকেরা বানানের উক্তরূপ সংস্কার চালাইয়া লইতে চেষ্টা করেন–ব্যাকরণ তাও সসম্মানে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।[২০]

বাংলা বানানের কতিপয়ক্ষেত্র বিবেচনা করে এর সংস্কার করলে বানান সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলা বানানের জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূচি:

---

১. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, *বানান বিতর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৩৭

২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার প্রচ্ছদে 'যা মনে রাখা দরকার' শিরোনামে বলা হয়েছে, 'সব ভাষারই আছে দুটি স্তর। একটি সরল, অন্যটি কঠিন। সরল ভাষার তুলনায় কঠিন ভাষার নাগাল অনেক সীমাবদ্ধ। যা ছাপা হয়, তার ভাষা যদি হয় কঠিন স্তরের, এই সীমাবদ্ধতার কারণেই তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে পারে না। লক্ষ্য যেখানে বৃহত্তর পাঠকসমাজ, ভাষা সেখানে সরল হওয়া চাই।.......কঠিন শব্দ পরিহার করুন। শার্দূলের গর্জনের চেয়ে বাঘের হালুম কম ভয়ঙ্কর নয়।'

৩. প্রাগুক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও কাজের পরিধি বাড়াতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয় 'বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩'। এ আইন পাসের মাধ্যমে 'বাংলা একাডেমী অধ্যাদেশ – ১৯৭৯' রহিত করা হয় এবং নবরূপে আবির্ভূত হয় 'বাংলা একাডেমি'। নতুন আইনের মাধ্যমে দীর্ঘ ৫৬ বছর পর পরিবর্তন হয়েছে বাংলা একাডেমীর 'একাডেমি' বানান। বানানরীতি অনুযায়ী 'একাডেমি' শব্দটি এসেছে বিদেশি শব্দ থেকে। এটি কোনো তৎসম শব্দ নয়। তাই এর বানান পরিবর্তন করা হয়েছে। সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো; তারিখ : ১৬-০৯-২০১৩

৫. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য, শিক্ষাবর্ষ - ২০১০, সংস্করণ - ১৯৯৬; মুনীর চৌধুরীর রচনা 'মাতৃভাষা'র মূল বক্তব্য, পৃ. ১২৪

৬. ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'অনুপ্রাণন'; ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা; অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৪২০ সংখ্যায় সরদার মেরাজ রচিত 'বাংলা বানান ভুল: একটি ফুলকুঁড়ি রচনা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে; পৃ. ৩৪

৭. 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে ড. হুমায়ূন আজাদ বলেন, "বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসে নি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।"

৮. বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত; 'বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার' প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'আমি বিকল্প বিধি দ্বারা গোলযোগ সৃষ্টি পছন্দ করি না।' পৃ. ২০৭

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮, ২০৯

১০. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত বানান বিতর্ক (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে ভাষাবিদ সুধীর মিত্র বলেন, "আমাদের মনে হয়, উপর্যুক্ত বর্ণগুলির মধ্য হইতে দন্ত্য ন, দন্ত্য স, হ্রস্ব-ই,হ্রস্ব-উ এবং বর্গ্য-জ-কে রাখিয়া বাকীগুলিকে ভাষার অঙ্গহানি না করিয়াও বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।" পৃ. ৩৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১২. প্রাগুক্ত;

১৩. সূত্র: প্রাগুক্ত

১৪. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'পাঠ্য বইয়ের বানান' গ্রন্থের (পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৯) পৃ. ৩৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৭. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত 'বানান বিতর্ক' (তৃতীয় সংস্করণ); পৃ. ৩৮ - ৩৯

১৮. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত 'বানান বিতর্ক' (তৃতীয় সংস্করণ); পৃ. ২৪৭

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-২৫১

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

২১. 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে ড.হুমায়ূন আজাদ বলেন, 'একদল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথামতো চলে নি। না চলে চলে অন্যরকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়।'

ISSN 2227-1635
নবপর্যায়: ৩য় সংখ্যা

বাঙালি চেতনায় নজরুল

মোঃ মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ: শুধু বাংলাদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারাই বাঙালি জাতি নয়, এদেশের ভূখণ্ডের বাইরের বাংলাভাষি মানুষকে বাঙালি এবং সেই জাতিকে বাঙালি জাতি বলা যায়। যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি ছিল নির্যাতিত, অবহেলিত, নিপিড়ীত ও বঞ্চিত। ব্রিটিশ শাসনামলে তা অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় ভাগ্যহত পরাধীন জাতির মুক্তির মানসে নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতির মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনার জোয়ার এনেছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন গল্প, কবিতা, গান, নাটক প্রভৃতি লেখনির মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শের মধ্যে বাঙালি জাতিরও অতীত ঐতিহ্য আছে; আছে সেই ঐতিহ্যের গৌরবময় ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে বাঙালি তার একাগ্র মনন সাধনায় বাইরের প্রভাবসমূহকে আত্মস্থ করে এবং দেশীয় আবেগ চেতনায় তাকে একাত্ম করে রচনা করেছে এ ইতিহাস। তাই আবুল কাশেম ফজলুল হক উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন-

> বাঙালি শুধু ইউরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়; আযাবর্ত ব্রহ্মাবর্তের, মক্কা-মদিনার কিংবা মস্কো-পিকিং-এর নিরেট প্রতিধ্বনিও বাঙালি নয়।... বাঙালির স্বকীয় সত্তা আছে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, স্বকীয় ইতিহাস আছে, অনন্ত সম্ভাবনা আছে। বাঙালির এই আত্মবিকাশের ধারায় মিলন-বিরোধ আছে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে, বিকার ও প্রতিকারের প্রয়াস আছে, অধঃপতন ও নব উত্থান আছে, স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়-ক্ষতি আছে, পরাজয় আছে, পরাধীনতা আছে, সর্বোপরি আছে অপরাজেয় মনোবল। বাঙালি বাহির থেকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু অপরের মধ্যে বিলীন হয়নি- নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি।[১]

অপর সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেও নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ন রাখার মধ্যেই বাঙালি রচনা করেছে তার মননচর্চার ইতিহাস, যদিও এ ইতিহাস বাঙালির উৎপত্তির বিষয়ের মতোই আজও অনেকটা ধূম্রাচ্ছন্ন। সঠিক উপাদান আর পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণের অভাবে বাঙালির অতীত ঐতিহ্যের বিষয়ে তাই বিশুদ্ধ দার্শনিক মহলেও অনাকাঙ্ক্ষিত মতবিরোধ বিদ্যমান কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক প্রাগ্রসর জাতির মতো বাঙালির চিন্তা ও চেতনা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রতীচ্য রীতির আলোকে বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চেতনাকে আমরা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক, এই তিন যুগে বিভক্ত করে দেখতে পারি। তবে এই তিন যুগে বাঙালির চেতনা ও যাতনা বিভিন্নভাবে বিকশিত হলেও মানবতত্ত্বের যে দিকটি সার্থক জীবনদর্শনের স্বরূপ-লক্ষণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সে দিকটি কিন্তু বাঙালির সব যুগেই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। জগৎ-জীবনের স্বরূপ ও গুঢ়ার্থ আবিষ্কার এবং যথার্থ মানবোচিত জীবনের অনুসন্ধান-সহ মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনা বাঙালির চিন্তা একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দিয়েছে যুগে যুগে।

তাই বাঙালির উৎপত্তি ইতিহাস যেমন সনাতন, বাঙালির চিন্তা চেতনায় মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনার ইতিহাসও তেমনি সনাতন। সেই সুপ্রাচীনকালে বাঙলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পূর্বেই যখন এ দেশে সংস্কৃত ভাষায় শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা চর্চিত হতো, তখনও বাঙালি তার পাশাপাশি চর্চা করতো মানবতত্ত্বের। মধ্যযুগের বাঙালি মানসে মানবতত্ত্বের এ চর্চা আরও বিকশিত হয়। উল্লেখ্য 'বঙ্গ' শব্দের দ্বারা বাংলার এক ব্যাপক অংশকে বুঝাতো, যার অবস্থিতি আমরা লক্ষ করি ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে। ভাগীরথীর পশ্চিমাংশকে বলা হত রাঢ় দেশ। রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিলো অঙ্গ দেশ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ। এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও গঙ্গা নিয়েই বাংলা। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে বাঙালির আবাসভূমি বঙ্গ দেশ প্রাচীন কালে বহু জাতির আবাসস্থল হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিলো। অন্তর্বর্তীকালে এদের অনেক নাম ছিলো। যেমন, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, জঙ্গল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি। এ সকল রাজ্যের ভৌগোলিক সীমারেখা এক এক যুগে এক এক রকম ছিলো। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরলে তার পশ্চিমে অবস্থিত ছিলো জঙ্গল, রাঢ়, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, কর্বট, সূক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভুক্তি। আর এর পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিলো পুণ্ড্র, গৌড় ও বরেন্দ্র; মধ্যভাগে বঙ্গ ও দক্ষিণে হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, খাড়ি ও নাব্য।[২] চর্যাপদেও আমরা বঙ্গাল, বাঙালি নামের

---

* প্রাবন্ধিক ও গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উল্লেখ পাই, যদিও বঙ্গ-এর পরিবর্তে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তাতে আধুনিক পণ্ডিতদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন যে, "চর্যাপদে বাঙাল-বাঙালি নাম মিললেও 'বঙ্গ'-এর পরিবর্তে বাঙাল ব্যবহৃত হয় ইবনে বতুতার বৃত্তান্তে। মিনহাজ সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন 'বাংলা', 'বঙ্গ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন দেখতে পাই। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ স্বয়ং 'শাহ্'ই বঙ্গালা' নাম গ্রহণ করেই ১৩৩৮ সনে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন"।[৩] তুর্কি আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, আলাদাভাবে চিহ্নিত হতো। মুঘল আমলে এক বিস্তৃত পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলীয় ভূ-খণ্ড 'সুবাহ বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিলো। ঐতিহাসিক মতে, শাহজাহান-আওরঙ্গজেবের আমল থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যাপ্ত বঙ্গদেশ বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিলো।[৪] ব্রিটিশ সরকার আমলে সমগ্র ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখন ছিলো অন্যরকম। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের ১৭৫৮ নং আদেশদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তখন ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ ভারত বারোটি বিভিন্ন শাসন বিভাগে বিভক্ত ছিলো, যথা- ১. বেঙ্গল ২. বোম্বে ৩. মাদ্রাজ ৪. উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ৫. পাঞ্জাব ৬. আসাম ৭. মধ্যপ্রদেশ ৮. ব্রিটিশ ব্রহ্ম ৯. বেরাব ১০. মহীশুর ও কুর্গ ১১. রাজপুতানা ও ১২. মধ্য ভারত। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আয়তন ছিলো পাঞ্জাবের পূর্ব-সীমান্ত থেকে ব্রিটিশ-ব্রহ্মের সীমান্ত পর্যন্ত। তার মানে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু নানারকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে খর্ব করার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলো। তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিলো বঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীপ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়।[৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন- "আমার বিশ্বাস বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনো ঋষির পাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর একথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই, বাঙালিও তেমনি।"[৬] সাধারণত বাংলাভাষি জনসাধারণের আবাসভূমিকেই 'বাংলা' বা 'বঙ্গদেশ' এবং বঙ্গদেশীয় জাতিকে 'বাঙালি' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সহজ কথায় ভারতে ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলা নামে একটি প্রদেশ ছিল- একে বেঙ্গলা বলা হত। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে এসময় বাংলার পশ্চিমাংশ পশ্চিমবাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্ববাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭] আসলে উভয় বাংলায় জাতিগতভাবে ও ভাষাগতভাবে বসবাসরত লোকজনকে বাঙালি জাতি বলা হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা উভয়েই বাঙালি জাতির আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত। তাছাড়া বাঙালি বলতে বুঝায় মাতৃভাষা বাংলা এমন জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তাগত অভিধা।[৮] এসব বিষয় বিবেচনা করে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে বাঙালি বলে অভিহিত করতে আর কোন বাধা নেই। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে বাংলা বা বঙ্গদেশের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে দেখতে পাই।[৯]

ক্ষণজন্মা প্রতিভা কাজী নজরুল শত অভাবের মধ্যেও কাব্য সাধনায় ছিলেন অটল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যেখানে ছিলেন প্রাচুর্যময় জমিদার, সেখানে নজরুল ছিলেন ভূমিহীন, উদারপন্থী ও সার্বজনীন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যভাবনা সর্বজনবিদিত। সাম্যের গান গেয়ে তিনি ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় আসন করে নেন। পরিণত হন মুকুটহীন সম্রাটে। পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও নানা আনুকূল্যে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে 'দ্বিতীয়' জন্মভূমি। এখানকার আলো-বাতাস তাকে শুধু দৈহিকভাবেই বৃদ্ধি করেনি, মেধা-মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনেও নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়। তার আবেগদীপ্ত 'চল চল চল' কবিতাটি আমাদের রণসঙ্গীত।[১০] আজও তিনি বাঙালির অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। ধূমকেতুর তীব্রগতির আঘাতে যিনি জাগিয়েছেন বাঙালির চেতনার জগৎ। সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের চোখে স্বপ্নের আগুন জ্বেলে দিয়ে গেয়েছেন জীবনের গান। জীবন আর মানুষের অমিত তেজোদ্দীপ্ত ক্ষমতার জয়গান করেছেন কেবলই নজরুল। এক এবং অভিন্ন সত্তায় তিনি প্রেম দ্রোহকে সমানভাবে লালন করতেন। নজরুল বিদ্রোহে যেমন রণহুংকার দিয়েছেন আবার বাঙালি চেতনায় প্রেমের জাদুকরী বাঁশিতে তুলেছেন মোহন সুর। বিশ্ব মানবতার প্রতি আজন্ম পক্ষপাত তাঁকে অনন্য উচ্চতায় আসন করে দিয়েছে। তাঁর কবিতায় তেজোদ্দীপ্ত উচ্চারণ আর সঙ্গীতের মোহনীর সুরে সে কথাই ধ্বনিত বাঙালির প্রাণে-মনে।[১১]

দীর্ঘায়ু পেলেও তার সাহিত্য জীবন মাত্র ২৩ বছরের। এ স্বল্প পরিসর জীবনে নজরুলের বিপুল সৃষ্টিকর্ম বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঘটনা বহুল কর্মময় যেমন তার জীবন, তেমনি বিচিত্র তাঁর সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে উপমহাদেশের মুক্তির আন্দোলন এবং একাত্তরে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নজরুলের কবিতা ও গান ছিল অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। বাংলা গানের জগতে নজরুল সুর ও বাণীর ক্ষেত্রে ঘটিয়েছেন এক অনন্য বিপ্লব। এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য তিনি। এখন বাঙালি জীবনে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে তার বিচিত্র রচনা। তাই তো তিনি বাঙালি তথা বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তার গান আমাদের রণসঙ্গীত। তিনি সামাজিক বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[১২]

বাঙালির সাহিত্য চর্চায় নিজের জাত বা সম্প্রদায়, ধর্ম বা সংস্কৃতির গণ্ডি পেরিয়ে অপরের আঙিনায় চোখ ফেরানোর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক অভিমান অনেক তর্ক আছে। কি রবীন্দ্রনাথ, কি শরৎচন্দ্র- মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষোভ- মেশানো অভিযোগ থেকে এঁদের কেউই রেহাই পাননি। সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহে এঁরা নাকি অন্য সমাজের কাছে যাননি- সবচেয়ে কাছের পড়শি মুসলমানের জীবন-সংস্কৃতি-ধর্ম-সমাজ এসব বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহী বা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অবশ্য এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়, আবার একেবারে অগ্রাহ্যও করা চলে না। কিন্তু অভিযোগ-কৈফিয়তের এসব উতোর-চাপানের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ছিলেন ব্যতিক্রম। শুধু ব্যতিক্রম নন, বিরল ব্যতিক্রম। নজরুলের কবিতা ও গানে হিন্দু পুরাণ-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি যেভাবে রূপায়িত-চিত্রিত হয়েছে তার তুলনা হয় না। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর সাধনা ছিল মেলা আর মেলানোর- সমন্বয়ের। বিয়ে করেছেন হিন্দু ঘরে, কিন্তু স্ত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নজরুলের কাছেই থাকতেন। আচারনিষ্ঠ এই হিন্দু-বিধবা অবাধেই তাঁর ধর্ম পালন করতেন। জাতি ধর্মের কথা বিবেচনা না করে অসুস্থ হিন্দু যুবকের রক্তের প্রয়োজনে নজরুল এগিয়ে এলেও সাড়া মেলেনি সেই হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে। কারণ নজরুলের ধর্মপরিচয়। দুঃখ পেয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন এবং তাঁর ক্ষোভ-মেশানো আফসোসের কথা চিঠি লিখে জানিয়েছেন প্রিয় বন্ধু 'মোতিহার'কে- মানে কাজী মোতাহার হোসেনকে। তবুও নজরুল শত সংকটেও তাঁর মিলন-কামনার ব্রত থেকে নিজেকে কখনো সরিয়ে নেননি।

নজরুল হয়ে উঠেছিলেন সর্বজনীন- ছিলেন বিশুদ্ধ বাঙালিও। তাঁর আবেগ ও চেতনায় বাংলা ও বাঙালি তার সকল গৌরব-মহত্ত্ব-সম্ভাবনা নিয়ে বন্দিত ও প্রকাশিত। 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখির ঝড়/তোরা সব জয়ধ্বনি কর'- 'প্রলয়-নেশায় নৃত্য-পাগল' হয়ে নজরুল জীর্ণ-পুরাতনকে বাতিল করে যেমন সৃষ্টিশীল 'নূতন'কে আহ্বান করেছেন তেমনি অন্তর থেকে কামনা করেছেন- 'বাঙালির জয় হোক'। 'জয় বাংলা'- বাঙালির এই জাগরণের এবং সেই সঙ্গে উল্লাস-প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞার মন্ত্রটিও প্রথম তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে।[১৩]

কবি ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি বলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার কবি সহ্য করতে পারেননি বলেই তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন। জনগণকে অত্যাচারমুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করতে চেয়েছিলেন বলেই নজরুল বিদ্রোহ করেছিলেন। মানুষের উপকার করা ও মানবকল্যাণ সাধন করা স্রষ্টারই নির্দেশ। সে জন্যই কবি লিখেছেন, 'আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না।' নজরুল মূলত সত্যের বিজয় চেয়েছেন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃত অর্থেই নজরুল উৎপীড়িত জনগোষ্ঠীর কবি, প্রেম প্রকৃতি ও দ্রোহের কবি। যার দ্রোহী সত্তার প্রতিফলন পাই তার কবিতার ছত্রে ছত্রে। প্রেম বিরহ ও প্রকৃতি চেতনা যার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ।[১৪] নজরুলের এসব আহ্বান কি পুরনো হয়ে গেছে, নাকি এখনো প্রাসঙ্গিক আছে সে কথা বিবেচ্য নিশ্চয়ই। নজরুলের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিল ইংরেজ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। ভারতবর্ষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে আসাই যে চূড়ান্ত কথা নয়, সে কথা বোঝা গেল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার আদর্শ থেকে। সেখানে আগেকার উপনিবেশবাদ নব-উপনিবেশবাদে রূপান্তরিত হলো। দেখা দিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। নজরুল এই সংগ্রামে প্রেরণাদাতা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণে রইলেন। বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর যে ঘোষণা, তাতে তিনি নির্দিষ্ট কোন উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে নন, তিনি সর্বপ্রকার উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানি নব-উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠল, তখন নজরুল এসে দাঁড়ালেন এখানকার গর্জনমুখর মিছিলের অগ্রভাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো ১৯৭১ সালে। মুক্তির সংগ্রাম শেষ হলো না; বরং নতুন নতুন সংকটে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন নতুন বিপর্যয়ের মুখে ফেলা হতে থাকল। বাংলাদেশ বর্তমান সময়েও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই কাল অতিক্রম করছে। এই বিপর্যয় অতিক্রম করার প্রেরণাও নজরুল রচনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।[১৫]

নজরুল গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের ভাষায় বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে উপমহাদেশে অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব নজরুল। তিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতারও পথিকৃৎ। নজরুল তাঁর কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরাধীন ভারতে, বিশেষ করে বিভক্ত বাংলার পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সোচ্চার ছিলেন। সে কারণে ইংরেজ সরকার একের পর এক তার গ্রন্থ ও রচনা নিষিদ্ধই শুধু করেনি; শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিতও করেছিল। রাজবন্দি নজরুল প্রায় চল্লিশ দিন একটানা অনশন করে ইংরেজ সরকারের জেল-জুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন।

নজরুল গবেষক ও প্রেমিক কবি আবদুল হাই শিকদারের ভাষায়, 'আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতেরও সবচেয়ে বড় রূপকার নজরুল। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির পরতে পরতে আছে সব যুগের সব মানুষের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সমান আতিথ্য। নজরুল একমাত্র কবি, যিনি কাউকে বড় করতে গিয়ে অন্যকে ছোট করেননি। 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান', 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন'- এমন কথা তাঁর আগে এ ভাষায় কেউ বলেননি। বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চারণ 'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'-এটাই নজরুলের দর্শন। তাই বাংলাদেশের জাতীয় কবি হয়েও তিনি বিশ্বকবি, বিশ্বনাগরিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মতো।[১৬] তিনি অবিভক্ত বাংলায় জন্মেছেন, বাংলা ভাষায় লিখছেন, বাঙালির জীবন সমস্যাকে তুলে এনেছেন তাঁর লেখায়; তাই বাঙালি সমাজ তাঁকে নিজেদের কবি বলে ভাবছে। সে সত্যি নিশ্চয়ই বাঙালি তো তাঁকে নিজেদের কবি বলে ভাববেই। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, নজরুল জগতের সব মানুষের জন্যই ভাবছেন। বাংলা ভাষায় লিখছেন বলে তিনি সব মানুষের কাছে পৌঁছছেন না; কিন্তু তাঁর অন্তরে যে বেদনা, ভাবনায় যে বিদ্রোহ তা সব মানুষের জন্যই।[১৭]

নজরুল বলেন, 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি, এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণাভুজঙ্গ প্রখর দর্শন শার্দূল পশুরাজের ভ্রুকুটি...। আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে, তারা যেন সকলের তরে দেখেন। আমি এই দেশের এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।... তাই আমি বাঙালি সমাজের পাশাপাশি সকল সমাজকেই একই চোখে একই চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করি। নজরুলের মানপত্রে এস. ওয়াজেদ আলী বলেন, 'কবি তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালিকে চিরঋণী করিয়াছ। তুমি তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত, সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করো। তোমার কবিতা বিচার বিস্ময়ের উর্ধ্বে, সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা ঝরণার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালি যুগসম্ভাবনার বিচিত্র লীলা বিশ্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে অভিনন্দন লও।

বাংলার মানুষ কাব্যকণ্ঠ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে তাহার ছাড়া বাঙালির পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় হে অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক বন্দনা গ্রহণ করো। তুমিই বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠে জয় ইঙ্গিত নত মস্তকে চয়ন করিতেছে। তাহার হাতের পতাকা তোমার মহিমায় উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিবাদনে তুমি নয়নপাত করো।

তুমি বাঙলার মধুবনেরও শ্যামা কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার শাখে আঙ্গুল লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালির শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকির লাল সিরাজির আবেশ বিহ্বলতা দান করিয়াছ।... ধুলার আসনে বসিয়া বাঙালির মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি।[১৮]

নজরুলের বাঙালি চেতনায় আরো বিস্ময়করভাবে আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে উঠে তার রচিত বাউল, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, ঝাপান, কাজরি, ছাদ পেটানো গান, গণসঙ্গীত, মেয়েলি গীত, ঘুমপাড়ানি গান, রাখালি গান, মাঝির গান, লোকগান, গ্রাম্যসঙ্গীত, স্বদেশীগান, ভক্তিসঙ্গীত, ভজন, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গানের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, বাংলা লোকসঙ্গীতের একটা উল্লেখযোগ্য ধারা হলো ভাটিয়ালি। অর্থাৎ বাঙলার নদীতে ভাটির স্রোতে নৌকা প্রবাহিত হওয়ার সময় গীত হওয়ার কারণে এর নাম হয়েছে ভাটিয়ালি এবং এ গান যে সুরে গাওয়া তার নামও ভাটিয়ালি। নজরুলের ভাটিয়ালি সুরে রচিত পদ্মার ঢেউ রে, ও মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যা রে, চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে, একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা প্রভৃতি গান রীতিমতো ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তিসম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ,

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে কিছু গান লিখলেও সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কেউ বাংলা গান লিখেননি। এদিক দিয়েও নজরুল এক অলৌকিক সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণে নজরুলকে বাংলা গানের জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ আর সুরের সমন্বয়ে তার গানগুলো হয়ে উঠেছে রসের এক চিরন্তন উৎস।[১৯]

কাজেই উপরের আলোচনার মাধ্যমেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গল্প, গান, কবিতা, নাটক, প্রভৃতি লেখনীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে বাস্তবসম্মত পথে সঞ্চালিত করে বাঙালির মননে ও মানসিকতায় সচিত্র প্রতিবাদন হিসেবে নিজেকে স্থান করে নিয়েছেন যা বাঙালি চেতনায় উজ্জীবিত এক মহৎ দৃষ্টান্তের দাবিদার।

তথ্যসূচি:

---

১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তাধারা: আমূল পরিবর্তনবাদী প্রবণতা, ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *বাঙালীর চিন্তাধারা: আধুনিক যুগ*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৯

২. অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩

৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩-৪

৪. আহমদ শরীফ, বাঙলা, *বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩-৪

৫. মোঃ মতিউর রহমান, বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৮০

৬. রমাপ্রসাদ চন্দ্র, *ইতিহাসে বাঙালী*, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩৯

৭. ড. রামদুলাল রায়, বাঙালির দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৭

৮. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৯৬

৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পাটনা, ১৯৯০, পৃ. ১

১০. আবুল আসাদ সম্পাদিত, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ বৈশাখ, ২০১৩, পৃ. ৭

১১. শ্যামল দত্ত সম্পাদিত, ভোরের কাগজ, ২৫ মে, ২০১৩, পৃ. ১

১২. আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত, দৈনিক ইত্তেফাক

১৩. গোলাম সারওয়ার সম্পাদিত, দৈনিক সমকাল, ২৫ মে, ২০১৩

১৪. মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ সম্পাদিত, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ মে, ২০১৩

১৫. ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদিত, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ শে ২০১৩, পৃ. ১০

১৬. মাহামুদুর রহমান সম্পাদিত, দৈনিক আমার দেশ, ২৫ মে, ২০১২, পৃ. ৬

১৭. ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদিত, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ মে, ২০১২, পৃ. ১৬

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. গোলাম সারওয়ার সম্পাদিত, দৈনিক সমকাল, ২৫ মে, ২০১২, পৃ. ৪

বাঙলা সাহিত্যিকী